বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১লা শ্রাবণ ১৩৬১
চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৯০ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীপ্রাণকুমার মুখার্জী কর্তৃক অ্যাপ্টুল এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ৯১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	...	গোপাল হালদার	/০
আদর্শ হিন্দু-হোটেল	...	...	১
বিপিনের সংসার	...	...	১৬৫
বেণীগীর ফুলবাড়ী			
কুয়াশার রঙ	...	...	৩৪৩
মাস্টার মশায়	...	...	৩৫৪
তিরোলের বালা	...	...	৩৬০
জনসভা	...	...	৩৭৩
প্রত্যাবর্তন	...	...	৩৮২
প্রাবল্য	...	...	৩৮৮
বাঁশি	...	...	৩৯৫
পাঁচুমামার বিয়ে	...	...	৪০১
শান্তিরাম	...	...	৪১৩
ফিরিওয়ালা	...	...	৪২৬
নিষ্ফলা	...	...	৪৩৩
বেণীগীর ফুলবাড়ী	...	...	৪৩৭

বিভূতিভূষণ ও তাঁর পত্নী রমাদেবী

ভূমিকা

'শেক্‌স্‌পীয়র যদি শুধু সনেট্‌গুলিই লিখতেন তবু তিনি হতেন শেক্‌স্‌পীয়র'—এমন একটা উক্তি নাকি শেক্‌স্‌পীয়র-ভক্ত মহলে প্রচলিত। কিন্তু আমরা কে শেক্‌স্‌পীয়র-ভক্ত নই—দু'একজন তলস্তয়-বার্নার্ডশ'কে বাদ দিলে? তথাপি ভক্তির মাত্রা অত্যধিক না হলে আমরা মনে মনে বুঝি—এ উক্তিটা বহু পরিমাণে অত্যুক্তি। সনেট্‌গুলি উৎকৃষ্ট রচনা। সেদিনে শেক্‌স্‌পীয়র ব্যতীত আর কেউ তা লিখতে পারতেন না, ওয়াট্‌, সারে, বেন্‌ জনসন্‌ কেন, মার্লো বা মিল্টন কেউ না। আর, এদিনে ও-রচনা অসম্ভব—সে যুগই নেই। কিন্তু শুধু সনেট্‌গুলি দিয়েই কি শেক্‌স্‌পীয়র শেক্‌স্‌পীয়র?—নিশ্চয়ই না। অন্ততঃ আমাদের মত পাঠকরা তাতে নিঃসন্দেহ। সেরূপই আবার মানব—শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট্‌গুলিও শেক্‌স্‌পীয়রেরই লেখা সম্ভব, অন্যের তা অসাধ্য। 'বড় লেখকের ছোট কাজ'—minor works of major writers—ছোট নয়। তার মধ্যেও বড়'র স্বাক্ষর অভ্রান্ত। সে স্বাক্ষর হয়তো অস্পষ্ট, কিম্বা প্রচ্ছন্ন—অদৃশ্য কালিতে লেখা; কিন্তু পাঠকের মনে তার স্পর্শ লাগে, আর সে স্পর্শ পেতেই তার আভাসও মনে সঞ্চারিত হয়, মন সকৌতুহলী স্বীকার করে, 'তুমিই। সাধারণের মধ্যেও তোমার অসাধারণতা হারিয়ে যায় নি।' এসব লেখায় লেখকের পরিচয় প্রসারিত হয়ে যেতে যেতে তার শক্তির সীমাও যেমন প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি তার অপরাজেয়তাও অনস্বীকার্য হয়ে ওঠে, দুয়ে মিলে পাঠকের সঙ্গে লেখকের পরিচয় সুস্থির এবং সম্পূর্ণ হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (আশ্বিন, ১৩৪৭), 'বিপিনের সংসার' (শ্রাবণ, ১৩৪৮) ও 'বেণীগীর ফুলবাড়ী' (বৈশাখ, ১৩৪৮)—এ তিনখানা বই বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ কীর্তির মধ্যে গণ্য নয়,—এ সব দিয়েই বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণ, তা নয়; কিন্তু এসব নিয়েই বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণ; বিভূতিভূষণেরই তা রচনা, তাঁর সৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। এসব লেখার মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণের পরিচয় কীর্তির একটি শৈলশৃঙ্গে কেন্দ্রিত হয়ে নেই; জগৎ ও জীবনের সমতল দেশে আলোছায়ার জাল বুনে ছড়িয়ে পড়তে চেয়েছে। অনেকটা দৈনন্দিন পরিচিত আলোর মত অলক্ষিত তার সহজ শ্রী।

(২)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল পরিচয় বাঙালি পাঠকদের নিকট সুবিদিত। 'রচনাবলী'র পূর্ব-পূর্ব খণ্ডে তা বিবৃত হয়েছে, প্রতি খণ্ডের ভূমিকায় সুযোগ্য সমালোচকগণ নিজ নিজ আলোচনায় তা পরিস্ফুট করে তুলে ধরেছেন। এই ষষ্ঠ খণ্ডে সে সবের পুনরুল্লেখ অসম্ভব। কিন্তু এ খণ্ডের পাঠকের পক্ষেও সেই পরিচয় মনে রাখা প্রয়োজন। তার মূল সূত্রগুলি তাই একবার নির্দেশ করা যেতে পারে—যদিও তা অত্যন্ত নীরস শোনাবে—পাঠককে তৃপ্তি দেবে না।

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে সহজ বিস্ময়-দৃষ্টি—কতকটা তা কবি-সুলভ, কতকটা শিশুসুলভ, কিন্তু সততায় সুস্থির ; অকৃত্রিম নিসর্গানুভূতি বা প্রকৃতি-প্রীতি ; অকুণ্ঠিত রহস্যানুভূতি বা অন্তর্মুখিতা ; এবং সাধারণ জীবনযাত্রার শ্রী ও মাধুর্য বোধ—এই চার মূল সীমায় বিভূতিভূষণের মূল সাহিত্য-পরিচয়কে স্থাপিত করা যায় ;—অবশ্য যদি সংকীর্ণ করে কথাটা আমরা গ্রহণ না করি, এবং মনে রাখি, শুধু সূত্র দিয়ে যে পরিচয় সে পরিচয় কিছুতেই সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। সূত্রের সার্থকতা পাঠকের বিচারবুদ্ধিকে কতকটা অবলম্বন যোগানো। কিন্তু বিভূতিভূষণের স্বকীয়তার স্বরূপ তাতে বিশেষ ধরা পড়ে না—তাও কতকটা বোঝা চাই।

যেমন বিভূতিভূষণের নিসর্গপ্রীতির ও রহস্যানুভূতির কথা ধরা যাক্। রহস্যবোধের সে ঐতিহ্য যে কত সুদূরাগত, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অতুলনীয় বিদ্যাবত্তায় তা নির্দেশ করেছেন। তিনি 'আরণ্যকে'র স্রষ্টাকে 'অরণ্যশ্রী' উপাধিতে বরণ করতে চান ; মোটেই তা অসমীচীন নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ যে সে তুলনাতেই 'পল্লীশ্রী' উপাধিরও অধিকারী 'পথের পাঁচালী' থেকেই তো তাও আমরা উপলব্ধি করেছি। আবার তখন থেকেই সুস্পষ্ট তারা-ভরা আকাশ ও বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি বিভূতিভূষণের আন্তরিক অনুভূতি। মানবশৈশবের এই সহজ বিস্ময় তার হৃদয়ে যে জেমস্ জীন্স্-এর 'মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' বা আধুনিক প্রাণ-তত্ত্বের গ্রন্থাদি পাঠে, নতুনতর সরসতা অর্জন করেছে, এ কথাও বুঝি।

আবার কোনো কোনো দিক থেকে দেখলে মনে হবে বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের অংশীদার, এবং ওয়ার্ডস্ওয়ার্থেরও। প্রকৃতি অনুরাগের কথায় ওই দু'জন মহারথীর কথা বিশেষ করে এসে পড়ে। কারণ ও দুজনার মতোই বিভূতিভূষণের নিসর্গানুভূতি তাঁর রহস্যানুভূতির বা অধ্যাত্মমুখিতার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু সেখানেও মিল যতটা, পার্থক্য তার অপেক্ষা কম নয়—বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মতত্ত্ব যে পরিমাণে পরলোকে বিশ্বাস ও প্রেততত্ত্বের কাছাকাছি গিয়ে ঠেকে, রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের নিকট তাতে তা গ্রাহ্য হবার কথা নয়। অনেক রহস্যবাদীর দৃষ্টিতেও ওরূপ অতিপ্রাকৃতানুরাগ অপরিণত অধ্যাত্মচেতনারই প্রমাণ।

বিভূতিভূষণের এ বোধও যেন মানব-শৈশবের 'এনিমিস্টিক' বোধেরই সগোত্র। তাই বলে বিভূতিভূষণ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রাণশক্তির যে অপরাজেয় প্রকাশ অনুভব করেন, তা মোটেই বিভ্রান্ত নয়, শিশুচিত্তও নয়।

ভারতীয় বৈদিক ঋষিদের ভাবনায় এই প্রাণ-ভাবনারও মূল রয়েছে,—'প্রাণ এব একতি' ছিল যাঁদের সুস্থির উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথকে তো এই সত্যের নব-মন্ত্রদ্রষ্টাও বলা চলে। কিন্তু বিভূতিভূষণ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের 'এলাঁ ভিতাল' বা 'লাইফ-ফোর্স' ধারণার সঙ্গেও নিজের আত্মীয়তা স্বীকার করতেন, সে কথাও আমরা জানি। মূল কথাটা এই—এরূপেই বিভূতিভূষণের স্বকীয়তা—জগৎ ও জীবনকে চোখ মেলে দেখা, ও সে দেখায় বিস্ময় অন্তর্মুখিতায় অনুরঞ্জিত। এই আপন সীমাতেই বিভূতিভূষণের দৃষ্টি সার্থক ; তার বেশি সম্পূর্ণতা তাতে প্রত্যাশা করা বৃথা।

বিভূতিভূষণের এই নিজস্ব ধর্ম ও তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা বিভূতিভূষণের রহস্যবোধের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অধ্যাত্মচেতনার পার্থক্যের আরেকটি দিক স্মরণ করি। বিভূতিভূষণ বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে কল্যাণের প্রকাশ ও বিকাশ দেখতেই অভ্যস্ত। এ বিশ্বাসও তাঁর স্বভাবগত—জীবন-জিজ্ঞাসার ফল নয়। শিশুর মতোই এই অনুভূতিতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। (রবীন্দ্রনাথ বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিকট এই কল্যাণবোধ অত সরল নয়। তা জটিল জীবন-জিজ্ঞাসার পরিণত ফল, যে কঠিন জীবনবোধে stern daughter of the voice of God রূপে নিজের স্বধর্মকে চিহ্নিত না করে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উপায় থাকে না, যাতে 'অমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন' বলে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি সুদৃঢ় হয়, সেরূপ প্রাজ্ঞ কোনো উপলব্ধি বিভূতিভূষণকে আলোড়িত করে নি, তাঁকে অশান্ত করে নি। তাঁর মঙ্গলবোধ যন্ত্রণাবর্জিত এবং এই তাৎপর্য বঞ্চিত, কিন্তু সে বোধ অকৃত্রিম ও আন্তরিক, তাতে সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের নিসর্গানুভূতির মধ্যেও সেরূপ প্রৌঢ়ত্বের গাম্ভীর্য এ কারণেই দুর্লভ। Nature red in tooth and claw তাঁর লেখায় যথাসম্ভব নেপথ্যে নির্বাসিত; শঙ্কা, ত্রাস, অন্ধকারের অনুভূতি প্রায় অনুপস্থিত। The sounding cataract/Haunted me like a passion,...এ কথাও বিভূতিভূষণের পক্ষে বলা দুঃসাধ্য; কারণ, তাঁর অনুভূতি দুর্দান্ত 'প্যাশানে'র কাছেও ঘেঁষতে চায় না। 'সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম/সে কখনো করে না বঞ্চনা'—এ কথাও বিভূতিভূষণ বলতে পারতেন না।)

কিন্তু একথা তেমনি সত্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো বিভূতিভূষণেরও বিশ্বাস—প্রত্যেকটি ফুলই বাতাসে যে শ্বাস গ্রহণ করছে তা অনুভবও করে; —every flower enjoys the air it breathes—তিনিও বলতে চেয়েছেন 'দরিদ্রের ক্ষুদ্র ও সরল জীবন-কথাই— short and simple annals of the poor'—পৃথিবীর পরম বিস্ময়কর সত্য। দুটি ধারণাই কবি রবীন্দ্রনাথে ও গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথেও সমুজ্জ্বল প্রকাশ লাভ করেছে। "প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এক-একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সেই জগৎ ধরা দেয়।...মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকালের আগ্রহ"—এ মর্মের কথা বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে চিঠি-পত্রে সর্বত্র ছড়ানো। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের নিকটে পত্রে কথাটার অপর অর্ধাংশেরও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন—মহৎ বা বৃহৎ মানুষের কর্মময় জীবনে বা সমাজ-সত্যের বৃহৎ কোনো প্রকাশে সেই 'চিরপুরাতন কথার' কোনো অভিজ্ঞান তিনি দেখতে পান না। অথবা দেখতে চান না। মানুষের সহজ অনুভূতি, ব্যক্তির হৃদয়মনের চিরদিনকার রহস্য, সরল গৃহস্থ জীবনের প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-মমতা; কিম্বা বিশ্বরহস্যে উদাসীন মানুষের স্বপ্নময় অন্তবিচরণ,—এসবই তো পৃথিবীর আদিম ও অকৃত্রিম সত্য। কারণ প্রকৃতি ও জীবনের দ্বৈতলীলা মানুষের সমাজ ও সভ্যতার সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নের থেকেও অনেক বেশি প্রাচীন, তাই সনাতন। মানুষের জীবন-যুদ্ধের অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্তন সে তুলনায় সাময়িক ও গৌণ। ইতিহাসব্যাপী মানুষের মহৎ প্রকাশের মধ্যে—বিরাটের সাধনায়—প্রাণলীলার কোনো বিশিষ্টতা বা বিস্ময়করতা নেই। সেই শাশ্বত বৈচিত্র্য আছে বরং নামহীন কীর্তিহীন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায়।

তাদের সেই হাসিতে অশ্রুতে বিশ্বাসে মমতাতেই বিশ্ববিধাতার মহদভিপ্রায় প্রকাশমান। সে প্রকাশ প্রসন্ন সরল নিরুদ্বেগ ও মসৃণ, বিভূতিভূষণ অন্তত তা'ই বোঝেন। মানব-সত্তাকে—সমাজ-সত্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে—এই রহস্যাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মানুষকে দেখাই বিভূতিভূষণের প্রায় স্বভাব। 'পল্লীসমাজে'র সুস্পষ্ট কঠোর বাস্তবতা, দুই মহাযুদ্ধের বিপুল বিস্ফোরণ, সভ্যতার বিপর্যয়, জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশের আলোড়ন,—কিছুতেই বিভূতিভূষণের যায় আসে না। এমন কি, ব্যক্তিজীবনের তীব্র-জটিল গতি—জীবনের প্রায় সমস্ত দুর্যোগ, কালের সমস্ত উদ্বেলতা,—তাঁর দৃষ্টির অগোচর। তাঁর আবেগলালিত নায়কেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ শিশু, অশান্ত কৈশোর ও দুরন্ত যৌবনের মধ্যে দিয়ে মানুষ হয়ে উঠতেও ভুলে গিয়েছে। বিস্ময়-বোধ ও রহস্যানুভূতিতে তারাও চিরশিশু।

এই ষষ্ঠ খণ্ডের গ্রন্থ তিনখানায় আমরা বিভূতিভূষণের এই স্বকীয় জীবনদৃষ্টিরই পরিচয় পাই। 'Short and simple annals of the poor' তাঁর এ সব গ্রন্থের বিষয়। রোমান্টিক বিস্ময়-বোধ ও কবিচেতনাকে এসব নবেলের ক্ষেত্রে অনেকটা নেপথ্যে রাখতে হয়েছে। মূলতঃ, 'সামান্যের মধ্যে অসামান্যের উদ্‌ঘাটনই' এর মর্মকথা। বাহ্যতঃ, তা বাঙলা দেশের অতি সাধারণ নরনারীর অতি সরল হৃদয়-মনের কাহিনী, চোখে যা প্রতিদিন দেখা যায়, কিন্তু দেখবার মত মন নেই বলে যা আমরা দেখেও দেখি না, অথবা দেখেও তার তাৎপর্য বুঝি না, তার অসামান্যতা অনুভব করতে পারি না, বিভূতিভূষণের চোখ তা এড়িয়ে যায় না। তাঁর দৃষ্টির সততা, তাঁর মনের সারল্যের মতই এ ক্ষেত্রে অকুণ্ঠিত। কারণ দেখবার মত শুধু দৃষ্টিই তো না, মনও যে তার আছে। তাই দেখতেও তার পরম আগ্রহ ; সমস্ত খুঁটিনাটি, ছোট কথায়, সুখ-দুঃখেই তিনি পরম উৎসুক। তিনি বলতে পারেন—সততার সঙ্গেই বলতে পারেন,—এই বাঙলা দেশের নগণ্য সাধারণ মানুষের জীবনও অদ্ভুত, 'যা দেখেছি, যা পেয়েছি (নিজের অন্তর্মুখী দৃষ্টিতে) তুলনা তার নাই।' সযত্ন কৌশলে জীবনের এই বিশেষ রূপটি—সমস্ত সহজ খুঁটিনাটি সুদ্ধ—বিভূতিভূষণ এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। এ কলা-কৌশল,—বাস্তববাদীর নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন—সহৃদয় শিল্পীর। মহৎ সৃষ্টি নয়, কিন্তু এ সব সফল রচনা, সততায় সার্থক।

(৩)

ঘটনার ঘনঘটা বিভূতিভূষণের কোনো উপন্যাসে বিশেষ নেই—'বিপিনের সংসারে'ও নেই। অজস্রতা আছে, সাধারণ নিয়মেই তা আসে, সে নিয়মেই ছোটখাটো জটিলতাও জোটে। 'বিপিনের সংসারে' তা যথেষ্ট।—নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশের গ্রাম্য যুবক বিপিন, ক্ষুদ্র এক জমিদারের নায়েব বিনোদ চাটুজ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শিক্ষাদীক্ষা সামান্য, প্রায় অপদার্থ হতে বসেছিল। পিতার মৃত্যুতে যে সামান্য বিত্ত-বিষয়ের সে অধিকারী হয়, প্রথম যৌবনেই প্রায় নির্বোধের মত নেশায় ও মেয়েমানুষে তা উড়িয়ে দিয়েছে। তারপরে মধ্য যৌবনেই এখন বৃদ্ধা মা,

পত্নী মনোরমা ও পুত্র কন্যা ও বিধবা বোন্ বীণাকে নিয়ে সপরিবারে প্রায় সম্বলহীন। ছোট ভাই বলাই নিজের খাটা-খাটুনিতে যা সংস্থান করে তা আঁচরেই আর জুটবে না। বলাই মরণের পথে, কুপথ্যের লোভে মরবেও। বিপিনও অনিচ্ছায় তাই পিতার চাকরি গ্রহণ করেছে—যদিও তার না আছে গ্রাম্য নায়েবের দাপট, না কর্মপটুতা। জমিদার অনাদি চৌধুরীও তা জানেন, তাঁর স্ত্রীও জানেন, আরও বিশেষ করে জানে তাঁদের বিবাহিতা কন্যা মানী। বাল্যে কৈশোরে সে বিপিনদা'কে অনেক সময় দেখেছে, তার সঙ্গে খেলেছে,—বিপিনের থেকেও বিপিনকে চিনেছে মানীই বেশি। জমিদার-বাড়িতে খাওয়া শেষ করে বিপিন বহির্বাটিতে যাবার সময়ে জানালার গরাদ ধরে ঘরের মধ্য থেকে সেই মানীই প্রথম ডাক দিলে, 'বিপিনদা'। বর নরেনের সঙ্গে মানী এসেছিল তখন পিত্রালয়ে। পিত্রালয়ে কন্যা একটু মুক্ত স্বাধীন নিশ্চয়ই। কৌতুহলে ও চপলতায় তাই এগিয়েও সে গেল—পুরনো সৌহার্দ্যে। তারপর যথানিয়মে মানীর সেই প্রীতির স্পর্শেই এসে বিপিন সচেতন হল—এ এক নতুন ভাব, শুধু বাল্যের সখ্য নয়, নারী-পুরুষের পরস্পরের আকর্ষণ যা সংসারের ও সংযমের নিয়ম না ভাঙলেও মনকে স্বস্তি দেয় না, আবার যা অশান্ত মনকে মাধুর্যে ভরে রাখে। এর নামগন্ধও তার স্ত্রী মনোরমা জানে না। সে জানে বিপিনের সংসার। শাশুড়ী, দেওর, পুত্রকন্যা সকলকে সুদ্ধ সংসারটাকে আগ্‌লে রাখা ছাড়া মনোরমার আর কোনো সত্তা নেই। বিপিনও এতদিন জানত না, মানীর জন্যই তা জানল—'মানী তার জীবনে আলো দেখাইল'। সে পড়বে, পড়ে-শুনে হবে গ্রাম্য ডাক্তার,—মানুষ হবে। হ'লও তা'ই, গ্রাম্য ডাক্তার, অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ। সেই জীবিকার সূত্রে তার বাস পিপলিপাড়ায় দত্তদের বাড়ি। সে বাড়ির মেয়ে শান্তি বাপের বাড়ি এসে বিপিন ডাক্তারের মধ্যে কী দেখলে কে জানে। বিপিনের বুঝতে দেরি হয় না—তা শুধু ব্রাহ্মণ ডাক্তারবাবুর সেবা নয়, তার সঙ্গে মাধুর্যেরও সংযোগ ঘটেছে। কিন্তু বিপিন এত দিনে জানে—তাতে কষ্টই পেতে হবে দু'জনার। তবু যোগাযোগ যখন ঘটেছে—এদিকে বিপিনেরও পসার জমেছে—তখন আকস্মিক পুনরাবির্ভাব ঘটল মানীর। সে যাচ্ছে পিত্রালয়ে পিতৃশ্রাদ্ধে। সম্পর্কটা এবার সকরুণ মমতায় একটা সীমায় এসে যাচ্ছে। এসে গেলও। মানীই এবারও আলো দেখালে—শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক এবার সমাপ্ত করাই বিপিনের উচিত, না হলে অনর্থই ঘটবে। আর, 'যেখানেই থাক, বৌদিকে (মনোরমাকে) নিয়ে এসো তোমার কাছে।' বিপিন সে পথই গ্রহণ করবে—ওই তো তার সংসার। অবশ্য মানী রইল তার মন জুড়ে, আর বিলীয়মান শান্তির মুখটিও অনেকদিন ছিল তার মনে। মনোরমা তার প্রেমের আশ্রয় নয়, একটা রক্ষা-কবচ, সংসারধর্মের নিরাপদ অবলম্বন।

মুখ্য কাহিনীটি এরূপ। অবশ্য এ কাঠামোর মধ্যে আরও দু'টি ক্ষুদ্রতর উপাখ্যান জুগিয়েছে প্রয়োজনীয় আলোছায়া—পিতা বিনোদ চাটুজ্জের ও কামিনীর পূর্বযুগের প্রণয়কথা, আর বিধবা বোন বীণা ও পটলের খণ্ডিত পারস্পরিক আকর্ষণের কথা। সাধারণ গ্রাম্য প্রণয়ের দু'টি রূপ, অসামাজিক, কিন্তু ক্লেদহীন।

'বিপিনের সংসারে' বিশেষ লক্ষণীয় সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে বিভূতি-

ভূষণের অশেষ পরিচয় ও সহানুভূতি ; তাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি, তাঁর মমতা ও সহমর্মিতা ; তাদের সুস্থ হৃদয়ধর্মে তাঁর সুস্থ বিশ্বাস। অশান্ত হৃদয়াবেগও সরল মাধুর্যে ও মঙ্গলবোধে সমন্বিত হয়ে উঠে এসব সাধারণকে দেয় সহজশ্রী, বিবেকবুদ্ধি, সরল মনুষ্য-মর্যাদা ; সে রূপ আমরা দেখেও দেখতে শিখি না।

অবশ্য আরও দু-একটি সত্যও অলক্ষণীয় থাকে না।

বিভূতিভূষণ প্রেমের দুর্জ্ঞেয় গতি সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু প্রেমের আবিলতার প্রতি আগ্রহ-হীন, জটিলতার সম্বন্ধেও সতর্ক। তাঁর নায়কেরা মধুর রসের উপভোগে কুতূহলী, রমণী-রূপের প্রসাদ ভিখারী,—কিন্তু তাতে একটা মাত্রা পর্যন্তই তারা স্বচ্ছন্দ, তদতিরিক্ত আবিলতায়ও যেমন ভীত, প্রেমের গভীরতাও তেমনি তাদের অগোচর। তা ছাড়া বিপিন নামক সাধারণ মানুষটির মধ্যে এমন আকর্ষণীয় কী আছে তা বোঝা দুঃসাধ্য যদি আমরা মনে না রাখি—বিভূতিভূষণ নিজের কবিমনের শিশুচিত সারল্যের ও রহস্যবোধের একটু অধিকার তাকে দিয়েছেন, এবং মানী ও শান্তি শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রের ঐতিহ্যেই গড়া, সে হিসাবেই বিশ্বাস্য চরিত্র, এবং সেই রূপেই আমাদের প্রীতি ও সহমর্মিতার স্বাভাবিক উত্তরাধিকারিণী। কেউ তারা শিশু নয়, বরং হৃদয়ধর্মে নারী, প্রাণ-চঞ্চল মানবকন্যা—বাঙালী মেয়ের মত দুঃখ দেওয়া অপেক্ষা দুঃখ পেতেই তারা অভ্যস্ত।

(৪)

'আদর্শ হিন্দু হোটেল'এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে বাৎসল্য রস—অবশ্য যদি বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পরিভাষা অবলম্বন করে বলি 'বিপিনের সংসারে'র কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এক ধরনের মধুর রস, দুর্লভতর—'কামগন্ধ নাহি তায়।' হাজারি ঠাকুর লোকটি বিপিনের তুলনায় সাধারণ বুদ্ধির মানুষ, স্বভাবতই সৎ এবং অসতের প্রতিও বিমুখ হতে জানে না। এমন অসাধারণ মানুষ সংসারে থাকতে পারে—থাকলে এ দেশের সাধারণের মধ্যেই আছে। কিন্তু আশ্চর্য এই—সংসারে নিজের রন্ধনপটুতা ও সততার জোরেই সে দাঁড়াবার স্থান পায়, জীবনক্ষেত্রেও প্রায় অনায়াসেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এবং সেই প্রতিষ্ঠালাভের পরেও তার হৃদয়-মনে কোনো পরিবর্তনই ঘটে না। পদ্মঝি'র এককালের বৈরিতা যখন কৃতজ্ঞতায় পরিবর্তিত হয়, তখনি বরং হাজারি ঠাকুর তাতে লাভ করে জীবনের কৃতার্থতা। এ যেন এক নাম-হীন প্রচ্ছন্ন গান্ধী-চরিত্র। এ সবই আশ্চর্য, তবে বিশ্বাস্যও। কারণ হাজারি ঠাকুরও বিভূতিভূষণের আদর্শ প্রতিমা বা 'ইমেজ'—শিশুর মত সরল ; চূর্ণী নদীর পারে চোখ মেলে বসে থেকে সে দৈনন্দিন জীবনের শ্রম ও অপমান থেকে মুক্ত হয়ে যায়। হয়তো এ কারণেই আমরা মেনে নিতে পারি—কুসুমের মতো পসারিণী গোয়ালিনী, অতসীর মতো শিক্ষিতা ভাগ্যবতী, এবং নতুন পাড়ার গোয়ালা বউটির মতো অ-শিক্ষিতা বধূটি—কেউ তারা এই পিতৃ-প্রতিম প্রৌঢ়কে স্বেচ্ছায় ও গোপনে আপনাদের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বিশ্বাস না করে পারে না। না হলে তাদের এ আচরণ বিশ্বাস্য হয়ে উঠত না।

আসলে 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে' বিভূতিভূষণ জয় ঘোষণা করেছেন আদর্শের—হাজারি ঠাকুরের নয়। জয় ঘোষণা করেছেন অজস্র নর-নারীর, কয়েকটি টানে আঁকা চিত্রের মধ্য দিয়ে অজস্র মানব-বৈচিত্র্যের এবং বিভূতিভূষণের সেই অসামান্য দৃষ্টিশক্তির ও সাধারণ মানুষের প্রতি সীমাশেষ-হীন মমতা। রবীন্দ্রনাথ 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতে'র আলোচনায় যে কথাটি বলেছিলেন 'বিপিনের সংসার' ও 'আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র মত রচনার পক্ষে তা আরও সত্য—এসব রচনা দাঁড়িয়ে আছে তার সত্যের জোরে। বিভূতিভূষণের কবিদৃষ্টি, রহস্য-বাদিতা, প্রকৃতিপ্রেম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এসব কাহিনীকে সেই সরল অপূর্বতা দান করেনি। এখানে মুখ্য হচ্ছে একদিকে মানব-সত্য,—সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বস্ততা, অন্যদিকে প্রকাশ-সত্য—চোখ মেলে দেখা ও দেখানোর কুশলতা। এই দিক থেকে এ দুই বই যেন বিভূতি-ভূষণের 'অভিযাত্রিকে'রই অনুবৃত্তি। কত মেয়ে কত পুরুষ, সকলেই কত পরিচিত এবং অদ্ভুত, সাধারণ এবং বিশিষ্ট।

(৫)

নবেল যেমনই লিখুক বাংলা সাহিত্যিক ছোটগল্প লিখতে জানে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে একেবারে আমাদের জীবিত ঔপন্যাসিকরাও অনেকেই ছোটগল্পে সিদ্ধহস্ত। বিভূতিভূষণের সম্বন্ধেও একথা মিথ্যা নয়, এবং তাঁর ছোটগল্প অনেক সময়ে তাঁর উপন্যাস-গোত্রীয়। গল্পে তিনি প্রধান দু'টি দিকে বিশেষ কৃতী। শিল্পকর্মের দিক থেকে অনেক গল্পের শেষ সীমায় পৌঁছে দেন গল্পটিকে একটি মোচড়—যাতে সমস্ত কথাবস্তু এক নতুন ভাববস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। এ রীতি সার্থক হলেও আসলে একটা কৌশল—চমক লাগানো। কলা-কৌশল আরও অনেক ধরনের হতে পারে,—তা না বললেও চলে। তবে যে কৌশলের প্রয়োগ যত অলক্ষিত ততই তা স্বাভাবিক এবং সার্থক। 'বেণীগীর ফুলবাড়ী'তে ও-নামের গল্পটি, 'কুয়াশার রং' এবং 'প্রাবল্য' প্রভৃতি গল্পে এ কৌশলের সার্থক প্রয়োগই দেখতে পাই। কিন্তু 'প্রাবল্য' ছাড়া অন্য গল্প দু'টির বিস্তার নবেলের উপযোগীও, আর চমকটা অভাবনীয় নয়। 'প্রাবল্য' সেদিক থেকে আরও সার্থক। তার আবেদন কথঞ্চিৎ খর্ব হয়েছে বরং শেষ বাক্যদুটিতে, তা বাহুল্য। এ ত্রুটি বিভূতিভূষণের নবেলেও আছে—তাঁর অমোঘ প্রকৃতিপ্রীতি ও আবেগপ্রবণতা সময়ে-অসময়ে উৎসাহিত হয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অমোঘ তার রসাবেদন, তবু বাহুল্যও তা মনে হয় এক এক সময়ে। আর, বাহুল্যোক্তি বাঙালি লেখকের প্রায় একটা জাতীয় ত্রুটি।

আসলে বিভূতিভূষণের আসল কৃতিত্ব গল্পে যা নবেলেও তা—সেই কবিদৃষ্টিতে, প্রকৃতি-প্রেমে, প্রাণশক্তির রহস্যধ্যানে, বিশেষ এক মানবসত্যের অনুভূতিতে, সাধারণের মধ্যে অসাধারণের উদ্ঘাটনে। 'বেণীগীর ফুলবাড়ী'র গল্পগুলিও এসব সত্যের ক্ষণপ্রকাশে উদ্ভাসিত। সঙ্গে আছে কখনো মানবপ্রকৃতির স্ববিরোধী আচরণে একটু করুণ রঙ্গবোধ—মানুষ এরূপই,

এসব নিয়েই মানুষ। একমাত্র 'পাঁচুমামার বিয়ে'তে একটা সংশয় থাকে—একি শুধুই দায়িত্ব-হীন অভ্যস্ত আচরণ, না, অভ্যস্ত অন্যায়ের আরেকটা কপট ওজর। তবে বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে 'বেণীগীর ফুলবাড়ী'র কোনো গল্প গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না।

শেষ পর্যন্ত রচনাবলীর এই খণ্ডে বিভূতিভূষণের এই 'মাইনর' রচনা কয়টির মধ্য দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে সাহিত্যিক পরিচয় আমাদের নিকট সুস্থির হয়ে ওঠে তাতে দেখি—যেখানে তিনি স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে তিনি অসামান্য—জগৎ ও জীবন-মুগ্ধ শিল্পী। তুলনায় যেখানে তাঁর প্রকাশ অনুজ্জ্বল অস্পষ্ট বা আচ্ছন্ন সেখানেও তিনি আন্তরিকতায় অকৃত্রিম, দৃষ্টিশক্তির সততায় সফল, মানবসত্যের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কল্যাণময়—শ্রদ্ধায় মমতায় সহমর্মিতায় সাধারণ মানুষের বন্ধু, সহজ জীবন-ছন্দের সহৃদয় শিল্পী।

গোপাল হালদার

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্কত্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌শিম্ খাইয়া যায়, এমন খদ্দেরের ভিড়।

বেচু চক্কত্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফর্সা না-কালো দোহারা চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বাক্সের ওপর কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্কত্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল, তরকারী ভাত—হিন্দু-হোটেল বাবু—

দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের লোকের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্কত্তির হোটেলেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টিকিট নিতে হবে এখানে—কোন্ ক্লাসে খাবেন? ফাস্ট ক্লাস না সেকেন্ ক্লাস—ফাস্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পয়সা দিয়া বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে টিকিট (এক টুকরা সাদা কাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে যাইতে হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে-বামুন বসিয়া আছে, খদ্দেরের টিকিট লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাস্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন্ ক্লাস। খদ্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টিকিট বেচু চক্কত্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগুলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্বৃত্ত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে-বামুনেরা চুরি করিতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটে চার জন লোক খদ্দের। দু'জন ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাক্ গে। তুই আর একটু এগিয়ে যা—শান্তিপুর আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু-পাঁচটা খদ্দের থাকেই। আর ভেতরে বামুনকে বলে আয়, শান্তিপুর আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেক্‌চিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পদ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পয়সা দেও বাবু, দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাস্টো কেলাসে খাবে। আমায় বলে পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্ তো? খদ্দের?

—খদ্দের তো বটেই। পয়সা দিয়ে খাবে। এমনি না। আমার ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুরের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পয়সা দিতে হবে না। সে ছেলেমানুষ, দু-এক দিনের জন্যে আসবে—তার কাছ থেকে পয়সা কিসের ? দুইয়ের পয়সা নিয়ে যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা। পদ্ম ঝি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপর কথা বলিবার কেহ নাই। সেজন্য দুষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপুরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খদ্দের আনিতে স্টেশনে যাইতেছিল, বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের বেশী ক'রে আনতে না পারলে আর তোমায় রাখা হবে না মনে রেখো—আমার খরচা না পোষালে মিথ্যে চাকর রাখতে যাই কেন ? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খদ্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে ?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমায় পই-পই ক'রে বলে হার মেনে গেলাম ; তিন আনা বাড়িয়ে চোদ্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস্-টেলাস্ তুলে দ্যাও। ক'টা খদ্দের হয় ফাস্টো কেলাসে ? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে রেট্ কমিয়েছে—শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল্ না। কারও কানে কথা গেলে এখুনি—

এমন সময় ছ'জন খদ্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুঁটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে খাবেন বাবুরা ? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বামুন ঠাকুরটি আছে তো ? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে আর ভুলতে পারি নে। মাংস হবে ?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিদ্ধেশ্বরীর ইচ্ছেয়—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হ'লে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বামুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম ঝি বলিল—পোড়ারমুখো মিন্‌সে আবার শুন্‌তে না পায়। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার !

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আয় তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই—আবার সেই একটায় মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেল—

—আসাম মেলে আর তেমন খদ্দের আসছে কই ? আগে আগে আসাম মেলে আটটা-

দশটা খদ্দের ফি দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম ঝি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বামুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনো মজা, কাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খদ্দের বাবুরা গিয়ে তাকে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিচ্চে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেনো রাঁধো ব'লে —যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো—

—ডাল কতটা আছে দেখলি?

—লবডঙ্কা। আর মেরে-কেটে তিন জনের মত হবে—

—ক'জনের মত ডাল দিইছিলি?

—দশ জনের মত মুগের ডাল আলাদা কাস্টো কেলাসের মুড়িঘন্টের জন্যে দিইছি—সেকেন্ কেলাসে ত্রিশ জনের মুসুরি-খেঁসারি মিশেল ডাল--

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পদ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ-ছে'চল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো। দেখিলে মনে হয় লোকটা নিপাট ভালমানুষ।

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাজারি ঠাকুর, ডাল কম হ'ল কি ক'রে?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন ডাল খদ্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হ'লে আমি কি করবো বলুন।

পদ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল --তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পষ্ট দেখেছি তুমি ওই খদ্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মুড়িঘণ্ট ঢালছো। পয়সা-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলে কত পাই দেখছো তো পদ্মদিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ ভায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে ভাখো আমাকে।

পদ্ম বলিল—তুমি মুখে-মুখে তক্কো ক'রো না বলে দিচ্ছি। পদ্ম ঝি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলবার মেয়ে নয়। কাস্টো কেলাসের বাবুরা পুজোর সময় তোমায় গেঞ্জি কিনে দেয় নি?

—ইস্—ভারী গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল বুঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্কত্তি বলিল—যাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খদ্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

—কেন বাবু আমার কি দোষ হ'ল এতে। পদ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পদ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নচ্ছার, বদমাইশ, গাঁজাখোর কোথাকার—দশ জনের দশের

অর্দ্ধেক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের ক'রে ?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পদ্ম ঝি অত অল্পে বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খদ্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেকচিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পড়িয়া আছে। ডাল, মাছ যাহা ছিল, পদ্ম ঝিকে তাহার বড় থালায় বাড়িয়া দিতে হইয়াছে—সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উদ্বৃত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়—রসুয়ে-বামুনদের জন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামুনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলে বসিয়া খায় না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেই থাকে, হোটেলেই খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্য্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন তাও না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেকচিতে বেশী ভাত থাকিলে পদ্ম ঝি বলিবে—অত ভাত খাবে কে ? ও তো তিন জনের খোরাক—আমার থালায় আর দুটো বেশী ক'রে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত, না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পদ্মটা কি সোজা বদমাইশ মাগী—পেট ভ'রে যে কেউ খায়—তাও তার সহ্যি হয় না। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে বেলা এগারোটার সময় রাঁধুনি-বামুন একথালা ভাত খেয়ে নেয়, আমাদের এখানে তা হবার জো আছে ? বাব্বাঃ, যেমন কর্ত্তা, তেমনি গিন্নি—(পদ্ম ঝিকে মনে মনে গিন্নি বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাত্র আড়াই ঘণ্টা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেকচি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া ঘুমোয়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারের ঠাকুর-বাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না ঘুমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নির্জ্জনে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রান্নার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্য্যন্ত খদ্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্য্যন্ত নিজেদের খাওয়া-দাওয়া, তার

পর কর্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটায় এদিকে শুইবার অবসর পাওয়া যায় না, দু-দণ্ড একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই ?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুর যাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকায় লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমুল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত, গাবভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাণাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাংনাপুর হইতে রাণাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজের সন্ধানে।

কর্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন। বলিলেন—কি চাই ?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে ?

—তোমার নাম কি ?

—আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্ম্মা, উপাধি চক্রবর্ত্তী।

এই ভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায় ?

—গাংনাপুর ইস্টিশানে নেমে যেতে হয় এড়োশোলা গ্রামে।

—রাঁধতে জানো ?

—বাবু একদিন রাঁধিয়ে দেখুন। মাংস মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাঁধতে হবে—তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজি থাকো আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সাত টাকার এক পয়সা মাহিনা বাড়ে নাই। অথচ খদ্দের বাবুরা সকলেই তাহার রান্নার সুখ্যাতি করে, যদিচ পদ্ম ঝিয়ের মুখে একটা সুখ্যাতির কথাও সে কখনো শোনো নাই, ভালো কথা তো দূরের কথা, পদ্ম কি তাহাকে আঁশবঁটি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই বা কোথায় ? যাক, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোদিন—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়।

হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে।

হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—

হাজারি চক্রবর্ত্তীর হিন্দু-হোটেল

রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সস্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

কর্তার মত তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাঁধুনী-বামুন ও ঝি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এ হোটেলের মত ঝিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খদ্দেরদের ভাল জিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে বুঝিয়া দেখিল, লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট্ দিতেও আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না, মুসুরি ডালের সঙ্গে কম দামের খেঁসারি ডাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তা মাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্ম কিনিবে না।

এখানে খদ্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই—যাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়—কিন্তু তাহার মনে হয় বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে সে হোটেলে লোক বেশী আসিবে—অনেকেই খাওয়ার পরে একটু গড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটেলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খদ্দেরদের বিশ্রামের জন্ম। সেখানে তক্তপোশের ওপর শতরঞ্চি ও চাদর পাতা থাকিবে, বালিশ থাকিবে, তামাক খাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেও অনায়াসে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটের কোনো হোটেলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলেও না। ব্যবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইস্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল' বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খদ্দের আসে?

খদ্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোক ঝুঁকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটেলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে দেখিতে দেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটেলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘর খুলিয়া বসিবে—যদি তাহাতে খদ্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারই সুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাথায় আছে, শুধু খদ্দেরের বিশ্রাম ঘর কেন, মোকদ্দমা মামলা যাহারা করিতে আসে, তাহারা সারাদিনের খাটুনির পরে হয়তো খাইয়া-দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়—সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক।

চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহার মনে আসে। কিন্তু কখনো কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বয়স তো হইয়া গেল ছ'চল্লিশের উপর—সারাজীবন কিছু করিতে পারে নাই, সাত টাকা মাহিনার চাকুরি আজও ঘুচিল না—ছা-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা, এই চূর্ণী নদীর ধারে বসিয়া? ভাবিতে বেশ লাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত্র সে নয়। ছে'চল্লিশ বছর এমন কিছু বয়স নয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচিবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া মরিয়া গেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ বসিয়া থাকা চলিবে না। পদ্ম ঝি এতক্ষণ উনুনে আঁচ দিয়াছে, দেরি করিয়া গেলে তাহার মুখনাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্ত্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়—অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিন্‌কালে।

ফিরিবার পথে ছোট বাজারে রাধাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়।

—বাবা রাধাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। পদ্ম ঝির ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ওই কর্ত্তাবাবুর হোটেলের পাশে পদ্ম ঝিকে দেখিয়ে দেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেলে ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পদ্ম ঝি উনুনে আঁচ দিয়া কোথায় গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

—শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিষ্টি করবেন, তাঁরা আমায় আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা করবে। ওঁরা মুর্শিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসে নি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্কত্তি একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনো ইহারা তাহার রান্না ভাল বলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে!

রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এঁড়োশোলা গ্রামে একজন সেকালের প্রাচীনা ব্রাহ্মণ বিধবা থাকিতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নায় তাঁর শুধু সাধারণ ধরণের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামেরও বাহিরেও অনেক জায়গায় লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল—খুড়ীমা, আপনার তো বয়েস হয়েছে, কবে চলে যাবেন—আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলেন—আচ্ছা তোকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি ক'রে নিরিমিষ চচ্চড়ি রাঁধতে হয় সেটাই তোকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটিমাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একটি জিনিস রাঁধিবার গুণেই হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্ত জিনিস—নিরিমিষ চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এ-কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি খাইতে হয়।

তুঃখের বিষয় তিনি আর বাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—মাংস, মাছ সবই রাঁধে ভাল—কিন্তু তার হাতের নিরিমিষ চচ্চড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চক্কত্তির হোটেলে একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘুরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে—সে আর কোথাও যাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধিবার ভার তাহারই উপর পড়িল। খদ্দেররা মাংস খাইয়া খুব তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই—খদ্দেরের মুখের প্রশংসা ছাড়া। পদ্ম ঝি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাও বলিল না। বেচু চক্কত্তিও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্ত তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল, কর্তাবাবু নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্ত কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পদ্ম ঝি চাটিয়া-পুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মুশকিল ঘটে। তাহার জন্ত বিশেষ কিছুই থাকে না, এক-একদিন ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িয়া যায়—মাছ, মাংস তো দূরের কথা। বয়স ছে'চল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে ভাল, খাইতে ভালও বাসে—কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট ভরে না।

রাত সাড়ে বারোটা। কর্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেলে সে আর মতি চাকর ছাড়া আর কেহ রাত্রে থাকে না। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রাত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল—চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্চে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর?

—এত রাত্রে যাত্রা? পাগল আর কি! সারাদিন খেটে আবার ও-সব শখ থাকে? আমি যাবো না—তুই যাস্ তো যা। এসে ভাঁড়ার ঘরের জানালায় টোকা মারিস্। দোর খুলে দেবো।

মতি চাকর ছোকরা মানুষ। তাহার শখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয্যেকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের সঙ্গে তাহাদের রেষারেষি করিয়া কারবার চলে। তিনি এত রাত্রে এখানে কি মনে করিয়া? কখনো তো আসেন না! হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুয্যেও একটা হোটেলের কর্তা, সুতরাং হাজারির

কাছে সেও তার মনিবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল, আর কে আছে ঘরে?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণে মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল—বিনীত ভাবে বলিল—কেউ নেই বাবু, আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—চল ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে বসিয়া যদু বাঁড়ুয্যে বেচু চক্কত্তির গদিতে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

—কাপড় চোপড় দেয়?

— আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুয্যে কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—শোন, আমার হোটেলে তুমি কাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা কাপড় পাবে। ধোপা-নাপিত, তেল-তামাক। যাবে?

হাজারি দস্তুরমত অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না। তার পর বলিল—বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

—ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজি। তবে হ্যাঁ, বেচু চক্কত্তির সঙ্গে আমি অসরস করতে চাইনে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম ঝি কোথাও আড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন আমি কোন কথা বলতে পারবো না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুয্যে চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যা নয়, তবে খায় খুব সঙ্গোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না। সংসারে কেহ এ পর্য্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল রাঁধে বলিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুরস্কার দিতে চায় নাই—খদ্দেরর মুখের ফাঁকা কথায় পেট ভরে না তো!

যদুবাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার চাকরি (বায় খোরাকী ধোপা নাপিত) দিতে!

এতদিন রাণাঘাটের বাজারে আছে—কখনও কাহারও সঙ্গে মেশে না সে—মিশিতে ভালও বাসে না। তাহার জীবনের আশা যে-টা, সে-টা দশজনের সঙ্গে মিশিয়া আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে পূর্ণ হইবে না। তাহাকে খাটিতে হইবে, বাজার বুঝিতে হইবে, হিসাব রাখা শিখিতে হইবে, একটা ভাল হোটেল চালাইবার যাহা কিছু সুলুক সন্ধান সব সংগ্রহ করিতে

হইবে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, দেশের কাছে বড় মুখ দেখাইতে হইলে, পরের মুখে নিজের নাম শুনিতে হইলে—সেজন্য চেষ্টা চাই, খাটুনি চাই। আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে কিংবা মতি চাকরের মত ছোট বাজারের বারোয়ারীর যাত্রা শুনিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

রাত অনেক। মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঘুম আসার নামটি নাই।

দরজায় খটখট শব্দ হইল। হাজারি উঠিয়া দরজা খুলিল—সে আগেই বুঝিয়াছিল মতি চাকর ফিরিয়াছে। মতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি ঠাকুর? এখনো জেগে যে!

হাজারি গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখিয়া তবে মতিকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বলিল—যে গরম, ঘুম আসবে কি, সারাদিন আগুনের তাতে—যাত্রা দেখলি নে?

মতি বলিল—যাত্রার আসরে জায়গা নেই। লোক ভর্ত্তি। ফিরে এলাম। চল এক জায়গায়, যাবে ঠাকুরমশায়?

—কোথায়?

—পাড়ার মধ্যে। চলো না—ঘুম যখন নেই, একটু ঘুরেই না হয় এলে। তোমার তো কোনদিন কোথাও—

হাজারি বলিল—তোরা ছেলে-ছোকরা, আমার বয়স ছে'চল্লিশ। আমি তোর বাপের বয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব কথা কেন?···তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস্ করগে যা।

—বাবুর কাছে কি পদ্মদিদির কাছে কিছু ব'লো না ঠাকুরমশাই, দোহাই, দুটি পায়ে পড়ি।

আশ্চর্য্য এই যে, মতির এই কথা হাজারির মনে এক নতুন ধরনের ভাবনা আনিয়া দিল। তাহার উচ্চাশা আছে, মতির মত রাত বেড়াইয়া স্ফূর্ত্তি করিয়া সময় নষ্ট করিলে ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না। মতি কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না, বাসনের ঘরে (হোটেলের পিতল কাঁসার থালা-বাটি রান্নাঘরের পাশে সিন্দুকে থাকে, মাজাঘষার পর রোজ রাত্রে বেচু চক্কত্তি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেগুলি গুনিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া চাবি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান) গিয়া শুইয়া পড়িল। হাজারিও বাসনের ঘরে শোয়, আজ সে বাহিরের গদির মেজেতে তাহার পুরোনো মাদুরখানা পাতিয়া শুইল।

না—যদুবাবুর হোটেলে সে যাইবে না। হোটেলের রাঁধুনিগিরি সব জায়গায় সমান। এ হোটেলে আছে পদ্ম, ও হোটেলে হয়তো আবার কে আছে কে জানে? তা ছাড়া, বেচু-বাবু তাহার পাঁচ বছরের অন্নদাতা। লোভে পড়িয়া এতদিনের অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

সে নিজে হোটেল খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাঁধুনি-বিত্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেন, তখন অন্য কথা।

পরদিন খুব সকালে পদ্ম ঝি আসিয়া ডাকিল—ও ঠাকুর, দোর খোল—এখনও ঘুম—বাবাঃ! কুম্ভকর্ণকে হার মানালে তোমরা!

হাজারি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ছেঁড়া মাদুরখানা গুটাইয়া রাখিয়া দোর খুলিয়া দিল। একটু পরেই বেচু চক্কত্তি আসিলেন। দরজায়, গদিতে ও ক্যাশ-বাক্সে গঙ্গা জলের ছিটা দিয়া, ক্যাশ-বাক্সের ডালার উপরটা সামান্য একটু গঙ্গাজল দিয়া মার্জ্জনা করিয়া লইয়া পদ্ম ঝিকে বলিলেন—ধুনো দে—বেলা হয়ে গেল। আজ হাটবার, ব্যাপারীদের ভিড় আছে, শীগ্‌গির ক'রে আঁচ দে—আর সেদিনকার মত পচা দই-টই আনিস্‌ নে বাপু। ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—শেষকালে স্যানিটারি বাবুর চোখে পড়ে যাবো। দরকার কি?

ব্যাপারীরা সাধারণতঃ পাড়াগাঁয়ের চাষা লোক। তাহারা দই খাইতে পছন্দ করে বলিয়া প্রতি হাটবারে তাহাদের জন্য কয়েক হাঁড়ি দইয়ের বরাদ্দ আছে। এই দই পদ্ম ঝি তাহার নিজের ঘরে পাতিয়া হোটেলে বিক্রয় করিয়া দুই পয়সা লাভ করিয়া থাকে। এবং সে যে প্রথম শ্রেণীর জিনিস সরবরাহ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ্ম ঝি মুখ ঘুরাইয়া বলিল—বাবু আপনার যত সব অনাছিষ্টি কথা! দই পচা না ঘণ্ট, কে বল্‌চে দই পচা! ওই মুখপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাদ্দর চাল যদি আজ—

হাজারি ঠাকুর কথাটা বলিয়াছিল বটে—তবে সে দই পচা কি তাজা তাহা বলে নাই—বলিয়াছিল ব্যাপারী খদ্দেররা বলাবলি করিতেছিল এ রকম খারাপ দই খাইতে দিলে তাহারা চোদ্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সার বেশি খোরাকি দিবে না।

পদ্ম ঝি রান্নাঘরের চৌকাঠে পা দিয়া ঝাঁজালো ঝগড়ার সুরে বলিল—বলি, ও ঠাকুর,—দই পচা তোমাকে কে বলেচে?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—ওই সাধু মণ্ডল আর তার ভাইপো রোজ হাটেই তো এখানে খায়—ওরাই বলছিল—

—বলছিল! তোমার গলা ধরে বলতে গিয়েছে ওরা। তোমার মত হিংশুক কুচুটে লোক তো কখনো দেখিনি—আমি দই দিই ব'লে তুমি হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্চ সে কি আমি বুঝিনে! তোমার শখের কুসুম গয়লানীর ছাপ-বাক্সে পয়সা না উঠলে কি আর তোমার মনে শান্তি আছে!…গাঁজাখোর মড়ুই-পোড়া বামুন কোথাকার!

হাজারি জিভ্‌ কাটিয়া বলিল—ছি ছি, কি যে বলো পদ্মদিদি তার ঠিক নেই—কুসুমের বাপের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে, আমায় জ্যাঠা ব'লে ডাকে, আমি তাকে মেয়ে বলি—তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না? ·

ইহার উত্তরে পদ্ম ঝি যাহা বলিল, তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কুসুমকে সে সত্যই মেয়ের মত স্নেহ করে—তাহাদের গ্রামের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে—রাণাঘাটে তার শ্বশুরবাড়ী—অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন দুধ বেচিয়া, দই বেচিয়া ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে মানুষ করে। এক শাশুড়ী ছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে কেহ নাই।

হঠাৎ একদিন পথে দু'জনের দেখা।

—জ্যাঠামশায় যে! দাঁড়ান একটু পায়ের ধুলো দিন। আপনি এখানে কোথায়?

—আরে কুসুম, কোত্থেকে তুই এখানে?

—এই তো আমার শ্বশুরবাড়ী, ছোট বাজারে মন্দিরের গায়েই। আপনি কি আজ বাড়ী থেকে এসেছেন?

—না রে—আমি রেল-বাজারে হোটেলে কাজ করি। আজ মাস ছ'-সাত আছি।

বিদেশে একই গ্রামের মানুষ দেখিয়া দু'জনেই খুব খুশী হইল। সেই হইতে কুসুম হাজারি ঠাকুরের হোটেলে দুধ দই বেচিতে গিয়াছে। গরীব বলিয়া হাজারি ঠাকুর অনেকবার লুকাইয়া হোটেল হইতে রাঁধা ভাত-তরকারি তাহাকে থালা করিয়া বাড়িয়া দিয়াছে। দুধ দই বেচিয়া ফিরিবার সময় কুণ্ডুদের পাটের আড়তের গলিটায় দাঁড়াইয়া কুসুম থালা লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা পদ্ম ঝির চোখ এড়ায় নাই, সুতরাং সে বলিতেই পারে।

দুপুরের পর হাজারি প্রতিদিনের মত চূর্ণীর ধারে যাইতেছে—এমন সময় কুসুমের সঙ্গে দেখা হইল।

কুসুম দুধের ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, বেশ স্বাস্থ্য, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী বেশ শান্ত।

হাজারি বলিল—বাড়ী ফিরছিস এত বেলায় যে!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, বড্ড দেরি হয়ে গেল। নিজের তো দুধ নেই—কায়েত পাড়া থেকে দুধ আনি, তবে বিক্রী করি, তবে বাড়ী ফিরি। আসুন না আমাদের বাড়ী।

—না, এখন আর কোথায় যাবো! তুই যা, খাবি-দাবি।

কুসুম কিছুতেই ছাড়ে না, বলিল—আমার খাওয়া-দাওয়া জ্যাঠামশায়, শাশুড়ী রেঁধে রেখে দিয়েচে গিয়ে খাবো; কতক্ষণ লাগবে? আসুন না।

হাজারি অগত্যা গেল। ছ'চালা একখানা বড় ঘর, সেখানেতে কুসুমের শাশুড়ী থাকে—আর একখানা ছোট চারচালা ঘরে কুসুম ছেলে দুটি লইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত কুসুমের খুব সদ্ভাব নাই।

কুসুম নিজের ঘরে হাজারিকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্তপোশ, পুরু কাঁথা পাতিয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তাহার উপরে। তক্তপোশের নীচে বালি দেওয়া আর-বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি ও একটা বড় জালা—বাঁশের আল্‌নাতে কতকগুলি লেপ-কাঁথা বাঁধা। একটা জলচৌকিতে খানকতক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে পিতল কাঁসার বাসন। ঘর দেখিয়া হাজারির মনে হইল—কুসুম বেশ সাজাইয়া রাখিতে জানে জিনিসপত্র।

কুসুম বলিল—পান খাবেন জ্যাঠামশায়?

—সে একটা। আর তুই খেতে যা। বেলা অনেক হয়েচে।

কিন্তু কুসুমের দেখা গেল, খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো তাড়া নাই। হাজারিকে পান দিয়া সেই যে হাজারির সামনে মেজেতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল—প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। সে নড়িবার নামও করে না দেখিয়া হাজারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বলিল—তুই খেতে যা না। আমি যাই, আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে সকাল সকাল।

কুসুম বলিল—যাচ্ছি এবার।

বলিয়া আর যায় না। আরও আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কুসুম আর যায় নাই। বাবা মারা গিয়াছে, ভাইয়েরা গরীব বলিয়া হউক বা ভাইবৌদের জন্যই হউক—তাহাকে বাপের বাড়ীতে কেহ লইয়া যায় না। নিজে দু-একবার গিয়াছিল, বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ভাইবৌদের ব্যবহার ভাল নয়।

হাজারির সঙ্গে কুসুম সেই সব কাহিনীই বলিতে লাগিল। ছেলেবেলায় গ্রামে কি পথে করিয়াছিল কি, সেই বিষয়ে কথাও তাহার আর ফুরায় না।

—এখানে ছোলার শাক পয়সা দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের গাঁয়ের যুগীপাড়ার মাঠে আমরা ছোলার শাক তুলতে যেতাম জ্যাঠামশায়—একবার, তখন আমার বয়েস ন'বছর, আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দুজনে গিয়েছি ছোলার শাক তুলতে—একটা মিন্সে দেখি জ্যাঠামশায় ছোলার ক্ষেতে বসে কাঁচ ছোলা তুলে তুলে খাচ্ছে। আমাদের না দেখে দোড় দোড়, বিষম দোড়! আমরা তো হেসে বাঁচিনে—ভেবেছে বুঝি আমাদের ক্ষেত!

বলিয়া কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি!

হাজারি দেখিল, ইহার ছেলেমানুষী গল্প শুনিতে গেলে ওদিকে হোটেলে যাইতে বিলম্ব হইবে—পদ্ম ঝি মুখ-নাড়ার চোটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

সে উঠিতে যাইতেছে, কুসুম বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, আপনার জন্যে একটা জিনিস করে রেখেছি। সেইটে দেবার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বলিয়া একটা কাপড়ের পুঁটুলি খুলিয়া একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

—বাঃ, বেশ হয়েছে রে!

কুসুম কাঁথাখানি পাট করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল—আপনি এখানা রাত্রে পেতে শোবেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটেলে,—আমার অনেক দিনের ইচ্ছে একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই ক'রে দেব। তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু ক'রে এখানা আজ দিন পাঁচ-ছয় হ'ল শেষ হয়েছে।

হাজারি ভারি খুশী হইল।

কুসুমের বাবা রসিক ঘোষ প্রায় তাহার সমবয়সী। কুসুম তাহার মেয়ের সমান। একই গাঁয়ের লোক,—তাহা হইলেও কি সবাই করে? গাঁয়ে তো কত লোক আছে!

মুখে বলিল, বেঁচে থাক মা, মেয়ে না হ'লে বাপের জন্যে এত আত্তি দেখায় কে? ভারী চমৎকার কাঁথা। আমি পেতে শুয়ে বাঁচবো এখন। ভারী চমৎকার কাঁথা। বেশ, বেশ!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, আপনি তো বললেন মেয়ে না হ'লে কে করে—কিন্তু আমিও বলছি, বাবা না হ'লে হোটেল থেকে নিজের মুখের ভাতের থালা কে মেয়েকে দেয় লুকিয়ে—শ্রাবণ মাসের সেই উপব্যাস্ত বাদলায়—

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে সে বাঁ-হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—মাথার ওপর ভগবান জানেন—আর কেউ জানে না—আপনি আমার জন্যে যা করছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা—আমি ছোট জাতের মেয়ে—আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, তবে আমিও বলচি ওপরের দেনেওয়ালা আপনাকে ভাতের থালার বদলে মোহরের থালা যেন দেন। আমিও যেন দেখে মরি।

বলিয়াই সে আসিয়া হাজারির পায়ে গড় হইয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সেদিন ছিল বেশ বর্ষা।

হাজারি দেখিল, হোটেলে গদির ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। অন্যদিন এ ধরনের খদ্দের এ হোটেলে সাধারণতঃ আসে না—হাজারি ইহাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল।

বেচু চক্কত্তি ডাকিল—হাজারি ঠাকুর, এদিকে এস—হাজারি গদির ঘরে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে ভদ্রলোকদের একজন বলিলেন—এই ঠাকুরটির নাম হাজারি?

বেচু চক্কত্তি বলিল—হাঁ বাবু, এরই নাম হাজারি।

বাবুটি বলিলেন—এর কথাই শুনেচি। ঠাকুর তুমি আজ বর্ষার দিনে আমাদের মাংস পোলাও রেঁধে ভাল করে খাওয়াতে পারবে? তোমার আলাদা মজুরী যা হয় দেবো।

বেচু বলিল—ওকে আলাদা মজুরী দেবেন কেন বাবু, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার হোটেলের নাম অনেক দূর অবধি লোকে জানে। ও আমারই ঠাকুর, ওকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা যা হুকুম করবেন তা ও করবে।

এই সময় পদ্ম ঝি বেচু চক্কত্তির ডাকে ঘরে ঢুকিল।

বেচু চক্কত্তি কিছু বলিবার পূর্ব্বে জনৈক বাবু বলিল—ঝি, আমাদের একটু চা ক'রে খাওয়াও তো এই বর্ষার দিনটাতে। না হয় কোনো দোকান থেকে একটু এনে দাও। বুঝলেন চক্কত্তি মশায়! আপনার হোটেলের নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত যে গিয়েচে বল্লেন—সে কথা মিথ্যা নয়। আমরা যখন আজ শিকারে বেরিয়েছি, তখন আমার পিসতুতো ভাই ব'লে দিয়েছিল, রাণাঘাট যাচ্ছ, শিকার ক'রে ফেরবার পথে রেল-বাজারের বেচু চক্কত্তির হোটেলের হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস খেয়ে এসো। তাই আজ সারাদিন জলায় আর বিলে পাখী মেরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভাবলাম, ফিরবার গাড়ী তো রাত দশটায়। তা এ বর্ষার দিনে গরম

গরম মাংস একটু খেয়েই যাই। মজুরী কেন দেবো না চক্কত্তি মশায়? ও আমাদের রান্না করুক, আমরা ওকে খুশি ক'রে দিয়ে যাবো। ওর জন্যেই তো এখানে আসা। কথা শুনিয়া হাজারি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরও সে খুশি হইল এই ভাবিয়া যে, চক্কত্তি মশায়ের কানে কথাগুলি গেল—তাহার চাকুরির উন্নতি হইতে পারে। মনিবের সুনজরে পড়িলে কি না সম্ভব? খুশির চোটে ইহা সে লক্ষ্যই করিল না যে, পদ্ম ঝি তাহার প্রশংসা শুনিয়া এদিকে হিংসায় নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবুরা হোটেলের উপর নির্ভর করিল না—তাহারা জিনিসপত্র নিজেরাই কিনিয়া আনিল। হাজারি ঠাকুর মাংস রাঁধিবার একটি বিশেষ প্রণালী জানে, মাংসে একটুকু জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কায়দা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে মাংস কোনদিনই থাকে না—তবে বাঁধা খরিদ্দারগণের মনস্তুষ্টির জন্য মাসে একবার বা দুবার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে—সে রান্নার মধ্যে বিশেষ কৌশল দেখাইতে গেলে চলে না, বা হাজারির ইচ্ছাও করে না—যেমন ভাল শ্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না—তেমনি।

হাজারি ঠিক করিল, পদ্ম ঝি তাহাকে তুই চক্ষু পাড়িয়া যেমন দেখিতে পারে না—তেমনি আজ মাংস রাঁধিয়া সকলের বাহবা লইয়া পদ্ম ঝির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহাকে যত ছোট মনে করে ও, তত ছোট সে নয়। সেও মানুষ, সে অনেক বড় মানুষ।

ভাল যোগাড় না দিলে ভাল রান্না হয় না। পদ্ম ঝি যোগাড় দিবে না এ জানা কথা। হোটেলের অন্য উড়ে বামুনটিকে বলিতে পারা যায় না—কারণ সে-ই হোটেলের সাধারণ রান্না রাঁধিবে।

একবার ভাবিল—কুসুমকে আনবো?

পরক্ষণেই স্থির করিল, তার দরকার নাই। লোকে কে কি বলিবে, পদ্ম ঝি তো বঁটি পাতিয়া কুটিবে কুসুমকে। যাক্, নিজেই যাহা হয় করিয়া লইবে এখন।

বেলা হইয়াছে। হাজারি বাজার হইতে কেনা তরি-তরকারী, মাংস নিজেই কুটিয়া বাছিয়া লইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। বর্ষাও যেন নামিয়াছে হিমালয় পাহাড় ভাঙিয়া। কাঠগুলা ভিজিয়া গিয়াছে—মাংস সে কয়লার জালে রাঁধিবে না। তাহার সে বিশেষ প্রণালীর মাংস রান্না কয়লার জালে হইবে না।

সব রান্না শেষ হইতে বেলা তুইটা বাজিয়া গেল। তারপরে খরিদ্দার বাবুরা খাইতে বসিল। মাংস পরিবেশন করিবার অনেক পূর্বেই ওস্তাদ শিল্পীর গর্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত হাজারি বুঝিয়াছে, আজ যে ধরনের মাংস রান্না হইয়াছে—ইহাদের ভাল না লাগিয়া উপায় নাই। হইলও তাই।

বাবুরা বেচু চক্কত্তিকে ডাকাইলেন, হাজারি ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিলেন যে বেচু চক্কত্তিও যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল সে কথা শুনিয়া। চাকরকে ছোট

করিয়া রাখিয়া মনিবের সুবিধা আছে, তাহাকে বন্ধ করিলেই সে পাইয়া বসিবে।

যাইবার সময় একজন বাবু হাজারিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—সাত টাকা আর খাওয়া-পরা।

—এই দুটো টাকা তোমাকে আমরা বকশিশ দিলাম—চমৎকার রান্না তোমার। যখন আবার এদিকে আসবো, তুমি আমাদের রেঁধে খাইও।

হাজারি ভারি খুশি হইল। বকশিশ ইহারা হয়তো কিছু দিবেন সে আশা করিয়াছিল বটে, কিন্তু দু-টাকা দিবেন তা সে ভাবে নাই।

যাইবার সময় বেচু চক্কত্তির সামনে বাবুরা হাজারির রান্নার আর এক দফা প্রশংসা করিয়া গেলেন। আর একবার শীঘ্রই শিকারে আসিবেন এদিকে। তখন এখানে আসিয়া হাজারি ঠাকুরের হাতের মাংস না খাইলে তাঁহাদের চলিবেই না। বেশ হোটেল করেছেন চক্কত্তি মশায়।

বেচু চক্কত্তি বিনীত ভাবে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু মশায়েরা রাজলই লোক, সব দেখতে পাচ্ছেন, সব বুঝতে পাচ্ছেন। এই রাণাঘাট রেল-বাজারে হোটেল আছে অনেকগুলো, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন, সকলেই দয়া ক'রে এই গরীবের কুঁড়েতেই পায়ের ধুলো দিয়ে থাকেন। তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছা হয়, আগে থেকে একখানা চিঠি দেবেন, সব মজুদ থাকবে আপনাদের জন্যে; বলবেন কলকাতায় ফিরে দু'চার-জন আলাপী লোককে—যাতে এদিকে এলে তাঁরাও এখানেই এসে ওঠেন। বাবু—তা আমার বামুনের মজুরীটা?…হেঁ-হেঁ—

—কত মজুরী দেবো?

—তা দিন বাবু একবেলার মজুরী আট আনা দিন।

বাবুরা আরও আট আনা পয়সা বেচুর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেচু হাজারী ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—ঠাকুর আজ আর বেরিও না কোথাও। বেলা গিয়েচে। উনুনে আঁচ আর একটু পরেই দিতে হবে। পদ্ম কোথায়?

—পদ্মদিদি থালা বাসন বার করচে, ডেকে দেবো?

পদ্ম ঝি আজ যে মুখ ভার করিয়া আছে, হাজারি তাহা বুঝিয়াছিল। আজ হোটেলে সকলের সামনে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে বাবুরা, আজ আর কি তাহার মনে সুখ আছে! পদ্ম ঝির মনতুষ্টি করিবার জন্য তাহার ভাতের থালায় হাজারি বেশী করিয়া ভাত তরকারি এবং মাংস দিয়াছিল। পদ্ম ঝি কিছুমাত্র প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না, মুখ যেমন ভার তেমনিই রহিল।

ভাতের থালা উঠাইয়া লইয়া পদ্ম ঝি হঠাৎ প্রশ্ন করিল—রাঁধা মাংস আর কতটা আছে ঠাকুর?

বলিয়াই ডেকচির দিকে চাহিল। এমন চমৎকার মাংস কুটুম্বের বাড়ী কিছু দিয়া

আসিবে (সে ব্রাহ্মণের বিধবা নয়, মাছ-মাংস খাইতে তাহার আপত্তি নাই) ভাবিয়া ডেক্‌চিতে দেড় পোয়া আন্দাজ মাংস হাজারি রাখিয়া দিয়াছিল—পদ্ম ঝি কি তাহা দেখিতে পাইল ?

পদ্ম দেখিয়াছে বুঝিয়া হাজারি বলিল—সামান্ত একটু আছে।

—কি হবে ওটুকু ? আমায় দাও না—আমার আজ ভাগ্নীজামাই আসবে—তুমি ত মাংস খাও না—

কুসুমের জন্ত রাখা মাংস পদ্ম ঝিকে দিতে হইবে—যার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করে না হাজারির। হাজারি মাংস খায় না তাহা নয়, হোটেলে মাংস রান্না হইলেই হাজারি নিজের ভাগের মাংস লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসে—নিজেকে বঞ্চিত করিয়া। পদ্ম ঝি তাহা জানে, জানে বলিয়াই তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা উহার মনে জাগিয়াছে ইহাও হাজারি বুঝিল।

হাজারি বলিল—তোমায় তো দিলাম পদ্মদিদি, একটুখানি পড়ে আছে ডেক্‌চির তলায়—ওটুকু আর তুমি কি করবে ?

—কি করবো বললুম, তা তোমার কানে গেল না ? ভাগ্নীজামাই এসেছে শুনলে না ? যা দিলে এতটুকুতে কি কুলুবে ? ঢেলে দাও ওটুকু।

হাজারি বিপন্ন মুখে বলিল—আমি একটু রেখে দিইছি, আমার দরকার আছে।

পদ্ম ঝি ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া শ্লেষের সুরে বলিল—কি দরকার ? তুমি তো খাও না—কাকে দেবে শুনি ?

হাজারি বলিল—দেবো—ও একজন একটু চেয়েছে—

—কে একজন ?

—আছে—ও সে তুমি জানো না।

পদ্ম ঝি ভাতের থালা নামাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—না, আমি জানিনে। তা কি আর জানি ? আর সে জানা-জানির আমার দরকার নেই। হোটেলের জিনিস তুমি কাউকে দিতে পারবে না, তোমায় অনেকদিন বলে দিইছি। বেশ তুমি আমায় না দাও, চক্কত্তি মশায়ের শালাও আজ কলকাতা থেকে এসেছে—তার জন্তে মাংস বাটি ক'রে আলাদা রেখে দাও—ওবেলা এসে খাবে এখন। আমি না পেতে পারি, সে হোটেলের মালিকের আপনার লোক, সে তো পেতে পারে ?

বেচু চক্কত্তির এই শালাটিকে হাজারি অনেকবার দেখিয়াছে—মাসের মধ্যে দশ দিন আসিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী পড়িয়া থাকে, আর কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া টেরি কাটিয়া হোটেলে আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব চালায়—কথায় কথায় ঠাকুর-চাকরকে অপমান করে ; চোখ রাঙায়, যেন হোটেলের মালিক নিজেই।

তাহাদের গ্রামের মেয়ে, দরিদ্রা কুসুম ভালটা মন্দটা খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পেটের ভাত জুটাইতে পারে না—তাহার জন্ত রাখিয়া দেওয়া এত যত্নের মাংস শেষকালে

সেই চালবাজ বার্ডসাই-খোর শালাকে দিয়া খাওয়াইতে হইবে—এ প্রস্তাব হাজারির মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু সে ভালমানুষ এবং কিছু ভীতু ধরনের লোক, যাহাদের হোটেল, তাহারা যদি খাইতে চায়, হাজারি তাহা না দিয়া পারে কি করিয়া—অগত্যা হাজারিকে পদ্ম ঝিয়ের সামনে বড় জামবাটিতে ডেক্‌চির মাংসটুকু ঢালিয়া রান্নাঘরের কুলুঙ্গিতে রেকাবি চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হইল।

সামান্ত একটু বেলা আছে, হাজারি সেটুকু সময়ের মধ্যেই একবার নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে গেল।

আজ তাহার মনে আত্মপ্রত্যয় খুব বাড়িয়া গিয়াছে—তুইটি জিনিস আজ বুঝিয়াছে সে। প্রথম, ভাল রান্না সে ভুলিয়া যায় নাই, কলিকাতার বাবুরাও তাহার রান্না খাইয়া তারিফ করেন। দ্বিতীয়, পরের তাঁবে কাজ করিলে মানুষকে মায়া-দয়া বিসর্জন দিতে হয়।

আজ এমন চমৎকার রান্না মাংসটুকু সে কুসুমকে খাওয়াইতে পারিল না, খাওয়াইতে হইল তাহাদের দিয়া, যাহাদের সে তুই চক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারে না। কুসুম যেদিন কাঁথাখানি দিয়াছিল, সেদিন হইতে হাজারির কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ পড়িয়াছে কুসুমের ওপর।

বয়সে তো সে মেয়ের সমান বটেই, কাজও করিয়াছে মেয়ের মতই। আজ যদি হাজারির হাতে পয়সা থাকিত, তবে সে বাপের স্নেহ কি করিয়া দেখাইতে হয়, দেখাইয়া দিত। অন্ত কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের হাতে অমন রান্না মাংসটুকুই সে কুসুমকে দিতে পারিল না।

ছেলেবেলাকার কথা হাজারির মনে হয়। তাহার মা গঙ্গাসাগর যাইবেন বলিয়া যোগাড়-যন্ত্র করিতেছেন—পাড়ার অনেক বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বিধবাদের সঙ্গে। হাজারি তখন আট বছরের ছেলে—সেও ভীষণ বায়না ধরিল গঙ্গাসাগর সে না গিয়া ছাড়িবেই না। তাহার ঝুঁকি লইতে কেহই রাজী নয়। সকলেই বলিল—তোমার ও ছেলেকে কে দেখাশুনো করবে বাপু, অত ছোট ছেলে আর সেখানে নানান্ ঝক্কি—তাহ'লে তোমার যাওয়া হয় না।

হাজারির মা ছেলেকে ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁর যাওয়াই হইল না। জীবনে আর কখনোই তাঁর সাগর দেখা হয় নাই, কিন্তু হাজারির মনে মায়ের এই স্বার্থত্যাগের ঘটনাটুকু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া আছে।

হাজারি ভাবিল—যাক গে, যদি কখনো নিজে হোটেল খুলতে পারি, তবে এই রাণাঘাটের বাজারে বসেই পদ্ম ঝিকে দেখাবো—তুই কোথায় আর আমি কোথায়! হাতে পয়সা থাকলে কালই না হোটেল খুলে দিতাম! কুসুমকে রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবো আমার নিজের হোটেল হলে।

কতকগুলি বিষয় সে যে খুব ভাল শিখিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারে। বাজার-করা হোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারী কাজ এবং শক্ত কাজ। ভাল বাজার করার উপরে হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এবং ভাল বাজার করার মানেই হইতেছে সস্তা

ভাল জিনিস কেনা। ভাল জিনিসের বদলে সস্তা জিনিস—অথচ দেখিলে তাহাকে মোটেই খেলো বলিয়া মনে হইবে না—এমন দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা। যেমন বাটা মাছ যেদিন বাজারে আক্রা—সেদিন ছ'আনা সের রেল-চালানী রাস্ মাছের পোনা কিনিয়া তাহাকে বাটা বলিয়া চালাইতে হইবে—হঠাৎ ধরা বড় কঠিন, কোনটা বাটার পোনা, কোনটা রাসের পোনা।

পরদিন হাজারি চূর্ণীর ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মন কাল হইতে ভাল নয়। পদ্ম ঝির নিকট ভাল ব্যবহার কখনও সে পায় নাই, পাইবার প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তবুও কাল সামান্য একটু রাঁধা মাংস লইয়া পদ্ম ঝি যে কাণ্ডটি করিল, তাহাতে সে মনোকষ্ট পাইয়াছে খুব বেশী। পরের চাকরি করিতে গেলে এমন হয়। কুসুমকে একটুখানি মাংস না দিতে পারিয়া তাহার কষ্ট হইয়াছে বেশী—অমন ভাল রান্না সে অনেক দিন করে নাই—অত আশার জিনিসটা কুসুমকে দিতে পারিলে তাহার মনটা খুশি হইত।

ভাল কাজ করিলেও চাকুরির উন্নতি তো দূরের কথা, ইহারা সুখ্যাতি পর্য্যন্ত করিতে জানে না। বরঞ্চ পদে পদে হেনস্থা করে। এক একবার ইচ্ছা হয় যদুবাবুর হোটেলে কাজ লইতে। কিন্তু সেখানেও যে এরকম হইবে না তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। সেখানেও পদ্ম ঝি জুটিতে বিলম্ব হইবে না। কি করা যায়।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বেশীক্ষণ বসা যায় না। বহু পাপ না করিলে আর কেহ হোটেলের রাঁধুনীগিরি করিতে আসে না। এখনি গিয়া ডেক্‌চি না চড়াইলে পদ্ম ঝি এক ঝুড়ি কথা শুনাইয়া দিবে, এতক্ষণ উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।...কিন্তু ফিরিবার পথে সে কি মনে করিয়া কুসুমের বাড়ী গেল।

কুসুম আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—বাবাঠাকুর আসুন, বড় সৌভাগ্য অসময়ে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

হাজারি বলিল—স্যাখ্ কুসুম, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

কুসুম সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বাবাঠাকুর?

—আমার বয়েস ছে'চল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না, কি বলিস কুসুম? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে, তুই কি বলিস?

হাজারির কথাবার্ত্তার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া কুসুম কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতুকের সুরে বলিল—তা—বাবাঠাকুর, তা তো বটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি—কেন বাবাঠাকুর?

কুসুমের মনে একটা কথা উঁকি মারিতে লাগিল—বাবাঠাকুর আবার বিয়ে-টিয়ে করবার কথা ভাবচেন নাকি?

হাজারি বলিল—আমার বড় ইচ্ছে আছে কুসুম, একটা হোটেল করব নিজের নামে। পয়সা যদি হাতে কোনদিন জমাতে পারি, এ আমি নিশ্চয়ই করবো, তুই জানিস! পরের,

খাঁটা খেয়ে কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। আমি আজ দশ বছর হোটেলে কাজ করছি, বাজার কি ক'রে করতে হয় ভাল ক'রে শিখে ফেলেছি। চক্কত্তি মশায়ের চেয়েও আমি ভাল বাজার করতে পারি। মাখমপুরের হাট থেকে ফি হাটবা যদি তরিতরকারী কিনে আনি তবে রাণাঘাটের বাজারের চেয়ে টাকায় চার আনা ছ'আনা সস্তা পড়ে। এ ধরো কম লাভ নয় একটা হোটেলের ব্যাপারে। বাজার করবার মধ্যেই হোটেলের কাজের আদ্ধেক লাভ। আমার খুব মনে জোর আছে কুসুম, টাকা পয়সা হাতে যদি কখনো পড়ে, তবে হোটেল যা চালাবো, বাজারের সেরা হোটেলে হবে, তুই দেখে নিস্।

কুসুম হাজারি ঠাকুরের এ দীর্ঘ বক্তৃতা অবাক হইয়া শুনিতেছিল—সে হাজারিকে বাবার মত দেখে বলিয়াই মেয়ের মত বাবার প্রতি সর্বপ্রকার কাল্পনিক গুণ ও জ্ঞানের আরোপ করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ব্যাপারের সে বিশেষ কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাবাঠাকুর যে বুদ্ধিমান, তাহা সে হাজারির বক্তৃতা হইতে ধারণা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে বলিল—আমার এক জোড়া রুলি ছিল, এক গাছা বিক্রী ক'রে দিয়েছি আমার ছোট ছেলের অসুখের সময় আর বছর। আর এক গাছা আছে। বিক্রী করলে ষাট-সত্তর টাকা হবে। আপনি নেবেন বাবাঠাকুর? ওই টাকা নিয়ে হোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি হাসিয়া বলিল—দূর পাগলী! ষাট টাকায় হোটেল হবে কি রে?

—কত টাকা হ'লে হয়?

—অন্ততঃ দুশো টাকার কম তো নয়। তাতেও হবে না।

—আচ্ছা, হিসেব ক'রে দেখুন না বাবাঠাকুর।

—হিসেব ক'রে দেখব কি, হিসেব আমার মুখে মুখে। ধরো গিয়ে দুটো বড় ডেকচি, ছোট ডেকচি তিনটে। থালা-বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুন্তি, বেড়ি, চামচে, চায়ের বাসন। বাইরে গদির ঘরের একখানা তক্তপোশ, বিছানা, তাকিয়া। বাক্স, খেরো বাঁধানো খাতা দু'খানা। বালতি, লণ্ঠন, চাকি, বেলুন—এই সব নানান নটখটি জিনিস কিনতেই তো দুশো টাকার ওপর বেরিয়ে যাবে। পাঁচদিনের বাজার খরচ হাতে ক'রে নিয়ে নামতে হবে। চাকর ঠাকুরের দু'মাসের মাইনে হাতে রেখে দিতে হয়—যদি প্রথম দু'মাস না হোলো কিছু, ঠাকুর চাকরের মাইনে আসবে কোথা থেকে? সে-সব যাক্-গে, তা ছাড়া তোর টাকা নেবোই বা কেন?

কুসুম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন—ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্যি বাবাঠাকুর! সে ভাগ্যি থাকলে তো হবে, আমার অত টাকা যখন নেই, তখন আর সে কথা বলছি কি ক'রে বলুন! যা আছে, ওতে যদি কখনো-সখনো কোন দরকার পড়ে আপনার মেয়েকে জানাবেন।

হাজারি উঠিল। আর এখানে বসিয়া দেরি করিলে চলিবে না। বলিল—না রে কুসুম, ওতে আর কি হবে। আমি যাই এখন।

কুসুম বলিল— একটু কিছু মুখে না দিলে মেয়ের বাড়ী থেকে কি ক'রে উঠবেন বাবাঠাকুর, বসুন আর একটু। আমি আসচি।

কুসুম এত দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যে হাজারি ঠাকুর প্রতিবাদ করিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইল না। একটু পরে কুসুম ঘরের মধ্যে একখানা আসন আনিয়া পাতিল এবং মেজের উপর জলের হাত বুলাইয়া লইয়া আবার বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবিতে পেঁপে কাটা, আমের টিকলি ও দুটি সন্দেশ আনিয়া আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া বলিল—একটু জল খান, বসুন এসে, আমি খাবার জল আনি। হাজারি আসনের উপর বসিল। কুসুম ঝকঝকে করিয়া মাজা একটা কাঁচের গেলাসে জল আনিয়া রেকাবির পাশে রাখিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাইতে খাইতে হাজারির মনে পড়িল সেদিনকার সেই মাংসের কথা। মেয়ের মত স্নেহ-যত্ন করে কুসুম, তাহারই জন্য তুলিয়া রাখা মাংস কিনা খাওয়াইতে হইল চক্কত্তি মহাশয়ের গাঁজাখোর শালাকে দিয়া শুধু ওই পদ্ম ঝিয়ের জন্যে। দাসত্বের এই তো সুখ!

হাজারি বলিল—তুই আমার মেয়ের মতন কুসুম-মা।

কুসুম হাসিয়া বলিল—মেয়ের মতন কেন বাবাঠাকুর, মেয়েই তো।

—ঠিক, মেয়েই তো। মেয়ে না হোলে বাপের এত যত্ন কে করে?

—যত্ন আর কি করেচি, সে ভাগ্যি ভগবান কি আমায় দিয়েছেন? একে কি যত্ন করা বলে? কাঁথাখানা পেতে শুচ্চেন বাবাঠাকুর?

—তা শুচ্চি বই কি রে। রোজ তোর কথা মনে হয় শোবার সময়। মনে ভাবি কুসুম এখানা দিয়েছে! ছেঁড়া মাদুরের কাটি ফুটে ফুটে পিঠে দাগ হয়ে গিয়েছিল। পেতে শুয়ে বেঁচেছি।

—আহা, কি যে বলেন! না, সন্দেশ দুটোই খেয়ে ফেলুন, পায়ে পড়ি। ও ফেলতে পারবেন না।

—কুসুম, তোর জন্যে না রেখে খেতে পারি কিছু মা? ওটা তোর জন্যে রেখে দিলাম।

কুসুম লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। হাজারি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলে বলিল—পান আনি, দাঁড়ান।

তাহার পর সামনে দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া বলিল—আমার ও রুলি গাছা রইল তোলা আপনার জন্যে, বাবাঠাকুর। যখন দরকার হয়, মেয়ের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু।

সেদিন হোটেলে ফিরিয়া হাজারি দেখিল, প্রায় পনেরো সের কি আধ মণ ময়দা চাকর আর পদ্ম ঝি মিলিয়া মাখিতেছে।

ব্যাপার কি! এত লুচির ময়দা কে খাইবে?

পদ্ম ঝি কথার সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝাঁজ মিশাইয়া বলিল—হাজারি ঠাকুর, তোমার যা যা রাঁধবার আগে সেরে নাও—তারপর এই লুচিগুলো ভেজে ফেলতে হবে। আচার্য্য-পাড়ার

মহাদেব খোষালের বাড়ীতে খাবার যাবে, ওরা অর্ডার দিয়ে গেছে সাড়ে ন'টার মধ্যে চাই, বুঝলে ?

হাজারি ঠাকুর অবাক হইয়া বলিল—সাড়ে ন'টার মধ্যে ওই আধ মণ ময়দা ভেজে পাঠিয়ে দেবো, আবার হোটেলের রান্না রাঁধবো ! কি যে বল পদ্মদিদি, তা কি ক'রে হবে ? রতন ঠাকুরকে বল না লুচি ভেজে দিক, আমি হোটেলের রান্না রাঁধবো।

পদ্ম ঝি চোখ রাঙাইয়া ছাড়া কথা বলে না। সে গরম হইয়া ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার ইচ্ছে বা খুশিতে এখানকার কাজ চলবে না। কর্তা মশায়ের হুকুম। আমায় যা বলে গেছেন তোমায় বললাম, তিনি বড় বাজারে বেরিয়ে গেলেন—আসতে রাত হবে। এখন তোমার মর্জ্জি—করো আর না করো।

অর্থাৎ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের এই অবিচারে হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। নিছক অবিচার ছাড়া ইহা অন্য কিছু নহে। রতন ঠাকুরকে দিয়া ইহারা সাধারণ রান্না অনায়াসেই করাইতে পারিত, কিন্তু পদ্ম ঝি তাহা হইলে খুশি হইবে না। সে যে কি বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে পদ্ম ঝিয়ের ! উহাকে জব্দ করিবার কোনো ফাঁকই পদ্ম ছাড়ে না।

ভীষণ আগুনের তাতের মধ্যে বসিয়া রতন ঠাকুরের সঙ্গে দৈনিক রান্না কার্য্যেতেই প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। পদ্ম ঝি তাহার পর ভীষণ তাগাদা লাগাইল লুচি ভাজাতে হাত দিবার জন্য। পদ্ম নিজে খাটিতে রাজি নয়, সে গেল খরিদ্দারদের খাওয়ার তদারক করিতে। আজ আবার হাটবার, বহু ব্যাপারী খরিদ্দার। রতন ঠাকুর তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। হাজারি এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইয়াই আবার আগুনের তাতে বসিয়া গেল লুচি ভাজিতে।

আধঘণ্টা পরে—তখন পাঁচ সের ময়দাও ভাজা হয় নাই—পদ্ম আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, লুচি হয়েচে ? ওদের লোক এসেছে নিতে।

হাজারি বলিল—না এখনো হয়নি পদ্মদিদি। একটু ঘুরে আসতে বল।

—ঘুরে আসতে বললে চলবে কেন ? সাড়ে ন'টার মধ্যে ওদের খাবার তৈরি ক'রে রাখতে হবে বলে গেছে। তোমায় বলিনি সেকথা ?

—বল্লে কি হবে পদ্মদিদি ? মন্তরে ভাজা হবে আধ মণ ময়দা ? ন'টার সময় তো উনুনে ডাল্লার নেচি ফেলেচি—জিগ্যেস্ করো মতিকে।

—সে সব আমি জানিনে। যদি ওরা অর্ডার ফেরত দেয়, বোঝাপড়া ক'রো কর্তার সঙ্গে, তোমার মাইনে থেকে আধ মন ময়দা আর দশ সের ঘি র দাম একমাসে তো উঠবে না, তিন মাসে ওঠাতে হবে।

হাজারি দেখিল, কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। সে নীরবে লুচি ভাজিয়া যাইতে লাগিল। হাজারি ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস করে নাই—কাজ করিতে বসিয়া শুধু ভাবে কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার নিয়ম—কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক। লুচি ঘিয়ে ডুবাইয়া

তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লুচি কাঁচা থাকিয়া যাইবে। এজন্য সে ধীরে ধীরে সময় লইয়া লুচি তুলিতে লাগিল। পদ্ম ঝি একবার বলিল—অত দেরি ক'রে খোলা নামাচ্ছ কেন ঠাকুর? হাত চালাও না—অত লুচি ডুবিয়ে রাখলে কড়া হয়ে যাবে—

হাজারি ভাবিল, একবার সে বলে যে রান্নার কাজ পদ্ম ঝিয়ের কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে না, লুচি ডুবাইলে কড়া কি নরম হয় সে ভালই জানে, কিন্তু তখনই সে বুঝিল, পদ্ম ঝি কেন একথা বলিতেছে।

দশ সের ঘি হইতে জলতি বাদে যাহা বাকী থাকিবে পদ্ম ঝিয়ের লাভ। সে বাড়ী লইয়া যাইবে লুকাইয়া। কর্তামশায় পদ্ম ঝিয়ের বেলায় অন্ধ। দেখিয়াও দেখেন না।

হাজারি ভাবিল, এই সব জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খদ্দেরে পয়সা দেবে, তারা কাঁচা লুচি খাবে কেন? দশ সের ঘিয়ের দাম তো তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েচে, তবে তা থেকে বাঁচানোই বা কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভাল হয় তাই তো দেখতে হবে? পদ্ম ঝি বাড়ী নিয়ে যাবে ব'লে তারা দশ সের ঘিয়ের ব্যবস্থা করে নি।

পরক্ষণেই তাহার নিজের স্বপ্নে সে ভোর হইয়া গেল।

এই রেল-বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি কাহাকে বলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খদ্দের যে জিনিসের অর্ডার দিবে, তাহার মধ্যে চুরি সে করিবে না। খদ্দের সন্তুষ্ট করিলে ব্যবসা। নিজের হাতে রাঁধিবে, খাওয়াইয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।

লুচি ভাজা ঘিয়ের বুদ্বুদের মধ্যে হাজারি ঠাকুর যেন সেই ভবিষ্যৎ হোটেলের ছবি দেখিতে পাইতেছে। প্রত্যেক ঘিয়ের বুদ্বুদটাতে। পদ্ম ঝি সেখানে নাই, বেচু চক্কত্তির গাঁজাখোর ও মাতাল শালাও নাই। বাহিরে গদির ঘরে দিব্য ফর্সা বিছানা পাতা, খদ্দের যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করুক, তামাক খাইতে ইচ্ছা করে খাক্, বাড়তি পয়সা আর একটিও দিতে হইবে না। দুইটা করিয়া মাছ, হপ্তায় তিন দিন মাংস বাঁধা-খদ্দেরদের। এসব না করিয়া শুধু ইষ্টিশনের প্লাটফর্মে—হি-ই-ইন্দু হোটেল, হি-ই-ই-ন্দু হোটেল, বলিয়া মতি চাকরের মত চেঁচাইয়া গলা ফাটাইলে কি খদ্দের ভিড়িবে?

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, তোমার হোল? হাত চালিয়ে নিতে পাচ্ছ না? বাবুদের লোক যে বসে আছে।

বলিয়াই ময়দার বারকোশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা লুচি যতগুলি ছিল, হাজারি প্রায় সব খোলায় চাপাইয়া দিয়াছে—খান পনেরো কুড়ির বেশী বারকোশে নাই। মতি চাকর পদ্ম ঝিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে লাগিল।

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার হাত চলচে না, না? এখনো দশ সের ময়দার তাল তাওয়ার, ওই রকম ক'রে লুচি বেললে কখন কি হবে?

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, রাত এগারোটা বাজবে ওই লুচি বেলতে আর এক হাতে

ভাজতে। তুমি বেলবার লোক দাও।

পদ্ম ঝি মুখ নাড়িয়া বলিল—আমি ভাড়া ক'রে আনি বেলবার লোক তোমার জন্যে। ও আমার বাবু রে! ভাজতে হয় ভাজো, না হয় না ভাজো গে—ফেরত গেলে তখন কর্তামশায় তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এখন।

পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

মতি চাকর বলিল—ঠাকুর, তুমি লুচি ভেজে উঠতে পারবে কি ক'রে? লুচি পোড়াবে না। এত ময়দার তাল আমি বেলবো কখন বলো।

হঠাৎ হাজারির মনে হইল, একজন মানুষ এখনি তাহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া যাইত—কুসুম! কিন্তু সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের ঘরের বৌ—তাহাকে তো এখানে আনা যায় না। যদিও ইহা ঠিক, খবর পাঠাইয়া তাহার বিপদ জানাইলে কুসুম এখনি ছুটিয়া আসিত।

তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই—দেখিয়াছে শুধু লুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাখারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাঙ্গা রাঙ্গা লুচির গোছা—তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভীষণ আগুনের তাত, মাজা পিঠ বিষম টনটন্ করিতেছে, ঘাম ঝরিয়া কাপড় ও গামছা ভিজিয়া গিয়াছে, এক ছিলিম তামাক খাইবারও অবকাশ নাই—শুধু কাঁচা লুচি কড়ায় ফেলা এবং ভাজিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া পাশের ধামাতে রাখা।

রাত দশটা।

মুর্শিদাবাদের গাড়ী আসিবার সময় হইল।

মতি চাকর বলিল—আমি একবার ইষ্টিশনে যাই ঠাকুরমশায়। টেরেনের টাইম হয়েচে। খদ্দের না আনলে কাল কর্তামশায়ের কাছে মার খেতে হবে। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

ঠিক কথা, সে খানিকক্ষণ প্লাটফর্মে পায়চারি করিতে করিতে 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' বলিয়া চেঁচাইবে। মুর্শিদাবাদের ট্রেন আসিতে আর মিনিট পনেরো বাকী।

হাজারি বলিল—একা আমি বেলবো আর ভাজবো। তুই কি খেপলি মতি? দেখলি তো এদের কাণ্ড। রতনঠাকুর সরে পড়েছে, পদ্মদিদিও বোধ হয় সরে পড়েছে। আমি একা কি করি?

মতি বলিল—তোমাকে পদ্মদিদি দুচোখে দেখতে পারে না। কারো কাছে বোলো না ঠাকুর—এ সব তারই কারসাজি। তোমাকে জব্দ করবার মতলবে এ কাজ করেচে। আমি যাই, নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

মতি চলিয়া গেল। অন্ততঃ পাঁচ সের ময়দার তাল তখনও বাকী। লেচি পাকানো সে-ও প্রায় দেড় সের—হাজারি গুণিয়া দেখিল ষোল গণ্ডা লেচি। অসম্ভব! একজন মানুষের দ্বারা কি করিয়া রাত বারোটার কমে বেলা এবং ভাজা দুই কাজ হইতে পারে!

মতি চলিয়া যাইবার সময় যে বিড়িটা দিয়া গিয়াছিল সেটি তখনও ফুরায় নাই—এমন সময়

পদ্ম উঁকি মারিয়া বলিল—কেবল বিড়ি খাওয়া আর কেবল বিড়ি খাওয়া! ওদিকে বাবুর বাড়ী থেকে লোক দুবার ফিরে গেল—তখনি তো বলেচি হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে এ কাজ হবে না—বলি বিড়িটা ফেলে কাজে হাত দেও না, রাত কি আর আছে?

হাজারি ঠাকুর সত্যই কিছু অপ্রতিভ হইয়া বিড়ি ফেলিয়া দিল। পদ্ম ঝিয়ের সামনে সে একথা বলিতে পারিল না যে, লুচি বেলিবার লোক নাই। আবার সে লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল একাই।

রাত এগারোটার বেশী দেরি নাই। হাজারির এখন মনে হইল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না। কেবলই এই সময়টা মনে আসিতেছিল দুটি মুখ। একটি মুখ তাহার নিজের মেয়ে টেঁপির—বছর বারো বয়স, বাড়ীতে আছে; প্রায় পাঁচ ছ'মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নাই—আর একটি মুখ কুসুমের। ওবেলা কুসুমের সেই যত্ন করিয়া বসাইয়া জল খাওয়ানো…তার সেই হাসিমুখ…টেঁপির মুখ আর কুসুমের মুখ এক হইয়া গিয়াছে…লুচি ও ঘিয়ের বুদ্‌বুদে সে তখনও যেন একখানা মুখই দেখিতে পাইতেছে—টেঁপি ও কুসুম দুইয়ে মিলিয়া এক…ওরা আজ যদি দু'জনে এখানে থাকিত। ওদিকে কুসুম বসিয়া হাসিমুখে লুচি বেলিতেছে এদিকে টেঁপি…

—ঠাকুর!

স্বয়ং কর্তামশায়, বেচু চক্কত্তি। পিছনে পদ্ম ঝি। পদ্ম ঝি বলিল—ও গাঁজাখোর ঠাকুরকে দিয়ে হবে না আপনাকে তখুনি বলিনি বাবু? ও গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে, দেখচো না? কাজ এগুবে কোত্থেকে!

হাজারি তটস্থ হইয়া আরও তাড়াতাড়ি লুচি খোলা হইতে তুলিতে লাগিল। বাবুদের লোক আসিয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম ঝি যে লুচি ভাজা হইয়াছিল, তাহাদের ওজন করিয়া দিল কর্তাবাবুর সামনে। পাঁচ সের ময়দার লুচি বাকী থাকিলেও তাহারা লইল না, এত রাত্রে লইয়া গিয়া কোনো কাজ হইবে না।

বেচু চক্কত্তি হাজারিকে বলিলেন—ওই ঘি আর ময়দার দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে। গাঁজাখোর মানুষকে দিয়ে কি কাজ হয়?

হাজারি বলিল—আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। কেউ তো বেলে দিতে আসেনি এক মতি চাকর ছাড়া। সেও গাড়ীর টাইমে ইষ্টিশনে খদ্দের আনতে গেল, আমি কি করবো বাবু!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সে সব শুনচি নে ঠাকুর। ওর দাম তুমি দেবে। খদ্দের অর্ডার ফেরত দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারিনে, আর মাথা নেচি-কাটা ময়দা।

হাজারি ভাবিল, বেশ, তাহাকে যদি এদের দাম দিতে হয়, লুচি ভাজিয়া সে নিজে লইবে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত খাটিয়া ও মতি চাকরকে কিছু অংশ দিবার জন্য লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া লুচি বেলাইয়া সব ময়দা ভাজিয়া তুলিল। মতি তাহার অংশ লইয়া চলিয়া গেল।

এখনও তিন চার ঝুড়ি লুচি মজুত।

পদ্ম ঝি উঁকি মারিয়া বলিল—লুচি ভাজচো এখনও বসে? আমাকে খানকতক দাও দিকি—

বলিয়া নিজেই একখানা গামছা পাতিয়া নিজের হাতে খান পঁচিশ-ত্রিশ গরম লুচি তুলিয়া লইল। হাজারি মুখ ফুটিয়া বারণ করিতে পারিল না। সাহসে কুলাইল না।

অনেক রাত্রে সুপ্তোত্থিতা কুসুম চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরের দরজা খুলিয়া সম্মুখে মস্ত এক পোঁটলা-হাতে-ঝোলানো অবস্থায় হাজারি ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবাঠাকুর, কি মনে ক'রে এত রাত্রে?...

হাজারি বলিল—এতে লুচি আছে মা কুসুম। হোটেলে লুচি ভাজতে দিয়েছিল খদ্দেরে। বেলে দেবার লোক নেই—শেষকালে খদ্দের পাঁচ সের ময়দার লুচি নিলে না, কর্ত্তাবাবু বলেন আমায় তার দাম দিতে হবে। বেশ আমায় দাম দিতে হয় আমিই নিয়ে নিই। তাই তোমার জন্যে বলি নিয়ে যাই, কুসুমকে তো কিছু দেওয়া হয় না কখনো। রাত বড্ড হয়ে গিয়েচে—ঘুমিয়েছিলে বুঝি? ধর তো মা বোঁচকাটা রাখো গে যাও।

কুসুম বোঁচকাটা হাজারির হাত হইতে নামাইয়া লইল। সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছে, বাবাঠাকুর পাগল, নতুবা এত রাত্রে—(তাহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে—), এখন আসিয়াছে লুচির বোঁচকা লইয়া।

হাজারি বলিল, আমি যাই মা—লুচি গরম আর টাটকা, এই ভেজে তুলিচি। তুমি খানকতক খেয়ে ফেলো গিয়ে এখনি। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে। আর ছেলেপিলেদের দাও গিয়ে। কত আর রাত হয়েচে—সাড়ে বারোটার বেশী নয়।

হোটেলে ফিরিয়া হাজারি ঠাকুর একটি দুঃসাহসের কাজ করিল।

মতি চাকর পূর্ব্ব হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তুলিয়া বলিল—মতি, আমি রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাচ্চি। এত লুচি কি হবে, বাড়ীতে দিয়ে আসি। তুমি থাকো, আমি কাল সকাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না করবো, কর্ত্তা মশায়কে বলো।

মতি অবাক হইয়া বলিল—এত রাত্রে লুচি নিয়ে বাড়ী রওনা হবে!—

—এত লুচি কি হবে? এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমার জিনিস নিজের বাড়ী দিয়ে আসি। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পায় না, তাদের দিয়ে আসি! ছ'টা পয়সা তো খরচ।

হাজারি আর ঘুমাইল না। টেঁপির জন্য তার মন-কেমন করিয়া উঠিয়াছে। কুসুম যেমন, টেঁপিও তেমন। আরও দু'টি ছেলে আছে ছোট ছোট। তাদের মুখ বঞ্চিত করিয়া এত লুচি এখানে রাখিয়া পদ্ম ঝি আর কর্ত্তামশায়ের বাড়ীতে খাওয়াইয়া কোন লাভ নাই।

রাত সাড়ে তিনটার সময় গাংনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাজারি নিজের গ্রামের পথ ধরিল এবং সাড়ে তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বগ্রামে পৌঁছিল।

এড়োশোলা এক সময়ে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল—এখন পূর্ব্বের শ্রী নাই। গ্রামের জমিদার কর বাবুরা এখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়াতে গ্রামের মাইনর স্কুলটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এখান হইতে বাস উঠাইয়া কেহ রানাঘাট, কেহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। নিতান্ত নিরুপায় যারা তারাই গ্রামে পড়িয়া আছে।

হাজারির বাড়ীতে দুখানা খড়ের ঘর। ছোট্ট উঠান, একদিকে কাঁঠাল গাছ, অন্যদিকে একটা সজনে গাছ এবং একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছটা হাজারির মা নিজের হাতে পুঁতিয়াছিলেন—বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়, কাশীর পেয়ারার বীজের চারা।

হাজারির ডাকাডাকিতে হাজারির স্ত্রী উঠিয়া দোর খুলিয়া, এ অবস্থায় স্বামীকে দেখিয়া বলিল—এসো, এসো। শেষ রাতের গাড়ীতে এলে কেন গো? এই দুরান্তর রাস্তা, অন্ধকার রাত—আবার বড্ড সাপের ভয় হয়েছে—সাপের কামড়ে দু-তিনটি মানুষ মরে গিয়েছে এর মধ্যে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—আমাদের গাঁয়ে নয়—নতুন কাওরা পাড়ায় একটা মরেচে আর বামন পাড়ায় শুনচি একটা—অত বড় বোঁচকাতে কি গো?

হাজারি লুচির আসল ইতিহাস কিছু বলিল না। স্ত্রীর আনন্দপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল—পেয়েছি গো পেয়েছি। ভগবান দিয়েছেন, সবাই মিলে খেয়ে নাও মজা ক'রে। টেঁপিকে খুব ক'রে খাওয়াও, ও পেট ভরে খাবে আমি দেখি।

সেদিন সকালের গাড়ীতে হাজারি রাণাঘাটে ফিরিতে পারিল না।

দুপুরের পরে হাজারি কুসুমের বাপের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

এই গ্রামেই গোয়ালাপাড়ায় কুসুমের জ্যাঠামশায় হরি ঘোষের অবস্থা এক সময় যথেষ্ট ভাল ছিল, এখনও বাড়ীতে গোহাল-পোরা গরুর মধ্যে আট-দশটি অবশিষ্ট আছে, দুটি ছোট ছোট ধানের গোলাও বজায় আছে।

হাজারিকে হরি ঘোষ খুব খাতির করিয়া খেজুর পাতার চটে বসিতে দিল। বলিল—কবে আলেন বাবাঠাকুর? সব ভালো।

—তোমরা সব ভাল আছ?

—আপনার ছিচরণের আশির্ব্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে। রাণাঘাটেই কাজ কচ্চেন তো?

—হ্যাঁ। সেখান থেকেই তো এলাম।

—আমাদের কুসুমের সঙ্গে দেখা-টেখা হয় ?

হাজারি পাড়াগাঁয়ের লোক, এখানকার লোকের ধাত চেনে। কুসুমের সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা-শোনা বা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টানের কোন পরিচয় সে এখানে দিতে চায় না। ইহারা হয়তো সহজ ভাবে সেটা গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে নানারূপ কদর্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইতে। সুতরাং সে বলিল —হ্যাঁ,—দু-একবার হয়েছিল। ভাল আছে!

—এবার যদি দেখা হয়, একবার আসতে বলবেন ইদিকে। তার গাঁয়ে আসবার দিকে তত টান নেই, শহরে দুধ বেচে চালানো যে কি মিষ্টি লেগেছে!

হাজারি কথার গতি অন্য দিকে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—এবার আবাদপত্র কি রকম হোল বল ?

—ধানের আবাদ করিচি বারো বিঘে আর বাকী সব তরকারি। কুমড়ো দু-বিঘে, আলু, পেঁয়াজ,—তা এবার আকাশের অবস্থা ভাল না বাবাঠাকুর, ক্ষেতে মাটি ফেটে যাচ্চে!

তরকারির কথায় হাজারির নিজের গোপনীয় উচ্চাশার কথা মনে পড়িল। তরকারি তাহার গ্রাম হইতে কিনিলে রাণাঘাট বাজারের চেয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এখান হইতেই সে আনাজপত্র লইয়া যাইবে।

হরি ঘোষকে বলিল—আচ্ছা, তোমাদের আলু ক'মণ হ'তে পারে ?

—বাবাঠাকুর তার কি কোন ঠিক আছে ? তবে ত্রিশ-চল্লিশ মণ খুব হবে।

—তুমি সমস্ত আলু আমায় দিতে পারবে ? নগদ দাম দেবো।

হরি ঘোষ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বাবাঠাকুর, আজকাল কাঁচামালের ব্যবসা করচেন নাকি ?

—ব্যবসা এখনও করিনি, তবে করবো ভাবচি। সে তোমায় বলব একদিন।

গোয়ালপাড়া হইতে আসিবার পথে একটা খুব বড় বাঁশবনের মাঝখান দিয়া পথ। এখানে লোকজন নাই, এড়োশোলা গ্রামেই লোকজনের বসত নাই। আগে ছিল—ম্যালেরিয়ায় মরিয়া হাজিয়া লোকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। শুধুই বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান ও বাঁশবনের জঙ্গল।

এই বাঁশবনের মধ্যে পুরোনো দিনে পালিত পাড়া ছিল, হাজারি বাল্যকালেও দেখিয়াছে। পালিতেরা বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল গ্রামের মধ্যে, পূজাপার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত হইয়াছে রাজেন পালিতের বাড়ী। এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিতদের ভিটাটা পড়িয়া আছে এই পর্য্যন্ত। দিন-মানেই বোধ হয় বাঘ লুকাইয়া থাকে।

বাঁশঝাড়ে কট-কট করিয়া শুকনো বাঁশের শব্দ হইতেছে—ঘন ছায়া, শুকনো বাঁশপাতার ও সোলার শব্দ। ঝিঁঝেঁ, শালিখ পাখীর কলরব। হাজারির মনে হইল, আজ যেন তার হোটেলের দাসত্ব-জীবন গতে মুক্তির দিন। সেই ভীষণ গরম উনুনের সামনে বসিয়া আজ আর তাকে তেকুচিতে ভাত-ডাল রান্না করিতে হইবে না। পদ্ম ঝিয়ের কড়া তাগাদা ও

মুরুব্বিয়ানা সহ্য করিতে হইবে না। বাঁশবনের ছায়ায় পূর্ণ শান্তিতে সে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়—তাহা হইলেও কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

এই মুক্তি সে ভাল ভাবেই আস্বাদ করিতে চায় বলিয়াই তো হোটেল খুলিবার কথা এত ভাবে।

সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, এইবার কিছু টাকা হইলেই সে রাণাঘাটের বাজারে হোটেল খুলিয়া দিতে পারে।

হাজারি সত্যই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, টাকা কোথায় ধার পাওয়া যাইতে পারে। এক গ্রামের গোসাঁইরা বড় লোক, কিন্তু তাহারা প্রায় সবাই থাকে কলিকাতায়। এখানে বৃদ্ধ কেশব গোসাঁই থাকেন বটে—কিন্তু লোকটা ভয়ানক কৃপণ—তিনি কি হাজারির মত সামান্য লোককে বিনা বন্ধকে, বিনা জামিনে টাকা ধার দিবেন?

হাজারির জামিন হইবেই বা কে!

তাহার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। দু'খানা মাত্র চালাঘর। রান্নাঘরখানা গত বর্ষায় পড়িয়া গিয়াছে—পয়সা অভাবে সারানো হয় নাই, উঠানের আমতলায় রান্না হয়—বৃষ্টির দিন এখন ক্রমশঃ চলিয়া গেল, এখন তত অসুবিধা হয় না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

হাজারি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার ছোট মেয়ে টেঁপি ঘরের দাওয়ায় বসিয়া উল বুনিতেছে। টেঁপি বাবাকে দেখিয়া বলিল—তোমার জন্য আসন বুনচি বাবা—কাল তুমি যদি থাকো, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

হাজারি মনে মনে হাসিল। বেচু চক্কত্তির হোটেলে সে রঙীন পশমের আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়াছে—ছবিটি বেশ বটে। পদ্ম ঝি কি মন্তব্য করিবে তাহা হইলে?

মেয়েকে বলিল—দেখি কেমন আসন? বাঃ বেশ হচ্ছে তো, কোথায় শিখলি তুই বুনতে?

টেঁপি বলিল—মুখুয্যে-বাড়ীর নীলা-দি আর অতসী-দি'র কাছে। আমি রোজ যাই দুপুরে, ওরা আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়।

—ওরা এখনও আছে? হরিচরণবাবু চলে যান নি এখনও?

—ওরা নাকি এ মাসটা থাকবে। থাকলে তো আমারই ভাল—আমি কাজটা শিখে নিতে পারি। কি চমৎকার গান গাইতে পারে অতসী-দি! আজ শুনবে বাবা?

—তুই গান শিখলি কিছু?

টেঁপি লাজুক সুরে বলিল—দু-একটা। সে কিছু নয়। তুমি অতসী-দির গান যদি শোনো, তবে বলবে যে কলের গানের রেকর্ড শুনচি। ওদের বাড়ী খুব বড় কলের গানও আছে। রোজ সন্ধ্যের পর বাজায়। কত রকমের গান আছে—যাবে শুনতে সন্ধ্যের পর? অতসী-দি নিজে কল বাজায়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—অতসী-দিকে বলবো বাবা এসেচে, ভালো ভালো বেছে গান দেবে।

হাজারি বলিল—হ্যাঁরে, হরিচরণবাবুর শরীর সেরেচে জানিস্?

—তা তো জানিনে, তবে তিনি বৈঠকখানায় বসে রোজই তো সবার সঙ্গে গল্প করেন। একদিন বৈঠকখানায় কলের গান বাজিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্ত্তন!

সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি বর্ত্তমানে হাজারির তত আগ্রহ নাই, হাজারির উদ্দেশ্য হরিচরণবাবুকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ শ'দুই টাকা ধার করা যায় কিনা, সেদিকে।

হরিচরণ মুখুয্যে মহাশয় এ গাঁয়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহারা এ গ্রামের জমিদার—কিন্তু অনেক দিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন। প্রকাণ্ড তিন-মহলা বাড়ী পড়িয়া আছে, দু-একজন বৃদ্ধা পিসী-মাসী ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ এতদিন ছিল না।

আজ মাস চার-পাঁচ হইল হরিচরণ মুখুয্যের একমাত্র পুত্র কলিকাতায় মারা যায় বসন্ত রোগে। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই আজ প্রায় তিন মাস হইল হরিচরণবাবু সপরিবারে দেশের বাটীতে আসিয়া যে কেন বাস করিতেছেন—সে খবর হাজারি রাখে না। তবে ইহা জানে যে, হরিচরণবাবু গ্রামের উত্তর মাঠে একটি দীঘি খনন করিবার জন্য জেলা বোর্ডের হাতে অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন এবং পুত্রের নামে একটি ডিস্পেন্সারী করিয়া দিবেন গ্রামে। হরিচরণবাবু কারো বাড়ী যান না। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন সব সময়। তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী এখানেই, তাছাড়া চাকর-বাকর ও দু'জন দরোয়ান আছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পর সাহসে ভর করিয়া হাজারি হরিচরণবাবুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে বড় বড় থামওয়ালা সাদা মার্ব্বেল পাথর বাঁধানো বারান্দা। বারান্দার সামনে একটা মাঝারি গোছের কামরা, পাশে একটা ছোট কামরা, পূর্ব্বে নবীনবাবু বলিয়া ইহাদের এক সরিক বড় বৈঠকখানার পাশে পৃথক ভাবে নিজের জন্য আর একটি বৈঠকখানা তৈরী করিয়াছিলেন—তিনি আজ পঁচিশ বৎসর হইল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে, উক্ত বৈঠকখানা ঘর বর্ত্তমানে বিচালি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাজারি টেঁপিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। টেঁপি বলিল—বাবা তুমি বোসো, আমি অতসী-দিকে বলিগে তুমি এসেছ কলের গান শুনতে। এখুনি দেবে গান।

বৈঠকখানার সামনে হাজারিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া টেঁপি পাশের ছোট্ট দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে সরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে তেলের চৌপায়া লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ইহা সাবেকী কালের বন্দোবস্ত, এখনও ঠিক বজায় আছে। হাজারি বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে ঘরে ঢুকিবে কিনা, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে স্বয়ং হরিচরণবাবু বারান্দায় বাহির হইয়াই সামনে হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—কে?

হাজারি বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু, আমি হাজারি—

—ও, হাজারি! কি মনে করে, এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের মধ্যে এসো। মাস-দুই তোমায় দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে, আমার বড় মেয়ে অতসীর সঙ্গে তার বেশ ভাব।

হরিচরণবাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, গৌরবর্ণ, লম্বা আড়ার চেহারা, বড়-বড় চোখ—গলার স্বর গম্ভীর। তিনি খুব শৌখীন লোক ছিলেন। এখনও এই বয়সেও এবং ছেলে মারা যাওয়া সত্ত্বেও বেশ শৌখীনতা ও সুরুচির পরিচয় আছে তাঁর আটপৌরে পোশাকেও।

হাজারি আসলে আসিয়াছে টাকা ধার করিবার কথা বলিতে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড বড় সেকেলে প্রমাণ সাইজের আয়নাখানায় নিজের আপাদ-মস্তক দেখিয়াই তাহার সাহসটুকু সব উবিয়া গেল।

হরিচরণবাবুর নির্দেশ মত সে একখানা চেয়ারে বসিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—চা খাবে হাজারি?

হাজারি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চা আমি—থাক্‌গে, সে কেন আবার কষ্ট—

হরিচরণবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমি তো চা খাবোই এখন, দাঁড়াও আনতে বলি—

এই সময় টেঁপি বৈঠকখানার যে দোর অন্তঃপুরের দিকে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণবাবুকে বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়াও সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল—বাবা দাঁড়াও, অতসী-দি কলের গান বাজাচ্চে—আমি বলেচি আমার বাবা তোমাদের কলের গান শুনতে এসেচে—

হরিচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন—কলের গান শুনতে এসেচ হাজারি! তা আমাকে বলতে হয় এতক্ষণ। শুনতে আসবে এর আর কথা কি? তোমরা দু-পাঁচজন আস-যাও, বড় আনন্দের কথা। গ্রাম তো লোকশূন্য হয়ে পড়েচে। ওরে খুকি, তোর বাবার জন্যে আর আমার জন্যে দু' পেয়ালা চা আনতে বলে দে তোর অতসী-দিদিকে।

হাজারি মনে মনে টেঁপির উপর চটিয়া গেল। হতভাগা মেয়েটা সব দিল মাটি করিয়া। কে তাহাকে বলিয়াছিল কলের গান শুনিতে সে যাইতেছে মুখুয্যে বাড়ীতে? অতঃপর টাকার কথা উত্থাপন করা কি ভালো দেখায়? নাঃ, যত ছেলেমানুষ নিয়া হইয়াছে কারবার!

হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এই সময় দু' পেয়ালা চা-হাতে ঘরে ঢুকিল। প্রথমে হাজারির সামনে টেবিলে একটি পেয়ালা নামাইয়া অন্য পেয়ালাটি হরিচরণবাবুর হাতে দিল। অতসীর বয়স আঠারো-উনিশ, বেশ ধপ্‌ধপে ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী—ডাগর ডাগর চোখ—এক কথায় অতসী সুন্দরী মেয়ে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ সহজ অনাড়ম্বর সাজগোজ, হাতে কয়েক গাছি সরু সোনার চুড়ি এবং কানে ইয়ারিং ছাড়া অলঙ্কারেরও কোন বাহুল্য নাই।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা—প্রণাম কর অতসী।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হাজারির সামনে নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল।

হাজারি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—থাক্ থাক্, এসো মা, রাজরাণী হও মা—এসো, কল্যাণ হোক্।

অতসীকে হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা গান শুনবেন। গ্রামোফোনটা নিয়ে এসো।

অতসীর সঙ্গে টেঁপি খুব ভাব করিয়াছে। টেঁপির বাবাকে অতসী এই প্রথম দেখিল—বন্ধুর পিতা কি রকম দেখিতে, কৌতূহলের সহিত সে চাহিয়া দেখিতেছিল, বাবার কথায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডের বাক্স বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

হরিচরণবাবু চাকরকে বলিলেন বাজাবে কে? তোর দিদিমণি আসচে না?

—দিদিমণি যে বল্লেন আপনি বাজাবেন—

—আমি ভাল চোখে দেখতে পাব না। তাকেই পাঠিয়ে দিগে যা—। একটু পরে অতসী, টেঁপি এবং পাড়ার আরও দু-তিনটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। কলের গান বাজনা শুরু হইল এবং চলিল ঘন্টা-দুই। আরও একবার চা দিয়া গেল চাকরে, কিন্তু পরিবেশন করিল অতসী।

সব মিটিয়া চুকিয়া যাইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টা বাজিয়া গেল।

হাজারি ছটফট করিতেছিল, গান শুনিতে সে এখানে আসে নাই।

গান বন্ধ হইলে অতসী, টেঁপি ও মেয়ের দল যখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, তখন হাজারি সাহসে ভর করিয়া বলিল—আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল বাবু।

হরিচরণবাবু বলিলেন—কি বল?

—আমার কিছু টাকা দরকার, যদি আমায় কিছু ধার দিতেন, তাহলে আমার একটা মস্ত বড় আশার কাজ মিটতো।

—মেয়ের বিয়ে দেবে?

—আজ্ঞে না বাবু, তা নয়, ব্যবসা করবো।

—কি ব্যবসা?

—বাবু আপনি তো জানেন আমি হোটেলে কাজ করি। আপনার কাছে লুকোবো না। আমি নিজে একটা হোটেল খুলতে চাচ্ছি এবার। টাকাটা সেজন্যে দরকার।

—কত টাকা দরকার?

—অন্ততঃ দুশো টাকা আমায় যদি দয়া করে দেন বাবু, আমার খালধারের কাঁঠাল বাগান আমি বন্ধক রাখচি আপনার কাছে। এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করবো।

হরিচরণবাবু ভাবিয়া বলিলেন—বাগান বন্ধক রেখে টাকা আমি দিতাম না, দিতাম তো তোমাকে এমনি দিতাম, কিন্তু অত টাকা এখন সময় আমার হাতে নগদ নেই।

হাজারি এ-কথার পরে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, বিশেষতঃ সে জানিত হরিচরণবাবু উদার মেজাজের মানুষ, সত্যবাদী লোক। টাকা হাতে থাকিলে, হাতে টাকা না থাকার কথা বলিতেন না।

অতসী আসিয়া বলিল—কাকা, আপনি একটু বসুন। টেঁপি খেতে বসেচে, মা ডাকলে

না। মেয়েরা, যারা গান শুনতে এসেছিল, সবাইকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। একটু দেরি হবে। না হয় আপনি যান, আমি ঝি'র সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এখন। হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, একটু বসে যাও না হাজারি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। কেউ বড় একটা আসে না আমার এখানে—। হাজারি বসিল।

—তুমি কোথায় কোন্ হোটেলে কাজ কর ?

—আজ্ঞে রাণাঘাট, বেচু চক্কত্তির হোটেলে, রেল-বাজারের মধ্যে।

—কত মাইনে পাও ?

—বাবু সে আর বলবার কথা নয়, খাওয়া আর সাত টাকা মাসে। তাই ভাবছিলাম পরের তাঁবে থাকবো না। এদিকে বয়স হলো, এইবার একটা হোটেল খুলে নিজে চালাবো।

—হোটেল চালাতে পারবে ?

—তা বাবু আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম সবই জানি ও-লাইনের। বাজার আর রান্না, হোটেলের দুটো মস্ত কাজ, এ যে শিখেচে, সে হোটেল খুলে লাভ করতে পারে। আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা ক'রে ও দুটো কাজ শিখে নিইচি—খদ্দের কি চায় তাও জানি। চাকরি করি রাঁধুনীর বটে বাবু কিন্তু আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে, আপনার আশীর্ব্বাদে চোখ-কান খুলে কাজ করি।

—বেশ ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হাজারি তাহার বহুদিনের আশা ও সাধ একটি 'আদর্শ হিন্দু-হোটেল' প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। চূর্ণীনদীর ধারে বসিয়া অবসর মুহূর্ত্তে তাহার সে স্বপ্ন দেখার কথাও গোপন করিল না। তাহার রান্না খাইয়া কলিকাতার বাবুরা কি রকম সুখ্যাতি করিয়াছে, যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তাহাকে ভাগাইয়া লইবার চেষ্টা, কিছুই বাদ দিল না। হরিচরণবাবু বলিলেন—দেখ হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা রয়েচে একটা কিছু গড়ে তুলবো! এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সব-কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর যেন কিছু করবার নেই, ক'রে কি হবে, কার জন্যে করবো এই সব কথা মনে ওঠে। তা ছাড়া জীবনে কখনোই কিছু দরকার হয়নি। বাবার সম্পত্তি ছিল যথেষ্ট—নতুন কিছু গড়ে তুলবো এ ইচ্ছে কোনদিন জাগেনি। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, ওই একটা আশাই তোমায় যুবক ক'রে রেখে দেবে যে! আমার মাথায় এত পাকা চুল ছিল না। খোকা মারা যাওয়ার পরে জীবনের উদ্যম, আশা-ভরসা যেমন চলে গেল, অমনি মাথার চুলও পেকে উঠলো। তবে এখন ইচ্ছে আছে খোকার নামে একটা স্কুল ক'রে দেবো। আবার ভাবি, স্কুলে পড়বেই বা কে? আমাদের এ অঞ্চলে তো লোকের বাস নেই। তার চেয়ে না হয় একটা ডাক্তারখানা ক'রে দিই। উদ্যমই জীবনের সবটুকু, যার জীবনে আশা নেই, যা কিছু করার ছিল সব হয়ে গেছে—তার

জীবন বড় কষ্টকর! যেমন ধরো দাঁড়িয়েচে আমার। খোকা মারা না গেলে আজ আমার ভাবনা হে হাজারি! ভেবেছিলুম কয়লার খনি ইজারা নেবো—কত উৎসাহ ছিল। এখন মনে হয় কার জন্যে করবো? তাই বলছিলুম, তোমায় দেখে হিংসে হয়। তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে—আমার তা নেই। আর এই দেখ, এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি আছি পড়ে, ভালো লাগে কি? ভালো লাগে না। কখনো থাকিনি, কিন্তু বাইরেও আর হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না। ওই মেয়েটা আছে, কলের গান এনেচে একটা—বাজায়, আমি শুনি। ওর মায়ের জন্যে বেছে বেছে ভক্তি আর দেহতত্ত্বের গান কিনে দিইচি, যদি তা শুনে তাঁর মনটা একটু ভাল থাকে! মেয়েমানুষ, কষ্টটা লেগেছে তাঁর অনেক বেশী।

হাজারি এই দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা তেমন বুঝিল না—কেবল বুঝিল, পুত্রশোকে বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে সহানুভূতিসূচক দু-চার কথা বলিল। বেশী কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া গুছাইয়া বলিতে কখনো সে শেখে নাই, তবুও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের জন্য তাহার সত্যকার দুঃখ হওয়াতে, ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে বানাইয়া কিছু বলিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—আর একটু চা খাবে?

—আজ্ঞে না। চা খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই, আপনি খান বাবু।

এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—বাবা, যাবে?

হাজারি হরিচরণবাবুর কাছে বিদায় লইয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ভড়েদের বাড়ীর উঠানে রাঙাকাঠ কাটিয়াছে—রাঙাকাঠের গন্ধ বাহির হইতেছে। সিধু ভড় দাওয়ায় জাল বুনিতেছিল, বলিল—দা-ঠাকুর কনে ছেলেন এত রাত অব্দি?

হাজারি বলিল—বাবুর বাড়ী। বাবু ছাড়েন না কিছুতে, চা খাও, কলের গান শোন, শেষে তো টেঁপিকে না খাইয়ে ছাড়লেন না গিন্নী মা। হাজারির বড় ভাল লাগিয়াছিল আজ সন্ধ্যাটা। বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন ভাবে বসিয়া চা সে কখনো খায় নাই, খাতির করিয়া তাহার সঙ্গে কোনো বড় লোকে মনের কথাও কখনো বলে নাই। কলের গান তো আছেই। মেয়েকে বলিল—টেঁপি কি খেলি রে? টেঁপি একটু ভোজনপ্রিয়! খাইতে ভালবাসে আর গরীবের মেয়ে বলিয়াই অতসীর মা তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়েন না। বলিল—পরোটা, মাছের ডাল্‌না, সুজি, পটলভাজা, আলুভাজা—

হাজারির স্ত্রী অনেকক্ষণ রান্না সারিয়া বসিয়া আছে, বলিল—এত রাত্তির পজ্জন্ত ছিলে কোথায় সব? পাড়া বেড়ানো শেষ হয় না যে তোমাদের, বসে বসে কেবল ঘুম আসচে—

টেঁপি বলিল—আমি খেয়ে এসেছি মা, অতসী-দিদির মা ছাড়লেন না কিছুতে। আমি কিছু খাবো না।

—হ্যাঁরে, তুই খেয়ে এলি! ওবেলার সেই বাসি লুচি তোর জন্যে রয়েচে যে! লুচি খাবি না?

অনেকদিন ইহাদের সংসারে এমন সচ্ছলতা হয় নাই যে, লুচি ফেলিয়া ছড়াইয়া ছেলে-

মেয়েরা খাইতে পায়। বলিয়াও সুখ।

টেঁপি বলিল—তুমি খাও মা। আমি খুব খেয়ে এসেচি। সেখানেও তো পরোটা, সুজি, মাছের ডালনা, এই সব খাইয়েচে। আজ দিনটা বেশ কাটল—না মা? তার খাওয়া সকাল থেকে শুরু হয়েচে আর রাত পর্য্যন্ত চলেচে।

আহারাদি শেষ করিয়া হাজারি বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

হরিচরণবাবুর কথায় তাহার অনেকখানি উৎসাহ আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

লুচি! টেঁপি কত লুচি খাইতে পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার এই সব লোভাতুর ছেলে-মেয়ের মুখে ভাল খাবার-দাবার সে দিতে পারে না—কিন্তু যাতে পারে সে চেষ্টা করিবার জন্যই তো সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

হরিচরণবাবুর টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহার মত লোভাতুর ছেলে-মেয়ে নাই তাঁহার ঘরে, কাহাদের মুখে সুখাদ্য তুলিয়া দিবার আশায় তিনি খাটিবেন?

আজ হরিচরণবাবুর নিকট হইতে সে টাকা ধার পায় নাই বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিস পাইয়া আসিয়াছে, যাহার মূল্য টাকা-কড়ির চেয়ে বেশী।

তাহার সংসারে ছেলে মেয়ে আছে, টেঁপি আছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পায়ে বল আসিবে, মনে জোর পাইবে। হরিচরণবাবুর জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ছে'চল্লিশ হইলে কি হয়, টেঁপি যে ছেলেমানুষ। তাহার নিজের সুখ কিসের? টেঁপিকে একখানা ভাল শাড়ী কিনিয়া দিলে ওর মুখে যে হাসি ফুটিবে, সেই হাসি তাহাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে কর্ম্মের পথে।

আহা, যদি এমন কখনো হয়।

যদি টেঁপিকে একটা কলের গান কিনিয়া দেওয়া যায়? গান এত ভালবাসে যখন…

হয়তো স্বপ্ন…কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ। দেখা যাক্ না কি হয়।

বাঁশঝাড়ে শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। রাত অনেক হইয়াছে। গ্রাম নীরব হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে হাজারি স্ত্রীকে বলিল—ওগো, আমার গামছাখানা বড্ড ময়লা হয়েচে, একটু সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দাও তো, কাল খুব সকালে কেচে দিও আমি কাল সকালে উঠেই রাণাঘাট যাবো।

সকালে কেন, এখুনি কেচে দিই। ভিজে গামছা নিয়ে যাবে কি করে, এখন কেচে হাওয়ায় মেলে দিলে রাত্তিরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

•

সকালে উঠিয়া হাজারি ঠাকুর রাণাঘাট চলিয়া আসিল।

হোটেলে ঢুকিবার আগে তাহার ভয় করিতে লাগিল। কর্ত্তাবাবু এবং পদ্ম ঝি তাহাকে কি না জানি বলে! একদিন কামাই করিবার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে দিতে তাহার প্রাণ যাইবে।

হইলও তাই।

ঢুকিবার পথেই বসিয়া স্বয়ং বেচু চক্কত্তিমশায়—খোদ কর্ত্তা। হাজারিকে দেখিয়া হাতের

হুঁকা নামাইয়া কড়া সুরে বলিলেন—কাল কোথায় ছিলে ঠাকুর ? হাজারি মিথ্যা কথা বলিল না। বাড়ীতে কাহারও অসুখ ইত্যাদি ধরনের বানানো মিথ্যা কথা সে কখনও বলে না। বলিল—আজ্ঞে, অনেক দিন পরে বাড়ী গেলাম কর্তামশায়, ছেলে-মেয়ে রয়েছে--তাই একটা দিন —

—না ব'লে-ক'য়ে এভাবে হোটেল থেকে পালিয়ে যাবার মানে কি ? কার কাছে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে ?

এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। লুচি দিতে গিয়াছিল বাড়ীতে, তাহা বলিতেও বাধে। সে চুপ করিয়া রহিল।

—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর—পদ্ম ঝি ঠিক কথা বলে—দেখতে ভালমানুষ হোলে কি হবে ? তুমি এত বড় একটা হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নিউদ্দিশ হয়ে গেলে কাউকে কিছু না ব'লে ? বলি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই মিলে —গাঁজাখোর, নেমকহারাম কোথাকার ! চালাকির আর জায়গা পাওনি ?

বেচু চক্কত্তির গলার জোর আওয়াজ পাইয়া পদ্ম ঝি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল এবং দোরে উঁকি মারিয়া হাজারিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—এই যে ! কি মনে করে ! আবার যে উদয় হ'লে ? কাল আমি বলি আর দরকার নেই, ও আপদ বিদেয় ক'রে দেন কর্তা, গাঁজা খেয়ে কোথায় নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল--চেহারা দেখচেন না ?

হাজারি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো গজাল-আঁটা ছোট্ট আয়নাখানায় নিজের মুখখানা দেখিবার চেষ্টা করিল—কি দেখিল পদ্ম ঝি তাহার চেহারাতে ! গাঁজা তো দূরের কথা, একটা বিড়ি পর্য্যন্ত সকাল হইতে সে খায় নাই !

—যাও, কাল একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, তার মজুরি এক টাকা, আর জল-খাবারের চার আনা তোমার এ মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয়, সেই দিনই বিদেয় ক'রে দেবো মনে থাকে যেন—বেচু চক্কত্তি রায় দিলেন।

হাজারি অপ্রতিভ মুখে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল—সেখানেও নিস্তার নাই। কর্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও, পদ্ম ঝির হাতে অত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। পদ্ম ঝি হাজারির পেছন পেছন রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—করবে না তো তোমার কাজ ওরা—কেন করবে ?···একা হাঁড়ি ঠেলো আজকে—যেমন বদমাইশ তার তেমনি। একা বড় ডেকচি নামাও, ফেন গালো, ভাত বাড়ো খদ্দেরদের—কাল সব কাজ মুখ বুজে ও-ঠাকুর করেছে একা —নবাবপুত্তুর গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন আর ওর জন্যে খেটে মরবে সবাই—উড়ুঞ্চে মড়ুইপোড়া বামুন কোথাকার।

পদ্ম ঝি রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এই মাত্র বেচু চক্কত্তি বলিয়াছেন যে, কাল হাজারির বদলে ঠিকা ঠাকুর রাখা হইয়াছিল যাহার মজুরি হাজারির মাহিনা হইতে কাটা যাইবে।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল, একা কি রকম ? এই তো ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েচে বল্লেন কর্তাবাবু ?

পদ্ম ঝি সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল—হইছিল তো। হয়নি তো কি ? কর্তামশায় কি মিথ্যে কথা বলেন তোমার কাছে ? যদি না-ই বা পাওয়া যেত ঠাকুর তবে ঠাকুরকে একা খাটতে হোত না ? তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার—মুর্শিদাবাদ আসবার সময় হোল। এখুনি ইষ্টিশানের খদ্দের সব আসবে। ডাল সাঁৎলে ফেলো তাড়াতাড়ি, চচ্চড়িটা চড়িয়ে দাও।

মুর্শিদাবাদ ট্রেন সশব্দে আসিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইল। এইবার কিছু খরিদ্দারের ভিড় হইবে।

হাজারি ছোট ডেক্‌চিটার মধ্যে হাত ডুবাইয়া ডাল সাঁৎলাইতেছে, এমন সময় বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির চড়া গলার আওয়াজ এবং তর্কবিতর্কের শব্দ শুনিয়া সে রান্নাঘরের দোরের কাছে আসিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিল।

যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে কর্তামশায়ের কথা কাটাকাটি হইতেছে। যতীশ ভট্‌চাজ অনেক দিন হইতে তাহাদের খরিদ্দার—আগে আগে নগদ পয়সা দিয়া খাইয়া যাইত, আজ মাস-ছয় হইতে মাসিক হারে খায়। বয়স পঞ্চাশ-বাহান্ন, ম্যালেরিয়া রোগীর মত চেহারা, মাথার চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে, রং পূর্বে ফর্সা ছিল, এখন পুড়িয়া আধকালো হইয়া আসিয়াছে প্রায়। পরনে ময়লা ধুতি, গায়ে লংক্লথের ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে বিবর্ণ কেম্বিসের জুতো।

বেচু চক্কত্তি বলিতেছেন—না, আপনি অন্যত্তর চেষ্টা করুন ভট্‌চাজ মশাই। আমি পারবো না সোজা কথা। হোটেল খুলিচি দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায়, অন্নছত্তর তো খুলিনি ?

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ বলিতেছে—টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না চক্কত্তি মশাই। এ ক' মাসের বাকী আমি এক সঙ্গে দেবো।

—না মশাই—আপনি অন্যত্তর চেষ্টা করুন। যা গিয়েচে, গিয়েচে—আর আপনাকে খাইয়ে আমি জড়াতে রাজী নই।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ বেশ নরম সুরে বলিল—না না, যাবে কেন ? বিলক্ষণ! পাই-পয়সা শোধ ক'রে দেবো। তবে পড়ে গিইচি একটু ফেরে কর্তামশাই, ('খুব খোশামোদ জুড়ে দিয়েচে!') তা এই ক'টা দিন যেমন খাচ্চি তেমনি খেয়ে যাই—সামনের মাসের পয়লা দোস্‌রা—

—না মশাই, সামনের মাসের পয়লা দোস্‌রার এখনো ঢের দেরি। ও-সব আর চলবে না। মাপ করবেন, আপনি অন্যত্তরে দেখুন—

যতীশ ভট্‌চাজের চেহারা দেখিয়া হাজারির মনে হইল, লোকটা খুব ক্ষুধার্ত, সকাল হইতে কিছু খায় নাই। এত বেলায় না খাওয়াইয়া কর্তামশাই তাড়াইয়া দিতেছেন, কাজটা কি ভালো ? হয়ত কিছু কষ্টে পড়িয়া থাকিবে, নতুবা দুমুঠা খাইবার জন্য লোকে এত খোশামোদ করে না।

হাজারির ইচ্ছা হইল, একবার সে বলে—কর্তামশাই আমি আজ খাবো না—কাল দেশে

একটা নেমন্তন্ন ছিল খেয়ে শরীর খারাপ আছে। আমার ভাতটা না হয় ভট্‌চাজ্‌ মশাই খেয়ে যান—কিন্তু কথাটা বলিলে কর্তামশায়ের অপমান করা হইবে, বিশেষ করিয়া পদ্ম তাহা হইলে তাহাকে আস্ত রাখিবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্‌ শেষ পর্যন্ত না খাইয়া চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিল—আহা, পুরোনো খদ্দের—ওকে এক থাল ভাত দিলে কি ক্ষেতি হোত হোটেলের—আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এলে কাউকে ফেরাবো না—এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পয়সা—তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার খরিদ্দারগণ আসিয়া পড়িয়াছে। খাইবার ঘরে বেশ ভিড়। মতি চাকর আজ দশ-বারোটি লোক জুটাইয়া আনিয়াছে। পদ্ম আসিয়া বলিল—দশ থালা ভাত বাড়ো—দু'থালা নিরিমিষ্যি। আলুর ডাল্‌না দিও।

আধঘণ্টা পরে মুর্শিদাবাদ ট্রেনের খরিদ্দার বিদায় হইলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বনগাঁয়ের ট্রেনের সময় কতকগুলি লোক খাইতে আসিল। বেলা দেড়টা, এ সময় নূতন লোক প্রায়ই আসে না, পদ্ম ঝি যখন হাঁকিল, পাঁচ থালা ভাত ঠাকুর—হাজারি তাহাকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিল—ডাল একেবারেই নেই—দু'জনের মত হবে কি না—

পদ্ম ঝি ডেকচির কাছে আসিয়া নীচু হইয়া দেখিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—ওমা, এ তো একেবারেই নেই বল্লে হয়! এখন খদ্দের খাওয়াবো কি দিয়ে? তোমার দোষ, যখন ডাল কমে আসচে, এখনও দু'খানা টেরেন্‌ বাকি, তখন একটু ফেন মিশিয়ে সাঁৎলে নিলে না কেন? কতবার তোমায় ব'লে দেওয়া হয়েছে! ফেন আছে?

হাজারি বলিল—আছে।

—আছে তো দু'বাটি খাও ডালে ফেলে—দিয়ে একটু নুন দিয়ে গরম ক'রে নাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচো কি?

হাজারি এ ধরনের কাজ কখনো করে নাই। করিতে তাহার বাধে। সে সত্যই ভাল রাঁধুনী। ইচ্ছা করিয়া হাতের ভাল রান্নাটা নষ্ট করিতে বা এভাবে খরিদ্দার ঠকাইতে তাহার মন সরে না। কিন্তু পদ্ম ঝির হুকুম না মানিয়া উপায় কি? বাধ্য হইয়া ডালে ফেন মিশাইয়া খরিদ্দার বিদায় করিতে হইল।

ছুটি পাইল সেদিন প্রায় বেলা আড়াইটায়।

একটুখানি গড়াইয়া লইয়া রোদ একটু পড়িয়া আসিলে সে চূর্ণীনদীর তীরে তাহার অভ্যাসমত বেড়াইতে চলিল। আজ ক'দিন নদীর ধারে যায় নাই—আর সেই পরিচিত নির্জন নিমগাছটার তলায় বসিয়া গাছের গুঁড়ি ঠেস্‌ দিয়া ওপারের খেয়াঘাটের দিকে এবং শান্তিপুর যাইবার রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে নাই। বেশ লাগে জায়গাটা।

আর ওখানে গিয়া বসিলেই হাজারির মাথায় হোটেল সংক্রান্ত নানা রকম নতুন কথা আসে, অন্য কোথাও তেমন হয় না।

আজ জায়গাটাতে গিয়া বসিতেই হাজারির প্রথমে মনে হইল, হোটেল চলে রান্নার গুণে। যাহারা পয়সা দিয়া খাইতে আসিবে, তাহারা চায় ভাল জিনিস খাইতে—কেন-মিশানো ভাল খাইতে তারা আসে না।

পদ্ম ঝিয়ের অনাচারের দরুন বেচু চক্কত্তির হোটেল উঠিয়া যাইবে। তাহার নিজের হোটেল ভভদিনে খোলা হইয়া যাইবে। তাহার রান্নার গুণেই হোটেল চলিবে। হঠাৎ হাজারি লক্ষ্য করিল, যতীশ ভট্‌চাজ্, চূর্ণীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় পার হইয়া ওপারে যাইবে।

—ও ভট্‌চাজ্ মশায়—ভট্‌চাজ্ মশায়—

যতীশ চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া হাজারির কাছে আসিল।

—কোথায় যাবেন ?

—যাচ্ছি একটু ফুলে-নব্‌লা, আমার ভায়রাভাই থাকে, তারই ওখানে। দেখলে তো হাজারি তোমাদের চক্কত্তি মশায়ের কাণ্ডটা আজ! বলি টাকা কি আমি দিতাম না? দুপুরবেলা না খাইয়ে কি-না বল্লে অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন গিয়ে। ভাত-বেচা বামুন যদি ছোটলোক না হয়, তবে আর কে হবে! বিড়ি আছে? দাও তো একটা—

হাজারি নিকট হইতে বিড়ি লইয়া ধরাইয়া বলিল—দুশো ঝাঁটা মারি শহরের মাথায়। আর থাকচি নে। যাচ্ছি ফুলে-নব্‌লা, আমার বড় ভায়রাভাই পার্ব্বতী চক্কত্তি সেখানে একজন নাম-করা লোক। পার্ব্বতী দাদা একবার বলেছিল ওদের জমিদারী কাছারীতে একটা চাকরি ক'রে দেবে। পালচৌধুরীদের জমিদারী। মস্ত কাছারী। সেখানেই যাচ্ছি। একটা বিল্লে হয়ে যাবেই।

হাজারি বলিল—একটা কথা বলি ভট্‌চাজ্ মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—

যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—কি?—টাকাকড়ি এখন কিছু নেই আমার কাছে তা বলে দিচ্ছি। তবে দেনা আমি রাখবো না—খাওয়ার টাকা আগে শোধ দিয়ে তখন অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও চক্কত্তি মশাইকে।

হাজারি বলিল—টাকাকড়ির কথা বলিনি। বলছিলাম, আপনি আহার করেচেন?

যতীশ ভট্‌চাজ্ কিছুমাত্র না ভাবিয়া সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিল—না। কোথায় করবো? অত বেলায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেল থেকে ফিরে আর ভাত কে আমার জন্যে নিয়ে বসে ছিল?

হাজারি খপ্ করিয়া যতীশ ভট্‌চাজের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে চলুন ভট্‌চাজ্ মশায়—আমি আপনাকে রেঁধে খাওয়াবো আজ। আসুন আমার সঙ্গে—

যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—কোথায়? কোথায়? আরে না, না হাজারি, আজ ও-সব থাক, আমি জল-টল খেয়ে—আর এমন অবেলায়—

হাজারি নাছোড়বান্দা। তাদের হোটেলের একজন পুরানো খদ্দের আজ পয়সা নাই

বলিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাণাঘাট হইতে চলিয়া যাইতেছে—কি জানি কেন, এ ব্যাপারটার জন্ত হাজারি যেন নিজেকেই দায়ী করিয়া বসিল।

যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—আমি তোমাদের হোটেলে আর খাবো না কিন্তু হাজারি। আচ্ছা তুমি যখন ছাড়চো না তখন বরং একটু জল-টল খাওয়াও।

—হোটেলে নিয়েই বা যাবো কেন? আসুন না জল-টল নয়, ভাত খাওয়াবো রেঁধে। যতীশ ভট্‌চাজ্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, ফুলে-নব্‌লা যেতে পারবো না আজ তাহলে। আজ সেখানে পৌঁছুতেই হবে।

নিকটেই কুসুমের বাড়ী, একবার হাজারি ভাবিল ভট্‌চাজ্‌কে সেখানে লইয়া যাইবে কি না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করিল। ভদ্রলোককে নতুবা কোথায় বসাইয়া সে খাওয়ায়?

কুসুমের বাড়ীর দোরে কড়া নাড়িতেই কুসুম আসিয়া দোর খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যতীশ ভট্‌চাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে লজ্জিত হইয়া নীচুস্বরে বলিল—বাবাঠাকুর কি মনে করে? উনি কে সঙ্গে?

—ওঁর জন্তেই আসা। উনি বামুন মানুষ, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমার চেনাশুনা—আমাদের হোটেলের পুরোনো খদ্দের। পয়সা ছিল না ব'লে খেতে দেয়নি কর্তামশাই। উনি না খেয়ে শান্তিপুর চলে যাচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা—ধরে আনলুম। ওঁকে কিছু না খাইয়ে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাইরের ঘরটা খুলে দাও গিয়ে—

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরের দোর খুলিতে গেল। যতীশ ভট্‌চাজ্ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারি তাহাকে ডাক দিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীর ভিতর যাইতেই কুসুম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—কি করবেন বাবাঠাকুর, রান্না করবেন? সব যোগাড় ক'রে দিই! আর ততক্ষণ ঘরে যা-কিছু আছে, ও বাবাঠাকুরকে দিই, কি বলেন?

হাজারি বলিল—রান্না ক'রে খাওয়াতে গেলে চলবে না কুসুম। উনি থাকতে পারবেন না; ফুলে-নব্‌লা যাবেন। আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আনি—এখানে একটু বসবার জন্তে নিয়ে এলাম।

কুসুম হাসিয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিকিনি। আমি সব যোগাড় করচি জলখাবারের। আমার ঘরে সব আছে, ঘরে থাকতে বাজারে যাবেন খাবার আনতে কেন? আমার বাড়ীতে যখন ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো পড়েচে, তখন আমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে খেতে দেব—কিন্তু বাবাঠাকুর, সেই সঙ্গে আপনিও—মনে থাকে যেন। হাজারি প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করার পূর্ব্বেই কুসুম ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল—অগত্যা হাজারি বাহিরের ঘরে যতীশ ভট্‌চাজের কাছে ফিরিয়া আসিল।

যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী নাকি হে?

—না, আত্মীয় নয়, এরা হোল ঘোষ-গোয়ালা। এই বাড়ীতে আমার ধর্মমেয়ের বিয়ে হয়েছে, ওই যে দোর খুলে দিলে, ওই মেয়েটি!

পনেরো মিনিট আন্দাজ পরে ঝন্ ঝন্ করিয়া শিকল নড়িয়া উঠিতে হাজারি বাহিরের বাড়ীর অন্দরের দিকে দাওয়ায় গিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া দাওয়ার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। দু'খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পাতা—দু'বাটি জাল দেওয়া দুধ, দুখানা থালে ফল-মূল কাটা, বড় বাতাসা, ছানা, দুটি মুখ-কাটা ডাব। ঝক্‌ঝকে করিয়া মাজা দুটি কাঁসার গ্লাসে দু'গ্লাস জল।

হাসিমুখে কুসুম বলিল—ওঁকে ডাকুন, সেবা করতে বলুন। যা বাড়ীতে ছিল একটু মুখে দিয়ে নিন্ দু'জনে।

—তা তো হোল—কিন্তু আমি আবার কেন হুকুম?

—মেয়ের বাড়ী যে—না খেয়ে যাবার কি জো আছে? ডাকুন ওঁকে।

যতীশ ভট্‌চাজ্ খাইতে বসিয়া যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, দেখিয়া মনে হইল, সে বড়ই ক্ষুধার্ত্ত ছিল। তাহার থালায় একটুও কিছু পড়িয়া রহিল না। কুসুম পান সাজিয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিল, খাওয়ার পরে। যতীশ ভট্‌চাজ্ বিদায় লইবার সময় বলিল—তোমার মেয়েটিকে একবার ডাকো হাজারি, আশীর্ব্বাদ করে যাই।

কুসুম আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দু'জনকেই প্রণাম করিল। যতীশ ভট্‌চাজ্ বলিল—মা শোনো, সারাদিন সত্যিই খাইনি। ভারি তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম তোমার এখানে। তুমি বড় ভাল মেয়ে, ছেলেপিলে নিয়ে সুখে থাকো, আশীর্ব্বাদ করি।

হাজারি যতীশ ভট্‌চাজের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

পথে আসিয়া বলিল—ভট্‌চাজ্‌মশাই, একটা হোটেল নিজে খুলবো অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আছে। আপনি কি বলেন?

—অনায়াসে করতে পারো। খুব লাভের জিনিস—তোমার হবেও। তোমার মনটা বড় ভালো। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?

—তাই নিয়েই তো গোলমাল। নইলে এতদিন খুলে দিতাম—দেখি, চেষ্টায় আছি—ছাড়চি নে—ওই যে আমার মেয়ে দেখলেন, ওই কুসুম, ও একবার টাকা দিতে চেয়েছিল। তা কি নেওয়া ভাল? ও গরীব বেওয়া লোক, কেন ওর সামান্য পুঁজি নিতে যাবো? তাই নিই নি। নিলে ও এখুনি দেয়—তবে সে টাকা খুব সামান্য। তাতে হোটেল খোলা হবে না।

যতীশ ভট্‌চাজ্ চূর্ণীর খেয়ার ধারে আসিয়া বলিল—আচ্ছা, চলি হাজারি—তুমি হোটেল খুললে তোমার হোটেলে আমি বাঁধা খদ্দের থাকবো, সে তুমি ধরে নিতে পারো। আর কোথাও যাবো না—তোমার মত রান্না ক'টা ঠাকুর রাঁধতে পারে হে? বেচু চক্কত্তির হোটেলে আমি যে যেতাম শুধু তোমার নিরামিষ রান্না খাওয়ার লোভে! ভাল চলবে তোমার হোটেল। এদিগরে তোমার মত রাঁধতে পারে না কেউ, বলে যাচ্ছি।

যতীশ ভট্‌চাজ্ তো চলিয়া গেল, কিন্তু হাজারির মনে তাহার শেষ কথাগুলি একটা খুব বড় বল ও প্রেরণা দিয়া গেল।

সে জানে, তাহার হাতের রান্না ভাল—কিন্তু খরিদ্দারের মুখে সে কথা শুনিলে তবে না তৃপ্তি। ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণকে খাওয়াইয়াছিল বটে—কিন্তু সে যাইবার সময় যাহা দিয়া গেল হাজারির মনের আনন্দ ও উৎসাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা খুব মূল্যবান ও সার্থক প্রতিদান।

হাজারি যখন হোটেলে ফিরিল, তখন বেলা বেশী নাই। রতন ঠাকুর ডাল-ভাত চাপাইয়া দিয়াছে, মতি চাকর বা পদ্ম ঝি কেহই নাই। গদির ঘরে বেচু চক্কত্তি কাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল।

হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকিলে কিন্তু হাজারির মনে নতুন বলের সঞ্চার হয়। বরং ছুটি পাইয়া বাহিরে গেলেই যত দুর্ভাবনা আসিয়া জোটে—প্রকাণ্ড উনুনের উপরে ফুটন্ত ডেকচির সামনে বসিয়া হাজারি নিজেকে বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করে। তখন না মনে থাকে কুসুমের কথা, না মনে থাকে অন্য কোনো কিছু। অবসাদ আসে কাজ হাতে না থাকিলে, এ বরাবর দেখিয়া আসিতেছে সে।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর ফিরিল।

হাজারিকে চুপি চুপি বলিল—একটি কথা আছে। আমার দেশের একজন লোক এসেছে—আমার কাছে থেকে চাকরি খুঁজবে। বড় গরীব—তাকে বিনি টিকিটে খাওয়ার ঘরে ঢুকিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমার যদি মত হয়, তবে তাকে বলি।

হাজারি বলিল—নিয়ে এসো, তার আর কি। গরীব মানুষ খাবে, আমার কোনো অমত নেই। রতন ঠাকুর খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল। রাত্রে তাহার লোক যখন খাইতে আসিল, রতন ঠাকুর হাজারিকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে লোকটাকে চিনাইয়া দিতে, হাজারি পরিতোষ করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

পদ্ম ঝিয়ের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া লোকটা বিনা টিকিটে খাইয়া চলিয়া গেল—কেহ কিছু ধরিতেও পারিল না।

এই রকম চলিল, এক-আধ দিন নয়, দশ-বারো দিন। একদিন আবার তাহার অন্য এক সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বিনামূল্যে খাইতে দিতে হইল।

ব্যাপারটি সামান্য, হাজারি কিন্তু একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা পাইল ইহা হইতে। এত সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যেও চুরি তো বেশ চলে! বেচু চক্কত্তির টিকিট ও পয়সাতে ঠিক মিল আছে, সুতরাং তাঁর দিক দিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই—পদ্ম ঝি যে পদ্ম ঝি, সে পর্য্যন্ত বিন্দুবিসর্গ জানিল না ব্যাপারটার। ভাত তরকারি কিছু মাপ থাকে না যে কম পড়িবে। সুতরাং কে ধরিতেছে? কেন? এ ধরনের চুরি ধরিবার কি উপায় নাই কোনো?

কয়দিন ধরিয়া হাজারি চূর্ণীর ঘাটে নির্জ্জনে বসিয়া শুধু এই কথা ভাবে। ঠাকুরে ঠাকুরে ষড়যন্ত্র করিয়া যদি বাহিরের লোক ঢুকাইয়া খাওয়ায়, তবে সে চুরি ধরিবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়া একটা উপায় তাহার মাথায় আসিল একদিন বিকালে। থালায়

নম্বর যদি দেওয়া থাকে, আর টিকিটের নম্বরের সঙ্গে যদি তার মিল থাকে, তবে থালা এঁটো হইলেই ধরা পড়িবে অমুক নম্বরের থালার খদ্দের বিনা টিকিটে খাইয়াছে—না পয়সা দিয়া খাইয়াছে।

মাঝে মাঝে তদারক করিলেই জিনিসটা ধরা পড়িবে। তা ছাড়া থালা মাজিবার সময় ঝি বা চাকরের নিকট হইতে এঁটো থালার নম্বরগুলি জানিয়া লইলেই হইবে।

হাজারি খুব খুশী হইল। ঠিক বাহির করিয়াছে বটে—একটা ফাঁক অবিশ্যি আছে, সেও জানে—যদি কলাপাতায় খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিনা নম্বরী থালা সেই লোকটা বাহির হইতে আনে—তাহাতে নিস্তার নাই, কারণ ঝি-চাকরের চোখে তখনই ধরা পড়িবে। এঁটো থালা সেই লোকটা কিছু মাজিতে বসিতে পারে না হোটেলের মধ্যেই। কলার পাতায় কেহ খাইতেছে, ইহা চোখে পড়িলে তখনি ঝি-চাকরে সন্দেহ করিবে বলিয়া হঠাৎ কেহ সাহস করিবে না কাহাকেও পাতায় ভাত দিতে।

দুশো-আড়াইশো টাকা যদি যোগাড় করা যায়, তবে এই রেলবাজারেই আপাততঃ হোটেল খুলিয়া দেওয়া যায়। টাকা দেয় কে?

যতীশ ভট্‌চাজের কথা তাহার মনে পড়িল।

বেচারী বড় কষ্টে পড়িয়াছে! শেষে কিনা ভায়রাভাইয়ের বাড়ী চলিয়াছে আশ্রয় প্রার্থনা করিতে! লোকে কি সোজা কষ্ট পাইলে তবে কুটুম্বস্থানে যায় চাকুরির উমেদার হইয়া!

যদি সে হোটেল খোলে, যতীশ ভট্‌চাজ্‌কে আনিয়া রাখিবে। বৃদ্ধ মানুষ, দুটি খাইয়া খাইতে পারিবে আর কিছু হাত খরচ মিলিবে। ইহার বেশী তাহার আর কিসেরই বা দরকার।

প্রতিদিনের মত আজও বেলা পড়িয়া আসিল। গত দু'বৎসর যেরূপ হইয়া আসিতেছে। সেই একই ঘোড়ানিম গাছ, সেই একই চূর্ণীর খেয়াঘাট, পালেদের সেই একই কয়লার ডিপোতে মুটে ও সরকার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে—সবই পুরাতন।

দিন যায়, কিন্তু তাহার সাধ পূর্ণ হইবার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে।

সামান্য মাইনে হোটেলের—কি হইবে ইহাতে? বাড়ীতে টেঁপিকে একখানা ভাল শখের কাপড় দেওয়া যায় না, পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া যায় না।

টেঁপির মা গরীব ঘরের মেয়ে। যেমন বাপের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, স্বামীর ঘরে আসিয়াও তাই। সংসারে গভীর খাটুনি খাটিয়া ছেলেমেয়ে মানুষ করিতেছে—মুখ ফুটিয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে কোনো আদর-আবদার করে নাই—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিতেছে, আধপেটা খাইয়া নিজে, ছেলেমেয়েদের জন্য দু-মুঠা বেশী ভাত জল দিয়া রাখিয়া দিতেছে হাঁড়িতে, তাহারা সকালে বেলা খাইবে। কখনো কোনোদিন সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, অদৃষ্টকে নিন্দা করে নাই।

হাজারি সব বোঝে।

তাই তো সে আজকাল সর্ব্বদা একমনে উপায় চিন্তা করে—কি করিয়া সংসারের উন্নতি করা যায়। চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে রাঁধুনীবৃত্তি করিলে কখনও যে উন্নতি করা যাইবে না। আর পদ্ম ঝির ঝাঁটা খাইয়া মাঝে পড়িয়া হাড় কালি হইয়া যাইবে।

ভগবান যদি দিন দেন, তবে তাহার আজীবনের সংকল্প সে কার্য্যে পরিণত করিবে। হোটেল একখানা খুলিবে।

কুসুমের সঙ্গে এই যে আলাপ হইয়াছে, হাজারি এটাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কুসুম চমৎকার মেয়ে—প্রবাস-জীবনে কুসুমের সাহচর্য্য, তাহার মধুর ব্যবহার—হোক্ না সে গোয়ালার মেয়ে—কিন্তু বড় ভাল লাগে, আরও ভাল লাগে এইজন্যে যে ঠিক কুসুমের মত স্নেহ-প্রবণ কোনো আত্মীয়া মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

অনেকখানি যে নির্ভর করা যায় কুসুমের ওপর। সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মনে হয়, এ কাজের ভার কুসুমের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সে প্রতারণা করিবে তো নাই-ই, বরং প্রাণপণ-যত্নে কাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন আপনার লোকে করিয়া থাকে।

হাজারি যদি নিজের দিন ফিরাইতে পারে, তবে কুসুমের দিনও সে অমন রাখিবে না।

টেঁপিও তার মেয়ে, কিন্তু টেঁপি বালিকা, কুসুম বুদ্ধিমতী। ও যেন তার বড় মেয়ে—যে বাপের দুঃখকষ্ট সব বোঝে এবং বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে। মন-প্রাণ দিয়া চেষ্টা করে। মেয়েও বটে, বন্ধুও বটে।

সকালে সেদিন রতন ঠাকুর আসিল না।

পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল, ও-ঠাকুর আজ আর আসবে না, কাল ব'লে গিয়েচে; তরকারী-গুলো তুমি কুটে নাও, নিয়ে রান্না চাপিয়ে দাও, আমি আঁচ দিয়ে দিচ্চি।

হাজারি প্রমাদ গণিল। আজ হাটবার, দুপুরে অন্ততঃ একশো দেড়শো হাটুরে খরিদ্দার খাইবে; একহাতে তাহাদের রান্না করা এবং খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

পদ্ম ঝিয়ের কথামত সে বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল—বেলা সাড়ে-আটটার সময় সবে ডাল-ভাত নামিয়াছে—এমন সময় একজন খরিদ্দার টিকিট লইয়া খাইতে আসিল।

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, সবে ডাল-ভাত নেমেছে, কি দিয়ে খাবেন?

লোকটি রাগিয়া বলিল—ন'টা বেজেচে, মোটে ডাল-ভাত? কি রকম ঠাকুর তুমি? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে এতক্ষণ তিনটে তরকারি হয়ে গিয়েচে। এ রকম করলেই তোমাদের হোটেল চলেচে?

হাজারি বলিল—ন'টা তো বাজেনি বাবু, সাড়ে-আটটা।

লোকটার মেজাজ রুক্ষ ধরনের। বলিল—আমি বলচি ন'টা, তুমি বলচো সাড়ে-আটটা! আবার মুখে মুখে তর্ক? আমি ঘড়ি দেখতে জানিনে?

—সে কথা তো হয় নি বাবু। ঘড়ি কেন দেখতে জানবেন না, আপনারা বড় লোক। কিন্তু ন'টা বাজলে কেষ্টনগরের গাড়ী আসে। সে গাড়ী তো এখনো আসে নি?

—আবার তর্ক ? এক চড় মারবো গালে—

বোধ হয় লোকটা মারিয়াই বসিত, ঠিক সেই সময় পদ্ম ঝি গোলমাল শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু ?

লোকটা পদ্ম ঝিয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করচে, কি জানোয়ার। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে এসে আবার লম্বা লম্বা কথা, আজ দিতাম তোমাকে একটি চড় কষিয়ে, টের পেতে তুমি মজা—

পদ্ম ঝি বলিল—থাক বাবু, আপনি ক্ষ্যামা দেন। ওর কথায় চটলে কি চলে ? আসুন, আপনি খাবেন এখানে।

—খাবো কি, তোমাদের ঠাকুর বলচে এখনও কিছু রান্না হয় নি। তাই বলতে গেলাম তো আমার সঙ্গে তর্ক। রান্না হয় নি তো টিকিট বিক্রি করেছিলে কেন তোমরা ? দেখাবো তোমাদের মজা ! যত বদমায়েশ সব।

পদ্ম ঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—ঠাকুর, তুমি কি রকম মানুষ ? বাবুর সঙ্গে মুখোমুখি তক্কো করা তোমার কি দরকার ছিল ? রান্না কেনই বা হয় না। যা হয়েচে তাই দিয়ে ভাত দাও, আর মাছ ভেজে দাও। যান বাবু আপনি গিয়ে বসুন।

খানিক পরে লোকটা খাওয়া ফেলিয়া বলিল—মাছটা এক্কেবারে পচা। রামো রামো, কেন মরতে এ হোটেলে খেতে এসেছিলুম—ছি ছি—এই ঠাকুর এদিকে এসো—

পদ্ম ঝি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু, কি হয়েছে ?

—কি হয়েচে ? যত সব ন্যাকামি ? মাছ একদম পচা, লোকজনকে মারবার মতলব তোমাদের—না ? আজই রিপোর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের নামে—

রিপোর্টের কথা শুনিয়া পদ্ম ঝির মুখ শুকাইয়া গেল ; সে তাড়াতাড়ি বলিল—বাবু, আপনার পায়ে পড়ি বসুন, না খেয়ে উঠবেন না, আমি দই এনে দিচ্চি। একদিন যা হয়ে গিয়েচে ক্ষ্যামা ঘেন্না করে নিন বড় বাবু।

সে তাড়াতাড়ি দই ও বাতাসা আনিয়া দিল। লোকটি খাইয়া উঠিয়া যাইবার সময় বেচু চক্কত্তি বিনীতস্বরে নিতান্ত কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, বাবু একটা কথা আছে, আপনার টিকিটের পয়সাটা ত নিতে পারি নে। আপনার খাওয়াই হোল না। পয়সা ক'আনা আপনি নিয়ে যান।

লোকটা বলিল—না না থাক্। পয়সা দিতে হবে না ফেরত—কিন্তু এরকম আর যেন কখনও না হয়।

বেচু চক্কত্তি জোর করিয়া লোকটার হাতে পয়সা কয়েক আনা গুঁজিয়া দিল।

একটু পরে গদির ঘরে হাজারি ঠাকুরের ডাক পড়িল। হাজারি গিয়া দেখিল সেখানে পদ্ম ঝি দাঁড়াইয়া আছে।

বেচু চক্কত্তি বলিল—ঠাকুর, খদ্দেরদের সঙ্গে ঝগড়া করতে কদ্দিন শিখেচ ?

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—ঝগড়া ? কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম বাবু ?

পদ্ম ঝি বলিল—ঝগড়া করেছিলে না তুমি ওই বাবুর সঙ্গে ? সে মুখোমুখি তক্কো কি ! বাবু তো চড় মারবেনই ! আমি গিয়ে না পড়লে দিত কষিয়ে দু-চার ঘা। আগে কি বলেচে না বলেচে আমি তো শুনি নি, গিয়ে দেখি বাবু রেগে লাল হয়ে গিয়েচেন। ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে ? তখনও সমানে ঝগড়া চালাচ্চে—

বেচু চক্কত্তি বলিল—খদ্দের যাই কেন বলুক না তাই শুনে যেতে হবে, এ তুমিশ্বুড়ো হয়ে মরতে চল্লে, আজও শিখলে না তুমি ?

—বাবু, আপনি শুনে বিচার করুন। ঝগড়া তো আমি করি নি—উনি বল্লেন ন'টা বেজেচে, আমি বল্লাম সাড়ে-আটটা বেজেচে, এই উনি আমায় বল্লেন, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানিনে ?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার সব মিথ্যে কথা ঠাকুর। ও কথায় কখনো ভদ্দর লোক চটে না। তুমি বেয়াদপের মত তক্কো করেচো তাই বাবু চটে গিয়েচেন। আমি গিয়ে স্বকর্ণে শুনিচি তুমি যা তা বলচো।

অবশ্য এখানে পদ্ম ঝিয়ের উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলিতে পারে না, এ কথা হাজারি ভাল করিয়া জানিত। বেচু চক্কত্তি মহাশয় কাহারও কথা শুনিবেন না, পদ্ম ঝি যাহা বলিবে তাহাই ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেনই। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল।

বেচু চক্কত্তি বলিল—পচা মাছ কে এনেছিল ?

হাজারি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই পদ্ম ঝি বলিল—ওই গিয়েছিল বাজারে। ওই এনেচে।

হাজারি বিস্ময়ে কাঠ হইয়া গেল। কি সর্ব্বনেশে মিথ্যে কথা ! পদ্ম ঝি খুব ভাল করিয়াই জানে, কাল রাত্রে প্রায় দেড়পোয়া আন্দাজ পোনা মাছ উদ্বৃত্ত হইলে, পদ্ম ঝি-ই তাহাকে বলিয়াছিল, মাছগুলা ঢাকিয়া রাখিতে এবং পরদিন কড়া করিয়া আর একবার ভাজিয়া লইয়া মাছের ঝাল করিতে ; তাহা হইলে খরিদ্দার টের পাইবে না যে মাছটা বাসি। বাসি মাছ ভাজা সে খরিদ্দারকে দিতে যায় নাই, পদ্ম ঝি নিজেই ভাজা মাছ দিবার কথা বলিয়াছিল !

কিন্তু এ সব কথা বেচু চক্কত্তিকে বলিয়া কোন লাভ নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তোমার আট-আনা জরিমানা হোল। মাইনের সময় কাটা যাবে —যাও।

হাজারি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছিল, কি অসহ্য অবিচার ! সে বাজারে গিয়াছিল ইহা সত্য, মাছ কিনিয়াছিল তাহাও সত্য, কিন্তু সে মাছ পচা নয়, সে মাছ খরিদ্দারের পাতে দেওয়াই হয় নাই ! অথচ পদ্ম ঝি দিব্য তাহার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিল, আর সেই মিথ্যা অপরাধে তাহার হইল জরিমানা।

পদ্ম দিদি তাহার সঙ্গে যে কেন এমন করিয়া লাগে—কি করিয়াছে সে পদ্ম দিদির ?

রতন ঠাকুর আজ নাই, খাটুনি সবই তাহার ওপর। আট-দশজন লোক ইতিমধ্যে টিকিট কিনিয়া খাবার ঘরে ঢুকিল, চাকরে জায়গা করিয়া দিল। হাজারি তাড়াতাড়ি আলু ভাজিয়া

ইহাদের ভাত দিল। তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল, শুধু আলুভাজা আর ডাল দিয়া খাওয়া যায়? ইহারা সকলেই রেলের যাত্রী। স্টেশন হইতে তাহাদের হোটেলের চাকর বলিয়া আনিয়াছে যে একমাত্র তাহাদেরই হোটেলে এত সকালে সব হইয়া গিয়াছে—মাছের ঝোল, অম্বল পর্য্যন্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে ডাল আর আলুভাজা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, এ কি অন্যায়—ইত্যাদি।

পদ্ম ঝি দরজার কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল—ও ঠাকুর, দাও না মাছ ভেজে, বাবুরা বলচেন শুনতে পাও না? বাবুরা খাবেন কি দিয়ে?

অর্থাৎ সেই পচা মাছ ভাজা আবার দাও। আজকার মাছ এখনও কোটা হয় নাই পদ্ম তাহা জানে।

হাজারি ঠাকুর কিন্তু পচা মাছ আর খরিদ্দারদের পাতে দিবে না। সে বলিল—ভাজা মাছ আর নেই। যা ছিল ফুরিয়ে গিয়েচে।

পদ্ম ঝি বলিল—তবে একটু বসুন বাবুরা, একখানা তরকারী করে দিচ্চে, বসুন আপনারা, উঠবেন না।

শিক্ষামত মতি চাকর আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, বনগাঁয়ের গাড়ী আসবার যে সময় হোল, রান্নাবান্না কিছু হোল না এখন? ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে যে।

খরিদ্দারেরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহারাও সেই গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে যাইবে। একজন বলিল—ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে?

মতি চাকর বলিল—হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ। গাড়ী গাংনাপুর ছেড়েচে—এল বলে।

মাছভাজা খাওয়া মাথায় থাকুক—তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিতে পারিলে বাঁচে। গাড়ী ফেল হইয়া গেলে অনেকক্ষণ আর গাড়ী নাই।

পদ্ম ঝি বলিল—আহা-হা উঠবেন না বাবুরা, ধীরে-সুস্থে খান। মাছ ভেজে দাও ঠাকুর, আমি তাড়াতাড়ি কুটে দিচ্ছি। বসুন বাবুরা।

খরিদ্দারেরা উঠিয়া পড়িল—ধীরভাবে বসিয়া খাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চলিয়া যাইতেই পদ্ম ঝি বলিল—যাক, এইবার মাছগুলো কুটি। এত সকালে কোন্ হোটলে রান্না হয়েচে? ছ'খানা মাছের গাদা বেঁচে গেল।

এই জুয়াচুরিগুলা হাজারি পছন্দ করে না।

শুধু এখানে বলিয়া নয়, রেল বাজারের সব হোটেলেই এই ব্যাপার সে দেখিয়া আসিতেছে। খরিদ্দারকে খাওয়াইতে বসাইয়া দিয়া বলে—বাবু, গাড়ীর ঘণ্টা পড়ে গেল। খরিদ্দার আধ-পেটা খাইয়া উঠিয়া যায়, হোটেলের লাভ।

ছিঃ—ন্যায্য পয়সা গুনিয়া লইয়া এ কি জুয়াচুরি?

হাজারি ঠাকুর এতদিন এখানে কাজ করিতেছে, কখনো মুখ দিয়া একথা বাহির করে নাই যে ট্রেনের সময় হইয়া গেল।

অনেক সময় ট্রেনের সময় না হইলেও ইহারা মিথ্যা করিয়া ধুয়া তুলিয়া দেয়, যাহাতে

খরিদ্দার ব্যস্ত হইয়া পড়ে—অধিকাংশই পাড়াগেঁয়ে লোক, রেলের টাইমটেবিল মুখস্থ করিয়া তাহারা বসিয়া নাই, ইহাদের ধাঁধা লাগাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

মতি চাকরকে শিখানো আছে, সে সময় বুঝিয়া রেল গাড়ীর ধুয়া তুলিয়া দিবে—আজ পাঁচ-বছর হাজারি দেখিয়া আসিতেছে এই ব্যাপার।

নিজের হোটেল যখন সে খুলিবে ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্ম এসব হীন ও নীচ কৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায্য পয়সা লইবে, ন্যায্যমত পেট ভরিয়া খাইতে দিবে। এই সব নিরীহ পল্লীবাসী রেলযাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা না লইলে যদি তাহার হোটেল না চলে, না হয় না-ই চলিল হোটেল।

ফাঁকি দেওয়া যায় না হাটুরে খরিদ্দারদের!

আজ মদনপুরের হাট—এখানকারও হাট। পাড়াগাঁ হইতে দুধ ও তরিতরকারী লইয়া বহুলোক আসে—তাহারা অনেকে এখানে খায়। বার বার যাতায়াত করিয়া তাহারা চালাক হইয়া গিয়াছে—মতি চাকর প্রথম প্রথম দু-একবার ইহাদের উপর কৌশল খাটাইতে গিয়া বেকুব বনিয়াছে।

তাহারা বলে—হোক্ হোক্ গাড়ীর ঘণ্টা, লাও তুমি। না হয় পরের গাড়ীতার যাবানি। তা' বলে সারাদিন খাটবার পরে ভাত ফেলে তো উঠতি পারিনে? হ্যাদে নিয়ে এসো আর দু-হাতা ডাল—ও ঠাকুর—

হাটুরে লোকজন খাইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা একটা।

ইহাদের জন্ম আলাদা বন্দোবস্ত। ইহারা চাষা লোক, খায় খুব বেশী! তা ছাড়া খুব শৌখীন রকমের খাদ্য না পাইলেও ইহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু পেট ভরা চাই।

সাধারণ বাবু-খরিদ্দারদের জন্ম যে চাল রান্না হয়, ইহাদের সে চাল নয়। মোটা নাগ্‌রা চালের ভাত ইহাদের জন্ম বরাদ্দ। ফেন মিশানো ডাল ও একটা চচ্চড়ি। ইহাদের সাধারণতঃ দেওয়া হয় চিংড়ি মাছ বা কুচা মাছ। পোনা মাছ ইহাদের দিয়া পারা যায় না। কুচো চিংড়ি কিছু বেশী দিতেও গায়ে লাগে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় হাজারির নিজের গ্রামের লোকও থাকে—তাহাদের মুখে বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, কিন্তু আজ তাহার স্বগ্রাম হইতে কেহ আসে নাই।

রতন ঠাকুর নাই—একা হাতে এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেশন করিয়া হাজারি নিতান্ত ক্লান্ত দেহে যখন খাইতে বসিবার যোগাড় করিতেছে তখন বেলা প্রায় তিনটার কম নয়। পদ্ম ঝি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, বেচু চক্কত্তি গদিতে বসিয়া এবেলার ক্যাশ মিলাইতেছেন—এই সময় পাশের হোটেলের বংশীধর ঠাকুর আসিয়া বলিল—ও ভাই হাজারি, দুটো ভাত হবে?

বংশীধর মেদিনীপুর জেলার লোক, তবে বহুকাল রাণাঘাটে থাকায় কথার বিশেষ কোন টান লক্ষ্য করা যায় না। সে বলিল, আমার এক ভাগ্নে এসেচে হঠাৎ এখন এই তিনটের গাড়ীতে। আজ হাটবার, হাটুরে খদ্দেরদের দল সব খেয়ে গিয়েচে, আমাদের খাওয়াও

ঢুকেচে, তাই বলে দেখে আসি যদি—

হাজারি বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দাও গিয়ে, ভাত যা আছে খুব হয়ে যাবে।

বংশীধরের ভাগিনেয় আসিল। চমৎকার চেহারা, আঠারো-উনিশের বেশী বয়স নয়। তাহাকে আসন করিয়া ভাত দিতে গিয়া হাজারি দেখিল ডেক্‌চিতে যা ভাত আছে, তাহাতে দু-জনের কুলায় না। বংশীধরের ভাগিনেয়টি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবান ছেলে, নিশ্চয়ই দুটি বেশী ভাত খায়—তাহারই পেট ভরিবে কিনা সন্দেহ।

হাজারি উহাকেই সব ভাতগুলি বাড়িয়া দিল—ডাল তরকারি যাহা ছিল তাহাও দিল, সে খাইতে খাইতে বলিল—মাছ নেই ?

—না বাবা, মাছ সব ফুরিয়ে গিয়েচে। আজ এখানকার হাটবার, বড্ড খদ্দেরের ভিড়। মাছের টান, ডাল তরকারির টান, সবেরই টান। তোমার খাওয়ার বড্ড কষ্ট হোল বাবা, তা বোসো দু-পয়সার দই আনিয়ে দিই।

—না না থাক্, আপনার দই আনাতে হবে না।

—না বাবা বসো! বংশীধরের ভাগ্নে যা, আমার ভাগ্নেও তাই। পাশাপাশি হোটেল—এতদিন কাজ করচি।

হাজারি নিজে গিয়া দই আনিয়া দিল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মামা, এখানে কোন চাকুরি খালি আছে ?

—কি চাকুরি বাবা ?

—এই ধরুন হোটেলের রাঁধুনীগিরি কি এম্‌নি। কাজের চেষ্টায় ঘুরচি। এখানে কিছু হবে মামা ?

মামা বলিয়া ডাকিতে ছেলেটির উপর হাজারির কেমন স্নেহ হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল—না বাবা, আমার সন্ধানে তো নেই, কিন্তু একটা কথা বলি। হোটেলের রাঁধুনীগিরি করতে যাবে কেন তুমি ? দিব্যি সোনার চাঁদ ছেলে। এ লাইনে বড় কষ্ট, এ তোমাদের লাইন নয়। পড়াশুনা কদ্দূর করেচ ?

ছেলেটি অপ্রতিভের সুরে বলিল—না মামা, বেশী করি নি। আমাদের গাঁয়ের ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলের ফোর্থ ক্লাস পর্যান্ত পড়েছিলাম, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর লেখাপড়া হোল না।

—তোমার নামটি কি ?

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত হাজারির মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, চমৎকার ছেলেটি, ইহার সঙ্গে টেঁপির বিবাহ দিলে বড় সুন্দর মানায়!...

কিন্তু তাহা কি ঘটিবে ? ভগবান কি এমন পাত্র টেঁপির ভাগ্যে জুটাইয়া দিবেন!

ছেলেটি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল—আপনার খাওয়া হয়েচে মামা ?

—এইবার খেতে বসবো বাবা। আমাদের খাওয়া এইরকম। বেলা তিনটের এদিকে বড় একটা ঘেটে না, সেইজন্যই তো বলচি বাবা এসব ছ্যাঁচ্‌ড়া লাইন, তোমাদের জন্যে নয়

এসব। রান্না কাজ বড় ঝঞ্ঝাটের কাজ।

ছেলেটি একটু হতাশ সুরে বলিল—তবে কোন্ লাইন ধরবো বলুন মামা? কত জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে দেখলাম। আজ ছ'মাস ধরে ঘুরচি। কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। আপনি বলচেন রাঁধুনীর কাজ—কলকাতায় একটা হোটেলের বাইরে লেখা ছিল—দুজন চাকর চাই। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম, বল্লে—কি? আমি বল্লাম—চাকরের কাজ খালি আছে দেখে এসেচি। বল্লে—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এ কাজ তোমার জন্যে নয়। কত করে বল্লাম, কিছুতেই নিলে না।

হাজারি অবাক হইয়া শুনিতেছিল। বলিল—বলো কি?

—তারপর শুনুন। কোথাও চাকুরি জোটে না। কলকাতায় শেষকালে খেতে পাইনে এমন হোল। দু-একদিন তো না খেয়েই কাটলো। তারপর ভাবলাম, আমার এক মামা রাণাঘাটে হোটেলে কাজ করেন সেখানেই যাই। তাই আজ এলাম—উনি আমার আপন মামা নয়। মায়ের জ্ঞাতি ভাই। তা এখানেও আপনি বলচেন এ লাইন আমার জন্যে নয়—তবে কোথায় যাবো আর কি-ই বা করবো?

ছেলেটির হতাশার সুর এবং তাহার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী হাজারির মনে বড় লাগিল। সে তখনও ভাবিতেছিল—আহা, ছেলেমানুষ! আমার বড় ছেলে সন্তু বেঁচে থাকলে এতদিন এত বড়টা হোত। টেঁপির সঙ্গে ভারি মানায়। সোনার চাঁদ হেন ছেলে! টেঁপি কি আর সে অদেষ্ট করেচে! নাই বা হোল চাকুরি! ও গিয়ে টেঁপিকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে হয়ে আমার গাঁয়ের ভিটেতে গিয়ে বসুক—ওকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজে রোজগার করে ওদের খাওয়াবো। জমিজমাও তো আছে কিছু।

খাওয়া শেষ করিয়া বংশীধরের ভাগিনেয়টি চলিয়া গেল বটে কিন্তু হাজারির প্রাণে যেন কি এক অনির্দেশ্য নূতন সুরের রেশ লাগাইয়া দিয়া গেল। তরুণ মুখের ভঙ্গি, তরুণ চোখের চাহনি হইতে এত প্রেরণা পাওয়া যায়?... ...জীবনে এ সব নবীন অভিজ্ঞতা হাজারির।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের গাছতলায় নির্জনে বসিয়া সে কত স্বপ্ন দেখিল। নতুন সব স্বপ্ন। টেঁপির সহিত বংশীধরের ভাগিনেয়টির বিবাহ হইতেছে। বাধা কিছুই নাই, তাহাদেরই পালটি ঘর।

টেঁপির ক্ষুদ্র, কোমল হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ হাতে তুলিয়া দিয়াছে...দুই হাত একত্র মিলাইয়া হাজারি মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।...টেঁপির মার চোখ দিয়া আনন্দে জল পড়িতেছে—কি সুন্দর সোনার চাঁদ জামাই!

কেন সে হোটেলে রাঁধুনীগিরি করিতে যাইবে ছেলেবয়সে? হাজারির নিজের হোটেলে জামাই থাকিবে ম্যানেজার, চক্কত্তি মশায়ের মত গদিতে বসিয়া খরিদ্দারকে টিকিট বিক্রয় করিবে—হিসাবপত্র রাখিবে।

দ্বিগুণ খাটিবার উৎসাহ আসিবে হাজারির—জামাইও যা ছেলেও তাই। অত বড় অত

সুন্দর, উপযুক্ত ছেলে। টেঁপির সারাজীবনের আনন্দ ও সাধের জিনিস। ওদের দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রাণপণে খাটিবে। তিন মাসের মধ্যে হোটেল দাঁড় করাইয়া দিবে।

বেলা পড়িল। চূর্ণীর খেয়ায় লোক পারাপার হইতেছে, যাহারা শহরে কেনা-বেচা করিতে আসিতেছিল—এই সময় তাহারা বাড়ী ফেরে।

একবার কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া হোটেলে ফিরিতে হইবে—গাছতলায় বসিয়া আর বেশীক্ষণ আকাশ-কুসুম ভাবিলে চলিবে না। রতন ঠাকুর সম্ভব এবেলাও দেখা দিতেছে না, তাহাকে একাই সব কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু সত্যই কি আকাশ-কুসুম? হোটেল তাহার হইবে না? টেঁপির সঙ্গে ওই ছেলেটির—

যাক্। বাজে ভাবনায় দরকার নাই। দেরি হইয়া যাইতেছে।

পদ্ম ঝি বৈকালের দিকে হাজারিকে বলিল—বলি, হ্যাগো ঠাকুর, আজ মাছের মুড়োটা কি হ'ল গা? আজ ত কর্ত্তাবাবুর জ্বর। তিনি বেলা এগারোটার মধ্যেই চলে গিয়েছেন—অত বড় মুড়োটার কি একটা টুকরোও চোখে দেখতে পেলাম না—

হাজারি মাছের মুড়োটা লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল। বড় মাছের মুড়ো সাধারণতঃ কর্ত্তার বাসায় যায়, কিন্তু আজ কর্ত্তার অসুখ—তিনি বেশীক্ষণ হোটেলে ছিলেন না—মুড়োটা পদ্ম ঝি নিজের বাড়ী লইয়া যাইত—হাজারি কখনও মুড়ো নিজে খায় নাই—রতনঠাকুর খাইয়াছে, পদ্ম ঝি ত প্রায়ই লইয়া যায়—হাজারির দাবি কি থাকিতে পারে না মুড়োর উপর? তাই সে সেটা কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল যখন ছুটি করিয়া চূর্ণীর ঘাটে বেড়াইতে যায় তখন।

পদ্ম ঝিয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাজারি বলিল—কেন গা পদ্মদিদি, এতক্ষণ পরে মুড়োর খোঁজ হ'ল?

—এতক্ষণ পরেই হোক আর যতক্ষণ পরেই হোক—কি হ'ল মুড়োটা?

—আমায় কি একদিন খেতে নেই? তোমরা ত সবাই খাও। আমি আজ খেয়েছি।

—কই মুড়োর কাঁটাচোকড়া ত কিছু দেখলাম না? কোথায় বসে খেলে?

হাজারির বিব্রত ভাব পদ্ম ঝিয়ের চোখ এড়াইল না। সে চড়াগলায় বলিল—খাও নি তুমি। খেলে কিছু বলতাম না। তুমি সেটা লুকিয়ে বিক্রী করেছ—কেমন ঠিক কথা কি না? চোর, জুয়াচোর কোথাকার—হোটেলের জিনিস লুকিয়ে লুকিয়ে বিক্রী? আচ্ছা, তোমার চুরির মজা টের পাওয়াচ্ছি—আসুক কর্ত্তা—

হাজারি বলিল—না পদ্ম দিদি, বিক্রী করব কাকে? রাঁধা মুড়ো কে নেবে? সত্যি আমি খেয়েছি।

—আবার মিথ্যে কথা? আমি এতকাল হোটেলে কাজ করে হাতে ঘাটা পড়িয়ে ফেলনু, মাছের মুড়োর কাঁটাচোকড়া আমি চিনিনে—না? অত বড় মুড়োটা চার আনার কম বিক্রী কর নি। জমা দাও সে পয়সা গদিতে, ওবেলা নইলে দেখো কি হাল করি কর্ত্তার সামনে।

—আচ্ছা নিও চার আনা পয়সা—আমি দেব। একটু মুড়ো খেয়ে যদি দাম দিতে হয়—তাও নিও।

পদ্ম ঝি একটুখানি নরম হইয়া বলিল—তা হ'লে বেচেছিলে ঠিক ?

—না পদ্ম দিদি।

—তবে কি করলে ঠিক করে বল—

—তোমার ত পয়সা পেলেই হ'ল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ?

—দরকার আছে তাই বলছি—কোথায় গেল মুড়োটা ? বলো—নইলে কর্তার সামনে তোমার অপমান করব। বল এখনো—

—আমি খেয়েছি।

—আবার ? আমার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ঠাকুর ? আমি এবার বুঝতে পেরেছি মুড়ো কোথায় গেল।—তোমার সেই—

হাজারি জানে পদ্ম কি বলিতে যাইতেছে—সে পদ্ম ঝিয়ের মুখের কথা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—পদ্ম দিদি, তোমাদের ত খেয়ে পরে মানুষ হচ্ছি গরীব বামুন। কেন আর ও সামান্য জিনিস নিয়ে বকাঝকা কর ?

এ কথায় পদ্ম ঝি নরম না হইয়া বরং আরও উগ্র হইয়া উঠিল। বলিল—নিজে খেলে কিছু বলতাম না ঠাকুর—কিন্তু হোটেলের জিনিস পর দিয়ে খাওয়ান সহ্যি হয় না। এর একটা বিহিত না করে আমি যদি ছাড়ি তবে আমার নামে কুকুর পুষো, এই বলে দিচ্ছি সোজা কথা।

হাজারি ভয়ে ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল—নিজের জন্য নয়, কুসুমের জন্য। পদ্ম ঝিয়ের অসাধ্য কাজ নাই—সে না জানি কি করিয়া বসিবে—কুসুমের শাশুড়ীর কানে—হয়ত কত রকমের কথা উঠাইবে, তাহার উপরে যদি কুসুমের বাপের বাড়ী অর্থাৎ তাহার স্বগ্রামে সে কথা গিয়া পৌঁছায়—তবে উভয়েরই লজ্জায় মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিবে সেখানে। অথচ কুসুম নিরপরাধিনী। পদ্ম ঝি চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিয়া চিন্তিয়া রতনঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। তাহার আত্মীয়কে বিনা পয়সায় খাওয়ানর ষড়যন্ত্রের মধ্যে হাজারি ছিল—সুতরাং রতন হাজারির দিকে টানিত। সে বলিল—তুমি কিছু ভেব না হাজারি দা, পদ্ম দিদিকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। মুড়ো বাইরে নিয়ে যাবে, তা আমায় একবারখানি জানালে হ'ত নি ? তোমায় কত বুঝিয়ে পারব আমি ?

কিছু পরে সন্ধ্যার দিকে বেচু চক্কত্তি আসিলেন। চাকর হুকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিল। হুকা হাতে লইয়া বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ধুনো গঙ্গাজল দে আগে—আর পদ্মকে বাজারের ফর্দ্দ দিতে বলে দে—

কয়লাওয়ালা মহাবীর প্রসাদ বসিয়াছিল পাওনার প্রত্যাশায়—তাহাকে বলিলেন—সন্ধ্যের সময় এখন কি ? ওবেলা ত সাড়ে বার আনা নিয়ে গিয়েছ, আবার এবেলা দেওয়া যায় ? কাল এসো। তোমার কি ?

একটি রোগা কালো মত লোক হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু সেদিন কুমড়ো দিয়েলাম—তার পয়সা।

—কুমড়ো? কে কুমড়ো নিয়েছে?

—আজ্ঞে, বাবু, আপনাদের হোটেলে দিয়ে গিয়েলাম—ছ'আনা দাম বলেলাম, তা তিনি বললেন—পাঁচগণ্ডা পয়সা হবে। তা বলি, ভদ্দর নোকের কথা—তাই ছ্যান। তিনি বললেন —আজ নয়, বুধবারে এসে নিয়ে যেওয়ানে—তাই এ্যালাম—

—ছ'আনা পয়সার কুমড়ো ধারে নিয়েছে কে—খাতায় কি বাজারের ফর্দ্দের মধ্যে ত ধরা নেই, এ ত বাপু আশ্চর্য্য কথা।—আমরা ধারে জিনিসপত্তর খরিদ করি নে। যা কিনি তা নগদ। কে তোমার কাছে কুমড়ো নিলে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

বেচু রতন ও হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা কুমড়ো কেনা ত দূরের কথা—গত পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কুমড়ার তরকারিই রাঁধে নাই, বলিল—কোন কুমড়া চক্ষেও দেখে নাই এই কয়দিনে।

কথাবার্ত্তার মধ্যে পদ্ম ঝি বাজারের ফর্দ্দ লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কুমড়াওয়ালা বলিয়া উঠিল— এই যে! ইনিই তো নিয়েলেন! সেই কুমড়ো মা ঠাকরুণ।—বলেলেন বুধবারে আসতি—তাই আজ এলাম। বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কুমড়ো কে নিয়েলেন—

পদ্ম ঝি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল—হাঁা, কুমড়ো নিয়েছিলাম তা কি হবে? পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে কি পালিয়ে যাব? দিয়ে দাও ত কর্ত্তাবাবু ওর পয়সা মিটিয়ে—আমি এর পরে—বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া কুমড়োওয়ালাকে পয়সা মিটাইয়া দিলেন, সে চলিয়া গেল।

রতনঠাকুর আড়ালে গিয়া হাজারিকে বলিল—হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল পদ্মদিদি—কিন্তু কর্ত্তাবাবুর দরদটা একবার দেখেছ ত হাজারি-দা?

—ও আর দেখাদেখি কি, দেখেই আসছি। আমি যদি কুমড়ো নিতাম তবে পদ্মদিদি আজ রসাতল বাধাত—কর্ত্তাবাবুও তাতেই সায় দিত। এ ত আর তুমি আমি নই? এ হোটেলে পদ্মদিদিই মালিক। তুমি এইবার একবার বল পদ্মদিদিকে মুড়োর কথাটা। নইলে ও এখুনি লাগাবে কর্ত্তাকে—

রতন পদ্ম ঝিকে আড়ালে বলিল—ও পদ্মদিদি, গরীব বামুন তোমাদের দোরে করে খাচ্ছে —কেন আর ওকে নিয়ে অমন করো? একটা মুড়ো যদি সে খেয়েই থাকে—এতদিন খাটছে এখানে, তা নিয়ে তাকে অপমান করো না। সবাই ত নেয়—কেউ ত নিতে ছাড়ে না—আমি নিইনে না তুমি নাও না? বেচারীকে কেন বিপদে ফেলবে?

পদ্ম ঝি বলিল—ও খায়নি—ও এখান থেকে বের করে ওর সেই পেয়ারের কুটুমকে দিয়ে এসেছে—আমি কচি খুকী? কিছু বুঝি নে? নচ্ছার বদমাইশ লোক কোথাকার—

রতন হাসিয়া বলিল—যা বোঝে সে করুক গিয়ে পদ্মদিদি—তোমার আমার কি? সে

মুড়ো নিজে খায়,—পরকে দেয়—তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি কিছু বোল না আজ আর ওকে।

পদ্ম ঝি কুমড়ার ব্যাপার লইয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল—নতুবা সে রতনের কথা এত সহজে রাখিত না। বলিল—তাহ'লে বারণ করে দিও ওকে—বারদিগর যেন এমন আর না করে। তাহলে আমি অনর্থ বাধাবো—কারোর কথা শুনবো না।

সে রাত্রে হোটেলের কাজকর্ম চুকাইয়া হাজারি চূর্ণীর ধারে বেড়াইতে গেল। দিব্য জ্যোৎস্না-রাত—প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ কি সর্ব্বনাশই আর একটু হইলে হইয়াছিল! তাহার নিজের জন্য সে ভাবে না, ভাবে কুসুমের জন্য। কুসুম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—সেখানে তার বদনাম রটিলে উভয়েরই সেখানে মুখ দেখানো চলিবে না। আর তাহার এই বয়সে এই বদনাম রটিলে লোকেই বা বলিবে কি?

কুসুমকে সে মেয়ের মত দেখে—ভগবান জানেন। ওসব খেয়াল তাহার থাকিলে এই রাণাঘাট শহরে সে কত মেয়ে জুটাইতে পারিত। এই রাধাবল্লভতলার মাটি ছুঁইয়া সে বলিতে পারে জীবনে কোনদিন ওসব খেয়াল তার নাই। বিশেষতঃ কুসুম। ছিঃ ছিঃ—টেঁপির সঙ্গে যাহাকে সে অভিন্ন দেখে না—তাহার সম্বন্ধে রতন ঠাকুরের কাছে পদ্ম ঝি যে সব বিশ্রী কথা বলিয়াছে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাত প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। শহর নিষুতি হইয়া গিয়াছে, কেবল কুতুদের চূর্ণীর ধারের কাঠের আড়তে হিন্দুস্থানী কুলীরা ঢোলক বাজাইয়া বিকট চিৎকার শুরু করিয়াছে—ওই উহাদের নাকি গান! যখন নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস্ আসিয়া দাঁড়ায় স্টেশনে তখন সে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে—আর এখন স্টেশন পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ এত রাত্রে কোনো ট্রেন আসে না। রাত চারটা হইতে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হইবে।

হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া মতি চাকরের ঘুম ভাঙাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বড় গরম—স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে না হয় বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়া যাক্। আজ রাত্রে ঘুম আসিতেছে না চোখে।

ভোরে উঠিয়া হোটেলের সামনে আসিয়া হাজারি দেখিল হোটেলের দরজা এখনও বন্ধ। সে একটু আশ্চর্য্য হইল। মতি চাকর তো অনেকক্ষণ উঠিয়া অন্যদিন দরজা খোলে। ডাকাডাকি করিয়াও কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর গদির ঘরের জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিতে গিয়া হাজারি লক্ষ্য করিল—বাসনের ঘরের মধ্যে অত আলো কেন?

ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল বাসনের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কেহই নাই।

মতি চাকরেরও সাড়াশব্দ নাই কোনদিকে। এরকম তো কখনো হয় না।

এমন সময় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের চাকর নিমাই গয়লাপাড়া হইতে চায়ের দুধ লইয়া ফিরিতেছে দেখা গেল—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে একটা চায়ের স্টলও আছে—খুব সকাল

হইতেই সেখানে চা বিক্রী শুরু হয়।

হাজারির ডাকে নিমাই আসিল। দুজনে ঘরের মধ্যে ঝুঁকিয়া দেখিল মতি চাকর খাবার ঘরে শুইয়া দিব্যি নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। উভয়ের ডাকে মতি ধড়মড় করিয়া উঠিল।

হাজারি বলিল—মতি দোর খোলা কেন?

মতি বলিল—তা তো আমি জানি নে! তুমি রাত্তিরে ছিলে কোথায়? দোর খুললে কে?

তিনজনে ঘরের মধ্যে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিল। হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা, সর্ব্বনাশ! থালা বাসন কোথায় গেল? একখানও তো দেখছি নে!

—সে কি!

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো ঘরেই বাসনের সন্ধান পাওয়া গেল না। নিমাই বলিল—চায়ের দুধটা দিয়ে আসি হাজারি-দা, বাসন সব চক্ষুদান দিয়েচে কে। তোমাদের কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর আসিল। সে-ই গিয়া বেচু চক্কত্তিকে ডাকিয়া আনিল। পদ্ম ঝিও আসিল। চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া পাশের হোটেল হইতে যদু বাঁড়ুয্যে আসিলেন, বাজারের লোকজন জড় হইল—থানায় খবর দিতে তখনি, এ. এস. আই নেপালবাবু ও দুজন কনস্টেবল আসিল। হৈ হৈ বাধিয়া গেল। বেচু চক্কত্তি মাথায় হাত দিয়া ততক্ষণ বসিয়া পড়িয়াছেন, প্রায় ষাট-সত্তর টাকার থালা বাসন চুরি গিয়াছে!

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

—ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্ম্মে বাবু। বড্ড গরম হচ্ছিল—তাই ঘাটের ধার থেকে ফিরে ওখানেই রাত কাটালাম।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—কত রাত্রে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শুয়েছিলে? কোন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে?

—আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের বেঞ্চির ওপর।

—তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল?

—না বাবু, তখন অনেক রাত।

—কত?

—দেড়টার বেশী।

—এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে?

—রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি দুবেলাই চূর্ণীর খেয়াঘাটে গিয়ে বসি। কালও সেখানে ছিলাম।

—আর কোনো দিন হোটেল ছেড়ে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে শুয়েছিলে?

—মাঝে মাঝে শুই, তবে খুব কম।

এই সময় বেচু চক্কত্তিকে পদ্ম ঝি চুপি চুপি কি বলিল। বেচু চক্কত্তি নেপালবাবুকে বলিলেন, দারোগাবাবু, একবার ঘরের মধ্যে একটা কথা শুনে যান দয়া করে—

ঘরের ভিতর হইতে কথা শুনিয়া আসিয়া নেপালবাবু বলিলেন—হাজারি ঠাকুর, তুমি কুসুমকে চেন ?

হাজারির মুখ শুকাইয়া গেল। ইহার মধ্যে ইহারা কুসুমের কথা আনিয়া ফেলিল কেন ? কুসুমের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ?

হাজারির মুখের ভাব নেপালবাবু লক্ষ্য করিলেন।

হাজারির উত্তর দিতে একটু দেরি হইতেছিল, নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—কথার জবাব দাও ?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে মুখে আঁচল চাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাজারি বুঝিল—কুসুমের কথা সে-ই কর্তাকে বলিয়াছে নতুবা তিনি অতশত খোঁজখবর রাখেন না। কর্তামশায় দারোগাকে বলিয়াছেন কথাটা—সে ওই পদ্ম ঝিয়ের উসকানিতে।

—কুসুম থাকে কোথায় ?

—গোয়ালাপাড়ায়, বড় বাজারের ওদিকে।

—সে কি করে ?

—দুধ-দই বেচে। গরীব লোক—

—বয়েস কত ?

—এই চব্বিশ-পঁচিশ—

পদ্ম ঝি একটু মুচ্‌কি হাসিল এই উত্তর শুনিয়া, হাজারির তাহা চোখ এড়াইল না। দারোগাবাবুর প্রশ্নের গতি তখনও সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের মুখের মুচ্‌কি হাসি দেখিয়া সে বুঝিল কেন ইহারা কুসুমের কথা এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

—তোমার সঙ্গে কুসুমের কত দিনের আলাপ ?

—সে আমার গাঁয়ের মেয়ে। সে যখন ছেলেমানুষ তখন থেকে তাকে জানি। তার বাবা আমার বন্ধুলোক—আমাদের পাড়ার পাশেই—

—কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই দেখাশোনা কর—না ?

—মাঝে মাঝে দেখা করি বৈকি—গাঁয়ের মেয়ে, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার—

নেপালবাবু হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই দরকার। এখানে তার শ্বশুরবাড়ী ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—স্বামী আছে ?

—না, আজ বছর চার-পাঁচ মারা গিয়েছে—শাশুড়ী আছে বাড়ীতে। এক দেওর-পো আছে।

—তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আস ?

লজ্জায় ও সঙ্কোচে হাজারি যেন কেমন হইয়া গেল। এসব কথা এখানে কেন ?

পদ্ম ঝি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই মুখে আঁচল চাপা দিল। নেপালবাবু ধমক

দিয়া বলিলেন—আঃ, হাসি কিসের? এটা হাসির জায়গা নয়। চুপ—

কিন্তু দারোগাবাবু ধমক দিলে কি হইবে—পদ্ম ঝিয়ের হাসি সংক্রামক হইয়া উঠিয়া উপস্থিত লোকজন সকলেরই মুখে একটা চাপা হাসির ঢেউ আনিয়া দিল। অন্য লোকের হাসি হাজারি তত লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পদ্ম ঝিয়ের হাসিতে সে কিসের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঠাওর করিয়া মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল—দারোগাবাবু, সে গরীব লোক, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, সে আমাকে বাবা বলে ডাকে—আমার সে মেয়ের মত—তাই মাঝে মাঝে কোনদিন একটু-আধটু তরকারী কি রাঁধা মাংস তাকে দিয়ে আসি। কত তো ফেলা-ঝেলা যায়, তাই ভাবি যে একজন গরীব মেয়ে—

—বুঝেছি, থাক আর তোমার লেকচার দিতে হবে না। কাল রাত্রে তুমি সেখানে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে না বাবু।

—আজ সকালে গিয়েছিলে?

—না বাবু, সকালে প্ল্যাটফর্ম থেকেই হোটেলে এসেছি।

—হুঁ।

দারোগাবাবু অন্য সকলের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল মতি চাকর ও হাজারিকে বলিলেন—আমার সঙ্গে তোমাদের থানায় যেতে হবে। কনস্টেবলদের বলিলেন —এদের ধরে নিয়ে চল।

মতি কান্নাকাটি করিতে লাগিল—একবার বেচু চক্কত্তি, একবার দারোগাবাবুর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ—ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া কি ফল?—ইত্যাদি।

হাজারির প্রাণ উড়িয়া গেল থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া।

এ কি বিপদে ভগবান তাহাকে ফেলিলেন?

থানা-পুলিস বড় ভয়ানক ব্যাপার, মোকর্দ্দমা হইলে উকীল দিবার ক্ষমতা হইবে না তাহার, বিনা কৈফিয়তে জেল খাটিতে হইবে—কত বছর তাই বা কে জানে? না খাইয়া স্ত্রীপুত্র মারা পড়িবে। জেলখাটা আসামীকে ইহার পর চাকুরিই বা দিবে কে?

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার, যদি ইহারা কুসুমকে ইহার মধ্যে জড়ায়? জড়াইবেই বোধ হয়। হয়তো কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে চাহিবে।

নিরপরাধিনী কুসুম! লজ্জায় ঘৃণায় তাহা হইলে সে হয়তো গলায় দড়ি দিবে। আরও কত কি কথা লোকে রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা তো গেলে তাহার নিজেরও আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

কখনও সে একটা বিড়ি-দেশলাই কাহারও চুরি করে নাই জীবনে—সে করিবে হোটেলের বাসন চুরি! নিজের মুখের জিনিস নিজেকে বঞ্চিত করিয়া সে কুসুমকে মাঝে মাঝে দিয়া আসে বটে—চুরির জিনিস নয় সে সব। সে খাইত, না হয় কুসুম খায়।

থানায় গিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই হাজারি ও মতি বসিয়া রহিল। হাজারি শুনিল বেচু চক্কত্তি ও পদ্ম ঝি দু'জনেই বলিয়াছে উহাদের উপরই তাহাদের সন্দেহ হয়। সুতরাং পুলিস তো তাহাদের ধরিবেই।

থানার বড় দারোগা থানায় ছিলেন না—বেলা একটার সময় তিনি আসিয়া চুরির সব বিবরণ শুনিয়া হাজারি ও মতিকে তাঁহার সামনে হাজির করিতে বলিলেন। হাজারি হাত জোড় করিয়া দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—হোটেলে কতদিন কাজ করচ?

—আজ্ঞে বাবু, ছ'বছর।

—বাসন চুরি করে কোথায় রেখে দিয়েচ?

—দোহাই বাবু—আমার বয়েস ছ'চল্লিশ-সাতচল্লিশ হোল—কখনো জীবনে একটা বিড়ি কারো চুরি করিনি—

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আর ওই চাকর বেটা দুজনে মিলে যোগসাজসে চুরি করেচ। স্বীকার করো—

—বাবু আমি এর কোনো বার্ত্তা জানি নে! আমি সে রাত্তিরে হোটেলেই ছিলাম না।

—কোথায় ছিলে?

—ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্ম্মে শুয়ে ছিলাম সারারাত।

—কেন?

—বাবু, আমি খাওয়া-দাওয়া করে চূর্ণীর ঘাটে বেড়াতে যাই রোজ। বড্ড গরম ছিল বলে সেখানে একটু বেশী রাত পর্য্যন্ত ছিলাম—ফিরে এসে দেখি দরজা বন্ধ, তাই ইষ্টিশানে—

এই সময় নেপালবাবু ইংরাজিতে বড় দারোগাকে কি বলিলেন। বড় দারোগা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ও। আচ্ছা- তুমি কুসুম ব'লে কোনো মেয়েমানুষের বাড়ী যাতায়াত করো?

—বাবু, কুসুম আমার গাঁয়ের মেয়ে। গরীব বিধবা, তাকে আমি মেয়ের মতো দেখি—সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে, বাবার মত ভক্তিছেদ্দা করে। যদি সেখানে গিয়ে থাকি, তাহোলে তাতে দোষের কথা কি আছে বাবু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। একথা লাগিয়েচে আমাদের হোটেলের পদ্ম ঝি—সে আমাকে দুচোখ পেড়ে দেখতে পারে না—কুসুমকেও দেখতে পারে না। আমাদের নামে নানারকম বিচ্ছিরি কথা সে-ই রটিয়েচে। আপনিই হাকিম—দেবতা। আর মাথার ওপর চন্দ্র সূয্যি রয়েচেন—আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হোতে গেল—আমার সেদিকে কখনো মতি-বুদ্ধি যায়নি বাবু। আমি তাকে মেয়ের মত দেখি—তাকে এর মধ্যে জড়াবেন না—সে গেরস্তর বৌ—মরে যাবে ঘেন্নায়।

বড় দারোগা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক। হাজারির চোখমুখের ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল লোকটা মিথ্যা বলিতেছে না।

বড় দারোগা মতি চাকরকে অনেকক্ষণ ধরিয়া জেরা করিলেন। তাহার কাছেও বিশেষ

কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না—তাহার সেই এক কথা, ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইতেছিল, সে কিছুই জানে না।

বড় দারোগা বলিলেন—দু-জনকেই হাজতে পুরে রেখে দাও—এম্‌নি এদের কাছে কথা বেরুবে না—কড়া না হোলে চলবে না এদের কাছে।

হাজারি জানে এই কড়া হওয়ার অর্থ কি। অনেক দুঃখ হয়তো সহ্য করিতে হইবে আজ। সব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত আছে যদি কুসুমের নাম ইহারা আর না তোলে।

বেলা দুইটার সময় একজন কনস্টেবল আসিয়া কিছু মুড়ি ও ছোলা-ভাজা দিয়া গেল। সকাল হইতে হাজারি কিছুই খায় নাই—সেগুলি সে গোগ্রাসে খাইয়া ফেলিল।

বেলা চারটার সময় রতন ঠাকুর হোটেল হইতে হাজারির জন্য ভাত আনিল।

বলিল—আলাদা করে বেড়ে রেখেছিলাম, লুকিয়ে নিয়ে এলাম হাজারি-দা। কেউ জানে না যে তোমার জন্যে ভাত আনচি।

বড় দারোগার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া রতন ঠাকুর হাজতের মধ্যে ভাত লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মতির ভাত আনিবার কথা তাহার মনে ছিল না—হাজারি বলিল—ওই ভাত দু-জনে ভাগ করে খাবো এখন।

রতন বলিল—হোটেলে মহাকাণ্ড বেধে গিয়েচে। একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, সে কাজের বহর দেখে এবেলাই পালিয়েচে। খদ্দের অনেক ফিরে গিয়েচে। পদ্ম বলচে তুমি আর মতি দুজনে মিলে এ চুরি করেচ। কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস না করিয়ে পদ্ম ছাড়বে না বলচে। সেখানে বাসন চুরি করে তুমি রেখে এসেচ। কর্তারও তাই মত। তুমি ভেবো না হাজারি-দা—মোকদ্দমা বাধে যদি আমি উকিল দেবো তোমার হয়ে। টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুমি এ কাজ করনি আমি তা জানি। আর কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কি ধরনের লোক।

হাজারি রতনের হাত ধরিয়া বলিল—ভাই আর যা হয় হোক্—কুসুমের বাড়ী যেন খানা-তল্লাস না হয় এটা তোমাকে করতে হবে। কোনো উকীলের সঙ্গে না হয় কথা বলো, আমার দুমাসের মাইনে পাওনা আছে—আমি না হয় তোমাকে দেবো।

রতন হাসিয়া বলিল—তোমার সেই মাইনে আবার দেবে ভেবেচ কর্তাবাবু? তা নয়—সে তুমি দাও আর নাই দাও—আমি উকীল দেবো তুমি ভেবো না। কত পয়সা রোজগার করলাম জীবনে হাজারি-দা—এক পয়সা তো দাঁড়াল না। সৎকাজে দুপয়সা খরচ হোক্।

হাজারি বলিল—মতিকে তাহোলে ভাত দিয়ে এস—সে অন্য ঘরে কোথায় আছে।

রতন বলিল—মতিকে আমার সন্দেহ হয়।

—না বোধ হয়। ও যদি চুরি করবে তো অমন নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমোতে পারে নাক ডাকিয়ে? আর ও সেরকম লোক নয়।

রতন ভাতের থালা লইয়া চলিয়া গেল।

আরও পাঁচ-ছ'দিন হাজারি ও মতি হাজতে আটক থাকিল। পুলিস বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—সুতরাং চুরির চার্জ্জ-শীট দেওয়া সম্ভব হইল না।

ছ'দিনের দিন দুজনেই খালাস পাইল।

মতি বলিল—হাজারি-দা, এখন কোথায় যাওয়া যায়? হোটেলে কি আমাদের আর নেবে?

হাজারিও জানে হোটেলে তাহাদের চাকুরি গিয়াছে। কিন্তু সেখানে দু'মাসের মাহিনা বাকি—বেচু চক্কত্তির কাছে গিয়া মাহিনা চাহিয়া লইতে হইবে।

বেলা তিনটা। এখন হোটেলে গেলে কর্ত্তা মশাই থাকিবেন না—সুতরাং হাজারি সন্ধ্যার পরে হোটেলে যাইবে ঠিক করিল। কতদিন চূর্ণীর ধারে যায় নাই—রাধাবল্লভতলায় গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সে আপন মনে চূর্ণীর ধারে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসিয়া হাজারির মনে পড়িল, সে এত বেলা পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই। রতন হাজতে রোজ ভাত দিয়া যাইত, আজ দুদিন সে আর আসে নাই—কেন আসে নাই কে জানে, হয়তো পদ্ম জানিতে পারিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে—কিংবা হয়তো তাহাদের ভাত আনিয়া দেওয়ার অপরাধে তাহারও চাকুরি গিয়াছে।

একটা পয়সা নাই হাতে যে কিছু কিনিয়া খায়। হাজতের ভাত হাজারি এক দিনও খায় নাই—আজও একজন কনস্টেবল ভাত আনিয়াছিল, সে বলিয়াছিল—তেওয়ারিজি, আমায় দুটি মুড়ি বরং এনে দিতে পারো, আমার জ্বর হয়েছে, ভাত খাবো না।

বেলা বারোটার সময় সামান্য দুটি মুড়ি খাইয়াছিল—আর কিছু পেটে যায় নাই সারাদিন। সন্ধ্যার পরে হোটেলে গিয়া দুটি ভাত খাইবে এখন, সেই ভালো।

হাজারির সন্দেহ হয় বাসন আর কেহ চুরি করে নাই, পদ্ম ঝির নিজেরই কাজ। ক'দিন হাজতে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া তাহার মনে হইয়াছে, পদ্ম অন্য কোন লোকের যোগসাজসে এই কাজ করিয়াছে। ও অতি ভয়ানক চরিত্রের মেয়েমানুষ, সব পারে। গত বৎসর খদ্দেরদের কাপড়ের ব্যাগ যে চুরি হইয়াছিল—সেও পদ্ম ঝিয়ের কাজ—এখন হাজারির ধারণা জন্মিয়াছে।

এরকম ধারণা সে বিদ্বেষবশতঃ করিতেছে না, গত ছ বৎসর হাজারি পদ্ম ঝিয়ের এমন অনেক কাণ্ড দেখিয়াছে যাহা সে প্রথম প্রথম তত বুঝিত না—কিন্তু এখন দুয়ে দুয়ে যোগ দিয়া সে অনেকটাই বুঝিয়াছে।

বৃদ্ধ বেচু চক্কত্তি পদ্ম ঝিয়ের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে—দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না, হোটেলটির যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে পদ্ম দিদি, তাহা তিনি এখন না বুঝিলেও পরে বুঝিবেন।

রতন ঠাকুরও সেদিন ভাত দিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে।

—হাজারিদা, হোটেলের অর্দ্ধেক জিনিস পদ্মদিদির ঘরে—আজকাল বাজারের জিনিস পর্য্যন্ত যেতে আরম্ভ করেচে। সেদিন দেখলে তো কুমড়োর কাণ্ড? চুষে খাবে এমন সাজানো হোটেলটা বলে দিচ্চি। পদ্ম দিদির কেন অত টান বাড়ীর ওপরে—তাও আমি জানি। তবে বলিনে, যাহোক্ আট টাকা মাইনের চাক্‌রিটা করি—এ বাজারে হঠাৎ চাকরিটা অনর্থক খোয়াবো?

সন্ধ্যার পরে হাজারি হোটেলের গদিঘর দিয়া ঢুকিতে সাহস না করিয়া রান্নাঘরের দিকের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিল। ভাবিয়াছিল রান্নাঘরে রতন ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে—কিন্তু একজন অপরিচিত উড়িয়া ঠাকুরকে ভাত রাঁধিতে দেখিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই বাহির হইয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছে—এমন সময় খরিদ্দারদের খাবার ঘর হইতে পদ্ম ঝি বলিয়া উঠিল—কে ওখানে? কে যায়?

হাজারি ফিরিয়া বলিল—আমি পদ্মদিদি—

পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আমি?—কে আমি?—ও। হাজারি ঠাকুর।...তুমি কি মনে করে? চলে যাচ্চ কোথায় অত তাড়াতাড়ি? ঢুকলেই বা কেন আর বেরুচ্ছই বা কেন?

—আজ হাজত থেকে খালাস পেয়েচি পদ্মদিদি। কোথায় আর যাবো, যাবার তো জায়গা নেই কোথাও—হোটেলেই এলাম, খিদে পেয়েচে—দুটো ভাত খাবো ব'লে। রান্নাঘরে এসে দেখি রতন ঠাকুর নেই, তাই সামনে দিয়ে গদিঘরে যাই—

—তা যাও গদিঘরে। এই খদ্দেরের খাবার ঘর দিয়েই যাও—

হাজারি সঙ্কুচিত অবস্থায় হোটেলের খাবার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিয়া গদির ঘরে গেল। পদ্ম ঝি গেল পিছু পিছু।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এই যে, হাজারি যে! কি মনে করে?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে কর্ত্তামশায়, পুলিসে ছেড়ে দিলে আজ—তাই এলাম। যাবো আর কোথায়? আপনার দরজায় দুটো ক'রে খাই। তা ছেড়ে আর কোথায় যাবো বলুন?

বেচু চক্কত্তি কোনো উত্তর দিবার আগেই পদ্ম ঝি আগাইয়া আসিয়া বেচু চক্কত্তিকে বলিল —ওকে আর একদণ্ড এখানে থাকতে দিও না কর্ত্তাবাবু—এখুনি বিদেয় করো। বাসন ও আর মতি যোগসাজসে নিয়েচে। পাকা চোর, পুলিসে কি করবে ওদের?

হাজারি এবার রাগিল। পদ্ম ঝিকে কখনও সে এ সুরে কথা বলে নাই। বলিল—তুমি দেখেছিলে বাসন নিতে পদ্ম দিদি?

পদ্ম ঝি বলিল—তোমার ও চোখ-রাঙানির ধার ধারে না পদ্ম, তা বলে দিচ্ছি হাজারি ঠাকুর। অমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না—বাসন তোমাকে নিতে দেখলে হাতের দড়ি তোমার খুলতো না তা জেনে রেখো।

হাজারি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে ততক্ষণ। নীচু হওয়াই তাহার অভ্যাস—যাহারা

বড়, তাহাদের কাছে আজীবন সে ছোট হইয়াই আসিতেছে—আজ চড়া গলায় তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সাহস তাহার আসিবে কোথা হইতে?

সেরকম সুরে বলিল—না না, রাগ করচো কেন পদ্ম দিদি—আমি এমনিই বলচি, বাসন নিতে যখন তুমি ছাখোনি—তখন আমি গরীব বামুন, তোমাদের দোরে দুটো ক'রে খাই—কেন আর আমাকে—

এইবার বেচু চক্কত্তি কথা বলিলেন।

একটু নরম সুরে বলিলেন—যাক্, যাক্, কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। আমার বাসন তাতে ফিরবে না। দুজনেই থামো। তারপর তুমি বলচ কি এখন হাজারি?

—বলচি, কর্ত্তা, আমায় যেমন পায়ে রেখেছিলেন, তেমনি পায়ে রাখুন। নইলে না খেয়ে মারা যাবো। বাবু, চোর আমি নই, চোর যদি হতাম, আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম না আর।

পদ্ম ঝি বলিল—চোর কিনা সে কথায় দরকার নেই—কিন্তু তোমার এখানে জায়গা আর হবে না। তা হোলে খদ্দের চলে যাবে।

বেচু বলিলেন—তা ঠিক।—খদ্দের চলে গেলে হোটেল চালাবো কি ক'রে আমি? হাজারি এ যুক্তির অর্থ বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ঠাকুর চোর হইলে সে না হয় হোটেলের জিনিস চুরি করিতে পারে, কিন্তু খরিদ্দারদের গায়ের শাল খুলিয়া বা তাহাদের পকেট মারিয়া লইতেছে না তো—তবে খরিদ্দারের আসিতে আপত্তি কি?

কিন্তু হাজারি এ প্রশ্ন উঠাইতে পারিল না। তাহার জবাব হইয়া গেল। সে কিছু খাইয়াছে কি না এ কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে সে বলিল—তা হোলে আমার মাইনেটা দিয়ে দিন বাবু, দু'মাসের তো বাকী পড়ে রয়েচে, হাওলাত নেই কিছু। খাতা দেখুন।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—সে এখন হবে না, এর পরে এসো।

পদ্ম একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলে। সে বলিল—ওর আশা ছেড়ে দাও, মাইনে পাবে না।

—কেন পাব না?

পদ্ম ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল—সে তক্কো তোমার সঙ্গে করবার সময় নেই এখন। পাবে না মিটে গেল। নালিশ করো গিয়ে—আদালত তো খোলা রয়েচে।

হাজারি চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

বেচু চক্কত্তির দিকে চাহিয়া বিনীত সুরে বলিল—কর্ত্তামশায়, আজ আপনার দোরে ছ'বছর খাটচি। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই—বাড়ীতে দুমাস খরচ পাঠাতে পারিনি, বাড়ী যাবার রেলভাড়া পর্য্যন্ত আমার হাতে নেই—আমায় কিছু না দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

বেচু চক্কত্তি দ্বিরুক্তি না করিয়া ক্যাশবাক্স খুলিয়া একটি আধুলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—

—ওই নিয়ে যাও। এখানে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না—খদ্দের আসতে আরম্ভ করচে, বাইরে যাও গিয়ে—

হাজারি আধুলিটা কুড়াইয়া লইয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিল। তারপর হাত জোড় করিয়া মাজা হইতে শরীরটা খানিকটা নোয়াইয়া বেচু চক্কত্তিকে প্রণাম করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁচুমাচু হইয়া বলিল, তাহোলে বাবু, মাইনের জন্যে কবে আসবো?

—এসো—এসো এর পরে যখন হয়। সে এখন দেখা যাবে—

ইহা যে অত্যন্ত ছেঁদো কথা হাজারির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বরং পদ্ম ঝি যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। মাহিনা ইহারা তাহাকে দিবে না। তাহার মাথায় আসিল একবার শেষ চেষ্টা করিবে। মরীয়ার শেষ চেষ্টা। বেচু চক্কত্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে পিছন দিয়া হোটেলের রান্নাঘরে আসিল। সেখানে পদ্ম ঝি একটু পরে আসিতেই সে হাত জোড় করিয়া বলিল—পদ্মদিদি, গরীব বামুন—চাকুরি করচি এতকাল, একখানা রেকাবী কোন দিন চুরি করিনি। আমি বড় গরীব। তুমি একটু বলে কর্তামশাইকে আমার মাইনের ব্যবস্থা করে দেও—নইলে বাড়ীতে ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। এই আধুলিটা সম্বল, দোহাই বলছি রাধাবল্লভের—এতে আমি কি খাবো, আর রেলভাড়া কি দেবো, বাড়ীর জন্মেই বা কি নিয়ে যাবো।

—আমি হোটেলের মালিক নই যে তোমায় টাকা দেবো। কর্তামশায় যা বলেচেন তার ওপর আমার কি কথা আছে?

—দয়া করে পদ্মদিদি তুমি একবার বলো ওঁকে। না খেয়ে মারা যাবে ছেলেপিলে।

—কেন তোমার পেয়ারের কুসুমের কাছে যাও না, পদ্মদিদিকে কি দরকার এর বেলা?

হাজারির ইচ্ছা হইল আর একদণ্ডও সে এখানে দাঁড়াইবে না। সে চায় না যে এই সব জায়গায় যার-তার মুখে কুসুমের নাম উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ পদ্ম ঝিয়ের মুখে। সে চুপ করিয়া রহিল। পদ্ম রান্নাঘর হইতে চলিয়া গেল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া সে চলিয়াই যাইতেছিল, পদ্ম ঝি আসিয়া বলিল—যাচ্ছ যে? খাওয়া হয়েছে তোমার?

হাজারি অবাক হইয়া পদ্ম ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল। কখনো সে এমন কথা তাহার মুখে শোনে নাই। আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল—না—খাওয়া—ইয়ে—না হয় নি এখনো।

—তা হোলে বোসো। এখনও মাছটা নামে নি। মাছ নামলে ভাত খেয়ে তবে যাও। দাঁড়িয়ে কেন? বসো না পিঁড়ি একখানা পেতে।

হাজারি কলের পুতুলের মত বসিল। পদ্মদিদি তাহাকে অবাক্ করিয়া দিয়াছে! পদ্মদিদির দরদ!.........সাত বছরের মধ্যে একদিনও যা দেখে নাই!............আশ্চর্য্য কাণ্ডই বটে!

মাছ নামিলে নতুন ঠাকুর হাজারিকে ভাত বাড়িয়া দিল। পদ্ম ঝিকে আর এদিকে দেখা গেল না—সে এখন খরিদ্দারদের খাওয়ার ঘরে ব্যস্ত আছে। নতুন ঠাকুর যদিও হাজারিকে চেনে না তবুও ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, হাজারি হোটেলের পুরোনো ঠাকুর—চাকুরিতে জবাব হইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে হাজারিকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইল।

যাইবার সময় হাজারি পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—পদ্মদিদি, চললাম তবে। কিছু মনে কোরো না।

পদ্ম ঝি দোরের কাছে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ দাঁড়াও ঠাকুর। এই দুটো টাকা রাখো, কর্তামশায় দিয়েচেন মাইনের দরুন। এই শেষ কিন্তু—আর কিছু পাবে না ব'লে দিলেন তিনি।

হাজারি টাকা দুইটি লইয়া আগের আধুলিটির সঙ্গে চাদরের খুঁটে রাখিল কিন্তু সে খুব অবাক্ হইয়া গিয়াছে—সত্যই অবাক্ হইয়া গিয়াছে।

—আচ্ছা, তবে আসি।

—এসো। খাওয়া হয়েচে তো? আচ্ছা।

রাত সাড়ে ন'টার কম নয়।

এত রাত্রে সে কোথায় যায়!

চাকুরি গেল। তবুও হাতে আড়াইটা টাকা আছে।

বাড়ী যাইয়া কি হইবে? চাকুরি খুঁজিতে হইবেই তাহাকে। বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চাকুরি চলিয়া যাইবে—একথা হাজারি ভাবে নাই। সত্য সত্যই চাকুরি গেল শেষকালে!

সে জানে রাণাঘাটে কোনো হোটেলে তাহার চাকুরি আর হইবে না। যদু বাঁড়ুয্যে একবার তাহাকে হোটেলে লইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সে চুরির অপবাদে হাজত বাস করিয়া আসিয়াছে, কেহই তাহাকে চাকুরি দিবে না।

হাজারি দেখিল সে নিজের অজ্ঞাতসারে চূর্ণী নদীর ধারে চলিয়াছে—তাহার সেই প্রিয় গাছতলাটিতে গিয়া বসিবে—বসিয়া ভাবিবে। ভাবিবার অনেক কিছু আছে।

কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা নদীর ধারে বসিয়া থাকিয়াও ভাবনার কোনো মীমাংসা হইল না। আজ রাত্রে অবশ্য স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে শুইয়া থাকিবে—কিন্তু কাল যায় কোথায়?

আড়াই টাকার মধ্যে দুটি টাকা বাড়ী পাঠাইতে হইবে। টেঁপি—টেঁপির মুখে হয়তো তাহার মা দুটি ভাত দিতে পারিতেছে না।

এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য।

না—কালই টাকা দুটি পাঠাইবে তাকে। মনি অর্ডার ফি দিবে আধুলিটা হইতে। পুরো দু'টাকা বাড়ী যাওয়া চাই।

স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে শেষ রাত্রের দিকে সামান্য ঘুম হইল। ফরিদপুর লোকালের শব্দে খুব

ভোরে ঘুম গেল ভাঙিয়া। তবুও সে শুইয়াই রহিল। আজ আর তাড়াতাড়ি বড় উহুনে ডেক্‌চি চাপাইতে হইবে না—উঠিয়া কি হইবে?

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে শুইয়াই রহিল। ডাউন দার্জ্জিলিং মেল আসিল, চলিয়া গেল। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ছাড়িল। রোদ উঠিয়াছে, প্ল্যাট্‌ফর্ম ঝাঁট দিতে আসিয়াছে ঝাড়ুদার। আর একখানা গাড়ীর ডাউন দিয়াছে আড়ংঘাটার দিকে। মুর্শিদাবাদ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার।

—এই কোন্ নিদ্ যাতা রে, এই উঠো—হঠ্ যাও—ঝাড়ুদার হাঁকিল। হাজারি উঠিয়া হাই তুলিয়া কলে গিয়া হাতমুখ ধুইল।

সে কোথায় যায়—কি করে? গত ছ'সাত বছরের মধ্যে এমন নিষ্ক্রিয় জীবন সে কখনো যাপন করে নাই—কাজ, কাজ, উহুনে ডেক্‌চি চাপাও, কর্ত্তামশায়ের চায়ের জল গরম কর আগে, বাজারে আজ কার পালা? হৈ চৈ—ঝাড়া বকুনি—পদ্ম ঝিয়ের চেঁচামেচি······

বেশ ছিল। পদ্ম ঝিয়ের বকুনিও যেন এখন সুমিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। পদ্ম খারাপ লোক নয়—কাল রাত্রে খাইতে বলিয়াছিল, টাকা দিয়াছে। রতন ঠাকুরও বড় ভাল লোক। তাহার সেই ভাগিনেয়টিও বড় ভাল। সবাই ভাল লোক। রতনের সেই ভাগিনেয় তাহার টেঁপির উপযুক্ত বর। দুজনে সুন্দর মানাইত। ছেলেটিকে বড় পছন্দ হইয়াছিল। আকাশকুসুম। মিথ্যা আশা, টেঁপিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে তার বিয়ে।

গত ছ'বছরে হাজারির একটা বড় কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে—সকালে বিকালে চা খাওয়া।

এখন চা খাইতে হইবে পয়সা খরচ করিয়া—সেজন্য হাজারি চা খাওয়ার ইচ্ছাকে দমন করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত আবশ্যক। আজ সাত আট দিন কুসুমের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। চুরির জন্য হাজতে যাওয়ার সংবাদ বোধ হয় কুসুম শোনে নাই—কে তাহাকে সে খবর দিয়াছে? চা ওখানেই খাওয়া চলিতে পারে। কুসুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও করা দরকার। তাহার নিজের মাথায় কিছুই আসিতেছে না।

কুসুম কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আপনি জ্যাঠামশায়? এমন অসময় যে! এতদিন আসেন নি কেন?

—চলো, ভেতরে বসি। অনেক কথা আছে।

কুসুম ঘরের মেঝেতে শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। হাজারি বসিয়া বলিল—মা কুসুম, একটু চা খাওয়াবে।

—এখুনি করে দিচ্ছি জ্যাঠামশায়, একটু বসুন আপনি।

চা শুধু নয়—চায়ের সঙ্গে আসিল একখানা রেকাবিতে খানিকটা হালুয়া। হাজারি চা

খাইতে খাইতে বলিল—কুসুম মা, আমার চাকরি গিয়েচে।

কুসুম বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

—চুরি করেছিলাম বলে।

—চুরি করেছিলেন!

—ওরা তাই বলে। পাঁচ-ছ'দিন হাজতে ছিলাম।

—হাজতে ছিলেন! হ্যাঁ! মিথ্যে কথা।

কুসুম দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারির সামনে মাটির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কৌতূহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—না কুসুম, মিথ্যে নয়, সত্যিই হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হিসেবে।

—হাজতে থাকতে পারেন জ্যাঠামশায়—কিন্তু চুরি আপনি করেন নি—ক'রতে পারেন না। সেইটেই মিথ্যে কথা, তাই বলচি।

—আমি চুরি করতে পারি নে?

—কক্ষনো না জ্যাঠামশায়। আপনাকে আমি জানি নে? চিনি নে?

—তোমার মা, এত বিশ্বাস আছে আমার ওপর!

কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে কান্না চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

হাজারি বাঁচিল। কুসুম সত্যই তার মেয়ে বটে। তাহার বড় ভয় ছিল কুসুম জিনিসটা কি ভাবে লইবে। যদি বিশ্বাস করিয়া বসে যে সত্যিই সে চোর! জগতে তাহা হইলে হাজারির একটা অবলম্বন চলিয়া গেল।

—আপনি এখন কোথা থেকে আসচেন জ্যাঠামশায়?

—কাল রাত্রে স্টেশনে শুয়ে ছিলাম—যাবো আর কোথায়? সেখান থেকে উঠে আসচি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করাটা দরকার মা, হয়তো আবার কতদিন—

—কেন, আপনি যাবেন কোথায়?

—একটা কিছু ছিল্লে লাগাতে তো হবে—বসে থাকলে চলবে না বুঝতেই পারো। দেখি কি করা যায়।

—এখানে আর কোনো হোটেলে—

—চুরির অপবাদ রটেচে যখন, তখন এখানকার কোনো হোটেলে নেবে না। দেখি, একবার ভাবচি গোয়াড়ি যাই না হয়—সেখানে অনেক হোটেল আছে, খুঁজে দেখি সেখানে।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছা, সে যা হয় হবে এখন। আপাতোক্ আপনি নেয়ে আসুন, তেল এনে দিই। তারপর রান্নার যোগাড় ক'রে দিচ্চি, এখানে দু'টি ভাতেভাত চড়িয়ে খান।

—না মা, ওসব হাঙ্গামে আর দরকার নেই—থাক্, খাওয়ার জন্যে কি হয়েচে—আমি

তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই ব'সে। ভাবলাম কুসুমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি গিয়ে, তাই এলাম। একটা বুদ্ধি দাও তো মা খুঁজে—একার বুদ্ধিতে কুলোয় না—তারপর বুড়োও হয়ে পড়েচি তো!

কুসুম হাসিয়া বলিল—পরামর্শ হবে এখন। না যদি খান, তবে আমিও আজ সারাদিন দাঁতে কুটো কাটবো না বলে দিচ্চি কিন্তু জ্যাঠামশায়। ওসব শুনবো না—আগে নেয়ে আসুন—তারপর ভাত চাপান, আমিও আপনার প্রসাদ দু'টি পাই। মেয়ের বাড়ী এসেচেন, যতই গরীব হই, আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেচেন বুঝি—ভারি টান তো মেয়ের ওপর?

অগত্যা হাজারি চূর্ণীর ঘাটে স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া দেখিল গোয়ালঘরের এক কোণ ইতিমধ্যে কুসুম কখন লেপিয়া পুঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া ইট দিয়া উনুন পাতিয়া ফেলিয়াছে।

একটা পেতলের মাজা বোগনো দেখাইয়া বলিল, এতেই হবে জ্যাঠামশায়, না নতুন হাঁড়ি কাড়বেন?

—না নতুন হাঁড়ির দরকার নেই। ওতেই বেশ হবে এখন।

ভাত নামিবার কিছু পূর্ব্বে একটি ছেলে গোয়ালঘরের দোরে আসিয়া উঁকি মারিয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে বাহিরে ডাকিল। হাজারি দেখিল, তাহার হাতে একখানা গামছায় বাঁধা হাটবাজার—অন্য হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ঝোলানো।

—একটুখানি দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, মাছ কুটে আনি।

হাজারি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিল কুসুমের কাণ্ড দেখিয়া। পাশের বাড়ীর ছেলেটিকে ডাকিয়া কুসুম কখন বাজার করিতে দিয়াছে থাক্ দিয়াছে দিয়াছে—কুসুম গরীব মানুষ, এত বড় মাছ কিনিতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? নাঃ, বড় ছেলেমানুষ এখনও। এদের জ্ঞানকাণ্ড আর হবে কবে?

কুসুম হাজারির তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না। মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনার রান্না ইলিশ মাছ একদিন খেতে যদি সাধ হয়ে থাকে তবে মেয়েকে অমন করে বকতে নেই জ্যাঠামশায়!

হাজারি অপ্রসন্নমুখে বলিল—নাঃ, যতো সব ছেলেমানুষের ব্যাপার!

আহারাদির পর হাজারির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুসুম খাইতে গেল। গত রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই—ইতিমধ্যে হাজারি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রায় বিকাল হইয়া গিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কাল ঘুম হয় নি মোটেই ইষ্টিশানের বেঞ্চিতে শুয়ে—তা বুঝতে পেরেচি। ঘুমিয়েচেন ভাল তো? চা ক'রে আনি, উঠে মুখ ধুয়ে নিন।

চায়ের সঙ্গে কোথা হইতে কুসুম গরম জিলিপি আনাইয়া দিল। বলিলেও শোনে না, বলিল—এই তো ওই মোড়ে হারান ময়রার দোকানে এ সময় বেশ গরম জিলিপি ভাজে, চায়ের সঙ্গে বেশ লাগবে—শুধু চা খাবেন?

ইহার উপর আর কত অত্যাচার করা চলিতে পারে। আজই এখান হইতে সরিয়া না পড়িলে উপায় নাই। হাজারি ঠিক করিল চা খাইয়া আর একটু বেলা গেলেই এখান হইতে রওনা হইবে।

কুসুম পান সাজিয়া আনিয়া হাজারির সামনে মেঝেতে বসিল।—তারপর এখন কি করবেন ভেবেচেন ?

—ওই তো বল্লাম গোয়াড়ি গিয়ে চাকরির চেষ্টা করি।

—যদি সেখানে না পান ?

—তবে কলকাতা যাবো। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতায় যাতায়াত অভ্যাস নেই—অত বড় শহরে থাকাও অভ্যাস নেই—ভয় করে।

—আমার একটা কথা শুনবেন জ্যাঠামশায় ?

—কি ?

—শোনেন তো বলি।

—বল না মা কি বলবে ?

—আমার সেই গহনা বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি ক'রে আপনাকে দু'শো টাকা এনে দিই। আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রান্নার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পসার জমে—এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কত্তির হোটেলের পাশেই খুলুন। পদ্ম চোখ টাটিয়ে মরুক। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায়—আপনার উন্নতি হবে—কোথায় যাবেন এ বয়সে পরের চাকরি করতে।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কি চমৎকার, এই অদ্ভুত মেয়ে কুসুম! মেয়েই বটে তাহার। কিন্তু তাহা হইবার নয়—নানা কারণে। কুসুমের টাকায় রাণাঘাটে হোটেল খুলিলে পাঁচজন পাঁচরকম বদনাম রটাইবে উভয়ের নামে। তাহার উপকার করিয়া নিরপরাধিনী কুসুম কলঙ্ক কুড়াইতে গেল কেন ? ওই পদ্ম ঝি-ই সাতরকম রটাইয়া বেড়াইবে গাত্রদাহের জ্বালায়।

তা ছাড়া যদি লোকসানই হয়, ধরো—(যদিও হাজারির দৃঢ় বিশ্বাস সে হোটেল খুলিলে লোকসান হইবে না) তাহা হইলে কুসুমের টাকাগুলি মারা পড়িবে। না, তার দরকার নাই।

—মা কুসুম, একবার তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার ও টাকা নেওয়া হবে না। আবার কেন সে কথা ? আমাকে এই গাড়ীতে গোয়াড়ি যেতে হবে, উঠি!

কুসুম গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা, কথা দিয়ে যান যদি গোয়াড়িতে চাকুরি না জোটাতে পারেন তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন ?

—তোমার কাছে মা ? কেন বলো তো ?

—এসে ওই টাকা নিতে হবে। হোটেল খুলতে হবে। ও টাকা আপনার হোটেলের জন্যে তোলা আছে। শুধু আপনার ভালোর জন্যেই বলচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমার স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু'পয়সা আমিও

পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বা?

হাজারি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা কথা দিয়ে গেলাম। তবে আসি মা আজ। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।

—মনে রাখবেন মেয়ের কথা।

—তুমিও মনে রেখো তোমার বুড়ো জ্যাঠামশায়ের কথা—

—ইস্! আমার জ্যাঠামশায় বুড়ো বৈকি?

—না, ছ'চল্লিশ বছর বয়েস হয়েচে—বুড়ো নয় তো কি?

—দেখায় না তো বুড়োর মত। বয়েস হলেই হোলো? আসবেন আবার কিন্তু তা হোলে।

—আচ্ছা মা।

হাজারি পুঁটুলি লইয়া বাটির বাহির হইল। কুসুম তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

রাণাঘাট হইতে বাহির হইয়া হাজারি হাঁটাপথে চাকদার দিকে রওনা হইল। প্রথমে ডাকঘর হইতে বাড়ীতে দু'টি টাকা মনিঅর্ডার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু ডাকঘরে গিয়া দেখিল মনিঅর্ডার নেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাকঘর খোলা না থাকার জন্য পরে হাজারি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। চাকদা যাইবার মাঝপথে সেগুন-বাগানের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল। একটা সেগুন গাছের তলায় দু'খানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজন নামিয়া গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। হাজারি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সম্মুখের পূর্ণিমায় কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নানের মেলা উপলক্ষ্যে উহারা মেলায় দোকান করিতে যাইতেছে। হাজারি তাহাদের সঙ্গ লইল।

রাত্রে আহারাদির পরে সবাই গাছতলায় শুইয়া রাত্রি কাটাইল—দোকানের মালিকের নাম প্রিয়নাথ ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, মনোহা'র দোকান লইয়া ইহারা মেলায় যাইতেছে। হাজারির পরিচয় পাইয়া ধর মহাশয় প্রস্তাব করিল মেলায় কয়দিন তাহারা কেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে এই কয়দিন হাজারি যদি রান্না করিয়া সকলকে খাওয়ায়—তবে সে দৈনিক খোরাকি ও মেলা অন্তে কয়দিনের মজুরি স্বরূপ দুই টাকা পাইবে।

প্রিয়নাথ ধরের দোকান তিনখানি—একখানি তার নিজের, অপর দুইখানি তাহার জামাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের। কম মাহিনায় যে ওস্তাদ রাঁধুনী পাইয়াছে, হাজারির প্রথম দিনের রন্ধনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। সকলেই খুব খুশি।

মেলায় পৌঁছিয়া কিন্তু হাজারি দেখিল, রান্নার চেয়েও অধিকতর লাভের একটি ব্যবসা এই মেলাতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া তেলে-ভাজা কচুরি সিঙ্গাড়ার দোকান খুলিয়া বসিল ধর মহাশয়দের বাসার একপাশে। বিনামূল্যে কচুরি খাইবার লোভে ধর মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না।

কয়দিন দোকানে অসম্ভব রকমের বিক্রি হইল। মূলধন ছিল আগের সেই দুই টাকা—শেষে খরিদ্দারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে হাজারি ধর মহাশয়ের তহবিল হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইল।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট উঠানো হইল। মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধর মহাশয়ের তহবিলের দেনা শোধ করিয়া ও সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়া হাজারি দেখিল সাড়ে তেরো টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ধর মহাশয়ের রান্নার মজুরি দুই টাকা লইয়া মোট হইল সাড়ে পনের টাকা।

প্রিয়নাথ ধর বলিলেন—ঠাকুর মশায়, আপনার রান্না যে এত চমৎকার, তা যখন আপনাকে সেগুনবাগানে প্রথম কাজে লাগালুম, তখন ভাবি নি। আমি বড়লোক নই, বাড়ীতে মেয়েরাই রাঁধে, না হোলে আপনাকে আমি ছাড়তুম না কিছুতেই।

বাড়ীতে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাজারির মন খানিকটা সুস্থ হইল। এখন সংসারের ভাবনা সম্বন্ধে মাসখানেকের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে। এই এক মাসের মধ্যে নতুন কিছু অবশ্যই জুটিয়া যাইবে।

কালীগঞ্জ হইতে যশোর যাইবার পাকা রাস্তা বাহিয়া হাজারি আবার পথ চলিল। এই পথের দুধারে বনজঙ্গল বড় বেশী—পূর্ব্বে গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাওয়াতে অনাবাদী মাঠ ও বিধ্বস্ত পুরাতন গ্রামগুলি বনে-জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলা কালীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়াছে, যখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়-হয়, তখন একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের ছায়ায় সে আশ্রয় লইল। অল্প দূরে একখানা ক্ষুদ্র চাষাদের গ্রাম। একটি ছোট ছেলে গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল গ্রামখানার নাম নতুন পাড়া। বেশীর ভাগ গোয়ালাদের বাস।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমেই যে খড়ের বড় আটচালা ঘরখানা দেখিল তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক কাহাকেও দেখিল না। একদিকে বড় গোয়াল, অনেকগুলি বলদ গরু বিচালির জাব খাইতেছে।

একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। হাজারি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—খুকী শোনো—বাড়ীতে কে আছে? মেয়েটি ভয় পাইয়া কোনো উত্তর না দিয়াই বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে বাড়ীর মালিক আসিল। তাহার নাম শ্রীচরণ ঘোষ। হাজারিকে সে খুব খাতির করিয়া বসাইল, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাং রান্না-খাওয়া করিতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা জলচৌকি ও এক বালতি জল আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল।

ইহারাও গোয়ালঘরের একপাশে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। সেখানে বসিয়া

রাঁধিতে রাঁধিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কুসুমের কথা। কুসুমও তাহাকে সেদিন গোয়াল-ঘরেই রাঁধিবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল—কুসুমও গোয়ালার মেয়ে।

বোধ হয় সেই জন্যই—ইহারা গোয়ালা শুনিয়াই—হাজারি ইহাদের বাড়ী আসিয়াছিল—মনের মধ্যের কোন গোপন আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। হঠাৎ সে আশ্চর্য্য হইয়া গোয়ালঘরের দরজার দিকে চাহিল।

একটি অল্পবয়সী বৌ আধঘোমটা দিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিয়া এক চুব্‌ড়ি শাক লইয়া লাজুক ভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। শাকগুলি সদ্য জল হইতে ধুইয়া আনা—চুব্‌ড়ি দিয়া জল ঝরিয়া গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—এস মা এস—কি ওতে?

বউটি লাজুক মুখে একটু হাসিয়া বলিল—চাঁপানটে শাক। এখানে রাখি?

বউটি কুসুমের অপেক্ষাও বয়সে ছোট। হঠাৎ একটা অকারণ স্নেহে হাজারির মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল—রাখো মা রাখো—

খানিকটা পরে বউটি আবার ঘরের মধ্যে গোটাকতক কাঁঠাল-বীচি লইয়া ঢুকিল। এবার সে যেন অনেকটা নিঃসঙ্কোচ, পিতার বয়সী এই শান্ত, প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের নিকট সঙ্কোচ করিতে তাহার বাধিতেছিল হয়তো।

হাজারিকে বলিল—কাঁঠাল-বীচি খান?

—খাই মা, কিন্তু ওগুলো কুটে দেবে? আমি ডাল চড়িয়েচি, আবার কুটি কখন?

বউটি এক পাথরের বাটিতে কাঁঠাল-বীচি আনিয়াছিল। বাটিটা নামাইয়া ছুটিয়া গিয়া একখানা বঁটি লইয়া আসিল এবং বীচিগুলি কুটিতে আরম্ভ করিল। হাজারির মন তৃষিত ছিল, ইহারা সবাই মেয়ের মত, সবাই ভালবাসে, সেবা করে, মনের দুঃখ বোঝে।

হাজারি কোন কথা বলিবার আগেই বউটি বলিল—আপনার গাঁয়ে আমি কত গিইচি।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—আমার গাঁ কোথায় তুমি কি ক'রে জানলে? তুমি সেখানে কি ক'রে গেলে?

—গঙ্গাধর ঘোষ আমার পিসেমশাই—

—ওহো—তুমি জীবনের ভাইঝি! তা হলে কুসুমকে তো চেনো—

—কুসুমদিদিকে তার বিয়ের আগে অনেকবার দেখেচি, বিয়ের পরে আর কখনও দেখি নি। সে আজকাল কোথায় থাকে জানেন নাকি?

—সে থাকে রাণাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। তবে তোমাকে মা বলে খুব ভাল করেচি, কুসুম আমার মেয়ে!

বউটি বীচি কোটা বন্ধ রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর হইতেই প্রণাম করিল।

—এসো মা চিরজীবী হও, সাবিত্রী সমান হও।

বউটি হাসিয়া বলিল—আপনি যখন উঠোনে দাঁড়িয়ে, তখনই আপনাকে দেখে আমি

চিনেছি। আমি শাশুড়ীকে গিয়ে বল্লাম আমার পিসিমার গাঁয়ের মানুষ উনি—তখন শাশুড়ী গিয়ে শ্বশুরকে জানালেন।

—বেশ মা বেশ। আসবো যাবো, আমার আর একটি মেয়ে হোল, তার সঙ্গে দেখাশুনা করে যাবো। ভালই হোল।

বউটি সলজ্জভাবে বলিল—আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দেবো না—থাকতে হবে এখন এখানে—

—না মা, আমার থাকা হবে না।

—না তা হবে না। যান দিকি কেমন করে যাবেন? আমি জোর করতে পারিনে বুঝি?

—অবিশ্যি পারো মা, কিন্তু আমার মনে শান্তি নেই, আবার সুদিন পেলে এসে দু'দিন থেকে যাবো—

বউটি হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন, কি হয়েচে আপনার?

হাজারির স্বভাবদুর্বল মন, সহানুভূতির গন্ধ পাইয়া গলিয়া গেল। সে তাহার চাকুরি যাওয়ার আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গেল—ডাল নামাইয়া চচ্চড়ি রাঁধিবার ফাঁকে ফাঁকে। একটু গর্ব করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না।

—রান্না যা করতে পারি মা, তোমার কাছে গোমর করে বলচি নে, অমন রান্না রাণাঘাটের কোনো হোটেলে কোনো বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে না। হয় না হয় মা এই তোমাদের এখানে এই যে চচ্চড়ি রাঁধচি, তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেখাবো; আমি জোর করে বলতে পারি এরকম চচ্চড়ি কখনও খাও নি, আর কখনও খাবে না।

বউটি বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে হাজারির দিকে চাহিয়া কথা শুনিতেছিল। বলিল—তা হোলে আমায় শিখিয়ে দিতে হবে খুড়োমশাই—

—একদিনের কর্ম্ম নয় সে। শেখালেও শিখতে পারা কঠিন হবে—তোমায় ফাঁকি দেওয়া আমার ইচ্ছে নয় মা। এ শেখা এক আধ দিনে হয় কখনো?

—তা আপনি যদি অমন রাঁধুনী, আপনার আবার চাকরির ভাবনা কি? কত বড়লোকের বাড়ী ভাল মাইনে দিয়ে রাখবে—

—অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় মা, কিছুতেই কিছু হয় না। হাতে টাকা থাকে দু'দিন চেষ্টা-চরিত্তির করে বেড়াতে পারি। বেড়াবো কি, রেস্ত ফুরিয়ে এসেচে কি না!

—ক'টাকা লাগবে বলুন।

—কেন, তুমি দেবে নাকি?

—যদি দিই?

—সে আমি নিতে পারি নে। কুসুম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আমি নেবো কেন? তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুলি পুঁজি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চাই নে।

—আচ্ছা, আপনাকে যদি টাকা ধার দিই? আপনাকে বলি শুনুন খুড়োমশায়। আমার মার কাছ থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম। এখানে রাখবার জো নেই। একটা কথা বলবো?

এদিক ওদিক চাহিয়া সুর নীচু করিয়া বলিল—ননদ আর জা ভাল লোক নয়। এখুনি যদি টের পায় নিয়ে নেবে। আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন?

এই কুসীদ-লোভী সরলা মেয়েটির প্রতি হাজারির প্রৌঢ় মন করুণায় ও মমতায় গলিয়া গেল। সে আরও খানিক মজা দেখিতে চাহিল।

—এমনি টাকা দেবে মা? আমায় বিশ্বাস কি?

—তা বিশ্বাস না করলে কি এ কারবার চলে? আর আপনি তো চেনা লোক। আপনার গাঁ চিনি, বাড়ী চিনি।

—চিনলেই হোল? একটা লেখাপড়া করে নেবে না? কত টাকা দিতে চাও?

—আমার কাছে আছে আশি টাকা। সবই দিতে পারি আপনি যদি নেন। সুদ কত দেবেন?

—কত করে চাও?

—আপনি যা দেবেন। টাকায় দুপয়সা করে রেট্, আপনি এক পয়সা দেবেন, কেমন তো? আপনার পায়ে পড়ি খুড়োমশায়, টাকাগুলো আলাদা আমার তোরঙ্গতে তোলা আছে। কেউ জানে না। আপনাকে এনে দিই, টাকাগুলো খাটিয়ে দিন আমার। কাকে বিশ্বাস করে দেবো, কে নিয়ে আর দেবে না।

—কই, লেখাপড়ার কথা বল্লে না তো?

—আমি লেখাপড়া জানি নে—কি লেখাপড়া করে নেবো। আপনি চান একটা কিছু লিখে দিয়ে যান। কিন্তু তাতে লোক-জানাজানি হবে। সে কাজের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান। আমি দিচ্ছি মিটে গেল। এর আর লেখাপড়া কি?

ইতিমধ্যে রান্নাবান্না শেষ হইয়া গেল। বউটি একবাটি দুধ আনিয়া বলিল—এই উনুনটা পেড়ে দুধটুকু জ্বাল দিয়ে খেতে বসুন—বেলা কি কম হয়েচে?

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। হাজারির কথা মিথ্যা নয়—গোয়ালাবাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, এরকম রান্না খাওয়া তো দূরের কথা, সামান্য জিনিস যে খাইতে এমনধারা হয় তাহা শোনেও নাই।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া হাজারি যাইবার জন্য তৈরী হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল আর একবার বউটির সঙ্গে দেখা করে। পল্লীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পর্দা নাই সে জানে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য জাতির মেয়েদের মধ্যে। মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল উহার সরলতার জন্য এবং বোধ হয় টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথাটা আর একবার বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ইতিমধ্যে একটা মতলব মাথায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

কুসুম এবং এই মেয়েটি যদি তাহাকে টাকা দেয় তবে সে তাহার চিরদিনের স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলতে পারিবে। ইহাদের টাকা সে নষ্ট করিবে না—বরং অনেক গুণ বাড়াইয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। খাইতে বসিয়া হাজারি এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে।

ইহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হইলে একটা পুকুরের ধার দিয়া যাইতে হয়—একটা বড় তেঁতুল গাছ এবং তাহার চারিপাশে অন্যান্য বন্য গাছের ঝোপ জায়গাটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে বাহির হইতে হঠাৎ সেখানে কেহ থাকিলে তাহাকে দেখা যায় না।

পুকুরের পাড় ছাড়াইয়া হাজারি হঠাৎ দেখিল মেয়েটি তেঁতুলতলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে যেন তাহারই অপেক্ষায়।

—চল্লেন খুড়োমশায় ?

—হ্যাঁ যাই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ?

—আপনি এই পথ দিয়ে যাবেন জানি, তাই দাঁড়িয়ে আছি। দুটো কথা আপনাকে বলবো। আপনার হাতের রান্না চচ্চড়ি খেয়ে ভাল লেগেছে খুড়োমশায়। আমরাও তো রাঁধি, রান্নার ভাল মন্দ বুঝি। অমন রান্না কখনো খাই নি। আর একটা কথা হচ্ছে আমার টাকাটার কথা মনে আছে তো ? কি করলেন তার ? জানেন তো মেয়েরা শ্বশুরবাড়ীর লোকদের চেয়ে বাপের বাড়ীর লোকদের বেশী বিশ্বাস করে ? এদের হাতে ও টাকা পড়লে দুদিনে উড়ে যাবে।

—টাকা তোমার এখুনি নিতে পারবো না মা। কিন্তু আবার আমি এই পথে আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন হয়তো টাকার দরকার হবে, টাকা তখন হয়তো নিতে হবে।

—কত দিনের মধ্যে আসবেন ?

—তা বলতে পারিনে, ধর মাস দুই। পূজোর পরে কার্ত্তিক-অঘ্রাণ মাসের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—কথা রইল তা হোলে ?

—ঠিক রইল। এসো এসো, লক্ষ্মী ছোট্ট মা আমার—সাবিত্রী সমান হও, আশীর্ব্বাদ করি তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হাজারি আবার পথ চলিতে লাগিল। গোয়ালাবাড়ীর সবাই এবেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, বউটি তো বিশেষ করিয়া। কিন্তু থাকিবার উপায় নাই, একটা কিছু যোগাড় না করা পর্য্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই।

মেয়েটি খুব আশ্চর্য্য ধরণের বটে। নির্ব্বোধ হয় তো—কুসুমের মত বুদ্ধিমতী নয় ঠিকই, তবুও বড় ভাল মেয়ে।

পথের দুধারে বনজঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে—পথ নদীয়া জেলা হইতে যত যশোর

জেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেছে এই বন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। স্থানে স্থানে বনজঙ্গল এত ঘন যে হাজারির ভয় করিতে লাগিল দিনমানেই বুঝি বাঘের হাতে পড়িতে হয়। লোকের বসতি এসব স্থানে বেশী নাই, ভয় করিবারই কথা।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেলের বাজারে আসিয়া পৌঁছিল। আগে যখন রেল হয় নাই, তখন বেলের বাজার খুব বড় ছিল, হাজারি শুনিয়াছে তাহার গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মুখে। এখনও পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে চাকদহের গঙ্গায় শবদাহ করিতে আসে বহুলোক—তাহাদের জন্যই বেলের বাজার এখনও টিঁকিয়া আছে।

হাজারি বেলের বাজার দেখিয়া খুশী হইল ও আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও দেখে নাই। চমৎকার জায়গা বটে। এই তাহা হইলে বেলে! তাহার এক মামাতো ভাই যশোর অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে শব লইয়া চাকদহে এই পথ বাহিয়া আসিতে আসিতে বেলের বাজারের কাছে ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হয়—এ গল্প উক্ত মামাতো ভাইয়ের মুখেই দু-তিনবার সে শুনিয়াছে।

হাজারি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের দোকানগুলি দেখিতে লাগিল। সর্ব্বসুদ্ধ ন'খানা দোকান ইহারই মধ্যে চাল ডাল মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান সব। একজন দোকানদারকে বলিল—একটু তামাক খাওয়াতে পারেন মশায়?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই ঠাকুর মশায়। আসুন, কোথায় যাওয়া হবে?—বসুন, ওরে বামুনের হুঁকোতে জল ফিরিয়ে নিয়ে আয়।

দোকানখানি কিসের তাহা হাজারি বুঝিতে পারিল না। এক পাশে চিটা গুড়ের ক্যানেস্তা চাল পর্য্যন্ত একটার গায়ে একটা উঁচু করিয়া সাজানো আছে—আর এক পাশে বড় বড় বস্তা। দোকানদার বৃদ্ধ, বয়স পঁয়ষট্টি হইতে সত্তর হইবে, রোগা একহারা চেহারা, গলায় মালা।

—নিন্ ঠাকুর মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। কোথায় যাওয়া হবে?

—যাচ্ছি কাজের চেষ্টায়, রাণাঘাট হোটেলে সাত বছর রেঁধেছি, বেচু চক্কত্তির হোটেলে। নাম শুনেছেন বোধ হয়। ভাল রাঁধুনী বলে নাম আছে—কিন্তু চাকুরিটুকু গিয়েছে—এখন যাই তো একবার এই দিক পানে—যদি কোথাও কিছু জোটে।

দোকানদার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রমের চোখে হাজারিকে দেখিল। নিতান্ত গ্রাম্য ঠাকুর পূজারী বামুন নয়—রাণাঘাটের মত শহর বাজারের বড় হোটেলে সাত-আট বছর সুখ্যাতির সঙ্গে রান্নার কাজ করিয়াছে, কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কত বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে—না, লোকটা সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়।

হাজারি বলিল—রাত হয়ে আসচে, একটু থাকার জায়গার কি হয় বলতে পারেন?

দোকানদার অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল—এইখানেই থাকুন, এর আর কি। আমার ওই

পেছন দিকে দিব্যি চালা রয়েচে, একখানা তক্তপোশ রয়েচে। চালায় রান্না করুন, তক্তপোশে শুয়ে থাকুন।

কথায় কথায় হাজারি বলিল—আচ্ছা এখানে গঙ্গাযাত্রী দিন কত যাতায়াত করে ?

—সে দিন আর নেই বেলের বাজারের। আগে আট দশ দল, এক এক দলে দশ-বারো জন করে মানুষ, এ নিত্য যেতো। এখন কোনোদিন যোটেই না, কোনোদিন তিনটে, বড্ড জোর চারটে। আগে লোকের হাতে পয়সা ছিল, মড়া গঙ্গায় দিত—আজকাল হাতে নেই পয়সা—ম'লে নদীর ধারে, খালের ধারে, বিলের ধারে পুড়োয়।

হাজারি ভাবিতেছিল বেলের বাজারে একখানা ছোটখাটো হোটেল চলিতে পারে কি-না ; তিন দল গঙ্গাযাত্রীতে ত্রিশটি লোক থাকিলে যদি সকলে খায়, তবে ত্রিশজন খরিদ্দার। ত্রিশজন খরিদ্দার রোজ খাইলে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে খরচ-খরচা বাদে। সেই জায়গায় কুড়ি জন হোক, দশ জন হোক রোজ—তবুও পরের চাকুরির চেয়ে ভাল। পরের চাকুরি করিয়া পাইতেছে সাত টাকা আর অজস্র অপমান বকুনি। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা —দশ জন খরিদ্দার যে হোটেলে রোজ খায়, সেখানে অন্ততঃ বারো-তেরো টাকা মাসে লাভ থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে গোপালনগরের দিকে রওনা হইল। হাতের পয়সা এখনও যথেষ্ট—পাঁচ টাকা আছে, কোনো ভাবনা নাই। কাল রাত্রে দোকানদার চাল ডাল হাঁড়ি কিনিয়া আনিতে চাহিয়াছিল, হাজারি তাহাতে রাজী হয় নাই। নিজে পয়সা খরচ করিয়াছে।

দুপুরের রৌদ্র বড় চড়িল। নির্জ্জন রাস্তা, দুধারে কোথাও ঘন বনজঙ্গল, কোথাও ফাঁকা মাঠ, লোকালয় চোখে পড়ে না, এক-আধখানা চাষাদের গ্রাম ছাড়া। ঘণ্টা দুই হাঁটিবার পরে হাজারির তৃষ্ণা পাইল। কিছুদূরে একটা ছোট পুকুর দেখিয়া তাহার ধারে বসিতে যাইবে এমন সময় একখানা খালি গরুর গাড়ী পুকুরের পাশের মেটে রাস্তা দিয়া নামিতে দেখিল। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল—কাছে কোনো গ্রাম আছে বাপু ? একটু জল খাবো। ব্রাহ্মণ।

গাড়োয়ান বলিল—আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর মশায়, কাছেই ছিনগর-সিমলে আমি বামুন বাড়ী যাবো। তেনাদের গাড়ী—গাড়ীতে আসুন।

হাজারি শ্রীনগর-সিমলে গ্রামের নাম শুনিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে দেখিল এ তো গ্রাম নয়—বিজন বন। এতখানি বেলা চড়িয়াছে এখনও গ্রামের মধ্যে সূর্য্যের আলো প্রবেশ করে নাই ; শুধু আম-কাঁটালের প্রাচীন বাগান, বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল।

একটা গৃহস্থ-বাড়ীর উঠানে গরুর গাড়ী গিয়া থামিল। গাড়োয়ানের ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে গৃহস্বামী আসিলেন, ম্যালেরিয়া-শীর্ণ চেহারা, মাথার চুল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বয়স ত্রিশও হইতে পারে পঞ্চাশও হইতে পারে। তিনি বাহিরে আসিয়াই হাজারিকে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—কে রে সঙ্গে ?

গাড়োয়ান বলিল—এজ্ঞে উনি পাকা রাস্তায় মুদির পুকুরের ধারে বসে ছিলেন, বল্লেন একটু জল খাবো- তা বল্লাম চলুন আমার সঙ্গে—আমার মনিবেরা ব্রাহ্মণ—সেখানে জল খাবেন, তাই সঙ্গে করে আনলাম।

গৃহস্বামী আগাইয়া আসিয়া হাজারিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। বসুন, বিশ্রাম করুন। ওরে চণ্ডীমণ্ডপের তক্তপোশে মাদুরটা পেতে দে,—আসুন।

এসব পল্লী অঞ্চলে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। আধঘণ্টা পরে হাজারি হাত পা ধুইয়া বসিয়া গাছ হইতে সদ্য পাড়া কচি ডাবের জল পান করিয়া সুস্থ ও খোশমেজাজে হুঁকা টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর নাম বিহারীলাল বাঁড়ুয্যে। চাকুরি জীবনে কখনো করেন নাই, যথেষ্ট ধানের আবাদ আছে, গরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, আম-কাঁটালের বাগান আছে। এসব কথা গৃহস্বামীর নিকট হইতেই হাজারি গল্পচ্ছলে শুনিল।

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিতেছিলেন, শ্রীনগর-সিমলে মস্ত গ্রাম ছিল, রাজধানী ছিল কেষ্টনগরের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষের। জঙ্গলের মধ্যে রাজার গড়খাই আছে, পুরোনো ইটের গাঁথুনি আছে, দেখাবো এখন ওবেলা। না না, আজ যাবেন কি? ওসব হবে না। দুদিন থাকুন, আমাদের সবই আছে আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে, তবে মানুষজনের মুখ দেখতে পাইনে এই যা কষ্ট। ছেলেবেলাতেও দেখেছি গাঁয়ে ত্রিশ-বত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন দাঁড়িয়েচে সাত ঘর মোট—তার মধ্যেও দু ঘর আছে বারোমাস বিদেশে। আপনার নিবাস কোথায় বল্লেন?

—আজ্ঞে, এঁড়োশোলা—গাংনাপুর থেকে নেমে যেতে হয়।

—তবে তো আপনি আমাদের এদেশেরই লোক। আসুন না আমাদের গাঁয়ে? জায়গা দিচ্চি, জমি দিচ্চি, ধান করুন, পাট করুন, বাস করুন এখানে। তবুও এক ঘর লোক বাড়ুক গ্রামে। আসুন না?

হাজারি শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করিতে আসিবে —সেইটুকু অদৃষ্টে বাকী আছে বটে! শহর বাজারে থাকিয়া সে শহরের কল-কোলাহল কর্ম্মব্যস্ততাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—এই বনের মধ্যে সমাধিপ্রাপ্ত হইতে হয় যে বৃদ্ধ বয়সে! ছ'চল্লিশ বৎসর বয়স তার—দিন এখনও যায় নাই, এখনও যথেষ্ট উৎসাহ শক্তি তার মনে ও শরীরে। তা ছাড়া সে বোঝে হোটেলের কাজ, একটা হোটেল খুলিতে পারিলে তাহার বয়স দশ বছর কমিয়া যাইবে—নব যৌবন লাভ করিবে সে। চাষবাসের সে কি জানে?

হোটেলের কথা হাজারি এখানে বলিল না। সে জানে হোটেলওয়ালা বামুন বলিলে অনেকে ঘৃণার চক্ষে দেখে—বিশেষতঃ এই সব পাড়াগাঁয়ে।

শ্রীনগরে হাজারির মোটেই মন টিকিতেছিল না—এত বনজঙ্গলের অন্ধকার ও নির্জ্জনতার মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৈকালের দিকেই সে গ্রামের

বাহিরে আসিয়া পথে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল--বাপরে! কুড়ি বিঘে ধানের জমি দিলেও এ গাঁয়ে নয় রে বাবা! মানুষ থাকে এখানে? মানুষজনের মুখ দেখার যো নেই, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই—কুঁড়ের মতো বসে থাকো আর গোলার ধানের ভাত খাও—সর্ব্বনাশ!···আর কি জঙ্গল রে বাবা!···

রাস্তার ধারে একটা লোক কাঠ ভাঙিতেছিল। হাজারি তাহাকে বলিল—সামনে কি বাজার আছে বাপু?

লোকটা একবার হাজারির দিকে নীরবে চাহিয়া দেখিল। পরে বলিল—আপনি কি আলেন সিমলে থে?

—হ্যাঁ।

—এখানে আপনাদের এগ্গ্যি-কুটুম্ব আছেন বুঝি? আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরণাম হই। কোথায় যাবেন আপুনি?

হাজারি জানে পল্লীগ্রাম-অঞ্চলে এই সব শ্রেণীর লোক তাহাকে অকারণে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া মারিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব। হাজারিও পূর্ব্বে এই রকম ছিল—কিন্তু রাণাঘাট শহরে এতকাল থাকিয়া বুঝিয়াছে অপরিচিত লোককে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই বা করিলে লোকে চটে। হাজারি বর্ত্তমান প্রশ্নকর্ত্তার হাত এড়াইবার জন্য সংক্ষেপে দু-একটি কথার উত্তর দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—সামনে কি বাজার পড়বে বাপু?

—এজ্ঞে যান, গোপালনগরের বড় বাজার পড়বে—কোশ দুই আর আছেন।

গোপালনগরের নাম হাজারির কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এদিকের বড় গঞ্জ গোপালনগর, সকলেই নাম জানে।

মধ্যাহ্নভোজনটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, রাত্রে খাইবার আবশ্যক নাই। একটু আশ্রয় পাইলেই হইল। সুতরাং হাজারির মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। এ কয়দিন সে যেন নূতন জীবন যাপন করিতেছে—সকালে উঠিবার তাড়া নাই, পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া নাই—বেচু চক্কত্তির কাছে বাজারের হিসাব দিতে যাওয়া নাই—দশ সের কয়লাজ্বলা অগ্নিকুণ্ডের তাতে বসিয়া সকাল হইতে বেলা একটা এবং ওদিকে সন্ধ্যা হইতে রাত বারোটা পর্য্যন্ত হাতাখুন্তি নাড়া নাই, বাঁচিয়াছে সে!

পথের ধারে একটা গাছতলায় পাকা বেল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাজারি সেটা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাল সকালে খাওয়া চলিবে।

সব ভাল—কিন্তু তবু হাজারির মনে হয়, এ ধরণের ভবঘুরে জীবন তাহার পছন্দসই নয়। বৃথা ঘুরিয়া বেড়াইয়া কি হইবে? চাকুরি জোটে তো ভাল। নতুবা এ ধরণের জীবন সে কতকাল কাটাইতে পারে?···একমাসও নয়। সে চায় কাজ, পরিশ্রম করিতে সে ভয় পায় না, সে চায় কর্ম্মব্যস্ততা, দু-পয়সা উপার্জ্জন, নাম, উন্নতি। ইহার উহার বাড়ী খাইয়া

বেড়াইয়া, পথে পথে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

গোপালনগর বাজারে পৌঁছিতে বেলা গেল। বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি ছোটবড় দোকান, ভাল ব্যবসার জায়গা বটে। হাজারি একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনের টিউবওয়েলে হাতমুখ ধুইয়া লইল। নিকটে একটা কালীমন্দির—মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া সম্ভবতঃ মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হুঁকা টানিতেছে দেখিয়া হাজারি তামাক খাইবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একবার তামাক খাওয়াবেন?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—বসুন, এই নিন।

—আপনি কি মন্দিরে মায়ের পুজো করেন?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার বাড়ী গাংনাপুরের সন্নিকট এঁড়োশোলা। রাঁধুনীর কাজ করি—চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়েচি। এখানে কেউ রাঁধুনী রাখবে বলতে পারেন?

—একবার এই বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন। ওঁরা বড়লোক, রাঁধুনী ওঁদের বাড়ীতে থাকেই—বাবুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে আছে, যদি এ সময় নতুন লোকের দরকার-টরকার পড়ে—ওঁরা জাতে তিলি, বাজারের সেরা ব্যবসাদার, ধনী লোক।

হাজারি কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া দেখিল একজন শ্যামবর্ণ মোহারা চেহারার লোক গদির উপর বসিয়া আছে। সেই লোকটিই যে দোকানের মালিক, ইহা কেহ বলিয়া না দিলেও বোঝা যায়। হাজারিকে ঢুকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—আসুন, কি চাই? ওদিকে যান—ওহে, দেখ ইনি কি নেবেন—

বলিয়া লোকটি দোকানের অন্য যে অংশে অনেকগুলি কর্মচারী কাজ-কর্ম ও কেনাবেচা করিতেছে সে দিকটা দেখাইয়া দিল।

হাজারি বলিল—বাবু, দরকার আপনার কাছে। আমি রান্না করি, ব্রাহ্মণ—শুনলাম আপনার বাড়ীতে রাঁধুনী রাখবেন—তাই—

—ও! আপনি রান্না করবেন? রাঁধতে জানেন ভাল? কোথায় ছিলেন এর আগে?

—আজ্ঞে রাণাঘাট হোটেলে ছিলাম সাত বছর।

—হোটেলে? হোটেলের কাজ আর বাড়ীর কাজ এক নয়। এ খুব ভাল রান্না চাই। আপনি কি তা পারবেন? কলকাতা থেকে কুটুম আসে প্রায়ই—

হাজারি হাসিয়া ভাবিল—তুমি আর কি রান্না খেয়েছ জীবনে, কাপড়ের দোকান করেই মরেছ বই তো নয়। তেমন রান্না কখনো চোখেও দেখনি।

মুখে বলিল—বাবু, একদিনের জন্যে রেঁধে দেখুন না হয়। রান্না ভাল না হয়, এমনি চলে যাব। কিছু দিতে হবে না।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসাদার, লোক চেনে। হাজারির কথার ধরণ দেখিয়া

বুঝিল এ বাজে কথা বলিতেছে না। বলিল—আচ্ছা আপনি আমাদের বাড়ী যান। এই সামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁ-দিকে দেখবেন বড় বাড়ী—ওরে নিতাই, তুই বাপু একবার যা তো, ঠাকুর মশায়কে বাড়ীতে শশধরের হাতে তুলে দিয়ে আয়। বলগে, ইনি আজ থেকে রাঁধবেন। বুঝলি? নিয়ে যা—মাইনে-টাইনে কিন্তু, ঠাকুর মশায়, পরে কাজ দেখে ধার্য্য হবে। হ্যাঁ—সে দু-চারদিন পরে তবে—নিয়ে যা।

প্রথম দিনের কাজেই হাজারি নাম কিনিয়া ফেলিল। বাড়ীর কর্ত্তা দশ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। তাঁহার গৃহিণী অসুস্থ প্রায় বারোমাস, উঠিতে বসিতে পারিলেও সংসারের কাজকর্ম্ম বড় একটা দেখেন না—দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা থাকে শ্বশুরবাড়ী একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে, আর একটি আট বছরের ছোট মেয়ে।

বাড়ীর সকলেই ভাল লোক—এতদিন চাকুরি করিয়া হাজারির যে খারাপ ধারণা হইয়াছিল পরের চাকুরি সম্বন্ধে, এখানে আসিয়া তাহা চলিয়া গেল। ইহারা জাতিতে গন্ধবণিক, বাড়ীর সকলেই ব্রাহ্মণকে খাতির করিয়া চলে—হাজারির মৃদু স্বভাবের জন্যও সে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

মাসখানেক কাজ করিবার পর হাজারি প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই বাড়ী যাইবার ছুটি চাহিল।

অনেকদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই—টেঁপিকে কত কাল দেখে নাই। দোকানের মালিক ছুটিও দিলেন।

গোপালনগর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী আসিতে প্রায় তিন আনা ট্রেন ভাড়া লাগে। মিছামিছি তিন আনা পয়সা খরচ করিয়া লাভ নাই। হাঁটাপথে মাত্র সাত-আট ক্রোশ হাজারিদের গ্রাম—হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বাড়ী পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

টেঁপি ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবা, এসো, এসো। কোত্থেকে এলে এখন?

তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বসিয়া গেল। হাজারির মনে হইল তার সারা দেহ-মন জুড়াইয়া গেল টেঁপির হাতের পাখার বাতাসে। টেঁপির জন্য খাটিয়া সুখ—যত কষ্ট যত দুঃখ রানাঘাট হোটেলের—সব সে সহ্য করিয়াছে টেঁপির জন্য। ভবিষ্যতে আরও করিবে।

যদি বংশীধর ঠাকুরের ভাগিনেয় সেই ছেলেটির সঙ্গে—

যাক্ সে সব কথা।

টেঁপি বলিল—বাবা, অতসীদিদি একদিন তোমার কথা বলছিল—

—আমার কথা? হরিচরণবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ বাবা, বলছিল তুমি অনেকদিন আসো নি। চল না আজ, যাবে? ওখানে গিয়ে চা খাবে এখন। কলের গান শুনবে।

এই সময় টেঁপির মা ঘাট হইতে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিল। হাসিমুখে বলিল—কখন এলে ?

হাজারি—এই তো খানিকক্ষণ। ভাল তো সব ? টাকা পেয়েছিলে ?

—হ্যাঁ। ভাল কথা, ওদের বাড়ীর সতীশ বলছিল রাণাঘাট থেকে পাঠানো নয় টাকা। তুমি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?

—রাণাঘাটের চাকরি করিনে তো। এখন আছি গোপালনগরে। বেশ ভাল জায়গায় আছি, বুঝলে ? গন্ধবণিকের বাড়ী, ব্রাহ্মণ বলে ভক্তিছেদ্দা খুব। খাওয়া-দাওয়া ভাল। কাপড়ের মস্ত দোকান, দিব্যি জলখাবার দেয় সকালে বিকেলে।

টেঁপি বলিল—কি জলখাবার দেয় বাবা !

—এই ধরো কোন দিন মুড়ি নারকেল, কোন দিন হালুয়া।

টেঁপির মা বলিল—বোসো, জিরোও ; চা নেই, তা হোলে করে দিতাম। টেঁপি, যাবি মা, সতীশদের বাড়ী চা আছে—(এই কথা বলিবার সময় টেঁপির মা ভুরু দুটি উপরের দিকে তুলিয়া এমন একটি ভঙ্গি করিল, যাহা শুধু নির্ব্বোধ মেয়েরা করিয়া থাকে)—দুটো চেয়ে নিয়ে আয়।

টেঁপি বলিল—দরকার কি মা—আমি নিয়ে যাই না কেন বাবাকে অতসী দিদিদের বাড়ী ? সেখানে চা হবে এখন—জলখাবার হবে এখন—

দু-দু'বার টেঁপি অতসীদের বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছে সুতরাং হাজারি মেয়ের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না। টেঁপির ইচ্ছা তাহার নিকট অনেকের হুকুমের অপেক্ষা শক্তিমান।

হরিচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন—হাজারিকে যত্ন করিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

—এসো এসো হাজারি, কবে এলে ? ও টেঁপি, যা তো অতসীদিদিকে বলগে আমাদের চা দিয়ে যেতে। আমিও এখনো চা খাই নি—

—বাবু, ভাল আছেন ?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল ছিলে ? তোমার সেই হোটেলের কি হোল ? রাণাঘাটেই আছ তো ?

হাজারি সংক্ষেপে রাণাঘাটের চাকুরি যাওয়া হইতে গোপালনগরে পুনরায় চাকুরি পাওয়া পর্য্যন্ত বর্ণনা করিল।

এক সময় অতসী ও টেঁপি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের সামনের ছোট গোল টেবিলটাতে চা ও খাবার রাখিল। খাবার মাত্র এক ডিশ—শুধু হাজারির জন্য, হরিচরণবাবু এখন কিছু খাইবেন না।

হাজারি বলিল—বাবু, আপনার খাবার ?

—ও তুমি খাও, তুমি খাও। আমার এখন খেলে অম্বল হয়, আমি শুধু চা খাবো।

হাজারি ভাবিল—এত বড়লোক, এত ভাল জিনিস ঘরে কিন্তু খাইলে অম্বল হয় বলিয়া খাইবার

জো নাই এই বা কেমন দুর্ভাগ্য! বয়স ছ'চল্লিশ হইলে কি হয়, অম্বল কাহাকে বলে সে কখনো জানে না। ভূতের মত খাটুনির কাছে অম্বল-টম্বল দাঁড়াইতে পারে না। তবে খাবার জোটে না এই যা দুঃখ।

অতসী কিন্তু বেশ বড় রেকাবি সাজাইয়া খাবার আনিয়াছে—ঘি দিয়া চিঁড়া ভাজা, নারকেল-কোরা, দুখানা গরম গরম বাড়ীর তৈরী কচুরী ও খানিকটা হালুয়া, বড় পেয়ালার এক পেয়ালা চা। অতসী এটুকু জানে যে টেঁপির বাবা তাহার বাবার মত অল্পভোজী প্রাণী নয়, খাইতে পারে এবং খাইতে ভালবাসে। অবস্থাও উহাদের যে খুব ভাল, তাহাও নয়। সুতরাং টেঁপির বাবাকে ভাল করিয়াই খাওয়াইতে হইবে।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারিকাকাকে প্রণাম করেছ অতসী!

হাজারি ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অতসী তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিতে সে চিঁড়াভাজা চিবাইতে চিবাইতে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না। অতসী কিন্তু চলিয়া গেল না, সে হাজারির সামনে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। টেঁপি গল্প করিয়াছে তাহার বাবা একজন পাকা রাঁধুনী, অতসীর কৌতুহলের ইহাই প্রধান কারণ।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এখন ক'দিন বাড়ীতে আছ?

—আজ্ঞে, পরশু যাবো। পরের চাকরি, থাকলে তো চলে না।

—তোমার সেই হোটেল খোলার কি হোল?

—এখনও কিছু করতে পারি নি বাবু। টাকার যোগাড় না করতে পারলে তো—বুঝতেই পারছেন—

—তা হোলে ইচ্ছে আছে এখনও?

—ইচ্ছে আছে খুব। শীতকালের মধ্যে যা হয় করে ফেলবো।

অতসী বলিল—কাকা গান শুনবেন?

হরিচরণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ- আমি ভুলে গিয়েছি একদম। শোন না হাজারি, অনেক নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। নিয়ে এসো তো অতসী—শুনিয়ে দাও তোমার হাজারিকাকাকে।

হাজারি ভাবিল, বেশ আছে ইহারা। তাহার মত খাটিয়া খাইতে হয় না, শুধু গান আর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যা হইয়াছে, এ সময় উনুনে আঁচ দিয়া ধোঁয়ার মধ্যে ছোট্ট রান্নাঘরে বসিয়া মনিব-গৃহিণীর ফর্দ মত তরকারি কুটিতেছে সে অন্য অন্য দিন। বারো মাসই তাহার এই কাজ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বারো মাস বলিয়াই পথে বাহির হইলেই তাহার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হইতেছে আজ, এমন চমৎকার সাজানো বৈঠকখানা, বড় আয়না, বেতমোড়া কেদারায় সে বসিয়া চা খাইতেছে, পাশে টেঁপি, টেঁপির বন্ধু কিশোরী মেয়েটি, কলের গান…যেন সব স্বপ্ন।

কতদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই! আজ রাণাঘাট ছাড়িয়াছে প্রায় চারি মাসের উপর, এই চারি মাস কুসুমকে সে দেখে নাই। টেঁপিও মেয়ে, কুসুমও মেয়ে।

আর নতুন পাড়ার সেই বউটি! সে-ও আর এক মেয়ে। আজ কলের গানের সুমধুর সুরের ভাবুকতায় তাহার মন সকলের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলের গান বাজিল। হরিচরণবাবু মধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর কি কাজে উঠিয়া গেলেন, তখন রহিল শুধু অতসী আর টেঁপি। বাবার সামনে বোধ হয় অতসী বলিতে সাহস করিতেছিল না, হরিচরণবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে হাজারিকে বলিল—কাকাবাবু, আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন?

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা কেন দেব না মা? কিন্তু তুমি রান্না জানো নিশ্চয়। কি কি রাঁধতে পারো?

অতসী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝিল যাহার সহিত কথা বলিতেছে, রান্নার সম্বন্ধে সে একজন ওস্তাদ শিল্পী। সঙ্গীতের তরুণী ছাত্রী যেমন সঙ্কোচের সহিত তাহার যশস্বী সঙ্গীত শিক্ষকের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে কথা বলে—তেমনি সসঙ্কোচে বলিল—তা পারি সব, শুক্তুনি, চচ্চড়ি, ডাল, মাছের ঝোল—মা তো বড় একটা রান্নাঘরে যেতে পারেন না, তাঁর মন খারাপ, আমাকেই সব করতে হয়। টেঁপি বলছিল আপনি নিরিমিষ রান্না বড় চমৎকার করেন, আমায় দেবেন শিখিয়ে কাকাবাবু?

—টেঁপি বুঝি এই সব বলে তোমার কাছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার, ওর কথা বাদ দাও—

—না কাকাবাবু, আমি অন্য জায়গাতেও শুনেচি আপনার রান্নার সুখ্যাতি। সবাই তো বলে।

পরে আবদারের সুরে বলিল—আমাকে শেখাতে হবে কাকাবাবু—আমি ছাড়চি নে, আমি টেঁপিকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, আপনি কবে আসবেন আমি খোঁজ নিই—ও বলেনি আপনাকে? না কাকাবাবু, আমায় শেখান আপনি। আমার বড় শখ ভাল রান্না শিখি।

হাজারি বলিল—ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্ততঃ ঝাড়া দু'মাস তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে—তুমি রাঁধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরে দেবো, এ না হোলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপির মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে ফাঁকি দেবো না মা, ছেলেমানুষ, শিখতে চাইচ শিখিয়ে দিতে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি ক'রে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা!

অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মুখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা—বাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ, আনাড়ির কথাও নয়। তাহার চোখে হাজারি দরিদ্র রাঁধুনী বামুন পিতা নয়—যে ব্যবসায় সে ধরিয়াছে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ, পাকা শিল্পী।

হাজারির প্রতি তাহার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরদিন হাজারি ঘুম হইতে উঠিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অতসীকে

তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইল। বড়মানুষের মেয়ে অতসী, অসময়ে কি মনে করিয়া তাহার মত গরীব মানুষের বাড়ী আসিল?

টেঁপি বাড়ী ছিল না, টেঁপির মা-ও অতসীকে আসিতে দেখিয়া খুব অবাক হইয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, সেইভাবে জমিদার-বাটীর মেয়ের অভ্যর্থনা করিল।

অতসী বলিল—কাকাবাবু বাড়ী নেই খুড়ীমা?

টেঁপির মা বলিল—হাঁা মা, এসো আমার সঙ্গে, ঐ কোণের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে।

—টেঁপি কোথায়?

—সে মূলোর বীজ আনতে গিয়েছে সদগোপ-বাড়ীতে। এল বলে, বসো মা, বসো। দাঁড়াও আসনখানা পেতে—

অতসী টেঁপির মার হাত হইতে আসনখানা ক্ষিপ্র ও চমৎকার ভঙ্গিতে কাড়িয়া লইয়া কেমন একটা সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিল—রাখুন আসন খুড়ীমা, ভারি আমি একেবারে গুরুঠাকুর এলুম কিনা—তা আবার যত্ন করে আসন পেতে দিতে হবে—

এই হাসি ও এই ভঙ্গিতে সুন্দরী মেয়ে অতসীকে কি সুন্দরই দেখাইল!—টেঁপির মা মুগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতসীর দিকে। ইতিমধ্যে হাজারি সে স্থানে আসিয়া বলিল—কি মনে করে সকালে লক্ষ্মী-মা?

অতসী হাজারির কাছে গিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি কথা মা?

—চলুন ওদিকে, একটু আড়ালে বলব।

হাজারি ভাবিয়াই পাইল না, এমন কি গোপনীয় কথা অতসী তাহাকে আড়ালে বলিতে আসিয়াছে এই সকালবেলায়। দাওয়ায় ছাঁচতলার দিকে গিয়া বলিল—কি কথা মা?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—

হাজারি বিস্মিত মুখে বলিল—বলবো না মা, বলো তুমি।

—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?

—হাঁা, কিন্তু সে তো এবার নয়, সেবার। তোমায় কে বললে এসব কথা?

—সে সব কিছু বলব না। আমি আপনাকে টাকা দেবো, আপনি হোটেল খুলুন—

—তুমি কোথায় পাবে?

অতসী হাসিয়া বলিল—আমার কাছে আছে। দু-শো টাকা দিতে পারি—আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লুকিয়ে দোবো কিন্তু, বাবা যেন জানতে না পারেন। কেউ জানতে না পারে।

হাজারির চোখে জল আসিল।

এ পর্য্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাহাকে তাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে—তিনজনেই সমান সরলা, তিনজনেই অনাত্মীয়া—তবে অতসী জমিদারবাড়ীর সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে, সে যে এতখানি টান টানিবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরণের আশ্চর্য্য ঘটনা!

হাজারি বলিল—কিন্তু তুমি একথা শুনলে কোথায় বলতে হবে যা।

অতসী হাসিয়া বলিল—সে কথা বলবো না বলেছি তো।

—তা হোলে টাকাও নেবো না। আগে বলো কে বলেছে ?

—আচ্ছা, নাম করলে তাকে কিছু বলবেন না বলুন—

—কাকে কি বলবো বুঝতে পারছি নে তো ? বলাবলির কথা কি আছে এর মধ্যে ? আচ্ছা, বলবো না। বলো তুমি।

—টেঁপি বলেছিল, বাবার ইচ্ছে একটা হোটেল খোলেন, আমার বাবার কাছে নাকি টাকা চেয়েছিলেন ধার—তা বাবা দিতে পারেন নি। দেখুন কাকাবাবু, দাদা মারা যাওয়ার পরে বাবার মন খুব খারাপ। ওঁকে বলা না বলা দুই সমান। আমি ভাবলাম আমার হাতে তো টাকা আছে—কাকাবাবুকে দিই গে—ওঁদের উপকার হবে। আমার কাছে তো এমনি পড়েই আছে। আপনার হোটেল নিশ্চয়ই খুব ভাল চলবে, আপনারা বড়লোক হয়ে যাবেন। টেঁপিকে আমি বড় ভালবাসি, ওর মনে যদি আহ্লাদ হয় আমার তাতে তৃপ্তি। টাকা বাক্সে তুলে রেখে কি হবে ?

—মা, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারি নে।

অতসী যেন বড় দমিয়া গেল। হাজারির সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ছেলেমানুষী তর্ক করিল, বাবাকে না জানাইয়া টাকা লইলে দোষ কি !

শেষে বলিল—আমি টেঁপিকে এ টাকা দিচ্ছি।

—তা তুমি দিতে পারো না। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই মা। তুমি তো লেখাপড়া জানো, ভেবে দেখ।

—আচ্ছা, আমায় লাভের অংশ দেবেন তা হোলে ?

হাজারির হাসি পাইল। কুসুম, গোয়ালা-বাড়ীর সেই বউটি, অতসী—সবাই এক কথা বলে। ইহারা সকলেই মহাজন হইয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। মজার ব্যাপার বটে !

—না মা, সে হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্ব্বাদ করি রাজরাণী হও, তখন তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুকে যা খুশি দিও, এখন না।

অতসী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

হাজারির ইচ্ছা হইল টেঁপিকে ডাকিয়া বকিয়া দেয়। এসব কথা অতসীর কাছে বলিবার তাহার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু অতসীর নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছে, টেঁপিকে ইহা লইয়া কিছু বলিলেই অতসীর কানে গিয়া পৌঁছাইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

. . .

সেদিন বিকালে গোয়ালাপাড়ায় বেড়াইতে গিয়া কুসুমের বাপের বাড়ীতে শুনিল রাণাঘাটে কুসুমের অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল, কোনোরূপে এযাত্রা সামলাইয়া গিয়াছে। সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই, কথায় কথায় কুসুমের কাকা ঘনশ্যাম ঘোষ বলিল—মধ্যে রানাঘাটে পনেরো দিন ছেলাম দাদাঠাকুর, ছানার কাজ এ মাসটা বড্ড মন্দা।

হাজারি বলিল—পনেরো দিন ছিলে ? কেন হঠাৎ এ সময়—

তারপরেই ঘনশ্যাম কুসুমের কথাটা বলিল।

হাজারির কেবল মনে হইতে লাগিল কুসুমের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নাই—একবার তাহার সহিত দেখা করিতে গেলে কেমন হয় ? মনটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে তাহার অসুখের খবর শুনিয়া। জীবনে ওই একটি মেয়ের উপর তাহার অসীম স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

ইচ্ছা হইল কুসুমের সম্বন্ধে ঘনশ্যামকে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহা করা চলিবে না। সে মনের আকুল আগ্রহ মনেই চাপিয়া শুধু কেবল উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—এখন সে আছে কেমন ?

—তা এখন আপনার বাপমায়ের আশীর্বাদে সেরে উঠেছে—তবে বড় কষ্ট যাচ্ছে সংসারের, দুধ-দই বেচে তো চালাতো, আজ মাসখানেকের ওপর শয্যাগত অবস্থা। ইদিকি আমার সংসারের কাণ্ড তো দেখতেই পাচ্চেন—কোথেকে কি করি দাদাঠাকুর—

হাজারি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। যেন কুসুমের সম্বন্ধে তাহার সকল আগ্রহ ফুরাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে হাজারি ভাবিল রাণাঘাটে তাহাকে যাইতেই হইবে। কুসুমের অসুখ শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কালই একবার সে রাণাঘাট যাইবে।

পথে অতসীর পিতা হরিবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে হাজারি, কোথা থেকে ফিরচো ? তা এসো আমার ওখানে, চলো চা খাবে।

বৈঠকখানায় হাজারিকে বসাইয়া হরিবাবু বলিলেন—বসো, আমি বাড়ীর ভেতর থেকে আসছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে যতদিন বাড়ী আছ, আসা-যাওয়া একটু করো হে, কেউ আসে না, একলাটি সারাদিন বসে বসে আর সময় কাটে না। দাঁড়াও আসছি—

হরিবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতসী একখানা রেকাবিতে খানকতক লুচি, বেগুনভাজা এবং একটু আখের গুড় লইয়া আসিল। হাজারির সামনের টেবিলে রেকাবি রাখিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ খান কাকাবাবু, চা দিয়ে যাচ্ছি—

হাজারি বলিল—বাবু আসুন আগে—

—বাবা তো খাবার খাবেন না, তিনি খাবেন শুধু চা। আপনি খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নিন। চা একসঙ্গে দেবো—

অতসী চলিয়া গেল না, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। হাজারি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিবার কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল—টেঁপি আজ আসে নি মা ?

—না, এ বেলা তো আসে নি।

হাজারি আর কিছু কথা না পাইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে একবার

চোখ তুলিয়া দেখিল অতসী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অতসী সুন্দরী মেয়ে, টেঁপির বন্ধু হইলেও বয়সে টেঁপির অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের বড়—এ বয়সের সুন্দরী মেয়ের সহিত নির্জন ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইবার অভিজ্ঞতাও হাজারির নাই—সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অতসী হঠাৎ বলিল—কাকাবাবু আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি?

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল—রাগ? রাগ কিসের মা—

—ও-বেলার ব্যাপার নিয়ে?

—না না, এতে আমার রাগ হবার কিছু নেই, বরং তোমারই—

—না শুনুন কাকাবাবু, আমি তারপর ভেবে দেখলাম আপনি আমার টাকা নিলে খুব ভাল করতেন। জানেন, আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমি কেবলই ভাবি দাদা বেঁচে থাকলে বাবার বিষয় আমি পেতাম না, এখন কিন্তু আমি পাবো। কিন্তু ভগবান জানেন কাকাবাবু, আমি এক পয়সা চাইনে বিষয়ের। দাদা বিষয় ভোগ করতো তো করতো—নয় তো বাবা বিষয় যা খুশি করে যান, উড়িয়ে যান, পুড়িয়ে যান, দান করুন—আমার যেন এ না মনে হয় আজ দাদা থাকলে এ বিষয় আমি পেতাম না দাদাই পেতো। বিষয়ের জন্যে যেন দাদার ওপর কোনোদিন—আমার নিজের হাতে যা আছে তাও উড়িয়ে দেবো।

অতসীর চোখ জলে টলটল করিয়া আসিল, সে চুপ করিল।

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল—না মা, ও সব কথা কিছু ভেবো না। তোমার বাবা মাকে তুমিই বুঝিয়ে রাখবে, তুমিই ওঁদের একমাত্র বাঁধন—তুমি ওরকম হোলে কি চলে? ছি—মা—

হাজারি সত্যই অবাক হইয়া গেল, ভাবিল—এইটুকু মেয়ে, কি উঁচু মন গ্যাখো একবার! বড় বংশ নইলে আর বলেছে কাকে? এ কি আর বেচুবাবুর হোটেলের পদ্মঝি?

হাজারি বলিল—আচ্ছা মা আমাকে টাকা দেবার তোমার ঝোঁক কেন হোল বল তো? তোমরা মেয়েরা যদি ভাল হও তো খুবই ভাল, আর মন্দ হও তো খুবই মন্দ।—আমায় তুমি বিশ্বাস কর মা?

—আপনি বুঝে দেখুন। না হোলে আপনাকে টাকা দিতে চাইব কেন?

—তোমার বাবাকে না জানিয়ে দেবে?

—বাবাকে জানালে দিতে দেবেন না। অথচ আমার টাকা পড়ে রয়েচে, আপনার উপকার হবে, আমি জানি আপনাদের সংসারের কষ্ট। টেঁপির বিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাবেন টাকা, কোথায় পাবেন কি! আপনার রান্নার যেমন সুখ্যাতি, আপনার হোটেল খুব ভাল চলবে। ছ-বছরের মধ্যে আমার টাকা আপনি আমায় ফেরত দিয়ে দেবেন।

হাজারি মুগ্ধ হইয়া গেল অতসীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া। বলিল—আচ্ছা তুমি দিও টাকা, আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলবো—তোমার মুখ দিয়ে ভগবান এ কথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলেমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবান কথা কন।

অতসী হাসিয়া বলিল—তা হোলে নেবেন ঠিক?

—ঠিক বলচি। এবার ঘুরে জায়গা দেখে আসি। রাণাঘাট যাচ্ছি কাল সকালেই, হয় সেখানে, নয় তো গোয়াড়ির বাজারে জায়গা দেখবো। খবর পাবে তুমি, আবার ঘুরে আসচি তিন-চার দিনের মধ্যেই।

অতসী বলিল—বাবার আহ্নিক করা হয়ে গিয়েচে, বাবা আসবেন, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি। শুনুন কাকাবাবু, আপনি যেদিন বাবার কাছে হোটেলের জন্যে টাকা চান, আমি সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিলাম। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি আমার যা টাকা জমানো আছে আপনাকে তা দেবো।

—আচ্ছা বল তো মা একটা সত্যি কথা—আমার ওপর তোমার এত দয়া হোল কেন?

—বলবো কাকাবাবু? আপনার দিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হোত আপনি খুব সরল লোক আর ভালো লোক। আমার মনে বড় কষ্ট হয় আপনাকে দেখলে সত্যি বলচি—তবে দয়া বলচেন কেন? আমি আপনার মেয়ের মত না?

বলিয়াই অতসী এক প্রকার কুণ্ঠা ও লজ্জা মিশ্রিত হাসি হাসিল।

হাজারি বলিল—তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে তাই দয়ার কথা বলচি। নইলে কি সন্তানের ওপর এত মমতা হয়? তুমি সুখে থাকো, রাজরাণী হও—এই আশীর্ব্বাদ করচি। আমি তোমার গরীব কাকা, এর বেশী আর কি করতে পারি।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এবং আর একটুও না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

•

রাত্রে সারারাত্রি হাজারি ঘুমাইতে পারিল না। অতসীর মত বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের স্নেহ আদর করার মধ্যে একটা নেশা আছে, হাজারিকে সে নেশায় পাইয়া বসিল। তাহার জীবনের এক অদ্ভুত ঘটনা!

সকালে উঠিয়া সে রাণাঘাটে রওনা হইল। বেশী নয় পাঁচ ছ' মাইল রাস্তা, হাঁটিয়া বেলা সাড়ে আটটার সময় স্টেশনের নিকটে সেগুন-বনে গিয়া পৌঁছিল।

রেল-বাজারের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার ইচ্ছা হইল একবার তাহার পুরাতন কর্ম্মস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়। আজ প্রায় পাঁচ মাস সে রাণাঘাট ছাড়া। দূর হইতে বেচু চক্রবর্ত্তীর হোটেলের সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহার মন উত্তেজনায় ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গত ছয় বৎসরের কত স্মৃতি জড়ানো আছে ওই টিনের চালওয়ালা ঘরখানার সঙ্গে।

হোটেলের গদিঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে বেচু চক্কত্তির সম্মুখে পড়িয়া গেল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা, খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেচু চক্কত্তি পুরোনো দিনের মত গদিঘরে তক্তপোষের উপর হাতবাক্সের সামনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হাজারি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—আরে এই যে হাজারিঠাকুর! কি মনে করে? কোথায় আছ আজকাল? ভাল আছ বেশ?

হাজারি এক মুহূর্ত্তে আবার যেন বেচু চক্রবর্ত্তীর বেতনভুক রাঁধুনী বামুনে পরিণত হইল,

তেমনি ভয়, সঙ্কোচ ও মনিবের প্রতি সম্ভ্রমের ভাব তার সারা দেহমনে হঠাৎ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া ভর করিল।

সে পুরোনো দিনের মত কাঁচুমাচু ভাবে বলিল--আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় এক রকম—আজ্ঞে, তা বাবু বেশ ভাল আছেন ?

—আজকাল আছ কোথায় ?

—আজ্ঞে গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ীতে আছি।

—বাড়ীর কাজ ? কদ্দিন আছ ?

—এই চার মাস আছি বাবু।

—তা বেশ, তবে সেখানে মাইনে আর কত পাও ? হোটেলের মত মাইনে কি করে দেবে গেরস্ত ঘরে ?

বেচু চক্কত্তির এই কথার মধ্যে হাজারি এক ধরণের সুরের আঁচ পাইল। ব্যাপার কি ? বেচু চক্কত্তি কি আবার তাহাকে হোটেলে রাখিতে চান ? তাহার কৌতূহল হইল শেষ পর্য্যন্ত দেখাই যাক না কি দাঁড়ায়।

সে বিনীত ভাবে বলিল—ঠিক বলেছেন বাবু, তা তো বেশী নয়। গেরস্তবাড়ী কোথা থেকে বেশী মাইনে দেবে ?

—তারপর কি এখন আমাদের এখানে এসেছ ঠাকুর ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

—কি মনে ক'রে বলো তো ? থাকবে এখানে ?

হাজারি কিছুমাত্র না ভাবিয়াই বলিল—সে বাবুর দয়া।

—তা বেশ বেশ, থাকো না কেন, পুরোনো লোক, বেশ তো। যাও কাজে লেগে যাও। তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ ? কই ?

—না বাবু, আগে থেকে কি করে আনি। সে সব গোপালনগরে রয়েছে। চাকুরিতে দয়া করে রাখবেন কি না রাখবেন না জেনে কি ক'রে সে-সব—

—আচ্ছা আচ্ছা, যাও ভেতরে যাও। রতন ঠাকুরের অসুখ করেছে, বংশী একা আছে, তুমি কাজে লাগো এবেলা থেকে। ভাঙা ভাংটো এ মাসের ক'টা দিনের মাইনে তুমি আগাম নিও।

হাজারি কৃতজ্ঞতার সহিত বেচু চক্কত্তিকে আর একবার ঘাড় খুব নীচু করিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কলের পুতুলের মত রান্নাঘরের দিকে চলিল।

সামনেই বংশীঠাকুর।

তাহাকে দেখিয়া বংশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—বাবু ডেকে বহাল করলেন যে ফের ! ভাল আছ বংশী ? তোমার সেই ভাগ্নেটি ভাল আছে ?

বংশী বলিল—আরে এস এস হাজারি-দা। তোমার কথা প্রায়ই হয়। তুমি বেশ ভাল

আছ ? এতদিন ছিলে কোথায় ?

—ডেকে কি চাপিয়েছ ? সরো, হাতাটা দাও। এখনও মাছ হয়নি বুঝি ? যাও, তুমি গিয়ে মাছটা চড়িয়ে দাও ! তেলের বরাদ্দ সেই রকমই আছে না বেড়েচে ?

বংশী বলিল—একবার টেনে নিও একটু। অনেক দিন পরে যখন এলে। দাঁড়াও ডালটায় নুন দেওয়া হয়নি এখনও—দিয়ে দাও।

বলিয়া সে দরমার আড়ালে গাঁজা সাজিতে গেল।

চুপি চুপি বলিল—তোমায় বহাল করেছে কি আর সাধে ? এদিকে তুমি চলে যাওয়াতে হোটেলের ভয়ানক দুর্নাম। সেই কলকাতার বাবুরা দু'তিন দল এসেছিল, যেই শুনলে তুমি এখানে নেই—তারা বল্লে সেই ঠাকুরের রান্না খেতেই এখানে আসা। সে যখন নেই, আমরা রেলের হোটেলে খাবো। হাটুরে খদ্দেরও অনেক ভেঙ্গে গিয়েছে—যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। তোমায় বাবু বহাল করলেন কেন জান ? যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে তোমাকে পেলে লুফে নেয় এক্ষুনি। তোমার অনেক খোঁজ করেছে ওরা।

বংশীর হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া দম মারিয়া হাজারি কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি হইতে কি হইয়া গেল ! চাকুরি লইতে সে তো রাণাঘাট আসে নাই। কিন্তু পুরাতন জায়গায় পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সে বুঝিয়াছে এতদিন তাহার মনে সুখ ছিল না। এই বেচু চক্কত্তির হোটেল, এই দরমার বেড়া দেওয়া রান্নাঘর, এই পাথুরে কয়লার স্তূপ, এই হাতাবেড়ি এই তার অতি পরিচিত স্বর্গ। ইহাদের ছাড়িয়া কোথায় সে যাইবে ? ভগবান এমন সুখের দিনও মানুষের জীবনে আনিয়া দেন ?

বংশীর হাতে কলিকা ফিরাইয়া দিয়া সে খুশির সহিত বলিল—নাও, আর একবার টান দিয়ে নাও। ডালে সম্বরা দিই গে—এবেলা এখনও বাজার আসে নি নাকি ?

বংশী বলিল—মাছটা কেবল এসেছে। তরকারীপাতি এল বলে, গোবরা গিয়েছে। গোবরা নতুন চাকর—বেশ লোক, আমার ওপর ভারি ভক্তি। এলে দেখো এখন।

এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া জন দুই খরিদ্দার খাইবার ঘরে ঢুকিতেই হাজারি অভ্যাস মত পুরাতন দিনের ন্যায় হাঁকিয়া বলিল বসুন বাবু, জায়গা করাই আছে—নিয়ে যাচ্ছি। বসে পড়ুন। মাছ এখনও হয়নি এত সকালে কিন্তু—শুধু ডাল আর ভাজা—বংশী ভাত নিয়ে এস হে—ডালটায় সম্বরা দিয়ে নিই। বেলাও এদিকে প্রায় দশটা বাজে। কেষ্টনগরের গাড়ী আসবার সময় হোল। আজকাল ইষ্টিশনের খদ্দের আনে কে ?

হাজারি যেন দেহে-মনে নতুন বল ও উৎসাহ পাইয়াছে। বাজার হোক্, শহর বাজার জায়গা রাণাঘাট, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী, গাড়ী-ঘোড়া—এখানে একবার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে ? একটা জায়গার মত জায়গা।

এমন সময় একজন কালোমত ছোকরা চাকর তরকারি বোঝাই ঝুড়ি মাথায় রান্নাঘরে নীচু হইয়া ঢুকিল—পিছনে পিছনে পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিতে বলিতে আসিতেছিল—বাবাঃ, বেগুন আর কেনবার জো নেই রাণাঘাটের বাজারে। আট পয়সা করে বেগুনের সের ভূভারতে কে শুনেছে কবে—যত ব্যাটা ফড়ে জুটে বাজার একেবারে আগুন করে রেখেচে—সব চল্লো কলকেতা, সব চল্লো কলকেতা—তা গরীব-গুরবো লোক কেনেই বা কি আর খায়ই বা কি—ও বংশী, ঝুড়িটা ধরে নামাও ওর মাথা থেকে—দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে সম্মুখে থালায় অন্নপরিবেশনরত হাজারিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে যেন কাঠ হইয়া গেল।

হাজারি পদ্মঝিকে দেখিয়াই থতমত খাইয়া গেল। তাহার পুরাতন ভয় কোথা হইতে সেই মুহূর্ত্তেই আসিয়া জুটিল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া আমতা আমতা সুরে বলিল—এই যে পদ্মদিদি ভাল আছ বেশ? হেঁ-হেঁ—আমি—

পদ্মঝি বিস্ময়ের ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বংশী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল—ঝুড়িটা নামিয়ে নেও না ঠাকুর? ও সঙের মত দাঁড়িয়ে রইল ঝুড়ি মাথায়—মাছ হোল? তারপর হাজারির দিকে তাচ্ছিল্যের ভাবে চাহিয়া বলিল—কখন এলে?

—আজই এলাম পদ্মদিদি।

—আজ এবেলা এখানে থাকবে?

বংশী ঠাকুর বলিল—হাজারিকে যে বাবু বহাল করেছেন আবার। ও এখানে কাজ করবে।

পদ্মঝি কঠিন মুখে বলিল—তা বেশ। রান্নাঘরে আর না দাঁড়াইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

বংশী ঠাকুর অনুচ্চস্বরে বলিল—পদ্মদিদি চটেছে—বাবুর সঙ্গে এইবার একচোট বাধবে—

পদ্মকে সারাদুপুর আর রান্নাঘরের দিকে দেখা গেল না। হাজারির মন ছট্‌ফট্ করিতে-ছিল, কতক্ষণে কাজ সারিয়া কুসুমের সঙ্গে গিয়া দেখা করিবে। সে দেখিল সত্যই হোটেলের খরিদ্দার কমিয়া গিয়াছে—পূর্ব্বে যেখানে বেলা আড়াইটার কমে কাজ মিটিত না, আজ সেখানে বেলা একটার পরে বাহিরের খরিদ্দার আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হাজারি বলিল—হ্যাঁ বংশী, থার্ড ক্লাসের টিকিট মোট ত্রিশখানা! আগে যে সত্তর-পঁচাত্তর খানা একবেলাতেই হোত? এত খদ্দের গেল কোথায়?

বংশী বলিল—তবুও তো আজকাল একটু বেড়েচে। মধ্যে আরও পড়ে গিয়েছিল, কুড়িখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট হয়েচে এমন দিনও গিয়েচে। লোক সব যায় যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলে। ওদের এবেলা একশো ওবেলা ষাট-সত্তর খদ্দের। হাটের দিন আরও বেশী। আর খদ্দের থাকে কোথা থেকে বলো! মাছের মুড়ো কোনোদিন খদ্দেররা চেয়েও পাবে না। বড় মাছ কাটা হোলেই মুড়ো নিয়ে যাবেন পদ্মদিদি। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। তার ওপর আজকাল যা চুরি শুরু করেছে পদ্মদিদি—সে সব কথা এরপর বলবো এখন। খেয়ে নাও আগে।

হোটেল হইতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হাজারি বাহির হইয়া মোড়ের দোকানে এক

পয়সার বিড়ি কিনিয়া ধরাইল। চূর্ণীর ধারে তাহার সেই পরিচিত গাছতলাটায় কতদিন বসা হয় নাই—সেখানে গিয়া আজ বসিতে হইবে। পথে রাধাবল্লভতলায় সে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। আজ তাহার মনে যথেষ্ট আনন্দ, রাধাবল্লভ ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এমন দিনও তাহাকে জুটাইয়া দিয়াছেন! আজ ভোরে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সে কি ইহা ভাবিয়াছিল? অস্বপনের স্বপন। চোর বলিয়া বদনাম রটাইয়া যাহারা তাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই কিনা যাচিয়া তাহাকে চাকুরিতে বহাল করিল।

চূর্ণী নদীর ধারে পরিচিত গাছতলাটায় বসিয়া সে বিড়ি টানিতে টানিতে এক পয়সার বিড়ি শেষ করিয়া ফেলিল মনের আনন্দে। কুসুমের বাড়ী এখন সব ঘুমাইতেছে, গৃহস্থ বাড়ীতে দেখাশুনা করিবার এ সময় নয় বেলা কখন পড়িবে? অন্ততঃ চারটা না বাজিলে কুসুমের ওখানে যাওয়া চলে না। এখনও দেড় ঘণ্টা দেরি।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী হইতে তাহার কাপড়ের পুঁটুলিটা একদিন গিয়া আনিতে হইবে। গত মাসের মাহিনা বাকি আছে, দেয় ভালো, না দিলে আর কি করা যাইবে?

আজ একটু রাত থাকিতে উঠিবার দরুন ভাল ঘুম হয় নাই—তাহার উপরে অনেকদিন পরে হোটেলের খাটুনি, পাঁচক্রোশ পায়ে হাঁটা। স্বগ্রাম হইতে রাণাঘাট আসা প্রভৃতির দরুন হাজারির শরীর ক্লান্ত ছিল—গাছতলার ছায়ায় কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কুসুমের বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িল।

কুসুম নিজে আসিয়াই খিল খুলিল এবং হাজারিকে দেখিয়া অবাক হইয়া বলিল—জ্যাঠামশায়! কোথা থেকে? আসুন—আসুন—

তার পরেই সে নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—এস এস মা, কল্যাণ হোক। ছেলেপিলে সব ভাল তো? এত রোগা হয়ে গিয়েছ, ইস্। তোমার কাকার মুখে তোমার বড্ড অসুখের কথা শুনলাম।

কুসুম বাড়ীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে শতরঞ্চি পাতিয়া বসাইল। বলিল—ভয় নেই জ্যাঠামশায় মরচি নে অত শীগ্‌গির। আপনি সেই যে গেলেন, আর কোনো খবর নেই। অসুখের সময় আপনার কথা কত ভেবেছি জানেন জ্যাঠামশায়? মরেই যদি যেতাম, দেখা হোত আর? অথদ্দে আপদ না হোলে মরেই তো—

—ছি ছি, মা, ও রকম কথা বলতে আছে?

—কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি? আজ কোথা থেকে এলেন?

—এঁড়োশোলা থেকে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল—হেঁটে এসেছেন বুঝি? খাওয়া হয়নি?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ব্যস্ত হয়ো না মা। বলছি সব। সকালে বেরিয়েছিলাম এঁড়োশোলা থেকে, বলি যাই একবার রাণাঘাট, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব হোল।

রেল বাজারে যেমন বাবুর হোটেলে দেখা করতে যাওয়া, অমনি বাবু বহাল করলেন কাজে। সেখানে কাজ সাঙ্গ করে চূর্ণীর ধারে বেড়িয়ে এই আসছি।

—ওমা আমার কি হবে? ওরা আবার আপনাকে ডেকে বহাল করেছে! তবে মিথ্যে চুরির অপবাদ দিয়েছিল কেন? পদ্ম আছে তো?

—পদ্ম নেই তো যাবে কোথায়? আছে বলে আছে! খুব আছে।

পরে গর্ব্বের সুরে বলিল—আমায় না নিলে হোটেল যে ইদিকে চলে না। খদ্দেরপত্তর তো আদ্ধেক ফর্সা। সব উঠেছে গিয়ে বাঁড়ুযো মশায়ের হোটেলে।

হাজার হোক, হোটেলের মালিক, সুতরাং তাহার মনিবের সমশ্রেণীর লোক। হাজারি যদু বাঁড়ুযোর নামটা সমীহ করিয়াই মুখে উচ্চারণ করিল।

কুসুম যেন অবাক হইয়া খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—বসুন, জ্যাঠামশায়, আসছি আমি—

—না, না, শোনো। এখন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যেন কিছু কোরো না—

—আপনি বসুন তো। আসছি আমি—

কোনো কথাই খাটিল না। কুসুম কিছুক্ষণ পরে এক বাটি গরম সরদুধ ও দু-খানি বরফি সন্দেশ রেকাবিতে করিয়া আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—একটু জল সেবা করুন।

—ওঃ তো তোমাদের দোষ, বারণ করে দিলেও শোনো না—

কুসুম হাসিমুখে বলিল—কথা শুনবো এখন পরে—দুধটা সেবা করুন সবটা—ভালো দুধ—বাড়ীর গরুর। ঘন করে জাল দিয়েছি, দুপুর থেকে আকার ওপর বসানো ছিল।

—তুমি বড় মুশকিলে ফেললে দেখচি মা!···নাঃ—

হাজারিকে পান সাজিয়া দিয়া কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায় হোটেল ভাল লাগছে?

—তা মন্দ লাগছে না। আজ বেশ ভালই লাগলো। তবে ভাবছি কি জানো মা, এই রেল বাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

—শুধু বেশ চলে না জ্যাঠামশায়, খুব ভাল চলে। আপনার নিজের নামে হোটেল দিলে সব হোটেল কানা পড়ে যাবে।

—তোমার তাই মনে হয় মা?

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। খুলুন আপনি হোটেল।

—আর একজনও একথা বলেছে কালই। তোমার মত সেও আর এক মেয়ে আমার। আমাদের গাঁয়েরই—

—কে জ্যাঠামশায়?

—হরিবাবুর মেয়ে, অতসী ওর নাম, টেঁপির বন্ধু। খুব ভাব দুজনে। সে আমায় কাল বলছিল—

—আমাদের বাবুর মেয়ে? আমি দেখিনি কখনো। বয়েস কত?

—ওরা নতুন এসেছে গাঁয়ে, কোথা থেকে দেখবে। বয়েস ষোল-সতেরো হবে। বড় ভাল মেয়েটি।

—সবাই যখন বলছে, তাই করুন আপনি। টাকা আমি দেবো—

—অতসীও দেবে বলেছে। দু-জনের কাছে টাকা নিলে জাঁকিয়ে হোটেল দেবো। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আধুলি নিয়ে শেষে যদি লোকসান যায়, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। বরং অতসী বড় মানুষের মেয়ে—তার দুশো টাকা গেলে কিছু তার আসে যাবে না—

—না, আমার টাকাও খাটিয়ে দিতে হবে। সে শুনছি নে।

—আমি দুজনের টাকাই নেবো। কাল থেকে জায়গা দেখছি রও। তবে টাকা গেলে আমায় দোষ দিও না।

—জ্যাঠামশায়, আপনি হোটেল খুললে টাকা ডুববে না—আমি বলছি। এর পরেও যদি ডোবে, তবে আর কি হবে। আপনার দোষ দেবো না।

উঠিবার সময় কুসুম বলিল, জ্যাঠামশায়, পরশু সংক্রান্তির দিন বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবো ভাবছি, আপনি এখানে রাত্রে সেবা করবেন।

—তা কি করে হবে মা? আমি রাতে বারটার কম ছুটি পাবো না।

—তবে তার পর দিন দুপুরে? বেলা একটার সময় আসবেন। আমি লুচি ভেজে রাখবো, আপনি এসে তরকারি করে নেবেন। কথা রইলো, আসতেই হবে কিন্তু জ্যাঠামশায়।

হোটেলে ফিরিয়া সে বড় ডেকে রান্না চাপাইয়া দিল। বংশী ঠাকুর এবেলা এখনো আসে নাই, হাজারি অত্যন্ত খুশির সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—সেই অত্যন্ত পরিচিত পুরাতন রান্নাঘর, এমন কি একখানা পুরানো লোহার খুন্তি পাঁচমাস আগে টিনের চালের বাতার গায়ে সেই গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিল এখনও সেখানা সেই স্থানেই মরিচা-পড়া অবস্থায় গোঁজাই রহিয়াছে। সেই বংশী, সেই রতন, সেই পদ্মদিদি।

বংশী আসিয়া ঢুকিল। হাজারি বলিল—আজ পেঁপে কুটিয়ে দাও তো বংশী, একবার পেঁপের তরকারী মন দিয়ে রাঁধি অনেক দিন পরে। একদিনে বাঁড়ুজ্যে মশায়ের হোটেল কানা করে দেবো।

গদির ঘরে পদ্মঝিয়ের গলার আওয়াজ পাইয়া বংশী বলিল—ও পদ্মদিদি, শোনো ইদিকে —ও পদ্মদিদি—

পদ্মঝি থার্ডক্লাসের খাওয়ার ঘর পার হইয়া রান্নাঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে?

বংশী বলিল—কি কি রান্না হবে এবেলা? হাজারি বলেছে পেঁপের তরকারি রাঁধবে ভাল করে। দু-একটা ভালমন্দ আমাদের দেখাতে হবে আজ থেকে। পেঁপে তো রয়েছে—কি বল?

পদ্মঝি বলিল—না পেঁপে কাল হবে। আজ এবেলা বিলিতি কুমড়ো হোক। আর কুচো মাছের ঝাল করো। সাত আনা সের চিংড়ি ওবেলা গিয়েছে—এবেলা দেখি কি মাছ পাওয়া যায়।

হাজারি বলিল—পদ্মদিদি, আজ একটু মাংস হোক না ?

পদ্মঝি এতক্ষণ পর্য্যন্ত হাজারির সঙ্গে সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করে নাই। সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মাংস বুধবার হয়ে গিয়েছে। আজ আর হবে না—বরং শনিবার দিনে হবে।

হাজারি অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিল পদ্ম তাহার সহিত কথা বলাতে এবং পুলকের প্রথম মুহূর্ত্ত কাটিতে না কাটিতে তাহাকে একেবারে বিস্মিত ও চকিত করিয়া দিয়া পদ্মঝি জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর ?

হাজারি সাগ্রহে বলিল—আমার কথা বলছ পদ্মদিদি ?

—হ্যাঁ।

—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী। আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম—তারপর রাণাঘাটে আজ এসেছিলাম বেড়াতে। তা বাবু বল্লেন—

—হুঁ, বেশ থাকো না। তবে বাইরে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি। ওসব একদম বন্ধ করে দিয়েছেন বাবু। যা পারো এখানে খেও—বুঝলে ?—

—না বাইরে নিয়ে যাবো কেন পদ্মদিদি ? তা নিয়ে যাবো না।

—তোমার সেই কুসুম কেমন আছে ? দেখা করতে যাওনি ? পদ্মঝিয়ের কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও শ্লেষের আভাস।

হাজারি লজ্জিত ও অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—কুসুম ? হ্যাঁ তা কুসুম—ভালই—

পদ্মঝি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় যেন হাসিল। অন্ততঃ হাজারির তাহাই মনে হইল। পদ্মঝি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বংশী বলিল—যাক্ চাকরি তোমার পাকা হয়ে গেল হাজারিদা—দুপুরের পর আমরা চলে গেলে বোধ হয় কর্ত্তা-গিন্নীতে পরামর্শ হয়েছে—চলো এক ছিলিম সাজা যাক্।

হাজারি হাসিল। সব দিকেই ভালো, কিন্তু পদ্মদিদি কুসুমের কথাটা তুলিল কেন আবার ইহার মধ্যে ? ভারি ছোট মন—ছিঃ।

বংশী বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিল—ও হাজারিদা, এসো—টেনে নাও একটান—

গাঁজায় কষিয়া দম মারিয়া হাজারি আসিয়া আবার রান্নাঘরে বসিতেই হঠাৎ অতসীর মুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। দুর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে অতসী। কি মনটি চমৎকার। তাহার কাকাবাবু গাঁজা খায়, অতসী যদি দেখিত! ওই জন্যেই তো গ্রামে সে কখনো গাঁজা খায় না। ছেলেপিলের সামনে বড় লজ্জার কথা।

অতসী টাকা দিতে চাহিয়াছে, হোটেল তাহাকে খুলিতে হইবেই। কথাটা একবার বংশীকে বলিবে ? বংশী ও রতন ভাল লোক দু-জনেই, তাহাদের বিশ্বাস করা যায়।

দুজনেই তাহাকে ভালবাসে।

বংশীকে বলিল—আজকাল রাত্তিরে টিক্ হয় ?

—সব দিন হয় না। এখন নেবু সস্তা, নেবু দেওয়া হয়। পয়সায় ছ'সাতটা পাতিনেবু।

—একটা কিছু করে দেখাতে হবে তো ? বড়ির টিক্ করবো ভেবেছিলাম—

—তুমি ভাবলে কি হবে ? পদ্মদিদি পাস করলে তবে তো হাঁড়িতে উঠবে। ভুলে গেলে নাকি আইনকানুন, হাজারিদা ?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বংশী, একটু চা করে খেয়ে নিলে হোত না ? আছে তোড়জোড় ?

বংশী বলিল—খাবে ? আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। ডাল চড়িয়ে গরম জল এই ঘটিতে কেটে রেখো হাতা দিয়ে। চিনি আছে, চা আনিয়ে নিচ্ছি—মনে আছে আর বছর আমাদের চা খাওয়া ? আদার রস করেও দেবো এখন—

আধঘণ্টার মধ্যে হাজারি ও বংশী মনের আনন্দে কলাইকরা বাটি করিয়া চা খাইতেছিল। ভূতগত খাটুনির মধ্যেও ইহাতেই আনন্দ কি কম ? হাজারি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল—যেখানেই যার মন টেকে, বুঝলে বংশী। গোপালনগরে সন্দেবেলা রোজ ওদের মন্দিরে ঠাকুরের শেতল হয়—তার সন্দেশ, ফল কাটা, মুগের ডাল ভিজে খেতে দিত আমাকে। চা আমি করে নিতাম উনুনে। কিন্তু তাতে কি এমন মজা ছিল ? একা একা বসে রান্নাঘরে চা আর খাবার খেতাম, মন হু হু করতো। খেয়ে সুখ ছিল না—আজ শুধু চা খাচ্ছি, তাই যেন কত মিষ্টি !

রাত হইয়াছে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একখানা গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া হাজারি বলিল—ও বংশী, কেষ্টনগর এলো যে ! ডালে কাঁটা দিয়ে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে গোবরা চাকর খাবার ঘর হইতে হাঁকিল—থাড কেলাস দু-থালা—উত্তেজনায় হাজারির সারাদেহ কেমন করিয়া উঠিল। কি কাজের ভিড়, কি লোকজনের হৈ চৈ, কি ব্যস্ততা—ইহার মধ্যেই তো মজা। তা নয়, গোপালনগরের মত পাড়াগাঁ জায়গায় কুসুমের বৃহৎ নিস্তব্ধ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধ রান্নাঘরের কোণে বসিয়া কড়িকাঠ গুনিতে গুনিতে আর বাড়ীর পিছনের বাগানের তেঁতুল গাছে বাদুড় ঝোলা ডালপালার দিকে চাহিয়া চাহিয়া রান্না করা—সে কি তাহার পোষায় ! সে হইল শহরের মানুষ।

সংক্রান্তির পরের দিন কুসুমের বাড়ী বেলা প্রায় বারোটার সময় সে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। বংশী ঠাকুরকে বলিয়া একটু সকাল সকাল হোটেল হইতে বাহির হইল।

কুসুম গোয়ালঘরের নতুন উনুনে আলাদা করিয়া কপির ডালনা রাঁধিতেছে—একখানা কলার পাতায় খানকতক বেগুন ভাজা ও একটা পাথরের খোরায় ছোলার ডাল। শুদ্ধাচারে সব করিতে হইতেছে বলিয়াই পাথরের খোরা ও কলাপাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা—হাজারি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—কুসুমের কাণ্ড ছাখো ! থাকি হোটেলে—কত ছোঁয়ালেপা হয়ে

যায় তার নেই ঠিক—ও আবার নেয়ে ধুয়ে ধোয়া কাপড় পরে গুরুঠাকুরের মত যত্ন করে রাঁধতে বসেচে।

কুসুম সলজ্জ হাসিয়া বলিল—জ্যাঠামশায়, এখনও হয়নি। একটু দেরি আছে—আমি কিন্তু তরকারি সব রেঁধেছি—আপনি শুধু বসে যাবেন—

হাজারি বলিল—তুমি তরকারি রাঁধলে যে বড়! সে কথা তো ছিল না। আমি তোমার তরকারি খাবো কেন?

—ঠকাতে পারবেন না জ্যাঠামশাই। কোনো তরকারিতে নুন দিইনি। নুন না দিলে খেতে আপনার আপত্তি কি? ভাবলাম আপনি অত বেলায় এসে তরকারি রাঁধবেন সে বড় কষ্ট হবে—লুচি ভাজা আর কি হাঙ্গামা, দেরি তো হবে তরকারি রাঁধতে। তাই নিয়ে এসে—

—নুন দাওনি। না মা তুমি হাসালে দেখ্‌চি। আলুনি তরকারি খাওয়াবে তোমার বাড়ী?

—আর গোয়ালার মেয়ে হয়ে আমি নিজের হাতের রান্না তরকারি খাইয়ে আপনার জাত মেরে দেবো—নরকে পচ্‌তে হবে না আমাকে তার জন্যে?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, দাও ময়দাটা। মেখে নিই ততক্ষণ—

—সব ঠিক আছে জ্যাঠামশাই। কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি বরং শুধু নেচি কেটে লুচিগুলো বেলে দিন—কাপটা হয়ে গেলেই চাটনি রাঁধব—তারপর লুচি ভেজে গরম গরম—ওতে কি জ্যাঠামশায়?··· ও কি?

হাজারি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিতে করিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—এই কিছু নতুন গুড়ের সন্দেশ—মাজ পয়লা তারিখে ও মাসের ক'দিনের মাইনেটা দিলে কি না—তাই ভাবলাম একটুখানি মিষ্টি—

কুসুম রাগ করিয়া বলিল—এ আপনার বড্ড অন্যায় কিন্তু জ্যাঠামশাই। আপনার এই সবে চাকুরির মাইনে—আমার জন্যে খরচ করে সন্দেশ না কিনলে আর চলতো না? আপনার দণ্ড করতে আমার এখানে সেবা করতে বলেছি?···না, এসব কি ছেলেমানুষী আপনার—

হাজারি শালপাতার ঠোঙাটি দাওয়ার প্রান্তে অপরাধীর মত সঙ্কোচের সহিত নামাইয়া রাখিয়া বলিল—আমার কি ইচ্ছে করে না মা, তোমার জন্যে কিছু আনতে? বাবা মেয়েকে খাওয়ায় না বুঝি?

হাজারির রকম-সকম দেখিয়া কুসুমের হাসি পাইলেও সে হাসি চাপিয়া রাগের সুরেই বলিল—না ভারি চটে গিয়েছি—পয়সা হাতে এলেই অমনি খরচ করার জন্যে হাত সুড়সুড় করে বুঝি? ভারী বড়লোক হয়েছেন বুঝি? ও মাসের সাতটা দিন কাজ করে কত মাইনে পেয়েছেন যে এক টাকার সন্দেশ আনলেন অমনি? হাজারি চুপ করিয়া অপ্রতিভ মুখে বসিয়া রহিল।

—আসুন ইদিকে, এই আসনখানায় বসুন, ময়দাটা নেচি করুন এবার—

মা কাহাকে অত বকিতেছে দেখিতে কুসুমের ছেলে মেয়ে কোথা হইতে আসিয়া সামনে উঠানে দাঁড়াইতেই হাজারি ঠোঙা হইতে সন্দেশ লইয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু দিয়া বলিল—থাক, নাতিনাতনী তো আগে খাক্—মেয়ে খায় না খায় বুঝবে পরে—

পরে কুসুমের দিকে ফিরিয়া বলিল—নাও হাত পাতো, আর রাগ করে না—

কুসুম এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—আমি রাঁধতে রাঁধতে খাব?

—কেন আলগোছে?

—না।

—কেন?

—আমি বুড়ো মাগী, ভোগের আগে পেরসাদ পেয়ে বসে থাকি আর কি!

হাজারি বুঝিল তাহার খাওয়া না হইয়া গেলে কুসুম কিছুই খাইবে না। সে বিনা বাক্য-ব্যয়ে লুচির ময়দা লইয়া বসিয়া গেল।......

কুসুম বলিল—হোটেল খুলবার কি করলেন?

—গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। দেখেচ ঘরখানা?

কুসুম উৎফুল্ল হইয়া বলিল—কবে খুলবেন?

—সামনের মাসে। টাকা দেবে তো?

কুসুম গলার সুর নীচু করিয়া বলিল—আস্তে আস্তে। কেউ শুনবে—

—তোমার শাশুড়ী কই?

—আমি যেতে পারলাম না বাইরে, তাই দুধ নিয়ে বেরিয়েছে—এল বলে।

—বাত সেরেছে?

—মরচের মাদুলী নিয়ে এখন ভাল আছে। আগে মধ্যে দিনকতক পঙ্গু হয়ে পড়েছিল—তার চেয়ে ঢের ভাল। আপনার জায়গা করে দিই—ওগুলো ভেজে ফেলুন—গরম গরম দেবো—

হাজারি খাইতে বসিল। কুসুম কাছে বসিয়া কখনও লুচি, কখনও তরকারি দিতে দিতে বলিল—আপনি তরকারিতে বেশী করে নুন মেখে খান—

—রান্না চমৎকার হয়েছে মা—

—থাক আপনার আর—

—হোটেল যেদিন খুলবো, সেদিন তোমায় নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াবো—

—না। ও সব করতে দেবো না। বুঝেসুঝে চলতে হবে না? টাকা নিয়ে ভুতোনন্দি কাণ্ড করবেন?

—কিছু করবো না। তুমি চেন না আমায়।

—আমার জন্তে এক পয়সা খরচ করতে পাবেন না আপনি বলে দিচ্ছি। তাহ'লে

আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ করে দেবো—ঠিক।

পনেরো দিন পরে হাজারি স্বগ্রামে সংসারের খরচপত্র দিতে গেল। বৈকালে হরিবাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিল হরিবাবু বৈঠকখানায় আরও দুটি অপরিচিত ভদ্রলোকের সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে এস হাজারি, বসো বসো। এঁরা এসেছেন কলকাতা থেকে অতসীকে দেখতে—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। রাত্রে আমার এখানে খেও আজ—

অতসীর তাহা হইলে বিবাহ? যদি ইতিমধ্যে তার বিবাহ হইয়া যায়, সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলে টাকাকড়ির ব্যাপার চাপা পড়িয়া যাইবে। হাজারি একটু দমিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে হরিবাবু বলিলেন—আমি সন্ধ্যাহ্নিকটা সেরে আসি—আপনাদের ততক্ষণ চা দিয়ে যাক।

ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিলে একত্রে চা খাওয়া যাইবে। তাঁহারা ততক্ষণ একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই অতসী আসিয়া বৈঠকখানায় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা হইতে একবার সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—এসো, এসো মা। ভাল আছ?

—আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু? গোপালনগর থেকে আসছেন?

—না মা। আমি গোপালনগরে আর নেই তো? রাণাঘাটের সেই হোটেলে কাজ আবার নিয়েছি যে। ওরা ডেকে বহাল করলে।

—করবে না? আপনার মত লোক পাবে কোথায়? আমায় এবার একটা কিছু শিখিয়ে দিয়ে যান, কাকাবাবু। আপনার নাম করবো চিরকাল।

—মা, এ হাতেকলমের জিনিস। বলে দিলে তো হবে না, দেখিয়ে দিতে হবে। তার সুবিধে হবে কি? আমি এর আগেও তোমাকে তো বলেছি একথা।

—কাল আপনার বাড়ী যাবো এখন। টেঁপিকে বলবেন। তাকে নিয়ে এলেন না কেন? তাকে নিয়ে আসবেন, সেও আমাদের এখানে রাত্রে খাবে।

অতসী একটু পরেই চলিয়া গেল, কারণ আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে।

পরদিন সকালে টেঁপির মা উঠানে ঝাঁট দিতেছে এমন সময়ে অতসী বাড়ীর উঠানের মাচাতলা হইতে ডাকিল—টেঁপি, ও টেঁপি—

টেঁপির মা তাড়াতাড়ি হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের মেয়ে অতসী গ্রামের কাহারও বাড়ী বড় একটা যায় না, তাহাদের মত গরীব লোকের বাড়ী যে যাতায়াত করিতেছে—ইহা ভাগ্যের কথাও বটে, গর্ব্ব করিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত কথাও বটে।

হাসিয়া বলিল—টেঁপি বাসন নিয়ে পুকুরে গিয়েছে—এসো বসো মা।

—কাকাবাবু কোথায় ?

হাজারি কাল রাত্রে অতসীদের বাড়ী গুরুতর আহার করিলেও আজ হাঁটিয়া তিন ক্রোশ পথ রাণাঘাট যাইবে, এই ওজুহাতে বড় এক বাটি চালভাজা নুন লঙ্কা সহযোগে ঘরের ওদিকে দাওয়ায় বসিয়া চর্ব্বণ করিতেছিল—অতসী পাছে এদিকে আসিয়া পড়ে এবং তাহার চালভাজা খাওয়া দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে বাটিটা সে তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড় দিয়া চাপা দিল।

অতসী আসিয়া বলিল—কই কাকাবাবু কোন্ দিকে বসে ?

ওঃ, খুব সময়ে চালভাজার বাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সে।··· অতসী তাহাকে রাক্ষস ভাবিত—রাত্রের ওই ভীষণ খাওয়ার পরে সকাল হইতে না হইতেই—

—এই যে মা—কি মনে করে এত সকালে ?

—আপনি আমাদের বাড়ী দুপুরে খাবেন তাই বলতে বলে দিলেন বাবা—

—না মা আমি এখুনি বেরুচ্ছি রাণাঘাট—ছুটি তো নেই—আর কাল রাতে যে খাওয়া হয়েছে তাতে—

—তবে টেঁপি আর খুড়ীমা খাবেন—ওঁদের নেমন্তন্ন—আমি বলে যাচ্ছি ওঁদের। বলিয়া অতসী দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল দেখিয়া হাজারি প্রমাদ গণিল। একে সময় নাই, দশটার মধ্যে হোটেলে পৌঁছিয়া রান্না চাপাইতে হইবে। এক বাটি চালভাজা চিবাইতেও তো সময় লাগে! হতভাগা মেয়েটা সব মাটি করিল!···বাটিটা লুকাইয়া বসিয়া থাকাই বা কতক্ষণ চলে ?

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমার সঙ্গে যদি আপনার আর দেখা না হয় ?

—কেন দেখা হবে না ?

অতসী লাজুক মুখে বলিল—ধরুন যদি আমি—এখান থেকে যদি—

—বুঝেছি মা, ভালই তো, আনন্দের কথাই তো।

—আপনারা তাড়াতে পারলে বাঁচেন তা জানিই। মার মুখেও সেই এক কথা, বাবার মুখেও সেই এক কথা। সে যা হয় হবে আমি তা বলছি নে। আমি বলছি আপনি আজ থেকে যান, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে—সেই টাকা, মনে আছে তো ? আপনাকে তা আজ দিয়ে দিই। যদি বলেন তো এখুনি আনি। আমার মনের ভার কমে যায়, তারপর যেখানে আপনারা আমায় বিদেয় করে দেন দেবেন—

—ওকি মা। বিদেয় তোমায় কেউ করছে না। অমন কথা বলতে নেই।···কিন্তু টাকা নিতান্তই দেবে তা'হলে ?

—যখন বলেছি, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন কাকাবাবু আমি মিথ্যে বলছি ?

—তা ভাবিনি—আচ্ছা ধরো এমন তো হতে পারে, আমি হোটেল খুলে লোকসান দিলাম, তখন তোমার টাকা তো শোধ দিতে পারবো না ?

—আমি তো বলেছি, না দিতে পারেন তাই কি ?……আপনি বসুন, আমি টাকা নিয়ে আসি—

আধঘণ্টার মধ্যে অতসী ফিরিল। সন্তর্পণে আঁচলের গেরো খুলিয়া তাহাকে দুইশত টাকার খুচরা নোট গুনিয়া দিতে দিতে বলিল—এই রইল। আমার টাকা ফেরত দিতে হবে না। টেঁপির বিয়ে দেবেন সে টাকায়। আমি যাই, লুকিয়ে চলে এসেছি, বাবা খুঁজবেন আবার।

রাণাঘাট যাইতে সারাপথ হাজারি অন্যমনস্কভাবে চলিল ··

বেশ মেয়ে অতসী, ভগবান ওর ভাল করুন। তাহার মন বলিতেছে ওর হাত দিয়া যে টাকা আসিয়াছে—সে টাকায় ব্যবসা খুলিলে লোকসান যাইবে না। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তাহার হাতে আসিয়া টাকা গুঁজিয়া দিয়া গেলেন। · ···

হোটেলে পৌঁছিয়া সে দেখিল রান্নাঘরে বংশী ঠাকুর ডাল চাপাইয়া একা বসিয়া। তাহাকে দেখিয়া বলিল—আরে এসো হাজারি-দা, বড্ড বেলা করলে যে! বড় ডেকে ভাতটা চাপাও—নেবে নাকি একটু দম দিয়ে ?

—তা নাও না ? সাজো গিয়ে—আমি ডাল দেখছি—

একটু পরে গাঁজার কলিকাটি হাজারির হাতে দিয়া বংশী বলিল—একটা বড় কাজের বায়না এসেচে, নেবে ? আন্দুলের ঘোষেদের বাড়ী রাস হবে—সাতদিনের ঠিকে কাজ। বঁদে ভিয়েন, সন্দেশ ভিয়েন, রান্না এই সব। দু'টাকা মজুর দিন—খোরাকি বাদে।

হাজারি বলিল—বংশী একটা কথা বলি তোমায়। আমি হোটেল খুলছি রাণাঘাটের বাজারে। কাউকে বোলো না কথাটা। তোমাকে আসতে হবে আমার হোটেলে।

কথাটা ঠিক শুনিয়াছে বলিয়া বংশীর যেন মনে হইল না। সে অবাক্ হইয়া উহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল খুলবে ? তুমি !

—হাঁ, আমি না কে ? তোমার বেহাই ?

বংশী বলিল—কি পাগলের মত বলছ হাজারি-দা ? কল্কে রাখো, আর টান দিও না। রেলবাজারে একটা হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে তুমি জানো ?

—কত টাকা বলে তোমার মনে হয় ?

—পাঁচশো টাকার কম নয়।

—চারশোতে হয় না ?

—আপাততঃ চলবে—কিন্তু কে তোমায় চারশো টাকা—

উত্তরে কোঁচার কাপড়ের গেরো খুলিয়া হাজারি বংশীকে নোটের তাড়া দেখাইয়া বলিল—এই দেখছো তো দুশো টাকা এতে আছে। যোগাড় করে এনেছি। এখন লাগো গাছকোমর বেঁধে—তোমায় অংশ থাকবে যদি প্রাণপণে চালাতে পারো—তোমায় ফাঁকি দেবো না। আজ থেকেই বাড়ী দেখ—পনেরো টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া দেবো—আর দুশো টাকাও যোগাড় আছে।

বংশী ঠাকুর মুখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিল—জ্যালা আমার মানিক রে।

হাজারি-দা, এসো তোমায় কোলে করে নাচি। এক অস্ত্রে বেচু চক্কত্তি বধ, পদ্মদিদি বধ, যদু বাঁড়ুয্যে বধ—

—চুপ, চুপ,—চলো ছুটির পর দুজনে ঘর দেখা যাক্। তামাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। জায়গাটা ভাল। আচ্ছা, বাজার কেমন, বংশী?

—বাজার ভালো। নতুন আলু সস্তা হোলে আরও সুবিধে হবে। নতুন আলু উঠলো বলে। কেবল মাছটা এখনও আক্রা—

—ঘর দেখার পর একটা ফর্দ্দ করে ফেলা যাক এসো। থালা বাসন, বালতি, জালা, শিলনোড়া, বঁটি—

—আজ খাওয়াও হাজারি-দা। মাইরি, একটা কাজের-মত কাজ করলে। আচ্ছা টাকা পেলে কোথায় বল না?

—পরে বলবো সব। তার ঢের সময় আছে। এখন আগেকার কাজ আগে করো।

পদ্মঝি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—বেশ তো দুটিতে বসে খোসগল্প চলছে। উদিকে মাছ ভাজায়, তরকারি ভাজায়—এখুনি লোক খেতে আসবে—

গোবরা চাকর হাঁকিল—থাড্ কেলাস একথালা—

পদ্মঝি বলিল—ওই! এলো তো? এখন মাছ ভাজা পর্য্যন্ত হোল না যে তাই দিয়ে ভাত দেবে। এদিকে গাঁজার ধোঁয়ায় তো রান্নাঘর অন্ধকার—সব তাড়াতে হবে তবে হোটেল চলবে। কর্ত্তার খেয়েদেয়ে নেই কাজ তাই যত হাড়হাভাতে উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আবার জুটিয়ে এনে হাতাবেড়ি হাতে দিয়েছে—

বংশী ঠাকুর বলিল—রাগ করো কেন পদ্মদিদি, কাল রাতের বাসি মাছ ভেজে রেখেছি—থাড্ কেলাসের খদ্দের যারা সকালে খায়, তাই চিরকাল খেয়ে আসছে।

হাজারি বংশীর দিকে চাহিয়া বলিল—না বংশী দই এনে দাও সেও ভাল। বাসি মাছ দিও না—ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—ও থাক।

পদ্মঝি ঝাঁজের সহিত বলিল—দইয়ের পয়সা তুমি দিও তবে ঠাকুর। হোটেল থেকে দেওয়া হবে না। তুমি বেলা করে বাড়ী থেকে এলে বলেই মাছ হোল না। বংশী ঠাকুর একা কত দিকে যাবে?

হাজারি চুপ করিয়া রহিল।

হোটেলের ছুটির পর হাজারি চূর্ণীঘাটে যাইবার পথে রাধাবল্লভতলায় বার বার নমস্কার করিয়া গেল। ঠাকুর রাধাবল্লভ এতদিন পরে যেন মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাহার সেই প্রিয় গাছটির তলায় বসিয়া হাজারি কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। অতসী টাকা দিয়া দিয়াছে, তাহার বাড়ী বহিয়া আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে—হয়তো সে হোটেল খুলিতে দেরি করিত, কিন্তু আর দেরি করা চলিবে না। অতসী-মায়ের কাছে কথা দিয়াছে, সে কথা রাখিতে হইবেই তাহাকে।

রাণাঘাট বেশ লাগে তাহার, বেচুবাবুর হোটেল তো একমাত্র জায়গা যেখানে তাহার মন

ভাল থাকে, জীবনটা শান্তিতে কাটাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই রাণাঘাটের রেলবাজার ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এখানেই হোটেল খুলিবে, অন্যত্র নয়।

বৈকালের দিকে সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম বলিল—আজকে এলেন? আসুন, বসুন।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—একটা জিনিস রাখতে হবে মা।

—কি?

হাজারি পেট-কোঁচড় হইতে দু'শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—রেখে দাও।

কুসুম অবাক হইয়া বলিল—কোথায় পেলেন?

—ভগবান দিয়েছেন। হোটেল খুলবার রেস্ত জুটিয়ে দিয়েছেন এতদিন পরে—এই দু'শো, আর তোমার দু'শো, সামনের মাসেই খুলবো ভাবছি।

—এ টাকা কে দিলে জ্যাঠামশায় বললেন না আমায়?

—তোমার মত আর একটি মা।

—আমি চিনিনে?

—আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ে অতসী। বলবো সে সব কথা আর একদিন, আজ বেলা যাচ্ছে, আমি গিয়ে ডেক চাপাই গে—টাকা রেখে দাও এখন।

হোটেলে আসিয়া বংশীকে বলিল—তোমার ভাগ্নেটিকে চিঠি লিখে আনাও বংশী। তাকে গদিতে বসতে হবে। লেখাপড়ার কাজ তো আমায় বা তোমায় দিয়ে হবে না।

বংশী বলিল—সে তো বসেই আছে হাজারি-দা। একটা কাজ পেলে বেঁচে যায়। আমি আজই লিখছি আর ঘর আমি দেখে এসেছি—তামাকের দোকানের পাশে ঘরটা ভাল—ওইটেই নাও। লেগে যাও দুর্গা বলে।

দিন দুই পরে একদিন সকালে পদ্মঝি বলিল—ও ঠাকুর, শুনে রাখো, আজ কোথাও যেও না সব ছুটির পরে। আজ ও-বেলা সত্যনারায়ণের সিন্নি—খদ্দেরদের ভাত দেবার সময় বলে দিও ও-বেলা যেন থাকে—আর তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে সত্যনারায়ণের বাজার করতে।

বংশী ঠাকুর হাজারির দিকে চাহিয়া হাসিল—অবশ্য পদ্মঝি চলিয়া গেলে।

ব্যাপারটা এই, হোটেলের এই যে সত্যনারায়ণের পূজা, ইহা ইহাদের একটি ব্যবসা। যাহারা মাসিক হিসাবে হোটেলে খায় তাহাদের নিকট হইতে পূজার নাম করিয়া চাঁদা বা প্রণামী আদায় হয়। আদায়ী টাকার সব অংশ ব্যয় করা হয় না বলিয়াই হাজারি বা বংশীর ধারণা। অথচ, সত্যনারায়ণের প্রসাদের লোভ দেখাইয়া দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা তাহাদেরও রাত্রে আনিবার চেষ্টা করা হয়—কারণ এমন অনেক নগদ খরিদ্দার আছে, যাহারা একবেলা হোটেলে খাইয়া যায়, দু-বেলা আসে না।

বংশী ঠাকুর পরিবেশনের সময় প্রত্যেক ঠিকা খরিদ্দারকে মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে বাবু, ও-বেলা সত্যনারাণ হবে হোটেলে, আসবেন ও-বেলা—অবিশ্যি করে আসবেন—

বাহিরে গদির ঘরে বেচু চক্কত্তিও খরিদ্দারদিগকে ঠিক অমনি বলিতে লাগিল।

বংশী ঠাকুর হাজারিকে আড়ালে বলিল—সব ফাঁকির কাজ, এক চিলতে কলার পাতার আগায় এক হাত্তা করে গুড় গোলা আটা আর তার ওপর দুখানা বাতাসা—হয়ে গেল এর নাম তোমার সত্যনারাণের সিন্নি। চামার কোথাকার—

সন্ধ্যার সময় পূর্ণ ভট্‌চাজ সত্যনারায়ণের পূজা করিতে আসিলেন। বাসনের ঘরে সত্যনারায়ণের পিঁড়ি পাতা হইয়াছে। হোটেলের দুই চাকর মিলিয়া ঘড়ি ও কাঁসর পিটাইতেছে, পদ্মঝি ঘন ঘন শাঁকে ফুঁ পাড়িতেছে—খানিকটা খরিদ্দার আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেও বটে।

স্টেশনে যে চাকর 'হি-ই-ই-ন্দু হো-টে-ল-ল' বলিয়া চেঁচায়, তাহাকেও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সে যাত্রীদের প্রত্যেককে বলিতেছে—'আসুন বাবু, সিন্নি পেরসাদ হচ্চেন হোটেলে, খাওয়ার বড্ড জুৎ আজগে—আসুন বাবু—'

যাহারা নগদ পয়সার খরিদ্দার, তাহারা ভাবিতেছে—অন্য হোটেলেও তো পয়সা দিয়া খাইবে যখন তখন সত্যনারায়ণের প্রসাদ ফাউ যদি পাওয়া যায়, বেচু চক্কত্তির হোটেলেই যাওয়া যাক্ না কেন। ফলে যদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের দৈনিক নগদ খরিদ্দার যাহারা, তাহারাও অনেকে আসিয়া জুটিতেছে এই হোটেলে। এদিকে নগদ খরিদ্দারদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের সিন্নি খাইতে দেওয়া হইবে ভাতের পাতে অর্থাৎ টিকিট কিনিয়া ভাত খাইতে ঢুকিলে তবে। নতুবা সিন্নিটুকু খাইয়া লইয়াই যদি খরিদ্দার পালায়?

মাসিক খরিদ্দারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা। তাঁহারা চাঁদা দিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের খাতির করাও দরকার; পূজা সাঙ্গ হইলে তাহাদের সকলকে একত্র বসাইয়া প্রাসাদ খাইতে দেওয়া হইল—বেচু চক্কত্তি নিজে প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহারা আর একটু করিয়া প্রসাদ লইবে কি না।

যখন ওদিকে মাসিক খরিদ্দারগণকে সিন্নি বিতরণ করা হইতেছে, সে সময় হাজারি দেখিল রাস্তার উপর যতীন মজুমদার দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। সেই যতীন…

হাজারির মনে হইল লোকটার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন অনাহার-শীর্ণ চেহারা। সে ডাকিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, কেমন আছেন?

যতীন মজুমদার অবাক হইয়া বলিল—কে হাজারি নাকি? তুমি আবার কবে এলে এখানে?

—সে অনেক কথা বলবো এখন। আসুন না—আসুন—

যতীন ইতস্ততঃ করিয়া রান্নাঘরের পাশে বেড়ার গায়ের দরজা দিয়া হোটেলে ঢুকিয়া রান্নাঘরের দোরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি দেখিল তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে অতি মলিন উড়ানি, পরনের ধুতিখানিও তদ্রূপ। আগের চেয়ে রোগাও হইয়া গিয়াছে লোকটা। দারিদ্র্য ও অভাবের ছাপ চোখে মুখে বেশ পরিস্ফুট।

যতীন শাষ্টহাসি হাসিয়া বলিল—আরে, তোমাদের এখানে বুঝি সত্যনারায়ণ হচ্চে আজগে? আগে আমিও কত এসেচি খেয়েছি—

—তা খাবেন না? আপনি তো ছিলেন বারোমাসের বাঁধা খদ্দের—তা আসুন পেরসাদ খেয়ে যান—

যতীন ভদ্রতা করিয়া বলিল—না না, থাক্ থাক্—তার জন্যে আর কি হয়েছে—

হাজারি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোনোদিকে নাই। সবাই খাবার ঘরে মাসিক খরিদ্দারের আদর আপ্যায়ন করিতে ব্যস্ত—সে কলার পাত পাতিয়া যতীনকে বসাইল এবং পাশে বাসনের ঘর হইতে বড় বাটির একবাটি সত্যনারায়ণের সিন্নি, একমুঠা বাতাসা ও-দুটি পাকা কলা আনিয়া যতীনের পাতে দিয়া বলিল—একটু পেরসাদ খেয়ে নিন—

যতীন মজুমদার দ্বিরুক্তি না করিয়া সিন্নির সহিত কলাদুটি চটকাইয়া মাখিয়া লইয়া যেভাবে গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল, তাহাতে হাজারির মনে হইল লোকটা সত্যই যথেষ্ট ক্ষুধার্ত্ত ছিল, বোধ হয় ওবেলা আহার জোটে নাই। তিন চার গ্রাসে অতখানি সিন্নি সে নিঃশেষে উড়াইয়া দিল।

হাজারি বলিল—আর একটু নেবেন?

যতীন পূর্ব্বের মত ভদ্রতার সুরে বলিল—না না, থাক্ থাক্ আর কেন—

হাজারি আরও এক বাটি সিন্নি আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিতে যতীনের মুখচোখ যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে এমন সময় পদ্মঝি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া হাজারিকে কি একটা বলিতে গেল এবং গোগ্রাসে ভোজনরত যতীন মজুমদারকে দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ও কে?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, চিনতে পাচ্ছ না পদ্মদিদি? আমাদের পুরোনো বাবু। যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তা আমি বললাম আজ পুজোর দিনটা একটু পেরসাদ পেয়ে যান বাবু—

পদ্মঝি বলিল—বেশ—বলিয়াই সে ফিরিয়া আবার গিয়া মাসিক খরিদ্দারদের খাবার ঘরে ঢুকিল।

যতীন ততক্ষণ পদ্মঝিকে কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না তাহার। সে খাওয়া শেষ করিয়া এক ঘটি জল চাহিয়া লইয়া খাইয়া চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরেই গোবরা চাকর আসিয়া বলিল—ঠাকুর, কর্ত্তা তোমাকে ডাকছেন—

হাজারি বুঝিয়াছিল কর্ত্তা কি জন্য তাহাকে জরুরী তলব দিয়াছেন। সে গিয়া বুঝিল তাহার অনুমান সত্য—কারণ পদ্মঝি মুখ ভার করিয়া গদির ঘরে বেচু চক্কত্তির সামনে দাঁড়াইয়া। বেচু চক্কত্তি বলিলেন—হাজারি, তুমি যতনেটাকে হোটেলে ঢুকিয়ে তাকে বসিয়ে সিন্নি খাওয়াচ্ছিলে?

পদ্মঝি হাত নাড়িয়া বলিল—আর খাওয়ানো বলে খাওয়ানো! এক এক গামলা সিন্নি দিয়েছে তার পাতে—ইচ্ছে ছিল লুকিয়ে খাওয়াবে, ধর্ম্মের ঢাক বাতাসে নড়ে, আমি গিয়ে পড়েছি সেই সময় বড় ডেক্ নামলো কি না তাই দেখতে—আমায় দেখে—

হাজারি বিনীত ভাবে বলিল—সত্যনারাণের পেরসাদ বলেই বাবু দিয়েছিলাম—আমাদের পুরোনো খদ্দের—

বেচু চক্কত্তি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পুরোনো খদ্দের? ভারি আমার পুরোনো খদ্দের রে? হোটেলের একটি মুঠো টাকা ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, ভারি খদ্দের আমার! চার মাস বিনি পয়সায় খেয়ে গেল একটি আধ্‌লা উপুড়-হাত করলে না, পয়লা নম্বরের জুয়াচোর কোথাকার—খদ্দের! তুমি কার হুকুমে তাকে হোটেলে ঢুকতে দিলে শুনি?

পদ্মঝি বলিল—আমি কোনো কথা বল্লেই তো পদ্ম বড় মন্দ। এই হাজারি ঠাকুর কি কম শয়তান নাকি—বাবু? আপনি জানেন না সব কথা, সব কথা আপনার কানে তুলতেও আমার ইচ্ছে করে না। লুকিয়ে লুকিয়ে হোটেলের আদ্ধেক জিনিস ওঠে ওর এয়ার বক্‌শীদের বাড়ী। যত্‌নে ঠাকুর ওর এয়ার, বুঝলেন না আপনি? বহাল করেন লোক, তখন আমি কেউ নই—কিন্তু হাতে হাতে ধরে দেবার বেলা এই জনা না হোলেও দেখি চলে না—এই দেখুন আবার চুরি-চামারি শুরু যদি না হয় হোটেলে, তবে আমার নাম—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—এটা তোমার নিজের হোটেল নয় যে তুমি হাজারি ঠাকুর এখানে যা খুশি করবে। নিজের মত এখানে খাটালে চলবে না জেনো। তোমার আট আনা জরিমানা হোল।

হাজারি বলিল—বেশ বাবু, আপনার বিচারে যদি তাই হয়, করুন জরিমানা। তবে যতীন-বাবু আমার এয়ারও নয় বা সে সব কিছুই নয়। এই হোটেলেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ—ওঁকে দেখিনিও কতদিন। পদ্মদিদি অনেক অনেয্য কথা লাগায় আপনার কাছে—আমি আসছে মাস থেকে আর এখানে চাকরি করবো না।

পদ্মঝি এ কথায় অনর্থ বাধাইল। হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল—লাগায়? লাগায় তোমার নামে? তুমি যে বড় লাগাবার যুগ্যি লোক। তাই পদ্ম লাগিয়ে লাগিয়ে বেড়াচ্চে তোমার নামে। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোমার মত লোককে পদ্ম গেরাহ্যির মধ্যে আনে না তা তুমি ভাল করে বুঝো ঠাকুর। যাও না, তুমি আজই চলে যাও। সামনের মাসে কেন, মাইনেপত্তর চুকিয়ে আজই বিদেয় হও না—তোমার মত ঠাকুর রেল-বাজারে গণ্ডায় গণ্ডায় মিলবে—

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—চুপ চুপ পদ্ম, চুপ করো। খদ্দেরপত্র আসচে যাচ্চে, ওকথা এখন থাক। পরে হবে—আচ্ছা তুমি যাও এখন হাজারি ঠাকুর—

অনেক রাত্রে হোটেলের কাজ মিটিল।

শুইবার সময় হাজারি বংশীকে বলিল—দেখলে তো কি রকম অপমানটা আমার করলে পদ্মদিদি? তুমিও ছাড়, চল দুজনে বেরিয়ে যাই। ভাখো একটা কথা বংশী, এই হোটেলের

ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, মুখে বলি বটে যাই যাই --কিন্তু যেতে মন সরে না। কতকাল ধরে তুমি আর আমি এখানে আছি ভেবে ভাখো তো? এ যেন আপনার ঘর বাড়ী হয়ে গিয়েচে—তাই না? কিন্তু এরা—বিশেষ করে পদ্মদিদি এখানে টিকতে দিলে না—এবার সত্যিই যাবো।

বংশী বলিল—যতীনকে তুমি ডেকে দিলে না ও আপনি এসেছিল?

—আমি ডেকেছিলাম। ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েচে, আজকাল খেতেই পায় না। তাই ডাকলাম। বলি পুরোনো খদ্দের তো, কত লোক খেয়ে যাচ্চে, ও একটু পিণ্ডি খেয়ে যাক্। এই তো আমার অপরাধ।

পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের পাশেই নূতন হোটেলটা খুলিল। টিনের সাইনবোর্ড লেখা আছে—

আদর্শ হিন্দু-হোটেল

হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।

ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

বেচু চক্কত্তির হোটেলের অনুকরণে সামনেই গদির ঘর। সেখানে বংশী ঠাকুরের ভাগ্নে সেই ছেলেটি কাঠের বাক্সের উপর খাতা ফেলিয়া খরিদ্দারগণের আনাগোনার হিসাব রাখিতেছে। ভিতরে রান্না করিতেছে বংশী ও হাজারি—বেচু চক্কত্তির হোটেলের মতই তিনটি শ্রেণী করা হইয়াছে, সেই রকম টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়।

তা নিতান্ত মন্দ নয়। খুলিবার দিন দুপুরের খরিদ্দার হইল ভালই! বংশী খাইবার ঘরে ভাত দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া হাজারিকে বলিল—থাড্ কেলাস ত্রিশ খানা। প্রথম দিনের হক্কে যথেষ্ট হয়েচে। ওবেলা মাংস লাগিয়ে দাও।

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিয়াছেন। হাজারি এখন হোটেলের মালিক। বেচু চক্কত্তির সমান দরের লোক সে আজ। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যত জানাশোনা পরিচিত লোক যে যেখানে আছে—সকলকেই কথাটা বলিয়া বেড়ায়। মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া বৈকালে কুসুমের বাড়ী গিয়া হাজির হইল। কুসুম বলিল—কেমন চললো হোটেল জ্যাঠামশায়?

—বেশ খদ্দের পাচ্চি। আমার বড্ড ইচ্ছে তুমি একবার এসে দেখে যাও—তুমি তো অংশীদার—

—যাবো এখন! কাল সকালে যাবো। আপনার মনিব কি বল্লে?

—রেগে কাঁই। ও মাসের মাইনে দেয় নি—না দিক্‌গে, সত্যিই বলছি কুসুম মা, আমার

বয়েস কে বলে আটচল্লিশ হয়েচে? আমার যেন মনে হচ্চে আমার বয়েস পনের বছর কমে গিয়েচে। হাতপায়ে বল এসেচে কত! তুমি আর আমার অতসী মা—তোমরা আর জন্মে আমার কি ছিলে জানিনে—তোমাদের—

কুসুম বাধা দিয়া বলিল—আবার ওই সব কথা বলচেন জ্যাঠামশায়? আমার টাকা দিইচি সুদ পাবো বলে। এ তো ব্যবসায় টাকা ফেলা—টাকা কি তোরঙ্গের মধ্যে থেকে আমার স্বগ্গে পিদিম দিতো? বলি নি আমি আপনাকে? তবে হ্যাঁ, আমাদের বাবুর মেয়ের কথা যা বল্লেন, সে দিয়েচে বটে কোন খাঁই না করে। তার কথা, হাজার বার বলতে পারেন। তার বিয়ের কি হোল?

—সামনের সোমবার বিয়ে। চিঠি পেয়েছি—যাচ্ছি ওদিন সকালে।

—আমার কাকার সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে এসব টাকাকড়ির কথা যেন বলবেন না সেখানে।

—তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না মা, যতবার দেখা হয়েচে তোমার নামটি পর্যান্ত কখনো সেখানে ঘুণাক্ষরে করি নি। আমারও বাড়ী এঁড়োশোলা, আমায় তোমার কিছু শেখাতে হবে না।

কথামত পরদিন সকালে কুসুম হোটেল দেখিতে গেল। সে দুধ দই লইয়া অনেক বেলা পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় বেড়ায়—তাহার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নহে।

হাজারি তাহাকে রান্নাঘরে যত্ন করিয়া বসাইতে গেল—সে কিন্তু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল—আমি গুরুঠাকরুন কিছু আসি নি যে আসন পেতে যত্ন করে বসাতে হবে।

হাজারি বলিল—তোমারও তো হোটেল কুসুম-মা। তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভাল করে দেখে শোনো। কি হচ্চে না হচ্চে তদারক করো—এতে লজ্জা কি? বংশী, চিনে রাখো এ একজন অংশীদার।

এ কথায় কুসুম খুব খুশি হইল—মুখে তাহার আহ্লাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন—এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে। এ ভাবে ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। হাজারি বলিল—আজ মাছ রান্না হয়েছে বেশ পাকা রুই। তুমি একটু বোসো মা, মুড়োটা নিয়ে যাও।

—না না জ্যাঠামশায়।—ওসব আপনাকে বারণ করে দিইচি না! সকলের মুখ বঞ্চিত করে আমি মাছের মুড়ো খাবো—বেশ মজার কথা!

—আমি তোমার বুড়ো বাবা, তোমাকে খাইয়ে আমার যদি তৃপ্তি হয়, কেন খাবে না বুঝিয়ে দাও।

হোটেলের চাকর হাঁকিল—থাড্ কেলাস তিন থালা—

হাজারি বলিল—খদ্দের আসচে বোসো মা একটু। আমি আসছি, বংশী ভাত বেড়ে ফেলো।

আসিবার সময় কুসুম সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত হাজারির দেওয়া এক কাঁসি মাছ তরকারি লইয়া আসিল।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারি এঁড়োশোলা হইতে গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট ফিরিতেছে, সঙ্গে টেঁপির মা, টেঁপি ও ছেলেমেয়ে। তাহার হোটেলের কাজ আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাণাঘাটে বাসা না করিলে আর চলে না।

টেঁপির মা বলিল—আর কতটা আছে হাঁ৷ গা ?

—ওই তো সেগুন বাগান দেখা দিয়েছে—এইবার পৌঁছে যাবো—

টেঁপি বলিল—বাবা, সেখানে নাইবো কোথায় ? পুকুর আছে না গাঙ ?

—গাঙ আছে, বাসায় টিউব কল আছে।

টেঁপির মা বলিল—তাহোলে জল টানতে হবে না পুকুর থেকে। বেঁচে যাই—

ইহারা কখনো শহরে আসে নাই—টেঁপির মার বাপের বাড়ী এঁড়োশোলার দু ক্রোশ উত্তরে মণিরামপুর গ্রামে। জন্ম সেখানে, বিবাহ এঁড়োশোলায়, শহর দেখিবার একবার সুযোগ হইয়াছিল অনেকদিন আগে, অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একবার নবদ্বীপে রাস দেখিতে গিয়াছিল।

হোটেলের কাছেই একখানা একতলা বাড়ি পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা ছিল। টেঁপির মা বাড়ী দেখিয়া খুব খুশি হইল। চিরকাল খড়ের ঘরে বাস করিয়া অভ্যাস, কোঠাঘরে বাস এই তাহার প্রথম।

—ক'খানা ঘর গা ? রান্নাঘর কোন্ দিকে ? কই তোমার সেই টিউকল দেখি ? জল বেশ ওঠে তো ? ওরে টেঁপি, গাড়ীর কাপড়গুলো আলাদা করে রেখে দে—একপাশে। ও-সব নিয়ে ছিষ্টি ছোঁয়ানেপা করো না যেন, বস্তার মধ্যে থেকে একটা ঘটি আগে বের করে দাও না গো, এক ঘটি জল আগে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে কুসুম আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—ও জেঠিমা, এলেন সব ? বাসা পছন্দ হয়েছে তো ?

টেঁপির মা কুসুমকে চেনে। গ্রামে তাহাকে কুমারী অবস্থা হইতেই দেখিয়াছে। বলিল—এসো মা কুসুম, এসো এসো! ভাল আছ তো ? এসো এসো কল্যেণ হোক্।

হোটেলের চাকর রাখাল এই সময় আসিল। তাহার পিছনে মুটের মাথায় এক বস্তা পাথুরে কয়লা। হাজারিকে বলিল—কয়লা কোন্‌দিকে নামাবো বাবু ?

হাজারি বলিল—কয়লা আন্‌লি কেন রে ? তোকে যে বলে দিলাম কাঠ আনতে ? এরা কয়লার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম বলিল—কয়লার উনুন আছে ? আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি। আর শিখে নিতে তো হবে জেঠিমাকে। কয়লা সস্তা পড়বে কাঠের চেয়ে এ শহর-বাজার জায়গায়। আমি

একদিনে শিখিয়ে দেবো জেঠিমাকে।

রাখাল কয়লা নামাইয়া বলিল—বাবু, আর কি করতে হবে এখন ?

হাজারি বলিল—তুই এখন যাস্‌নে—জলটলগুলো তুলে দিয়ে জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে ?

—এসেছে বাবু।

—তা থেকে এবেলার মত মাছ-তরকারি চার-পাঁচ জনের মত নিয়ে আয়। ওবেলা আলাদা বাজার করলেই হবে। আগে জল তুলে দে দিকি।

টেঁপির মা বলিল—ও কে গো ?

—ও আমাদের হোটেলের চাকর। বাসার কাজও ও করবে, বলে দিইছি।

টেঁপির মা অবাক হইল। তাহাদের নিজেদের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' সম্বোধন করিতেছে—এ সব ব্যাপার এতই অভিনব যে বিশ্বাস করা শক্ত। গ্রামের মধ্যে তাহারা ছিল অতি গরীব গৃহস্থ, বিবাহ হইয়া পর্য্যন্ত বাসন-মাজা, জল-তোলা, ক্ষার-কাচা, এমন কি ধান ভানা পর্য্যন্ত সর্ব্বরকম গৃহকর্ম্ম সে একা করিয়া আসিয়াছে। মাস চার পাঁচ হইল দুটি সচ্ছল অন্নের মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে, নতুবা আগে আগে পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাওয়াও সব সময় ঘটিত না।

আর আজ এ কি ঐশ্বর্য্যের দ্বার হঠাৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল! কোঠাবাড়ী, চাকর, কলের জল—এ সব স্বপ্ন না সত্য ?

রাখাল আসিয়া বলিল—দেখুন তো মা এই মাছ-তরকারিতে হবে না আর কিছু আনবো ?

বড় বড় পোনা মাছের দাগা দশ-বারো খানা। টেঁপির মা খুশির সহিত বলিল—না বাবা আর আন্‌তে হবে না। রাখো ওখানে।

—ওগুলো কুটে দিই মা ?

মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে! এ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ছিল।

হাজারি বলিল—আগে জল তুলে দে তারপর কুটবি এখন। আগে সব নেয়ে নিই।

কুসুম কয়লার উনুনে আঁচ দিয়া আসিয়া বলিল—জেঠিমা আপনিও নেয়ে নিন্। ততক্ষণ আঁচ ধরে যাক্। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। রান্না চড়িয়ে দেবার আর দেরি করবার দরকার কি ? আমি এবার যাই।

টেঁপির মা বলিল—তুমি এখানে এবেলা খাবে কুসুম।

কুসুম ব্যস্তভাবে বলিল—না না, আপনারা এলেন তেতেপুড়ে এই দুপুরের সময়। এখন কোনোরকমে দুটো ঝোলভাত রেঁধে আপনারা এবেলা খেয়ে নিন—তার মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাংনামায়—

—কিছু হাংনামা হবে না মা। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না। ভাল বেগুন এনেছি গাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না—বেগুন পোড়াবো এখন। বাপের বাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ। কাল গুটকে যাবে।

হাজারি স্নান সারিয়া বলিল—আমি একবার হোটেলে চল্লাম। তোমরা রান্না চাপাও। আমি দেখে আসি।

আধঘণ্টা পরে হাজারি ফিরিয়া দেখিল টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনে উনুনে পরিত্রাহি ফুঁ পাড়িতেছে। আঁচ নামিয়া গিয়াছে, তখনও মাছের ঝোল বাকি।

টেঁপির মা বিপন্নমুখে বলিল—ওগো, এ আবার কি হোল, উনুন যে নিবে আসছে। কি করি এখন ?

কুসুম বাড়ীতে স্নান করিতে গিয়াছে, রাখাল গিয়াছে হোটেলে, কারণ এই সময়টা সেখানে খরিদ্দারের ভিড় অত্যন্ত। এবেলা অন্ততঃ একশত জন খায়। বেচু চক্কত্তি ও যদু বাঁড়ুয্যের হোটেল কানা হইয়া পড়িয়াছে। হাজারি নিজের হাতে রান্না করে, তাহার রান্নার গুণে—রেলবাজারের যত খরিদ্দার সব ঝুঁকিয়াছে তাহার হোটেলে। তিনজন ঠাকুর ও চারিজন চাকরে হিমসিম খাইয়া যায়। ইহারা কেহই কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া দূরের কথা, কয়লার উনুনই দেখে নাই। আঁচ কমিয়া যাইতে বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া হাজারির হাসি পাইল। বলিল—শেখো, পাড়াগেঁয়ে ভূত হয়ে কতকাল থাকবে ? সরো দিকি ? ওর ওপর আর চাট্টি কয়লা দিতে হয়—এই দেখিয়ে দিই।

টেঁপির মা বলিল—আর তুমি বড্ড শহুরে মানুষ ! তবুও যদি এঁড়োশোলা বাড়ী না হোত !

—আমি ? আমি আজ সাত বছর এই রাণাঘাটের রেলবাজারে আছি। আমাকে পাড়াগেঁয়ে বলবে কে ? ওকথা তুলে রাখোগে ছিকেয়।

টেঁপি বলিল—বাবা এখানে টকি আছে ? তুমি দেখেছ ?

হাজারি বিশ হাত জলে পড়িয়া গেল। টকি বাইস্কোপ এখানে আছে বটে কিন্তু বাইস্কোপ দেখার শখ কখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু টেঁপি আধুনিকা, এঁড়োশোলায় থাকিলে কি হয়, বাংলার কোন্ পাড়াগাঁয়ে আধুনিকতার ঢেউ যায় নাই ?···বিশেষতঃ অতসী তার বন্ধু···অতসীর কাছে অনেক জিনিস সে জানিয়াছে বা শিখিয়াছে যাহা তাহার বাবা (মা তো নয়ই) জানেও না।

টেঁপির মা বলিল—টাক কি গা ?

হাজারি আধুনিক হইবার চেষ্টায় গম্ভীর ভাবে বলিল—ছবিতে কথা কয়, এই ! দেখেছি অনেকবার। দেখবো না আর কেন ? হুঁ—

বলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে সবটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল—কিন্তু টেঁপি পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিল—কি পালা দেখেছিলে বাবা ?

—পালা ! তা কি আর মনে আছে ? লক্ষ্মণের শক্তিশেল বোধহয়, হাঁ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

মনের মধ্যে বহু কষ্টে হাতড়াইয়া ছেলেবেলায় দেখা এক যাত্রার পালার নামটা হাজারি

করিয়া দিল। টেঁপি বলিল—লক্ষ্মণের শক্তিশেল আবার কি পালার নাম? ওরকম নাম তো টকির পালার থাকে না? তাদের নাম আমি শুনেছি অতসীদির কাছে, সে তো অন্যরকম—

—হাঁ হাঁ—তুই আর অতসীদি ভারি সব জানিস আর কি! যা—সর দিকি—ওই কয়লার ঝুড়িটা—

—ও মামাবাবু, খাওয়া-দাওয়া হোল—বলিয়া বংশীর ভাগ্নে সেই সুন্দর ছেলেটি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই টেঁপির মা, পাড়াগেঁয়ে বউ, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। টেঁপি কিন্তু নবাগত লোকটির দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—এসো বাবা এসো—ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হোল বংশীর ভাগ্নে। আমার হোটেলে খাতাপত্র রাখে। ছেলেমানুষ—ওকে দেখে আবার ঘোমটা—

বংশীর ভাগিনেয় আসিয়া টেঁপির মার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি মেয়েকে বলিল—তোর নরেন দাদাকে প্রণাম কর টেঁপি। এইটি আমার মেয়ে, বাবা নরেন। ও বেশ লেখাপড়া জানে—সেলাইয়ের কাজটাও ভাল শিখেছে আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ের কাছে।

টেঁপির হঠাৎ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। ছেলেটি দেখিতে যেমন, এমন চেহারার ছেলে সে কখনো দেখে নাই—কেবল ইহার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যায় অতসীদি'র বরের। অনেকটা মুখের আদল যেন সেই রকম।

, বংশীর ভাগ্নেও তাহার স্বচ্ছন্দ স্বচ্ছতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাওয়া যেন একটু কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। টেঁপির দিকে তো তেমন চাহিতেই পারিল না।

হাজারি বলিল—মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক'জন নামলো আজ?

—নেমেছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিনজনকে বেচু চক্কত্তির চাকর একরকম হাত ধরে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। বাকি সাতজন আমরা পেয়েছি—আর বনগাঁর ট্রেন থেকে এসেছিল পাঁচজন।

—ইষ্টিশানে গিয়েছিল কে?

—ব্রজ ছিল, রাখালও ছিল বনগাঁর গাড়ীর সময়। ব্রজ বল্লে বেচু চক্কত্তির চাকরের সঙ্গে খদ্দের নিয়ে তার হাতাহাতি হয়ে যেতো আজ।

—না না, দরকার নেই বাবা ওসব। হাজার হোক, আমার পুরোনো মনিব। ওদের খেয়েই এতকাল মানুষ—হোটেলের কাজ শিখেছিও ওদের কাছে। শুধু রাঁধতে জানলে তো হোটেল চালানো যায় না বাবা, এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট-বাজার করতে হয়, কি করে খদ্দের তুষ্ট করতে হয়, কি করে হিসেবপত্র রাখতে হয়—এও তো জানতে হবে। আমি ছ'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম ওরা কি করে চালাচ্ছে। দেখে দেখে শেখা। এখন সব পারি।

বংশীর ভাগ্নে বলিল—আচ্ছা মামীমা, খাওয়া দাওয়া করুন, আমি আসবো এখন ওবেলা।

হাজারি বলিল—তুমি কাল দুপুরে হোটেলে খেও না—বাসাতে খাবে এখানে। বুঝলে?

বংশীর ভাগ্নে চলিয়া গেলে টেঁপির অনুপস্থিতিতে হাজারি বলিল—কেমন ছেলেটি দেখলে?

—বেশ ভাল। চমৎকার দেখতে।

—ওর সঙ্গে টেঁপির বেশ মানায় না?

—চমৎকার মানায়। তা কি আর হবে! আমাদের অদৃষ্টে কি অমন ছেলে জুটবে?

—জুটবে না কেন, জুটে আছে। ওকে আনিয়ে রেখেচি হোটেলে তবে কি জন্যে? তোমাদের রাণাঘাটের বাসায় আনলাম তবে কি জন্যে?…টেঁপিকে যেন এখন কিছু—বোঝ তো? কাল ওকে একটু যত্ন-আত্তি করো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপির—তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থা বেশ ভাল, ছেলেটাও ম্যাট্রিক পাস। বিয়ে দিয়ে হোটেলেই বসিয়ে দেবো—থাক্ আমার অংশীদার হয়ে। কাজ শিখে নিক্—টেঁপিও কাছেই রইল আমাদের—বুঝলে না, অনেক মতলব আছে।

টেঁপির মা বোকাসোকা মানুষ—অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পরে খবর আসিল স্টেশনে বেচু চক্কত্তির হোটেলের লোকের সঙ্গে হাজারির চাকরের খরিদ্দার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে। হাজারির চাকর নাথনি বলিল—বাবু, ওদের হোটেলের চাকর খদ্দেরের হাত ধরে টানাটানি করে—আমাদের খদ্দের, আমাদের হোটেলে আসচে—তার হাত ধরে টানবে আর আমাদের হোটেলের নিন্দে করবে। তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গিয়েচে।

—খদ্দের কোথায় গেল?

—খদ্দের এসেচে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের ওপর আকচ আছে, আমরাই সব খদ্দের পাই, ওরা পায় না—এই নিয়েই ঝগড়া, বাবু। ওদের হোটেলের হয়ে এল, বাবু। একটা গাড়ীতেও খদ্দের পায় না।

রাত আটটার সময়ে হাজারি সবে মাছের ঝোল উহুনে চাপাইয়াছে, এমন সময় বংশী বলিল—হাজারি-দা, জবর খবর আছে। তোমার আগের কর্তা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন দেখে এসো গে। বোধ হয় মারামারি নিয়ে—

—ঝোলটা তুমি দেখো। আমি এসে মাংস চাপাবো—দেখি কি খবর।

অনেকদিন পরে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই পুরোনো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাঁধুনী বামুন, বেচু চক্কত্তি আজও মনিব।

বেচু চক্কত্তি তাহাকে দেখিয়া খাতির করিবার সুরে বলিলেন—আরে এস এস হাজারি এস—এখানে বসো।

বলিয়া গদির এক পাশে হাত দিয়া ঝাড়িয়া দিলেন, যদিও ঝাড়িবার কোন আবশ্যক ছিল না। হাজারি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল—না বাবু, আমি বসবো না। আমায় ডেকেচেন কেন?

—এসো, বসোই এসে আগে। বলচি।

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, আপনি আমার মনিব ছিলেন এতদিন। আপনার সামনে কি বসতে পারি? বলুন, কি বলবেন—আমি ঠিক আছি।

হাজারির চোখ আপনা-আপনি খাওয়ার ঘরের দিকে গেল। হোটেলের অবস্থা সত্যই খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। রাত ন'টা বাজে, আগে আগে এসময় খরিদ্দারের ভিড়ে ঘরে জায়গা থাকিত না—আর এখন লোক কই? হোটেলের জলুসও আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—না, বোসো হাজারি। চা খাও, ওরে কাঙালী, চা নিয়ে আয় আমাদের।

হাজারি তবুও বসিতে চাহিল না। চাকর চা দিয়া গেল, হাজারি আড়ালে গিয়া চা খাইয়া আসিল।

বেচু চক্কত্তি দেখিয়া শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। হাজারির মাথা ঘুরিয়া যায় নাই হঠাৎ অবস্থাপন্ন হইয়া। কারণ অবস্থাপন্ন যে হাজারি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি এতদিন হোটেল চালানোর অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিতে পারেন।

হাজারি বলিল—বাবু, আমায় কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ—বলছিলাম কি জানো, এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের তখন তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই তো—তোমার চাকর আজ আমার চাকরকে মেরেচে ইস্টিশানে। এ কেমন কথা?

এই সময় পদ্মঝি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের চাকরও আসিল।

হাজারি বলিল—আমি তো শুনলাম বাবু আপনার চাকরটা আগে আমার চাকরকে মারে। নাথনি খদ্দের নিয়ে আসছিল এমন সময়—

পদ্মঝি বলিল—হ্যাঁ তাই বৈকি! তোমাদের নাথনি আমাদের খদ্দের ভাগাবার চেষ্টা করে—আমাদের হোটেলে আসছিল খদ্দের, তোমাদের হোটেলে যেতে চায় নি—

একথা বিশ্বাস করা যেন বেচু চক্কত্তির পক্ষেও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—যাক, ও নিয়ে আর ঝগড়া করে কি হবে হাজারির সঙ্গে। হাজারি তো সেখানে ছিল না, দেখেও নি, তবে তোমায় বলাম হাজারি, যাতে আর এমন না হয়—

হাজারি বলিল—বাবু, বেশ আমি রাজী আছি। আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ করলে চলবে না। আপনি আমার পুরোনো মনিব। আসুন, আমরা গাড়ী

ভাগ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইস্টিশানে চাকর পাঠাবেন, আমার হোটেলের চাকর সে সময় যাবে না।

বেচু চক্কত্তি বিস্মিত হইলেন। ব্যবসা জিনিসটাই রেষারেষির উপর, আড়াআড়ির উপর চলে—তিনি বেশ ভালই জানেন। মাথার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন তিনি এই ব্যবসা করিয়া। এস্থলে হাজারির প্রস্তাব যে কতদূর উদার, তাহা বুঝিতে বেচুর বিলম্ব হইল না। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—না তা কেন, ইস্টিশান তো আমার একস্বার নয়—

—না বাবু, এখন থেকে তাই রইল। মুর্শিদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি কি নেবেন বলুন মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? আমি সে সময় চাকর পাঠাবো না ইস্টিশানে।

পদ্মঝি দোর হইতে সরিয়া গেল।

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—তা তুমি যেমন বলো। মুর্শিদাবাদখানাই তবে রাখো আমার। তা আর একটু চা খেয়ে যাবে না?—আচ্ছা, এসো তবে।

হাজারি মনিবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

পদ্মঝি পুনরায় দোরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবু, কি বলে গেল?

—গাড়ী ভাগ করে নিয়ে গেল। মুর্শিদাবাদখানা আমি রেখেছি। যা কিছু লোক আসে, মুর্শিদাবাদ থেকেই আসে—বনগাঁর গাড়ীতে ক'টা লোক আসে? লোকটা বোকা, লোক মন্দ নয়। দুষ্টু নয়।

—আমি আজ সাত বছর দেখে আসচি আমি জানিনে? গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে, হোটেলের ছাই দেখাশুনো করে। বেঁধেই মরে, মজা লুটচে বংশী আর বংশীর ভাগ্নে। ক্যাশ তার হাতে। আমি সব খবর নিইচি তলায় তলায়। বংশীকে আবার এখানে আনুন বাবু, ও হোটেল এক দিনে ভুস্মিনাশ হয়ে বসে রয়েচে। বংশীকে ভাঙাবার লোক লাগান আপনি—আর ওর ভাগ্নেটাকেও—

পরদিন দুপুরে বংশীর ভাগ্নে সসঙ্কোচে হাজারির বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। হাজারি হোটেল হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল বটে, কিন্তু নিজে তখন আসিতে পারিল না, অত্যন্ত ভিড় লাগিয়াছে খরিদ্দারের, কারণ সেদিন হাটবার।

মায়ের আদেশে টেঁপিকে অতিথির সামনে অনেকবার বাহির হইতে হইল। কখনও বা আসন পাতা, কখনও জলের গ্লাসে জল দেওয়া ইত্যাদি। টেঁপি খুব চটপটে চালাকচতুর মেয়ে, অতসীর শিষ্যা—কিন্তু হঠাৎ তাহারও কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল এই সুন্দর ছেলেটির সামনে বার বার বাহির হইতে।

বংশীর ভাগ্নেটিও একটু বিস্মিত হইল। হাজারি-মামারা পাড়াগাঁয়ের লোক সে জানে—অবস্থাও এতদিন বিশেষ ভাল ছিল না। আজই না হয় হোটেলের ব্যবসায়ে দু-পয়সার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু হাজারি-মামার মেয়ে তো বেশ দেখিতে, তাহার উপর তার চালচলন

ধরন-ধারণ যেন স্কুলে পড়া আধুনিক মেয়েছেলের মত। সে কাপড় গুছাইয়া পরিতে জানে, সাজিতে গুজিতে জানে, তার কথাবার্ত্তার ভঙ্গিটাও বড় চমৎকার।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় হাজারি আসিল। বলিল—খাওয়া হয়েছে বাবা, আমি আসতে পারলাম না—আজ আবার ভিড় বড্ড বেশী।

—ও টেঁপি আমায় একটু তেল দে মা, নেয়ে নিই, আর তোর ঐ দাদার শোওয়ার জায়গা করে দে দিকি—পাশের ঘরটাতে একটু গড়িয়ে নাও বাবা।

বংশীর ভাগ্নে গিয়া শুইয়াছে—এমন সময় টেঁপি পান দিতে আসিল। পানের ডিবা নাই, একখানা ছোট রেকাবিতে পান আনিয়াছে। ছেলেটি দেখিল চুন নাই রেকাবিতে। লাজুক মুখে বলিল—একটু চুন দিয়ে যাবেন?

টেঁপির সারা দেহ লজ্জায় আনন্দে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রথম কারণ তাহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক ক্রিয়াপদের ব্যবহার এই হইল প্রথম। জীবনে ইতিপূর্ব্বে তাহাকে কেহ 'আপনি' 'আজ্ঞে' করিয়া কথা বলে নাই। দ্বিতীয়তঃ কোনও অনাত্মীয় তরুণ যুবকও তাহার সহিত ইতিপূর্ব্বে কথা বলে নাই। বলে নাই কি একেবারে! গাঁয়ের রামু-দা, গোপাল-দা, জহর-দা—ইহারাও তাহার সঙ্গে তো কথা বলিত! কিন্তু তাহাতে এমন আনন্দ তাহার হয় নাই তো কোনোদিন? চুন আনিয়া রেকাবিতে রাখিয়া বলিল—এতে হবে?

—খুব হবে। থাক ওখানেই—ইয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন?

টেঁপির বেশ লাগিল ছেলেটিকে। কথাবার্ত্তার ধরন যেমন ভাল, গলার সুরটিও তেমনি মিষ্ট। যখন জলের গ্লাস আনিল, তখন ইচ্ছা হইতেছিল ছেলেটি তাহার সঙ্গে আর একবার কিছু বলে। কিন্তু ছেলেটি এবার আর কিছু বলিল না। টেঁপি জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, বৈকাল অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে—টেঁপি তখন একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, ছেলেটি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

হঠাৎ টেঁপির কেমন একটা অহেতুক স্নেহ আসিল ছেলেটির প্রতি।

আহা, হোটেলে কত রাত পর্য্যন্ত জাগে। ভাল ঘুম হয় না রাত্রে!

টেঁপি আসিয়া মাকে বলিল—মা সেই লোকটা এখনও ঘুমুচ্ছে। ডেকে দেবো, না ঘুমুবে।

টেঁপির মা বলিল—ঘুমুচ্ছে ঘুমুক না। ডাকবার দরকার কি? চাকরটা কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। খাবার আনতে দিতাম। উনিও তো বাড়ী নেই।

টেঁপি বলিল—লোকটা চা খায় কিনা জানিনে, তা'হলে ঘুম থেকে উঠলে একটু চা করে দিতে পারলে ভাল হোত।

টেঁপির মা চা নিজে কখনো খায় নাই, করিতেও জানে না। আধুনিকা মেয়ের এ প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না।

মেয়েকে বলিল—তুই করে দিতে পারবি তো?

মেয়ে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি যে কি বল মা, হেসে প্রাণ বেরিয়ে যায়—পরে কেমন একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিভরা মুখের চিবুকখানি বার বার উঠাইয়া-নামাইয়া বলিতে লাগিল—চা কই? চিনি কই? কেটলি কই? চায়ের জল ফুটবে কিসে? ডিস্-পেয়ালা কই? সে সব আছে কিছু?

টেঁপির মায়ের বড় ভাল লাগিল টেঁপির এই ভঙ্গি। সে সস্নেহে মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে এমন সুন্দর ভঙ্গিতে কথা টেঁপি আর কখনও বলে নাই।

এই সময় হাজারি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, হোটেলেই ছিল। বলিল—নরেন কোথায়? ঘুমুচ্ছে নাকি?

টেঁপির মা বলিল—তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ওকে একটু খাবার আনিয়ে দিতে হবে। আর টেঁপি বলছে চা করে দিলে হোত।

হাজারির বড় স্নেহ হইল টেঁপির উপর। সে না জানিয়া যাহাকে আজ যত্ন করিয়া চা খাওয়াইতে চাহিতেছে, তাহারই সঙ্গে তাহার বাবা-মা যে বিবাহের ষড়যন্ত্র করিতেছে—বেচারী কি জানে?

বলিল—আমি সব এনে দিচ্ছি। হোটেলেই আছে। হোটেলে বড় ব্যস্ত আছি, কলকাতা থেকে দশ-বারো জন বাবু এসেছে শিকার করতে। ওরা অনেকদিন আগে একবার এসে আমার রান্না মাংস খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। সেই আগের হোটেলে গিয়েছিল, সেখানে নেই শুনে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। ওরা রাত্রে মাংস আর পোলাও খাবে। তোমরা এবেলা রান্না কোরো না—আমি হোটেল থেকে আলাদা করে পাঠিয়ে দেবো এখন। নরেনকে যে একবার দরকার, বাবুদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কইতে হবে, সে তো আমি পারবো না, নরেনকে ওঠাই দাঁড়াও—

টেঁপির মা বলিল—ঘুম থেকে উঠিয়ে কিছু না খাইয়ে ছাড়া ভাল দেখায় না। টেঁপি চায়ের কথা বলছিল—তা হোলে সেগুলো আগে পাঠিয়ে দেওগে, এখন জাগিও না।

বৈকালের দিকে নরেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। অত্যন্ত বেলা গিয়াছে, পাঁচিলের ধারে সজনে গাছটার গায়ে রোদ হলদে হইয়া আসিয়াছে। নরেনের লজ্জা হইল—পরের বাড়ী কি ঘুমটাই ঘুমাইয়াছে! কে কি—বিশেষ করিয়া হাজারি-মামার মেয়েটি কি মনে করিল। বেশ মেয়েটি। হাজারি-মামার মেয়ে যে এমন চালাক-চতুর, চটপটে, এমন দেখিতে, এমন কাপড়-চোপড় পরিতে জানে তাহা কে জানিয়াছিল?

অপ্রতিভ মুখে সে গায়ে জামা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় টেঁপি আসিয়া বলিল—আপনি উঠেছেন? মুখ ধোবার জল দেবো?

নরেন থতমত খাইয়া বলিল—না, না, থাক্ আমি হোটেলেই—

—মা বললে আপনি চা খেয়ে যাবেন, আমি মাকে বলে আসি—

ইতিমধ্যে হাজারি চায়ের আসবাব হোটেলের চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, টেঁপি নিজেই চা করিতে বসিয়া গেল। তাহার মা জলখাবারের জন্য ফল কটিতে লাগিল।

টেঁপি বলিল—মা চায়ের সঙ্গে শসা-টসা দেয় না। তুমি বরং ঐ নিমকি আর রসগোল্লা দাও রেকাবিতে—

—শসা দেয় না? একটা ডাব কাটবো? বাড়ীর ডাব আছে—

টেঁপি হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি। মুখে আঁচল চাপা দিয়া বলিল—হি হি, তুমি মা যে কি।…চায়ের সঙ্গে বুঝি ডাব খায়?

টেঁপির মা অপ্রসন্ন মুখে বলিল—কি জানি তোদের একেলে ঢং কিছু বুঝিনে বাপু। যা বোঝো তাই করো। ঘুম থেকে উঠলে তো নতুন জামাইদের ডাব দিতে দেখেছি চিরকাল দেশেঘরে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই টেঁপির মা মনে মনে জিভ কাটিয়া চুপ করিয়া গেল। মানুষটা একটু বোকা ধরনের, কি ভাবিয়া কি বলে, সব সময় তলাইয়া দেখিতে জানে না।

টেঁপি আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—নতুন জামাই? কে নতুন জামাই?

—ও কিছু না; দেশে দেখেছি তাই বলছি। তুই নে, চা করা হোল?

টেঁপির মনে কেমন যেন খটকা লাগিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, তাহার উপর নিতান্ত ছেলে-মানুষটিও নয়, যখন চা ও খাবার লইয়া পুনরায় ছেলেটির সামনে গেল তখন তাহার কি জানি কেন যে লজ্জা করিতেছে তাহা সে নিজেই ভাল ধরিতে পারিল না।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও কি! এই এত খাবার কেন এখন, চা একটু হোলেই—

টেঁপি কোনো রকমে খাবারের রেকাবি লোকটার সামনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলে যেন বাঁচে।

ছেলেটি ডাকিয়া বলিল—পান একটা যদি দিয়ে যান—

পান সাজিতে বসিয়া টেঁপি ভাবিল—বাবা খাটিয়ে মারলে আমায়! চা দেও—পান সাজো—আমার যেন যত গরজ পড়েছে, বাবার হোটেলের লোক তা আমার কি?

টেঁপি একটা চায়ের পিরিচে পান রাখিয়া দিতে গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ কিন্তু। কথাবার্ত্তা বেশ, হাসি-হাসি মুখ। কি কাজ করে হোটেলে কে জানে?

পান লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—মামীমা আমি যাচ্ছি, কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না। এত ঘুমিয়েছি, বেলা আর নেই আজ।

বেশ ছেলেটি।

নতুন জামাই? কে নতুন জামাই? কাহাদের নতুন জামাই?

মা এক-একটা কথা বলে কি যে, তাহার মানে হয় না।

টেঁপির মা কখনও এত বড় শহর দেখে নাই।

এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ইস্টিশানে বিদ্যুতের আলো, লোকজনই বা কত! আর তাদের এড়োশোলায় দিনমানেই শেয়াল ডাকে বাড়ীর পিছনকার ঘন বাঁশবনে। সেদিন তো দিনদুপুরে জেলেপাড়ার কেষ্ট জেলের তিন মাসের ছেলেকে শেয়ালে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুসুম আসিয়া একদিন উহাদের বেড়াইতে লইয়া গেল। কুসুমের সঙ্গে তাহারা রাধাবল্লভতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চূর্ণীর ঘাট, পালচৌধুরীদের বাড়ী—সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। পালচৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া টেঁপির মা ও টেঁপি দু-জনেই অবাক। এত বড় বাড়ী জীবনে তাহারা দেখে নাই। অতসীদের বাড়ীটাই এতদিন বড়লোকের বাড়ীর চরম নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে যাহারা, তাহাদের পক্ষে অবাক হইবার কথা বটে।

টেঁপির মা বলিল—না, শহর জায়গা বটে কুসুম! গায়ে গায়ে বাড়ী আর সব কোঠাবাড়ী এদেশে। সবাই বড়লোক। ছেলেমেয়েদের কি চেহারা, দেখে চোখ জুড়োয়। হ্যাঁরে, এদের বাড়ী ঠাকুর হয় না? পুজোর সময় একদিন আমাদের এনো মা. ঠাকুর দেখে যাবো।

সে আর ইহার বেশী কিছুই বোঝে না।

একটা বাড়ীর সামনে কত কি বড় বড় ছবি টাঙানো, লোকজন ঢুকিতেছে, রাস্তার ধারে কি কাগজ বিলি করিতেছে। টেঁপির মনে হইল এই বোধ হয় সেই টকি যাকে বলে, তাহাই। কুসুমকে বলিল—কুসুম দি, এই টকি না?

—হ্যাঁ দিদি। একদিন দেখবে?

—একদিন এনো না আমাদের। মা-ও কখনো দেখে নি—সবাই আসবো।

একখানা ধাবমান মোটর গাড়ীর দিকে টেঁপির মা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যতক্ষণ সেখানা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইয়া গেল।

কুসুম বলিল—আমার বাড়ী একটু পায়ের ধুলো দিন এবার জ্যাঠাইমা—

কুসুমের বাড়ী যাইতে পথের ধারে রেলের লাইন পড়ে। টেঁপির মা বলিল—কুসুম, দাঁড়া মা একখানা রেলের গাড়ী দেখে যাই—

বলিতে বলিতে একখানা প্রকাণ্ড-মালগাড়ী আসিয়া হাজির। টেঁপি ও টেঁপির মা দু-জনেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ী চলিয়াছে তো চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। উঃ, কি বড় গাড়ীটা!

কুসুম বলিল—জ্যাঠাইমা, রাণাঘাট ভাল লাগচে?

—লাগচে বৈকি, বেশ জায়গা মা।

আসলে কিন্তু এঁড়োশোলার জন্য টেঁপির মায়ের মন কেমন করে। শহরে নিজেকে সে এখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। সেখানকার তালপুকুরের ঘাট, সদা বোষ্টমের বাড়ীর পাশ দিয়া যে ছোট নিভৃত পথটি বাঁশবনের মধ্য দিয়া বাঁড়ুয্যে-পাড়ার দিকে গিয়াছে, দুপুর

বেলা তাহাদের বাড়ীর কাছের বড় শিরীষ গাছটায় এই সময় শিরীষের শুঁটি শুকাইয়া ঝুন ঝুন শব্দ করে, তাহাদের উঠানের বড় লাউমাচায় এতদিন কত লাউ ফলিয়াছে, পেঁপে গাছটায় কত পেঁপের ফুল ও জালি দেখিয়া আসিয়াছিল—সে সবের জন্ম মন কেমন করে বৈকি।

তবে এখানে যাহা সে পাইয়াছে, টেঁপির মা জীবনে সে রকম সুখের মুখ দেখে নাই। চাকরের ওপর হুকুম চালাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সকলে মানে, খাতির করে—অমন সুন্দর ছেলেটি তাহাদের হোটেলের মুহুরী—এ ধরনের ব্যাপারের কল্পনাও কখনও সে করিয়াছিল?

কুসুমের বাড়ী সকলে গিয়া পৌঁছিল। কুসুম ভারি খুশি হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বাপের বাড়ীর দেশের ব্রাহ্মণ-পরিবারকে এখানে পাইয়া। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া টেঁপির মায়ের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আমাদের বড্ড ভাগ্যি মা, আপনাদের চরণ-ধুলো পড়লো এ বাড়ীতে।

টেঁপির মাকে এত খাতির করিয়া কেহ কখনো কথা বলে নাই—এত সুখও তাহার কপালে লেখা ছিল! হায় মা ঝিটকিপোতার বনবিবি, কি জাগ্রত দেবতাই তুমি! সেবার ঝিটকিপোতায় চৈত্র মাসে মেলায় গিয়া টেঁপির মা বনবিবিতলায় স-পাঁচ আনার সিন্নি দিয়া স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়াছিল, এখনও যে বছর পার হয় নাই! তবুও লোকে ঠাকুর-দেবতা মানিতে চায় না।

কুসুম সকলকে জলযোগ করাইল। পান সাজিয়া দিল। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া কতক্ষণ গল্পগুজব করিল। কুসুম গ্রামের কথাই কেবল শুনিতে চায়। কতদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, বাবা-মা মরিয়া গিয়াছে, জ্যাঠামশায় আছে, কাকারা আছে—তাহারা কোনো দিন খোঁজও নেয় না। খোঁজ করিত অবশ্যই, যদি তাহার নিজের অবস্থা ভাল হইত। গরীব লোকের আদর কে করে?...এই সব অনেক দুঃখ করিল। আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে কুসুম উহাদের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

হাজারির হোটেলে রাত্রে এক মজার ব্যাপার ঘটিল সেদিন।

দশ-পনেরোটি লোক একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে—হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, এই যে ভাতটা দিলে, এ দেখছি ও বেলার বাসি ভাত।

বংশী ঠাকুর ভাত দিতেছিল, সে অবাক হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু সে কি? আমাদের হোটেলে ওরকম পাবেন না। আধ মণ চাল এক-একবেলা রান্না হয়, তাতেই কুলোয় না—বাসি ভাত থাকবে কোথা থেকে?

—আলবাৎ এ ও-বেলার ভাত। আমি বলছি এ ও-বেলার ভাত—

গোলমাল শুনিয়া হাজারি আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?...বাসি ভাত? কক্ষনো না। আপনি নতুন লোক, কিন্তু এঁরা যাঁরা খাচ্ছেন তাঁরা আমায় জানেন—আমার হোটেল না চলে না চলুক কিন্তু ওসব পিরবিত্তি ভগবান যেন আমায় না দেন—

লোকটা তখন তর্কের মোড় ঘুরাইয়া ফেলিল। সে যেন ঝগড়া করিবার জন্যই তৈরী হইয়া আসিয়াছে। পাত হইতে হাত তুলিয়া চোখ গরম করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—তবে তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি ?

হাজারি নরম হইয়া বলিল—না বাবু তা তো আমি বলছি নে। কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে। আমি দিব্যি করে বলছি বাবু, বাসি ভাত আমার হোটেলে থাকে না—

—থাকে না ? বড্ড নবাবী কথা বলছ যে। বাসি ভাত আবার এ বেলা হাঁড়িতে মেখে দাও না তুমি ?

—না বাবু।

—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— আবার তবুও না বলছ ? দেখবে মজা ?

এই সময়ে নরেন ও হোটেলের আরও দু একজন সেখানে আসিয়া পড়িল। নরেন গরম হইয়া বলিল—কি মজা দেখাবেন আপনি ?

—দেখবে ? সরে এসো দেখাচ্ছি—জোচ্চোর সব কোথাকার—

এই কথায় একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। পুরানো খরিদ্দাররা সকলেই হাজারির পক্ষ অবলম্বন করিল। লোকটা রাস্তায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রাস্তার সমবেত জনতার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—শুনুন মশাই সব বলি। এই এর হোটেলে বাসি ভাত দিয়েছিল খেতে—ধরে ফেলেছি বিনা তাই এখন আবার আমাকে মারতে আসছে—পুলিশ ডাকবো এখুনি—স্যানিটারি দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে তবে ছাড়বো—জোচ্চোর কোথাকার—লোক মারবার মতলব তোমাদের ?

এই সময় হোটেলের চাকর শশী হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—বাবু, এই লোকটাকে যেন আমি বেচু চক্কত্তির হোটেলে দেখেছি। সেখানে যে ঝি থাকে, তার সঙ্গে বাজার করে নিয়ে যেতে দেখেছি—

নরেনের সাহস খুব। সে হোটেলের রোয়াকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মশাই, আপনি বেচু চক্কত্তির হোটেলের পদ্মঝিয়ের কে হন ?

তবুও লোকটা ছাড়ে না। সে হাত-পা নাড়িয়া প্রমাণ করিতে গেল পদ্মঝিয়ের নামও সে কোনোদিন শোনে নাই। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের তেজ যেন তখন কমিয়া গিয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল—এইবার মানে মানে সরে পড় বাবা, কেন মার খেয়ে মরবে।

কিছুক্ষণ পরে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

এই ঘটনার পরে অনেক রাত্রে হাজারি বেচু চক্কত্তির হোটেলে গিয়া হাজির হইল। বেচু চক্কত্তি তহবিল মিলাইতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি, হাজারি যে ? এসো এসো। এত রাত্রে কি মনে করে ?

হাজারি বিনীতভাবে বলিল—বাবু, একটা কথা বলতে এলাম।

—কি—বল ?

—বাবু আপনি আমার অন্নদাতা ছিলেন একসময়ে—আজও আপনাকে তাই বলেই ভাবি। আপনার এখানে কাজ না শিখলে আজ আমি পেটের ভাত করে খেতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা আছে বলে আমি তো ভাবিনে।

—কেন, কেন, একথা কেন ?

হাজারি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার মনিব। আমাকে এভাবে বিপদে না ফেলে যদি বলেন হাজারি তুমি হোটেল উঠিয়ে দাও, তাই আমি দেবো। আপনি হুকুম করুন—

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য্য হইবার ভান করিয়া বলিল—আমি তো এর কোনো খবর রাখিনে—আচ্ছা, তুমি যাও আজ, আমি তদন্ত করে দেখে তোমায় কাল জানাবো। আমাদের কোন লোক তোমার হোটেলে যায় নি এ একেবারে নিশ্চয়। কাল জানতে পারবে তুমি।··· তারপর হাজারি চলচে-টলচে ভাল ?

—একরকম আপনার আশীর্ব্বাদে—

—রোজ কি রকম বিক্রীসিক্রি হচ্ছে ? রোজ তবিলে কি রকম থাকে ? তুমি কিছু মনে কোরো না—তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলেই জিজ্ঞেস করচি।

—এই বাবু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা—ধরুন না কেন আজ রাত্তিরের তবিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা স'বারো আনা।

বেচু চক্কত্তি আশ্চর্য্য হইলেন মনে মনে। মুখে বলিলেন—বেশ, বেশ। খুব ভালো—শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, তাহলে এসো আজগে। কাল খবর পাবে।

হাজারি চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মঝিকে ডাকাই'লন। পদ্ম আসিয়া বলিল—হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি ? কি বলছিল ?

বেচু চক্কত্তি বলিলেন—ও পদ্ম, হাজারি যে অবাক করে দিয়ে গেল। রাণাঘাটের বাজারে হোটেল ক'রে পঁয়ত্রিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার দাঁড়া-তবিল, এ তো কখনো শুনি নি। তার মানে বুঝচো ? দাঁড়া-তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাত-আট টাকা দৈনিক লাভ, ফেলে-ঝেলেও। মাসে হোল আড়াইশো টাকা। দুশো টাকার তো মার নেই—হ্যাঁ পদ্ম ?

পদ্মঝি মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—গুল্ দিয়ে গেল না তো ?

—না, গুল্ দেবার লোক নয় ও। সাদাসিধে মানুষটা—আমায় বড্ড মানে এখনও। ও গুল্ দেবে না, অন্ততঃ আমার কাছে। তা ছাড়া দেখছ না রেলবাজারে কোন হোটেলে আর বিক্রী নেই। সব শুষে নিচ্ছে ওই একলা।

—আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবু ওর হোটেলে। খুব খানিকটা রাউ করে দিয়েও এসেছে নাকি। খুব চেঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে। আর কিছু হোক না হোক লোকে শুনে তো রাখলে ?

—যদু বাঁড়ুয্যেরাও আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল, ওর হোটেল ভাঙতেই হবে। নইলে

রেলবাজারে কেউ আর টিকবে না। এই কথা যদু বাঁড়ুয্যেও বললে। কিন্তু তাতে কিছু হবে না—ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো। নৃসিংহ আছে?

—না বেরিয়ে গেল। পুলিশে সেই যে খবর দেবার কি হোল?

—দেখ পদ্ম, আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই। হাজারি লোকটা ভালো —আজ এসেছিল, এমন হাত জোড় করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর ওপর রাগ থাকে না।

—খ্যাংরা মারি ওর ভালমানুষেতার মুখে—ভিজে বেড়ালটি, মাছ খেতে কিন্তু ঠিক আছে —পুলিশের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদুবাবু, তাই তুমি করো এবার। ওর হোটেল না ভাঙলে চলবে না। নয়তো আমাদের পাততাড়ি গুটুতে হবে এই আমি বলে দিলাম—এবেলা তবিল কত?

বেচু চক্কত্তি অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—মোট ছ'টাকা সাড়ে তিন আনা—

পদ্মঝি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী ওদিকে। কাল বলেছে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে হৈ চৈ বাধাবে। ভাড়া দেবে কোথেকে?

—দেখি।

—তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকী পাঁচ মাস। সে বলছে আর কাজ করবে না, তার কি করি?

—বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা। দেখি সামনের মাসে কি রকম হয়—

পদ্মঝি রান্নাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল—আমার ভাতটা বেড়ে দাও ঠাকুর, রাত হয়েছে অনেক, বাড়ী যাই।

তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ছন্নছাড়া অবস্থা, ওই বড় দশ সেরী ডেক্‌চিটা আজ তিন-চার মাস তোলা আছে—দরকার হয় না। আগে পিতলের বালতি করিয়া সরিষার তৈল আসিত, এখন আসে ছোট ভাঁড়ে—বালতি দরকার হয় না। এমন দুরবস্থা সে কখনো দেখে নাই হোটেলের।

তাহার মনটা কেমন করিয়া ওঠে।...

নানারকমে চেষ্টা করিয়া এই হোটেলটা সে আর কর্তা দুজনে গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই হোটেলের দৌলতে যথেষ্ট একদিন হইয়াছে। ফুলেনবলা গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল, সেখানে তার ভাই এখনও আছে—চাষবাস করিয়া খায়—আর সে এই রাণাঘাটের শহরে সোনাদানাও পরিয়া বেড়াইয়াছে একদিন—এই হোটেলের দৌলতে। এই হোটেল তার বুকের পাঁজর। কিন্তু আজ বড় মুশ্‌কিলের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কোথা হইতে এক উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আসিয়া জুটিল হোটেলে—হোটেলের হালুকসন্ধান জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শীলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছে। এত যত্নের, এত সাধ-আশার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে! যাহার জন্য আজ হোটেলের এই দুরবস্থা,—ইচ্ছা হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে, যদি বাগে পায়। তাহার উপর আবার

দয়া কিসের ? কর্তা ওই রকম ভালমানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই তো আজ পথের কুকুর সব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।...দয়া !

একদিন রাণাঘাটের স্টেশন মাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাজারি নিজে যাইতে রাজী নয়—কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব, সে জানে। নরেন যাওয়াই ভাল। অবশেষে তাহাকেই যাইতে হইল। নরেন সঙ্গে গেল।

সাহেব বলিলেন—টোমার নাম হাজারি ? হিণ্ডু হোটেল রাখো বাজারে ?

—হ্যাঁ হুজুর।

—টুমি প্ল্যাটফর্মে কেটার করবে ? হিণ্ডু ভাত, ডাল, মাছ, দহি ?

হাজারি নরেনের মুখের দিকে চাহিল। সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না। নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুঝাইল। রেলযাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা হিন্দু ভাতের হোটেল খুলিতে চায়। সাহেব হাজারির নামডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। আপাততঃ দেড়শো টাকা জমা দিলে উহারা লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচে হোটেলের ঘর বানাইয়া দিবে।

হাজারি সাহেবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজী আছে।

স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেণ্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলি পুরাইয়া হাজারির নাম সই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোর কমপিটিশন চলিল। নৈহাটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালা টেণ্ডার দিল এবং ওপর-ওয়ালা কর্মচারীদের নিকট তদ্বিরতাগাদাও শুরু করিল।

নিজ রাণাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না—শেষের দিকে, অর্থাৎ যখন টেণ্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী, যদু বাঁড়ুয্যে কথাটা শুনিল। স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটেলে খায়, সেই কি করিয়া জানিতে পারিয়া যদুকে বলিল—একটু চেষ্টা করুন না। আপনি—টেণ্ডার দিন। হয়ে যেতে পারে।

যদু চুপি চুপি টেণ্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেণ্ডারের জন্য জমা দিয়া আসিল।

সেদিন বেচু চক্কত্তি সবে হোটেলের গদিতে আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় পদ্মঝি ব্যস্তসমস্ত হইয়া আসিয়া বলিল—শুনেছ গো ? শুনে এলাম একটা কথা—

—কি ?

—ইস্টিশানে ভাতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি, দরখাস্ত দাও না কর্তা।

—ইস্টিশানে ? ছোঃ, ওতে খদ্দের হবে না। দূরের যাত্রীদের মধ্যে কে ভাত খাবে ? সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে—

—তোমার এই সব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা-উজীর মারা। সবাই দূরের যাত্রী থাকে না—যারা গাড়ী বদলে খুলনে লাইনে যাবে, তারা খাবে, দুপুরে যে সব গাড়ী কলকাতায় যায়—তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই খেয়ে যাবে। শুনলাম বাঁড়ুয্যে মশায় নাকি দর-

খাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে—

বেচু চক্কত্তির চমক ভাঙিল। যদু বাঁড়ুয্যে যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে, তবে এ ব্যাপারে সব আছে, কারণ যদু বাঁড়ুয্যে ঘুঘু হোটেলওয়ালা। পয়সা আছে না বুঝিয়া সে টেণ্ডারের পাঁচ টাকা জমা দিত না। বেচু বলিল—যাই, একবার দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে—

পদ্মঝি বলিল—কেরানী বাবুদের কিছু খাইয়ে এস—নইলে কাজ হবে না। আমাদের হোটেলে সেই যে শশধরবাবু খেতো, তার শালা ইষ্টিশানের মালবাবু, তার কাছে সুলুকসন্ধান নিও। না করলে চলবে কি করে? এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

—কেন ওবেলা খদ্দের তো মন্দ ছিল না?

পদ্মঝি হতাশার সুরে বলিল—ওকে ভাল বলে না কর্তা। সতেরো জন খাড় কেলাসে আর ন'জন বাঁধা খদ্দেরে টাকা দিচ্ছে তবে হোটেল চলছে—নইলে বাজার হোত না। মুদি ধার দেওয়া বন্ধ করবে বলে শাসিয়েছে, তারই বা দোষ কি—একশো টাকার ওপর বাকী।

বেচু বলিল—টেণ্ডারের দরখাস্ত দিতে গেলে এখুনি পাঁচটা টাকা চাই, তবিলে আছে দেখছি এক টাকা সাড়ে তের আনা মোট, ওবেলার দরুন। তার মধ্যে কয়লার দাম দেবো বলা আছে ওবেলা, কয়লাওয়ালা এল বলে। টাকা কোথায়?

পদ্মঝি একটু ভাবিয়া বলিল—ও-থেকে একটা টাকা নাও এখন। আর আমি চার টাকা যোগাড় করে এনে দিচ্ছি। আমার লবঙ্গফুল থাকে এপাড়ায় তার কাছ থেকে। কয়লা-ওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—

—বুঝিয়ে রাখবে কি, সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে। তুমি পাঁচ টাকাই এনে দাও—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেচুও গিয়া টেণ্ডার দিয়া আসিল। পদ্মঝি সাগ্রহে গদির ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল, এখনও খরিদ্দার আসা শুরু হয় নাই। বলিল—হয়ে গেল কর্তা? কি শুনে এলে?

—হয়ে যাবে এখন? ছেলের হাতের পিঠে বুঝি? তবে খুব লাভের কাণ্ড যা শুনে এলাম। যদু পাকা লোক—নইলে কি দরখাস্ত দেয়? আমি আগে বুঝতে পারি নি। মোটা লাভের ব্যবসা। ইষ্টিশানের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতো মনে আছে? সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে। সে-ই বল্লে—যাত্রীরা রেলের বড় আপিসে দরখাস্ত করেছে আমাদের খাওয়ার কষ্ট। তা ছাড়া, রেল কোম্পানী এলেকটিক আলো দেবে, পাখা দেবে, ঘর করে দেবে—তার দরুন কিছু নেবে না আপাতোক। রেলের বোর্ড না কি আছে, তাদের অর্ডার। যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে। যথেষ্ট লোক খাবে পদ্ম, মোটা পয়সার কাণ্ড যা বুঝে এলাম।

পদ্মঝি বলিল—জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো সিদ্ধেশ্বরীতলায়। হয়ে যেন যায়—তুমি কাল আর একবার গিয়ে ওঁদিগের কিছু খাইয়ে এসো—

—বলি যদু বাঁড়ুয্যে টের পেলে কি করে হ্যা ?

—ও সব ঘুঘু লোক। ওদের কথা ছাড়ান দ্যাও।

ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা গেল রেলের তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈয়ারী করিতেছে—আসবাবপত্র, আলমারি, টেবিল, চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে, সে-সব কোম্পানী দিবে।

এই সময় একদিন যদু বাঁড়ুয্যেকে হঠাৎ তাহাদের গদিঘরে আসিতে দেখিয়া বেচু ও পদ্মঝি উভয়েই আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয্যে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—কুলীন ব্রাহ্মণ, মাটিঘরার বিখ্যাত বাঁড়ুয্যে-বংশের ছেলে। কখনও সে কারো দোকানে বা হোটেলে গিয়া হাউ-হাউ করিয়া বকে না—গম্ভীর মেজাজের মানুষটি।

বেচু চক্কত্তি যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

যদু বাঁড়ুয্যে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—তারপর এসেছি একটা কাজে, চক্কত্তি মশায়। হোটেল চলছে কেমন ?

বেচু বলিল—আর তেমন নেই, বাঁড়ুয্যে মশায়। ভাবছি, তুলে দিয়ে আর কোথায়ও যাই! খদ্দেরপত্তর নেই আর—

—আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি। ইস্টিশানে হোটেল হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই। আমি একটা টেণ্ডার দিই। শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ—তা—আমিও—

—বেশ। বলি, শুনুন। নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বড্ড তদ্বির করছে ওপরে—তারই হয়ে যাবে। মোটা পয়সার কারবার হবে ওই হোটেলটা। আসাম মেল, শান্তিপুর, বনগাঁ, ডাউন চাটগাঁ মেল—এসব প্যাসেঞ্জার খাবে—তা ছাড়া থাউকো লোক খাবে। ভাল পয়সা হবে এতে। আসুন আপনি আর আমি দু'জনে মিলে দরখাস্ত দিই যে রাণাঘাটের আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালা, আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবে হোটেল। স্থানীয় হোটেলওয়ালারা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করেচে এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের খুব।

বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যায় বলিয়াই আজ যদু বাঁড়ুয্যে তাহার গদিতে ছুটিয়া আসিয়াছে—নতুবা ঘুঘু যদু কখনও লাভের ভাগাভাগিতে রাজী হইবার পাত্র নয়। বলিল—বেশ দরখাস্ত লিখিয়ে আনুন—আমি সই করে দেবো এখন।

যদু বাঁড়ুয্যে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—আরে, সে কি বাকি আছে, সে অশ্বিনী উকীলকে দিয়ে মুসোবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করে এনেছি। আপনি এখানটায় সই করুন—

যদু বাঁড়ুয্যে সই লইয়া চলিয়া গেলে পদ্মঝি আসিয়া বলিল—কি গা কর্তা ?

বেচু হাসিয়া বলিল—কারে না পড়লে কি ঘুঘু যদু বাঁড়ুয্যে এখানে আসে কখনো ? সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল। শুনবে ?

পদ্ম সব শুনিয়া বলিল—তাও ভালো। বেশী যদি বিক্রী হয়, ভাগাভাগিও ভালো।

এখানে তোমার চলবেই না, যেরকম দাঁড়াচ্চে তার আর কি। হোক্, ইষ্টিশানে আধা বখরাই হোক্।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে একদিন যদু বাঁড়ুয্যে বেচুর গদিঘরে ঢুকিয়া যে ভাবে ধপ্ করিয়া হতাশ ভাবে তক্তপোশের এক কোণে বসিয়া পড়িল, তাহাতে পদ্মঝি (সেখানেই ছিল) বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদের জন্য পদ্মঝি প্রস্তুত ছিল না।

যদু বলিল—শুনেছেন, চক্কত্তি মশাই! কাণ্ডটা শোনেন নি?

বেচু চক্কত্তি ওভাবে যদু বাঁড়ুয্যেকে বসিতে দেখিয়া পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শুভ নয়। তবুও সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি! কি ব্যাপার?

—ইষ্টিশানের থেকে আসচি এই মাত্তর, আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেণ্ডার মঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে—

বেচু একথার উত্তরে কিছু না বলিয়া উদ্বিগ্ন মুখে যদু বাঁড়ুয্যের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—কার হয়ে গেল জানেন?

—না—সেই ভাটিয়া ব্যাটার বুঝি—

—তা হলেও তো ছিল ভাল। হল হাজারির, তোমাদের হাজারির—

বেচু ও পদ্মঝি দু'জনেই বিস্ময়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায়।

বেচু চক্কত্তি বলিল—দেখে এলেন?

—নিজের চোখে। ছাপা অক্ষরে। নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে—

পদ্মঝি হতবাক হইয়া যদু বাঁড়ুয্যের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল কথাটা যেন সে এখনও বিশ্বাস করে নাই।

বেচু চক্কত্তি বলিল—তা হলে ওরই হল!

এ কথার কোন অর্থ নাই, যদুও বুঝিল, পদ্মঝিও বুঝিল। ইহা শুধু বেচুর মনের গভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র।

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—ওঃ, লোকটার বরাত খুবই ভাল যাচ্ছে দেখছি। ধুলো মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হচ্ছে। আজ একুশ বছর এই রেলবাজারে হোটেল চালাচ্ছি, আমরা গেলাম ভেসে, আর ও হাতাবেড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাত, তার কিনা—সবই বরাত—

বেচু বলিল—কেন হল, কিছু শুনলেন নাকি? টাকা ঘুষঘাষ দিয়েছিল নিশ্চয়?—

—টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। হেড্ অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে—এখানকার ইষ্টিশান মাষ্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছিল। কোন কোন প্যাসেঞ্জার ওর নাম লিখেছে হেড্ অফিসে, খুব ভাল রান্না করে নাকি, এই সব।

আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্মঝি বলিল—বলি এ কি হল, হ্যাঁ কর্ত্তা?

—তাই তো!

—মড়ুই পোড়া বামুনটা বড় বাড় বাড়িয়েচে, আর তো সহ্যি হয় না—

—কি আর করবে বল। আমি ভাবছি—

—কি ?

—কাল একবার হাজারির হোটেলে আমি যাই—

—কেন, কি দুঃখে ?

—ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও, রেলের হোটেলের অংশ কিছু আমায় দাও—

পদ্মঝি ভাবিয়া বলিল—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চায় ?

—আমাকে খুব মানে কিনা তাই বলছি। এ না করলে আর উপায় নেই পদ্ম। হোটেল আর চালাতে পারবো না। একরাশ দেনা—খরচে আয়ে আর কুলোয় না। এ আমায় করতেই হবে।

পদ্মঝিয়ের মুখে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। বলিল—যা ভাল বোঝ কর কর্ত্তা। আমি কি বলব বল !

কিছুক্ষণ পরে যদু বাঁড়ুয্যে পুনরায় বেচুর হোটেলে আসিয়া বসিল। বেচু চক্কত্তি খাতির করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে যদু বলিল—একটা মতলব মনে এসেছে চক্কত্তি মশায়—তাই আবার এলাম।

বেচু সকৌতূহলে বলিল—কি বলুন তো ?

—আমি পালচৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম। ওঁরা জমিদার, ওঁদের খাতির করে রেল কোম্পানী। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন, আপনি আর আমি কলকাতা রেল আপিসে একবার আপীল করি গিয়ে।

পদ্মঝি দোরের কাছেই ছিল, সে বলিল—তাই যান গিয়ে কর্ত্তা, আমিও বলি যাতে কক্ষনো ও মড়ুই পোড়া বামুন হোটেল না পায় তা করাই চাই, দু'জনে তাই যান—

বেচু চক্কত্তি ভাবিয়া বলিল—কখন যেতে চান কাল ?

যদু বলিল—সকাল সকাল যাওয়াই ভাল। বড় বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে—পালচৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায়ই। গরফেতে বাড়ী, বড় ভাল লোক। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি।

যদু চলিয়া গেলে বেচু চক্কত্তি পদ্মকে বলিল—কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমার ওভাবে যাওয়া হয় না। ও সব টের পাবেই যে আমরা আপীল করেছি, ওকেও নোটিশ দেবে কোম্পানী। আপীলের শুনানী হবে। তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায় ?

—না হয় না গেলে। ওর দরকার নেই, যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই কর।

—বেশ, যা বল।

পরদিন যদু বাঁড়ুয্যের সঙ্গে বেচু চক্কত্তি কয়লাঘাটে রেলের বড় আপিসে যাইবে বলিয়া

বাহির হইল এবং সন্ধ্যার পরে পুনরায় রাণাঘাটে ফিরিল। বেচু যখন নিজের হোটেলে ঢুকিল, তখন খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। পদ্মঝি ব্যস্তভাবে বলিল—কি হ'ল কর্তা?

বেচু বলিল—আর কি, মিথ্যে যাতায়াত সার হ'ল, দুটো টাকা বেরিয়ে গেল। তারা বল্লে—এ আমাদের হাতে নেই, টেণ্ডার মঞ্জুর হয়ে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে। এখন আর আপীল খাটবে না।

—তবে যাও কাল হাজারির কাছেই যাও—

তার দরকার নেই। বাঁড়ুয্যে মশায় আসবার সময় বল্লেন—ওঁর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সামনের মাসে ওঁর ঘরেই—

পদ্মঝি বলিল—এ কিন্তু খুব ভাল কথা। ও ছোটলোকটার কাছে না গিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভাল।

পরবর্ত্তী পনেরো দিনের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল।

স্টেশনের আপ্ প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নূতন হিন্দু-হোটেল খোলা হইল। শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেক্‌ট্রিক আলো, পাখা দিয়া সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি। হোটেলের মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

আর একটি বিশিষ্ট ঘটনা, বেচু চক্কত্তির পুরানো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমন একটা গুজব রেলবাজারের সর্ব্বত্র রটিল।

সেদিন বিকালের দিকে হাজারি তাহার পুরানো অভ্যাসমত চূর্ণীর ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে, এমন সময় পদ্মঝিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

হাজারিই পদ্মকে ডাকিয়া বলিল—ও পদ্মদিদি, কোথায় যাচ্ছ?

পদ্মঝি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ছোট্ট পাথরের বাটি। সম্ভবতঃ কাছেই কোথাও পদ্মঝিয়ের বাসা।

হাজারি বলিল—বাটিতে কি পদ্মদিদি?

—একটু দম্বল, দই পাতবো বলে গোয়ালাবাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তারপর, ভাল আছ?

—তা মন্দ নয়। তুমি ভাল আছ ঠাকুর?

এখানে কাছেই থাকো বুঝি?

এ কথার উত্তরে পদ্মঝি যাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। বলিল—এস না ঠাকুর, আমার বাড়ীতে একবার এলেই না হয়—

—তা বেশ বেশ, চলো না পদ্মদিদি।

ছোট্ট বাড়ীটা, একপাশে একটা পাতকুয়া, অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোয়াল। পদ্মঝি রোয়াকটাতে একখানা মাদুর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল। হাজারি

খানিকটা অস্বস্তি ও আড়ষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল। পদ্ম যে তাহার মনিব, তাহাদেরই হোটেলে সে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাজ করিয়াছে, এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায়? এমন কি, পদ্মঝিকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে, আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

পদ্মঝি বলিল—পান সাজবো খাবে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—তা—তা বরং একটা—

পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—তারপর, রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম। ওখানে বসাবে কাকে?

—ওখানে বসাবো ভাবছি বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন—নরেনকে মনে আছে? সেই তাকে।

—মাইনে কত দেবে?

—সে সব কথা এখনও ঠিক হয় নি। ও তো আমার এই হোটেলে খাতাপত্র রাখে, লেখাশুনো করে, বড় ভাল ছেলেটি।

—তা ভালো।

—চক্কত্তি মশায়ের শরীর ভাল আছে? ক'দিন ওদিকে আর যেতে পারি নি। হোটেল চলছে কেমন?

—হোটেল চলছে মন্দ নয়। তবে আমি কি বলছিলাম জানো ঠাকুর, কর্ত্তামশায়কে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখো না তুমি? তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হাজারি এ প্রস্তাবের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কর্ত্তা কি করে থাকবেন? ওঁর নিজের হোটেল?

—সেজন্যে ভাবনা হবে না। সে আমি দেখব। কি বল তুমি?

—এখন আমি কোন কথা দিতে পারব না পদ্মদিদি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি। রেল-কোম্পানী যখন টেণ্ডার নেয়, তখন যার নাম লেখা থাকে, তার ছাড়া আর কোন লোকের অংশটংশ থাকতে দেবে না হোটেলে। হোটেল ত আমার নয়—হোটেল রেল-কোম্পানীর।

—ঠাকুর একটা কথা বলব? তুমি এখন বড় হোটেলওয়ালা, অনেক পয়সা রোজগার কর শুনি। কিন্তু আমি তোমায় সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি। তুমি এস আমাদের হোটেলে আবার।

হাজারি বিস্ময়ের সুরে বলিল—চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে? রাঁধতে?

সে মনে মনে ভাবিল—পদ্মদিদির মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? বলে কি?

পদ্ম কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিল—সত্যি বলছি ঠাকুর। এস আমাদের ওখানে আবার।

—কেন বল তো পদ্মদিদি? একথা তুললে কেন?

—তবে বলি শোন। তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জাঁকবে।

এমন ধরনের কথা হাজারি কখনও পদ্মঝিয়ের মুখে শোনে নাই। সেই পদ্মঝি আজ কি কথা বলিতেছে তাহাকে ?

হাজারি গলিয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক —পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক, তাহার মুখের একথা যেন হাজারির জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এরই আশায় যেন সে এতদিন রাণাঘাটের রেলবাজারে এত কষ্ট করিয়াছে।

অন্য লোকে হাজার ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উঁচু, অনেক বেশী মূল্যবান।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে, তাহা যে হয় না একথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে! যখন সে গোপালনগরের চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্কত্তি মশায়ের হোটেলে চাকুরি লইয়াছিল— তখনও উহারা যদি তাহাকে না তাড়াইয়া দিত, তবে তো নিজস্ব হোটেল খুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না। উহাদের হোটেলে পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে—কেন তাহাকে উহারা তাড়াইল!

এখন আর হয় না।

এখন সে নিজের মালিক নয়, কুসুমের টাকা ও অতসীমা'র টাকা হোটেলে খাটিতেছে, তাহার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অনেকগুলি প্রাণীর উন্নতি-অবনতি জড়ানো। নিজের খেয়াল-খুশিতে যা-তা করা এখন আর চলিবে না।

টেঁপির ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—টেঁপি আর নরেন।

অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে—আর এখন পিছানো চলে না।

হাজারি পদ্মঝিয়ের মুখের দিকে দুঃখ ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—

—আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি। কিন্তু এখন যাওয়া হয় কি ক'রে তুমিই বল!

পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয়, সে নিতান্ত মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। হাজারির কথার সে কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা কাপড়-জড়ানো ছোট্ট পুঁটুলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—পড়তে জান তো, পড়ে দেখ না ?

হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয়, তবে ও কাজে সে খুব পারদর্শী নয়। তবু পদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে সে ভাল পড়িতে পারে না! পুঁটুলি খুলিয়া সে দেখিল খান-কয়েক কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নাই।

পদ্মঝি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে নিজেই বলিল—ক-খানা হ্যাণ্ডনোট, তা সবসুদ্ধ সাত-শ টাকার হ্যাণ্ডনোট। কর্ত্তাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছে তখন। নিজের হাতের চুড়ি বিক্রি করি, কানের মাকড়ি বিক্রি করি—ছিল তো সব, যখন এইখিরি ছিলাম, দুখানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে।

হাজারি বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি ?

—নেই নি তো কার টাকায় হোটেল চলছিল এতদিন? যা কিছু ছিল সব ওর পেছনে খুইয়েছি।

—কিছু টাকা পাও নি?

—পেটে খেয়েছি আমি, আমার বোনঝি, আমার এক দেওর-পো এই পর্য্যন্ত। পয়সা যে একেবারে পাই নি তা নয়—তবে কত আর হবে তা? বোনঝির বিয়েতে কর্ত্তা-মশায় এক-শ টাকা দিয়েছিলেন—সে আজ সাত বছরের আগের কথা। সাত-শ টাকার সুদ ধর কত হয়?

—টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে?

—আজ ন-বছরের ওপর হ'ল। ওই এক-শ টাকা ছাড়া একটা পয়সা পাই নি—কর্ত্তা-মশায় কেবলই ব'লে আসছেন একটু অবস্থা ভাল হোক হোটেলের সব হবে, দেব।

—ওঁকে আগে থেকে জানতে নাকি, না রাণাঘাটে আলাপ?

—সে-সব অনেক কথা ঠাকুর। উনি আমাদের গাঁ ফুলে-নব্‌লার চক্কত্তিদের বাড়ীর ছেলে। ওঁর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্কত্তি—বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। অবস্থাও ভাল ছিল তাঁর—আমাদের কর্ত্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে। লেখাপড়া তেমন শেখেন নি, বললেন রাণাঘাটে গিয়ে হোটেল করব, পদ্ম কিছু টাকা দিতে পার? দিলাম টাকা। সে আজ হয়ে গেল—

হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্ন পদ্মদিদিকে না করাই ভাল। গ্রামে এত লোক থাকিতে তারাচাঁদ চক্কত্তির বড় ছেলে তাহার কাছেই টাকা চাহিল কেন, সেই বা টাকা দিল কেন, রাণাঘাটে বেচুর হোটেলে তাহার ঝি-গিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বিত ব্যবস্থার ফল—এসব কথা হাজারি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যাইত না।

কিন্তু হাজারির বয়স হইয়াছে, জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয়, সে এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করিয়া বলিল—হ্যাণ্ডনোটগুলো তুলে রেখে দাও পদ্মদিদি ভাল ক'রে। সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকাও তোমার হয়ে যাবে—এগুলো রেখে দাও।

পদ্ম কি রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল—ও সব তুলে রেখে কি করব ঠাকুর? ও-সব কোন্ কালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে। পড়ে দেখ না ঠাকুর—

হাজারি অপ্রতিভ হইয়া শুধু বলিল—ও!

—যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর, সব হোটেলের পেছনে দিয়েছি—আর কি আছে এখন হাতে, ছাই বলতে রাইও না।

শেষের কথাগুলি পদ্মঝি যেন আপন মনেই বলিল, বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া নহে। হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পদ্মঝির এমন অবস্থা সে কখনও দেখে নাই—ভিতরের কথা সে জানিত না, মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পদ্মদিদির উপর!

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল, সে কিছুই যখন করিতে পারিবে না

আপাততঃ—তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি ?…

বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটি অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল।

বাহিরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেঁপির গলা। সে বলিতেছে—নরেনদা, চা না খেয়ে কিছুতেই আপনি এখন যেতে পারবেন না। বসুন।

নরেন বলিতেছে—না, একবার এ-হোটেলে যেতে হবে, তুমি বোঝ না আশা, ইষ্টিশানের হোটেল এখন তো বন্ধ—কিন্তু মামাবাবু আসবার আগে এ-হোটেলের সব দেখাশুনো আমার করতে হবে।

টেঁপির ভাল নাম যে আশালতা, হাজারি নিজেই তা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—নরেন ইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল !

টেঁপি পুনরায় আবদারের সুরে বলিল—না ওসব কাজটাজ থাকুক, আপনি আমাকে আর মাকে টকি দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—আজ নিয়ে যেতেই হবে।

—কি আছে আজ ?

—আনব ? একখানা টকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে। ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি ক'রে যাচ্ছিল ওবেলা, খোকা একখানা এনেছে—

—যাও চট্ করে গিয়ে নিয়ে এস।

হাজারির ইচ্ছা ছিল না উহাদের কথাবার্তায় সে বাধা দেয়। এমন কি সে একপ্রকার নিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি টেঁপি টকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পড়িয়া গেল।

টেঁপি পাছে কোনপ্রকার লজ্জা পায়—এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—এই যে টেঁপি। তোর মা কোথায় ?

টেঁপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া গেল। মুখে বলিল—কে, বাবা ! কখন এলে ? টের পাই নি তো ?

হাজারির কিন্তু মনে হইল টেঁপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই। যেন ভাবিতেছে, আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত।

হাজারির বুকের ভিতরটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। মেয়েসন্তান, আহা বেচারী ! সব কথা কি ওরা গুছিয়ে বলতে পারে, না নিজেরাই বুঝিতে পারে ? টেঁপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি ?

হাজারি বলিল—আমি এখুনি হোটেলে বেরিয়ে যাব টেঁপি। বেলা পাঁচটা বেজে গিয়েছে, আর থাকলে চলবে না। এক গ্লাস জল বরং আমায় দে—

ওঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল—মামাবাবু কখন এলেন ?

হাজারি যেন পূর্ব্বে নরেনের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায় নাই বা এখানে নরেন উপস্থিত আছে সে-বিষয়ে কিছু জানিত না, এমন ভাব দেখাইয়া বলিল—কে নরেন ? কখন এলে বাবাজী ?

—অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু—চলুন, আমিও হোটেলে বেরিয়েছি—

বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি বলিল—একটু জলটল খেয়ে যাও না? হোটেলে এখন ধোঁয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি? ব'স ব'স বরং। টেঁপি তোর নরেনদা'র জন্যে একটু চা—

—না না থাক মামাবাবু, হোটেলে তো চা এমনিই হবে এখন।

—তা হোক, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন এখান থেকেই চা খেয়ে যাও।

বলিয়া হাজারি বাড়ীর মধ্যের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। টেঁপির মা তখনও রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা মাদুর বিছাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল। বেচারী চিরকাল খাটিয়াই মরিয়াছে এঁড়োশোলা গ্রামে—এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয় তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

হাজারি স্ত্রীকেও জাগাইল না। সবাই মিলিয়া বড় কষ্ট করিয়াছে চিরকাল, এখন সুখের মুখ যখন দেখিতেছে—তখন সে তাহাতে বাদ সাধিবে না। টেঁপির মা ঘুমাইয়া থাকুক।

বাড়ীর বাহির হইতে যাইতেছে, নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু লাজুক সুরে বলিল—মামাবাবু—এই গিয়ে আশা বলছিল—মামীমাকে নিয়ে আর ওকে নিয়ে একবার টকি দেখিয়ে আনার কথা—তা আপনি কি বলেন?

টেঁপিই যে একথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে, এ-বিষয়ে হাজারির সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। ছেলেমানুষ সব, উহারা কি করে না-করে বয়োবৃদ্ধ লোকে সব বুঝিতে পারে, অথচ বেচারীরা ভাবে তাহাদের মনের খবর কেহ কিছু রাখে না।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা যাবে যাও না! আজই যাবে? পয়সা-কড়ি সব তোমার মামীমার কাছে আছে, চেয়ে নাও! কখন ফিরবে?

—রাত আটটা হবে মামাবাবু—আপনি নিজে ইষ্টিশানে যদি গিয়ে বসেন একটু—

—আচ্ছা তা হোক, ইষ্টিশানে আমি যাব এখন, সে তুমি ভেবো না। তুমি ওদের নিয়ে যাও—ও টেঁপি, ডেকে দে তোর মাকে। অবেলায় পড়ে ঘুমুচ্চে, ডেকে দে। যাস যদি তবে সব তৈরি হয়ে নে—

হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। বালকবালিকাদের আমোদের পথে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চায় না। প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া এ-বেলার রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাট্‌ফর্মের হোটেলে। এখানে সে বড় একটা বসে না। নরেনই এখানকার ম্যানেজার। এ সব সাহেবী ধরনের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চাটগাঁ মেল আসিবার বেশী বিলম্ব নাই—বনগ্রামের গাড়ীও এখনি ছাড়িবে। এই সময় হইতে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত দিবারাত্রি, ঢাকা মেল,

নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরের ট্রেনগুলির ভিড়। যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু, অনেকেই খায়। হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা।

স্টেশনের হোটেলে দুজন নূতন লোক রান্না করে। এখানে বেশীর ভাগ লোকে চায় ভাত আর মাংস—সেজন্য ভাল মাংস রান্না করিতে পারে এরূপ লোক বেশী বেতন দিয়া রাখিতে হইতেছে। পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর—এক-একদিন ভিড় এত বেশী হয় যে, ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাইতে হয়।

হাজারিকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্যেরা একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব, নরেন ম্যানেজার মাত্র। তাহারা ইহাও ভাল জানিয়াছে যে হাজারির পদতলে বসিয়া তাহারা এখন দশ বৎসর রান্না-কাজ শিখিতে পারে—সুতরাং হাজারিকে শুধু তাহারা যে মনিব বলিয়া সমীহ করে তাহা নয়, ওস্তাদ কারিগর বলিয়া শ্রদ্ধা করে।

একজন রাঁধুনীর নাম সতীশ দীঘড়ি। বাড়ী হুগলী জেলার কোনো পাড়াগাঁয়ে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খুব ভাল রান্নার কাজ জানে, পূর্ব্বে ভাল ভাল হোটেলে মোটা মাহিনায় কাজ করিয়াছে—এমন কি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল—সেখানে এক শিখ হোটেলেও কিছুদিন কাজ করিয়াছে। সতীশ নিজে ভাল রাঁধুনী বলিয়া হাজারির মর্ম্ম খুব ভাল করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলে।

হাজারি তাহাকে বলিল—কি দীঘড়ি মশাই, রান্না সব তৈরী হোল?

সতীশ বিনীত সুরে বলিল—একবার দয়া করে আসুন কর্ত্তা, মাংসটা একবার দেখুন না?

—ও আমি আর কি দেখব, আপনি যেখানে রয়েছেন—

—অমন কথা বলবেন না কর্ত্তা, অন্য কেউ আপনাকে বোঝে না-বোঝে আমি তো আপনাকে জানি—এসে একবার দেখিয়ে যান—

হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ার মাংসের রং দেখিয়া বলিল—রং এরকম কেন দীঘড়ি মশায়?

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাঁধুনীকে বলিল—বলেছিলাম না কাত্তিক? কর্ত্তা চোখে দেখলেই ধরে ফেলবেন? কুঁদের মুখে বাঁক থাকে কখনো? কর্ত্তা যদি কিছু মনে না করেন, কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ।

হাজারি হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা দিতে হবে দীঘড়ি মশাই আবার এ বয়সে? লঙ্কার বাটনা হয় নি—পুরনো লঙ্কা, তাতেই রং হয় নি। রং হবে শুধু লঙ্কার গুণে।

—কর্ত্তা মশাই, সাধে কি আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিতে ইচ্ছে করে? কিন্তু আর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন।

হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের কড়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল—কষামাংসে যে গরম জল ঢেলেছিলেন, তা ভাল ফোটে নি। সেই জন্যে প্যাঁজা উঠেছে। ওতে মাংস শক্ত হয়ে যাবে।

সতীশ মস্ত শ্যাচকের দিকে চাহিয়া বলিল—শোন কার্ত্তিক, শোন। আমি বলছিলাম না তোমায় জল ঢালবার সময় যে এতে প্যাঁজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না? আর কর্ত্তা-মশায় না দেখে কি করে বুঝে ফেলেচেন স্যাথ। ওস্তাদ বটে আপনি কর্ত্তা।

হাজারি হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বেশ ভালো ঘর। বিজলী আলো জ্বলিতেছে। মার্ব্বেল পাথরের টেবিলে বাবু খরিদ্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া। ভীষণ ভীড় খরিদ্দারের—ওদিকে বনগাঁ লাইনের ট্রেনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা, পয়সা গুনিয়া কূল করা যায় না—এই তো জীবন। বেচু চক্কত্তির হোটেলের রান্নাঘরে বসিয়া হাতাবেড়ি নাড়িতে নাড়িতে এই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনও সাহস করে নাই। এত সুখও তার অদৃষ্টে ছিল! পদ্মদিদির কত অপমান আজ সার্থক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিত কর্ম্মব্যস্ত হোটেল-জীবনের মধ্যে! আজ কাহারও প্রতি তাহার কোন বিদ্বেষ নাই।

হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাঁটাপথে গোপালনগরে যাইবার সময় সেই ছোট্ট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ীর বধূটির কথা। হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায়ে খাটাইয়া দিবে। সে কাল যাইবে। গরীব মেয়েটির টাকা খাটাইবার এই ভাল ক্ষেত্র। বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিল হাজারির দুঃসময়ে—সুসময়ে সেই সরলা মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে। নতুবা ধর্ম্ম থাকে না।

পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল। চাকদা স্টেশন পর্য্যন্ত অবশ্য ট্রেনে আসিল—বাকী পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল।

সেই রকম বড় বড় তেঁতুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিনমানেই এ পথে অন্ধকার। হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়াছিল, তখন রাণাঘাট হোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে—হাতে পয়সা নাই, পথ হাঁটিয়া এই পথে সে চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। আর আজ?

আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় হোটেলের মালিক। তার অধীনে দশ-বারো জন লোক খাটে। যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি, হাজারির সাধ্য নাই তাহার বিন্দুমাত্র প্রত্যুপকার সে করে—অতসী-মা বড়মানুষের মেয়ে, তার উপর সে বিবাহিতা—হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে?

কিন্তু তাহার বদলে যে দুটি-একটি সরলা দরিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নতুন পাড়ার গোয়ালা-বউটি ইহাদের মধ্যে একজন। নতুন পাড়া পৌঁছিতে বেলা প্রায় ন'টা বাজিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেঁতুল গাছের ছায়ায় কাহাদের একখানা গরুর গাড়ী পড়িয়া

আছে, তাহার উপর আসিয়া বসিল। সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, এক হাঁটু ধুলা—একটু জিরাইয়া লইয়া ঘাম মরিলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকাই যুক্তিসঙ্গত।

একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পথিক যশোরের দিক হইতে আসিতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল—দেশলাই আছে?

—আছে, বসুন।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—প্রণাম হই, একটু পায়ের ধুলো দেন ঠাকুরমশাই।

লোকটির নাম কৃষ্ণলাল, জাতিতে শাখারি, বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে। কথাবার্ত্তায় বেশ টান আছে পূর্ব্ববঙ্গের। বনগ্রামে ইছামতীর ঘাটে তাহাদের শাঁখার বড় ভড় নোঙর করিয়া আছে, কৃষ্ণলাল পায়ে হাঁটিয়া এ অঞ্চলের গ্রামগুলি এবং ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কাজের লোক বেশীক্ষণ বসে না। একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণলাল উঠিতে চাহিল। হাজারি কথাবার্ত্তায় তাহাকে বসাইয়া রাখিল। বনগাঁ হইতে সতেরো মাইল পথ হাঁটিয়া ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে যে লোক, তাহার উপর অসীম শ্রদ্ধা হইল হাজারির। ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে।

সে বলিল—গাঁজাটাজা চলে? আমার কাছে আছে—

কৃষ্ণলাল একগাল হাসিয়া বলিল—তা ঠাকুরমশায়—পেরসাদ যদি দেন দয়া ক'রে—তবে তো ভাগ্যি।

—বোসো তবে, এক ছিলিম সাজি।

হাজারি খুব বেশী যে গাঁজা খায়, তা নয়। তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক-আধ ছিলিম খাইয়া থাকে। আজকাল রাণাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই, হোটেলের সকলে খাতির করে, তাহার উপর নরেন আছে—এই সব কারণে হোটেলে ও ব্যাপার চলে না—বাসায় তো নয়ই, সেখানে টেঁপি আছে। আবার যাহার তাহার সঙ্গেও গাঁজা খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে মান থাকে না। আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি হৃষ্টমনে ভাল করিয়া ছিলিম সাজিল। কলিকাটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিতে যাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—বাপরে, আপনারা দেবতা। পেরসাদ করে দিন আগে—

কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল। কৃষ্ণলাল খুশি হইল, সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে না—নিজের চেষ্টায় যে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোলেটের মালিক, তাহার সহিত বসিয়া গাঁজা খাওয়া যায় বটে।

হাজারি বলিল—রাণাঘাটে তো যাবে, আমার হোটেলেই উঠো। রেলবাজারে আমার

নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে। পয়সা দিও না কিন্তু, আমি সই দিয়ে দিচ্ছি—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণলাল পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে ওইটি মাপ করতে হবে কর্তা। আপনার হোটেলেই উঠবো—কিন্তু বিনি পয়সায় খেতে পারব না। ব্যবসার নিয়ম তা নয়, নেধ্য নেবে, নেধ্য দেবে। এ না হলে ব্যবসা চলে না। ও হুকুম করবেন না ঠাকুরমশায়।

—বেশ, তা যা ভাল বোঝো।

কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীচরণ ঘোষের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। শ্রীচরণ ঘোষ বাড়ীতেই ছিল, হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই। এসব স্থানে কালেভদ্রে লোকজন আসে—কাজেই মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন।

বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বলেছিলেন যে দু-মাসের মধ্যে আসবেন খুড়োমশায়? দু-বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে! মনে পড়ল এতদিন পরে মেয়ে বলে?

—তা তো পড়লো মা। এস সাবিত্রীসমান হও মা, বেশ ভাল আছ?

—আপনি যেরকম রেখেছেন। আপনাদের বাড়ীর সব ভাল খুড়োমশায়?

—তা এখন একরকম ভাল।

—কুসুমদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছে?

—হ্যাঁ, ভাল আছে।

—আমার কথা বলেছিলেন?

হাজারি বিপদে পড়িল। ইহার এখান হইতে সেবার সেই যাইবার পরে গোপালনগরে চাকুরি করিল অনেক দিন, তারপর কতদিন পরে রাণাঘাটে গিয়া কুসুমের সহিত দেখা—ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল?

—ইয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কিনা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় সব কথা মনেও পড়ে না ছাই। বুড়োও তো হয়েছি মা—

—আহা বুড়ো হয়েচেন না আরও কিছু! আমার পিসেমশায়ের চেয়ে আপনি তো কত ছোট।

—কে গঙ্গাধর? হ্যাঁ, তা গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্ততঃ ষোল-সতেরো বছরের বড়।

—বসুন খুড়োমশায়, আমি আপনার হাত-পা ধোয়ার জল আনি—

শ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল—আপনি তো দাঠাকুর বউমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক—সব শুনেচি আমরা সেবার আপনি চলে গেলে। বউমা সব পরিচয় দেলেন।

হাজারি বলিল—সে বউটির বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক নয়, তবে তাহার পিসিমার

শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক বটে এবং বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহুদিন হইতে জানাশোনা আছে বটে।

শ্রীচরণ বলিল—দাঠাকুর আমরা ছোট জাত, বলতে সাহস হয় না—যখন এবার পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন দু-চার দিন এখানে এবার থাকুন না কেন? বউমারও বড্ড সাধ আপনি দুদিন থাকেন, আমায় বলতি বলেচে আপনাকে।

হাজারি এখানে কুটুম্বিতার নিমন্ত্রণ খাইতে আসে নাই, এমন কি আজ ওবেলা রওনা হইতে পারিলেই ভাল হয়। দুটি বড় হোটেলের কাজ, সে না থাকিলে সব বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে—হাজার কাজ বুঝিলেও নরেন এখনও ছেলেমানুষ। তাহার উপর দুই হোটেলের ক্যাশের দায়িত্ব রাখা ঠিক নয়।

রান্না করিবার সময় বউটিও ঠিক ওই অনুরোধ করিল। এখন দুদিন থাকিয়া যাইতে হইবে, যাইবার তাড়াতাড়ি কিসের? সেবার ভাল করিয়া সেবাযত্ন না করিতে পারিয়া উহাদের মনে কষ্ট আছে, এবার তাহা হইতে দিবে না।

হাজারি হাসিয়া বলিল—মা, সেবার দুদিন থাকলে কোনো ক্ষেতি ছিল না—কিন্তু এবার তা আর ইচ্ছে করলেও হবার জো নেই।

হাজারির কথার ভাবে বউটি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন খুড়োমশায়? এবার থাকতে পারবেন না কেন? কি হয়েচে?

—সেবার চাকুরি ছিল না বলেছিলাম মনে আছে?

—এবার চাকুরি হয়েচে, তা বুঝতে পেরেচি। ভালই তো—ভগবান ভালই করেচেন। কোথায় খুড়োমশায়?

—গোপালনগরে।

—ও! তাই এ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্চেন বুঝি?

—ঠিক বুঝেচ মা। মায়ের আমার বড্ড বুদ্ধি!

বধূটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আহা, এর মধ্যে আবার বুদ্ধির কথা কি আছে খুড়োমশায়?

—বেশ, কিন্তু তুমি বঁটি দেখে কোটো মা। আঙুল কেটে ফেলবে। ঝিঙেগুলো ধুয়ে ফেল এবার—

—গোপালনগরের কোথায় চাকুরি করচেন খুড়োমশায়?

—কুণ্ডুদের বাড়ী।

—খুব বড়লোক বুঝি?

—নিশ্চয়ই। নইলে রাঁধুনী রাখে কখনো পাড়াগাঁয়ে? খুব বড়লোক।

—ওদের বাড়ী পূজো হয় খুড়োমশায়?

—খুব জাঁকের পূজো হয়। মস্ত প্রতিমে। যাত্রা, পাঁচালি—

আমায় নিয়ে দেখিয়ে আনবেন এবার পূজোর সময়? আপনার কোনো হাংনামা পোয়াতে হবে না। আমাদের বাড়ীর গরুর গাড়ী আছে, তাতে উঠে বাপে-ঝিয়ে যাবো।

আবার তার পরদিন দেখেশুনে ফিরবো। কেমন?

—বেশ তো।

—নিয়ে যাবেন তাহলে, কথা রইল কিন্তু। আমি কখনো কোনো জায়গায় যাই নি খুড়োমশায়, বাপের বাড়ীর গাঁ আর শ্বশুরবাড়ীর গাঁ—হয়ে গেল। আমার বড্ড কোনো জায়গায় যেতে দেখতে ইচ্ছে করে। তা কে নিয়ে যাচ্ছে?

হাজারির মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। মেয়েটিকে একটু শহর-বাজারের মুখ তাহাকে দেখাইতেই হইবে। সে বুঝাইয়া বলিল, তাহার দ্বারা যাহা হইবার তাহা সে করিবেই। পাকা কথা থাকিল।

একবার তামাক খাইয়া লইয়া বলিল—মা, সেই টাকার কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ খুড়োমশায়। টাকা আপনার দরকার?

—কত দিতে পারবে?

—তখন ছিল আশি টাকা—এই দু-বছরে আর গোটা কুড়ি হয়েছে।

বধূটি লজ্জায় মুখ নিচু করিয়া বলিল—আপনার জামাই লোক ভাল। গত সন তামাক পুঁতে দু-পয়সা লাভ করেছিল, আমায় তা থেকে কুড়িটা টাকা এনে দিয়ে বললে, ছোট বৌ রেখে দাও। এ তোমার রইল।

—বেশ, টাকাটা আমায় দিয়ে দাও সবটা।

—নিয়ে যান। আমি তো বলেছিলামই সেবার—

—ভাল মনে দিচ্ছ তো মা?

বধূ জিভ কাটিয়া বলিল—অমন কথা বলবেন না খুড়োমশায়, আপনি আমার বাপের বয়িসী ব্রাহ্মণ দেবতা—দুটো কানা কড়ি আপনার হাতে দিয়ে অবিশ্বাস করব, এমন মতি যেন ভগবান না দেন।

মেয়েটির সরল বিশ্বাসে হাজারির চোখে জল আসিল। বলিল—বেশ, তাই দিও। সুদ কি রকম নেবে?

—যা আপনি দেবেন। আমাদের গাঁয়ে টাকায় দু-পয়সা রেট্—

—তাই পাবে আমার কাছে।

হাজারি খাইতে বসিয়া কেবলই ভাবিতেছিল মাত্র এক শত টাকার মূলধনে মেয়েটিকে সে এমন কিছু বেশী লাভের অংশ দিতে পারিবে না তো। অংশীদার সে করিয়া লইবে তাহাকে নিশ্চয়ই—কিন্তু এক শত টাকায় কত আর বার্ষিক লভ্যাংশ পড়িবে। হাজারির ইচ্ছা মেয়েটিকে সে আরও কিছু বেশী করিয়া দেয়। রেলওয়ে হোটেলের অংশে যে অন্য কাহারও নাম থাকিবার উপায় নাই—নতুবা ওখানকার আয় বেশী হইত বাজারের হোটেলের চেয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অল্পক্ষণ মাত্র বিশ্রাম করিয়াই হাজারি রওনা হইল—যাইবার পূর্ব্বে বৌটি হাজারির নিকট এক শত টাকা গুণিয়া দিল। হাজারি রাণাঘাট হইতেই

একখানা হ্যাণ্ডনোট একেবারে টিকিট মারিয়া আনিয়াছিল, কেবল টাকার অঙ্কটি বসাইয়া নাম সই করিয়া দিল। হাজারির অত্যন্ত মায়া হইল মেয়েটির উপর। যাইবার সময় সে বার বার বলিল—এবার যখন আসবো, শহর ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো কিন্তু মনে থাকে যেন মা।

—গোপালনগর ?

—যেখানে বল তুমি।

—আবার কবে আসবেন ?

—দেখি, এবার হয়তো বেশী দেরি হবে না।

এখান হইতে নিকটেই বেলের বাজার—ক্রোশ দুয়ের মধ্যে। হাজারির অত্যন্ত ইচ্ছা হইল বেলের বাজারে সেবার যে মুদীর দোকানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহার সহিত একবার দেখা করে। জ্যোৎস্না রাত আছে, শেষ রাত্রের দিকে বেলের বাজার হইতে বাহির হইলেও বেলা আটটার মধ্যে রাণাঘাট পৌছানো যাইবে।

বেলের বাজারের মুদী হাজারিকে দেখিয়া চিনিল। খুব যত্ন করিয়া থাকিবার জায়গা করিয়া দিল। তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল ফিরাইয়া হাজারির হাতে দিয়া বলিল—ইচ্ছে করুন, ঠাকুরমশায়। তা এখন আপনার কি করা হয় ? সেবার তো চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন—

—হ্যাঁ সেবার তো চাকুরি পেয়েওছিলাম—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী।

—ও! তা বেশ বেশ। গোপালনগরের কুণ্ডুবাবুরা এদিগরের মধ্যে নাম-করা বড়লোক। লোকও তেনারা শুনিচি বড় ভাল। কত মাইনে দেয় ঠাকুরমশাই ?

—তা দিত দশ টাকা আর খাওয়া-পরা।

—ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন বুঝি ? এখন গোপালনগরেই যাবেন তো ?

—না, আমি আর সেখানে নেই।

মুদী দুঃখিত স্বরে বলিল—আহা! সে চাকুরি নেই ? তবে এখন কি—

হাজারি বসিয়া বসিয়া তাহার হোটেলের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। দোকানী পাকা ব্যবসাদার, ইহার কাছে এ গল্প করিয়া সুখ আছে, ব্যবসা কাহাকে বলে এ বোঝে।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজিল। হাজারির গল্প শুনিয়া মুদী তাহাকে অন্য চোখেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, সম্ভ্রমের সহিত বলিল—ঠাকুরমশাই, রাত হয়েছে, রান্নার যোগাড় করে দিই। তবে একটা কথা, আমার দোকানের জিনিসপত্তরের দাম এক পয়সা দিতে পারবেন না—

—সে কি কথা!

—না ঠাকুরমশায়, এখন তো পথ-চলতি খদ্দের নন, আমারই মত ব্যবসাদার, বন্ধু লোক। আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমার যা জোটে, দুটি বিদুরের খুদ-খেয়ে

যান। আবার রাণাঘাটে যখন আপনার হোটেলে যাব, তখন আপনি আমায় খাওয়াবেন।

হাজারি জানে এ অঞ্চলের এই রকমই নিয়ম বটে। ব্যবসাদার লোকদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ও খাতির এখনও এই সব পাড়াগাঁ অঞ্চলে আছে। রাণাঘাটের মত শহর জায়গায় রেষারেষির আবহাওয়ায় উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাত্রে দোকানী বেশ ভাল খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করিয়া দিল। ঘি ময়দা আনিয়া দিল, লুচি ভাজিয়া খাইতে হইবে, হাজারির কোনো আপত্তিই টিকিল না। ছোট একটা রুই মাছ কোথা হইতে আনিয়া হাজির করিল। টাটকা পটল, বেগুন, প্রায় আধ সের ঘন দুধ, বেলের বাজারের উৎকৃষ্ট কাঁচাগোল্লা সন্দেশ।

হাজারি দস্তুরমত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। এমন জানিলে সে এখানে আসিত না। মিছামিছি বেচারীর দণ্ড করা, অথচ সে-কথা বলিতে গেলে লোকটি মহা দুঃখিত হইবে। এই ধরনের নিঃস্বার্থ আতিথেয়তা শহর-বাজারে হাজারির চোখে পড়ে নাই—এই সব পল্লী-অঞ্চলেই এখনও ইহা আছে, হয়তো দু-দশ বছর পরে আর থাকিবে না।

পরদিন সকালে হাজারি দোকানীর নিকট বিদায় লইল বটে, কিন্তু রাণাঘাট না আসিয়া হাঁটাপথে গোপালনগর চলিল। তাহার পুরানো মনিব-বাড়ী, সেখানে তাহার একটা কাপড়ের পুঁটুলি আজও পড়িয়া আছে—আনি আনি করিয়া আনা আর হইয়া উঠে নাই।

পথে বেলা চড়িল।

পথের ধারে বনজঙ্গলে ঘেরা ছোট্ট পুকুরটি দেখিয়া হাজারির মনে পড়িল ইহারই কাছে শ্রীনগর সিমলে গ্রাম।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিল, তাহার বড় ইচ্ছা হইল সেবার যাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়া তবে যাইবে। অনেক দিন পরে যখন এ পথে আসিয়াছে, তখন তাঁহার সংবাদ লওয়াটা দরকার বটে।

বিহারী বাঁড়ুয্যে মশায় বাড়ীতেই ছিলেন। এই দুই বৎসরে চেহারা তাঁহার আরও ম্যালেরিয়াশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, মাথার চুল সবগুলি পাকিয়া গিয়াছে, সম্মুখের দু-একটি দাঁত পড়িয়াছে। বাঁড়ুয্যে মশায় হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, গ্রাম্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হইল না—তখনই হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিলেন এবং এ-বেলা অন্ততঃ থাকিয়া আহার না করিয়া তাহার যে যাইবার উপায় নাই এ-কথাটিও হাজারিকে জানাইয়া দিলেন। বাড়ীর সম্মুখস্থ নারিকেল গাছে ডাব পাড়িবার জন্য তখনই লোক উঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

গ্রামে তখনই লোক ছিল না তত, এ দু-বছরে যেন আরও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশায়ের বাড়ীর উত্তর দিকের বাঁশবনের ওপারে সেবার একঘর গৃহস্থ ছিল, হাজারির মনে আছে—এবার সেখানে শূন্য ভিটা পড়িয়া আছে। বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—কে, ও দুলাল তো? না ওদের আর কেউ নেই। দুলাল আর তার ভাই নেপাল এক কার্তিক মাসে মারা গেল—দুলালের বৌ বাপের বাড়ী চলে গেল, ছেলেটা মেয়েটার হাত ধরে, আর নেপাল তো বিয়েই করে নি। কাজেই ভিটে সমভূম হয়ে গেল। আর গাঁ সুদ্ধ হয়েছে এই দশা। তা আপনি আসবেন বলেছিলেন আসুন না? ঐ দুলালের ভিটেতে ঘর তুলুন কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারের জমি দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের গাঁয়ে এখন লোকের দরকার—আপনি আসুন খুব ভাল ধানের জমি দেবো আপনাকে আর আম-কাঁঠালের বাগান। কত চান? বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ঘোর জঙ্গল হয়ে পূব পাড়ায়। লোক নেই মশায়, কে ভোগ করবে আম-কাঁঠালের বাগান? আপনি আসুন, চারখানা বড় বড় বাগান আপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গাঁয়ের মত খাওদুধ কোথাও পাবেন না, আর এত সস্তা! দুধ বলুন, ফলফুলুরি বলুন, মাছ বলুন—সব সস্তা।

হাজারি ভাবিল, জিনিস সস্তা না হইয়া উপায় কি? কিনিবার লোক কে আছে? একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারী বাঁড়ুয্যেকে জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে লোক নেই তো জিনিসপত্তর তৈরী করে কে? এই তরি-তরকারি দুধ?

বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—ওই যে—আপনি বুঝতে পারলেন না! ভদ্দরলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষালোকের বাড়বাড়ন্ত খুব। সিমলে গাঁয়ের বাইরে মাঠের মধ্যে দেখবেন একশো ঘর চাষী কাওরী আর বুনোর বাসা। ওদের মধ্যে মশায় ম্যালেরিয়া নেই, যত রোগ বালাই সব কি এই ভদ্দরলোকের পাড়ায় মশায়? পাড়াকে পাড়া উজোড় করে দিলে একেবারে রোগে!

বিহারী বাঁড়ুয্যের চারিটি ছেলে, বড় ছেলেটির বছরখানেক হইল বিবাহ দিয়াছেন, বলিলেন। সে ছেলেটির স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর দু-তিন বছর এভাবে যদি ছেলেটি কাটায় তবে বাঁড়ুয্যে মশায়ের পুত্রবধূকে কপালের সিঁদুর এবং হাতের লোয়ার মায়া কাটাইতেই হইবে।

কিন্তু সে ছেলেটির বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই, জমিজমা, চাষ-আবাদের সমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয়—বৃদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশায় একরূপ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বড় ছেলেটিই একমাত্র ভরসা। তাহার উপর ছেলেটি লেখাপড়া এমন কিছু জানে না যে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পর্য্যন্ত—শুধু তাহার কেন, অন্য ছেলেগুলিরও তাই।

তবুও হাজারি বলিল—বাঁড়ুয্যেমশায় একটা কথা বলি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আপনার একটি ছেলেকে আমি রাণাঘাটে নিয়ে গিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি—ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে—

বিহারী বাঁড়ুয্যে বলিলেন—ভাত-বেচা হোটেলে ? না, মাপ করবেন। ও-সব আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের বংশে ও-সব কখনো—ও কাজ আমাদের নয়।

হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীনগর সিমূলে হইতে বাহির হইয়া যখন সে আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখন সেবারকারের মতই সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অমন নিরুপদ্রব নিশ্চিন্ত সুখ মৃত্যুর সামিল—ও সুখ তাহার সহ্য হইবে না।

গোপালনগরে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিল।

গোপালনগরের কুণ্ডুবাড়ী পৌঁছিতেই হাজারি যথেষ্ট খাতির পাইল। কুণ্ডুদের বড়কর্তা খুশি হইয়া বলিলেন—আরে, হাজারি ঠাকুর যে, কোথায় ছিলেন এতদিন ? আসুন—আসুন।

বাড়ীর মেয়েরাও খুশি হইল। হাজারি ঠাকুরের রান্না সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আজও তাহারা বলাবলি করে। লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ীর লোকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ইহারা হাজারির পুরানো মনিব সুতরাং সে ইহাদের ন্যায্য প্রাপ্য সম্মান দিতে ত্রুটি করিল না। বড়বাবুর স্ত্রী বলিলেন—ঠাকুরমশায়, দু-দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন, আর দু-বছর দেখা নেই, ব্যাপার কি বলুন তো ? মাইনে বাকী তাও নিলেন না। হয়েছিল কি ?

ইহারা ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে, রসুইয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সম্মান প্রদর্শনের কার্পণ্য নাই। মেজকর্তার মেয়ে নির্মলার সেবার বিবাহ হইয়াছিল—সে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার সময়েই হাজারি উঁহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। নির্মলা এখানে সম্প্রতি আসিয়াছে, সে হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বেশ আপনি, শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই! উনি সেই বিয়ের পরদিন আপনার হাতের রান্না খেয়ে গেছলেন, আমায় বললেন—তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভাল। ওর হাতের রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না, ওমা, এসে দেখি কোথায় কে!—কোথায় ছিলেন এতদিন ? সেই রকম মাংস রাঁধুন তো একদিন। এখন থাকবেন তো আমাদের বাড়ী ?

হাজারির কষ্ট হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে। তবুও বলিতে হইল। নির্মলাকে বলিল—তোমায় আমি মাংস রেঁধে খাইয়ে যাব মা, দু-দিন তোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই ক'রে খাওয়াব, তারপর যাব।

বড়কর্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন—রাণাঘাটের প্ল্যাটফর্ম্মের সে নতুন হোটেল আপনার ? বেশ, বেশ। আমরা ব্যবসাদার মানুষ ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকরি করে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে যে কোন ব্যবসাই হোক। আপনি ভাল রাঁধেন, ওই হোটেলের ব্যবসাই আপনার ঠিক-মত ব্যবসা—যেটা যে বোঝে বা জানে। উন্নতি করবেন আপনি।

আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে এক জোড়া ধুতি উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন যাহা বাকী ছিল সব চুকাইয়া দিল। হাজারি বেতন লইতে আসে নাই, কিন্তু উহা তাহার বলা

পাছে না। সম্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপালনগর হইতে বিদায় লইল।

রাণাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু? বাড়ীসুদ্ধ সব ভেবে খুন। কাল রেলওয়ে ইন্‌সপেক্টর এসেছিল, আমাদের হোটেল দেখে খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভাল লিখেছে।

—টেঁপি ভাল আছে?

—হ্যাঁ, কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু। মামীমা, আমি আর আশালতা। মামীমা টকি দেখে খুব খুশি।

টেঁপির কথাটা সে মামীমার উপর দিয়াই চালাইয়া দিল।

—আর একটা কথা মামাবাবু—

—কি?

—কাল পদ্মঝি এসে আপনাদের বাসায় মামীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল। আর কুসুমদিদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছে। উনিও কাল এসেছিলেন।

হাজারি বাড়ী ঢুকিতেই টেঁপি ওরফে আশালতা এবং তাহার মা দুজনেই টকির গল্পে মুখর হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম, তাহারা কখনও ও-জিনিসের কল্পনাই করে নাই—আবার একদিন দেখিতেই হইবে—এইবার কিন্তু টেঁপি বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়িবে না। কাজ তো সব সময়েই আছে, একদিনও কি সময় করিয়া যাইতে নাই?

—কি গান গাইলে! চমৎকার গান, বাবা। আমি দুটো শিখে ফেলেছি।

—কি গান রে?

—একটা হোল 'তোমারি পথ চেয়ে থাকব বসে চিরদিন'—চমৎকার সুর বাবা। শুনবে? বেশ গাইতে পারি এটা—

—থাক এখন আর দরকার নেই। অন্য সময়…এখন একটু কাজ আছে।

টেঁপি মনঃক্ষুণ্ণ হইল। এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুশি হইত। তা নয় বাবার সব সময় কেবল কাজ আর কাজ!

টেঁপির মা বলিল—ওগো, কাল পদ্ম বলে একটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। বেশ লোকটা। ওদের হোটেলে তুমি নাকি কাজ করতে!…

হাজারি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বললে পদ্মদিদি?

—গল্প করলে বসে, পান সেজে দিলাম, খেলে। ওদের সে হোটেল উঠে যাচ্ছে। আর চলে না, এই সব বললে।

হাজারি এখনও পদ্মকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। পদ্মদিদি—সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পদ্মদিদি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল বেড়াইতে—তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে—হাজারি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল—পদ্মঝি তাহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়া যেন তাহাকে

কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

টেঁপি বলিল—বাবা, নরেনদাদাকে আমি নেমন্তন্ন করেছি। নরেন-দা বলেছে আমাকে মাংস রেঁধে খাওয়াতে হবে। তুমি মাংস এনে দাও—

হাজারি এদিকের সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ী যাইবার জন্য রওনা হইল, পথে হঠাৎ পদ্মঝিয়ের সঙ্গে দেখা। পদ্মঝিয়ের পরনে মলিন বস্ত্র। কখনও হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই।

হাজারি বলিল—হাতে কি পদ্মদিদি? যাচ্ছ কোথায়?

পদ্ম হাজারিকে দেখিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ঠাকুরমশায়, কবে ফিরলে? হাতে তেঁতুল, একটু নিয়ে এলাম হোটেল থেকে।

হাজারি মনে মনে হাসিল। হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাস এখনও যায় নাই পদ্মদিদির!

হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পদ্ম বলিল—শোনো, দাঁড়াও না ঠাকুরমশায়! কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে! বলে নি বৌদিদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিল বটে।

—বৌদিদি লোক বড় ভাল, আমার সঙ্গে কত গল্প করলে। আর একদিন যাব।

—যা, যাবে বৈ কি পদ্মদিদি, তোমাদেরই বাড়ী। যখন ইচ্ছে হয় যাবে। হোটেল কেমন চলছে?

—তা মন্দ চলছে না। একরকম চলছে।

—বেশ বেশ। তাহলে এখন আসি পদ্মদিদি—

হাজারি চলিয়া গেল। ভাবিল—একরকম চলছে বলছে অথচ কাল বাড়ীতে বসে গল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না, উঠে যাবে। পদ্মদিদি ভাঙে তো মচকায় না!

কুসুমের বাড়ীতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। কথায়-কথায় নতুন গাঁয়ের বধূটির কথা মনে পড়াতে হাজারি বলিল—ভাল কথা কুসুম মা চেনো? এঁড়োশোলার বনমালীর স্ত্রীর ভাইঝি—তোমাকে দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নতুন গাঁ?

কুসুম বলিল—খুব চিনি। ওর নাম তো সুবাসিনী। ওকে কি ক'রে জানলেন জ্যাঠামশায়?

হাজারি বধূটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, তাহার টাকা লইয়া আসা, হোটেলে তাহাকে অংশীদার করার সঙ্কল্প।

কুসুম বলিল—এ তো বড় খুশির কথা। আপনার হোটেলে টাকা খাটলে ওর ভবিষ্যতে একটা হিল্লে হয়ে রইল।

—কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা? তখন কোথায় থাকবে হোটেল?

—ও কথা বলতে নেই জ্যাঠামশায়—ছিঃ—

কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে। হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসাবে দেখে না, হোটেলের অংশীদার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা দেয়, মাসিক লাভের অংশ-স্বরূপ।

কুসুম বলিল—অমন সব কথা বলেন কেন, ওতে আমার কষ্ট হয়। আপনি ছিলেন তাই আজ রাণাঘাট শহরে মাথা তুলে বেড়াতে পারছি, ছেলেপিলে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। এই বাড়ী বাঁধা রেখে গিয়েছিলেন শ্বশুর, আপনাকে বলি নি সে-কথা, এতদিন বাড়ী বিক্রি হয়ে যেতো দেনার দায়ে, যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস। ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ ক'রে ফেলেছি—এখন বাড়ী আমার নামে। আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশায়—আমার চোখে আপনি দেবতা।

হাজারি বলিল—উঠি আজ মা। একবার ইষ্টিশানের হোটেলটাতে যাব। একদল বড়-লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে, দার্জ্জিলিং মেলের সময় এখানে খানা খাবে। তাদের জন্যে মাংসটা নিজে রাঁধবো। তারে তাই লেখা আছে :

দার্জ্জিলিং মেলে চার-পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারির রেলওয়ে হোটেলে খাইতে আসিল। হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল। উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া গেল—হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল—হাজারিবাবু, আপনার নাম কলকাতায় পৌঁচেছে জানেন তো? বড়ঘরে যারা পঞ্চাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে, তারা জানে রাণাঘাটের হিন্দু-হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাঁধুনী। আমাদের সেইটে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে আজ আপনার এখানে আসা। তারে বলাও ছিল যাতে আপনি নিজে রাঁধেন। বড় খুশি হয়েছি খেয়ে।

ইহার কয়েক দিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলিকাতা হইতে। সেদিন যাহারা রেলওয়ে হোটেলে খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ওবেলা, বিশেষ জরুরী দরকার আছে। সাড়ে তিনটার কৃষ্ণনগর লোকালে দুইজন ভদ্রলোক নামিল। তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি—যে হাজারির রান্নার অত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিল। অন্য একজন বাঙালী নয়—কি জাত, হাজারি চিনিতে পারিল না।

পূর্ব্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবাঙালী ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়া হিন্দীতে বলিল—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এই সে হাজারি ঠাকুর।

অবাঙালী ভদ্রলোকটি হাসিমুখে হিন্দীতে কি বলিলেন, হাজারি ভাল বুঝিল না। বিনীত ভাবে বাঙালী বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দী বুঝিতে পারে না।

বাঙালী বাবুটি বলিলেন—শুনুন হাজারিবাবু, কথাটা বলি। আমার বন্ধু ইনি গুজরাটি, বড় ব্যবসাদার, ধুরন্ধর খাড্ডে কোম্পানীর বড় অংশীদার। জি. আই. পি. রেলের সব হিন্দু রেস্টোরাণ্টের কণ্ট্রাক্টর হোল খাড্ডে কোম্পানি। ওরা আপনাকে বলতে এসেছে ওদের সব হোটেলের রান্না দেখাশুনা তদারক করবার জন্যে দেড়শো টাকা মাইনেতে আপনাকে রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেণ্ট। আপনার সব খরচ, রেলের যে কোনো জায়গায়

যাওয়া-আসা, একজন চাকর ওরা দেবে। বম্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে আপনাকে একটা অংশও ওরা দেবে। আপনি রাজী ?

হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে। মন্দ কি ? কাজকর্ম এদিকে যাহা রহিল নরেন দেখাশুনা করিতে পারে। খরচা বাদে মাসে অতিরিক্ত দেড় শত টাকা কম নয়—তা ছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি। এ হাত-ছাড়া করা উচিত হয় না—নরেনের ইহাই মত।

হাজারি আসিয়া বলিল—আমি রাজী আছি। কবে যেতে হবে বলুন। কিন্তু একটা কথা আছে—হিন্দী তো আমি তত জানিনে! কাজ চালাব কি করে ?

বাঙালী বাবু বলিলেন—সেজন্যে ভাবনা নেই। দুদিন থাকলেই হিন্দী শিখে নেবেন। সই করুন এ কাগজে। এই আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্ম, এই এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। দুজন সাক্ষী ডাকুন।

যদু বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া আনা হইল তাহার হোটেল হইতে, অন্য সাক্ষী নরেন। কাগজ-পত্রের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহারা চা-পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল। বাঙালী ভদ্রলোক বলিয়া গেল—যে মাসের পয়লা জয়েন করতে হবে আপনাকে বম্বেতে। আপনার ইণ্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বম্বে পৌঁছে দেবে। তৈরী থাকবেন—আর পনেরো দিন বাকী।

হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল। এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে। বোম্বাই! সে বোম্বাই যাইতেছে! দেড়শো টাকা মাহিনায়! বিশ্বাস হয় না। সব যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল। টাকার জন্য নয়। টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশী ছাড়া কম রোজগার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব ? পাঁচটা দেশ দেখিয়া বেড়ানো, পাঁচজনের কাছে মান-খাতির পাওয়া, নূতনতর জীবনযাত্রার আস্বাদ—এ সবই তো আসল।

পিছন হইতে যদু বাঁড়ুয্যে ডাকিল—ও হাজারি-ভায়া, হাজারি-ভায়া শোন, হাজারি-ভায়া—

হাজারি কাছে যাইতেই যদু বাঁড়ুয্যে—রাণাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্রান্ত ব্যক্তি সে—সেই যদু বাঁড়ুয্যে স্বয়ং নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলো লইতে গেল। বলিল—ধন্যি, খুব দেখালে ভায়া, হোটেল করে তোমার মত ভাগ্যি কারো ফেরে নি। পায়ের ধুলো দাও, তুমি সাধারণ লোক নও দেখছি—

হাজারি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—কি করেন বাঁড়ুয্যেমশায়—আমার দাদার সমান আপনি—ওকি—ওকি—আপনাদের বাপমায়ের আশীর্বাদে, আপনাদের আশীর্বাদে—একরকম করে থাচ্ছি—

যদু বাঁড়ুয্যে বলিল—এসো না ভায়া গরীবের হোটেলে একবার এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাও—এসো।

যদু বাঁড়ুয্যের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না। যদু চা খাওয়াইল, ছানার জিলাপি খাওয়াইল, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল। স্বপ্ন না সত্য? এই যদু বাঁড়ুয্যে একদিন নিজের হোটেলে কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল! তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও!

না, যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে। ইহার বেশী আর সে কিছু চায় না। রাধাবল্লভ ঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন। আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন।

কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আপত্তি তুলিয়া বলিল—জ্যাঠামশায় কি ভাবেন, এই বয়সে তাঁহাকে সে অত দূরে যাইতে কখনই দিবে না। জেঠিমাকে দিয়াও বারণ করাইবে। আর টাকার দরকার নাই। সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের?

হাজারি বলিল—মা বেশীদিন থাকব না সেখানে। চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে। না গেলে ওরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করতে পারে। আর একটা উদ্দেশ্য আছে কি জান মা, বড় বড় হোটেল কি ক'রে চালায়, একবার নিজের চোখে দেখে আসি। আমার তো ঐ বাতিক, ব্যবসাতে যখন নেমেছি, তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব। বাধা দিও না মা, তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সাধ্যি নেই আমার।

টেঁপির মা ও টেঁপি কান্নাকাটি করিতে লাগিল। ইহাদের দুজনকে বুঝাইল নরেন। মামাবাবু কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছেন? অত কান্নাকাটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে? বম্বে তো বাড়ীর কাছে, লোকে কত দূর-দূরান্তর যাইতেছে না চাকুরির জন্য?

সেই দিন রাত্রে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—একটা কথা আছে। আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যে বোম্বাই যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাবার আগে টেঁপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব। নরেন এখানকার কারবার দেখাশুনা করবে—রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে—ওটাতেই মোটা লাভ। এতে তোমার কি মত?

বংশীধর অনেকদিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল—হাজারিদা, আমি কি বলব, বল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেলে কাজ করেছি। আমরা সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হয়ে কাটিয়েছি বহুকাল। নরেনও তোমারই আপনার ছেলে। যা বলবে তুমি, তাতে আমার অমত কি? আর ওরও তো কেউ নেই—সবই জান তুমি। যা ভাল বোঝ কর।

দেনাপাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল। হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির স্বত্ব টেঁপির নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে। তাহার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া উভয় হোটেল

চালাইবে—তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাবমত কুসুমকে ও টেঁপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে থাকিবে।

বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল।

টেঁপির মা বলিল—ওগো, তোমার মেয়ে বলছে অতসীকে নেমন্তন্ন করে পাঠাতে। ওর বড় বন্ধু ছিল—তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখ না?

হাজারিও সে-কথা ভাবিয়াছে। অতসীর সঙ্গে আজ বহুদিন দেখা হয় নাই। সেই মেয়েটির অযাচিত করুণা আজ তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে লোকের চোখে সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অতসীর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা হাজারি জানিত না, কেবলমাত্র এইটুকু জানিত অতসীর শ্বশুর বর্দ্ধমান জেলার মূলঘরের জমিদার। হাজারি চিঠিখানা তাঁহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল, কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পুনরায় পত্র লিখিবার সময় নাই।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে হাজারি শ্রীমন্ত কাঁসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতে গিয়াছে, শ্রীমন্ত বলিল—আসুন আসুন হাজারিবাবু, বসুন। ওরে বাবুকে তামাক দে রে—

হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলি পুরানো বাসনপত্র, পিতলের বালতি ইত্যাদি নূতন বাসনের দোকানে দেখিয়া বলিল—এগুলো কি হে শ্রীমন্ত? এগুলো তো পুরোনো মাল—চালাই করবে নাকি?

শ্রীমন্ত বলিল—ও-কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম বাবু। ও আপনাদের পুরোনো হোটেলের পদ্মঝি রেখে গেছে—হয় বন্ধক নয় বিক্রী। আপনি জানেন না কিছু? চক্কত্তি মশায়ের হোটেল যে নীল হবে আজই। মহাজন ও বাড়ীওয়ালার দেনা একরাশ, তারা নালিশ করেছিল। তা বাবু পুরোনো মালগুলো নিন না কেন? আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে—বড় ডেক্‌চি, পেতলের বালতি, বড় গামলা। সস্তা দরে বিক্রী হবে—ও বন্ধকী মালের হ্যাংনামা কে পোয়াবে বাবু, তার চেয়ে বিক্রীই করে দেবো—

হাজারি এত কথা জানিত না। বলিল—পদ্ম নিজে এসেছিল?

শ্রীমন্ত বলিল—হ্যাঁ, ওদের হোটেলের একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে। হোটেল নীল হলে কাল একটা জিনিসও বার করা যাবে না ঘর থেকে, তাই রেখে গেল আমার এখানে। বলে গেল এগুলো বন্ধক রেখে কিছু টাকা দিতেই হবে; চক্কত্তি মশায়ের একেবারে নাকি অচল।

বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ মিটাইয়া হোটেলে ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একবার বেচু চক্কত্তির হোটেলে যাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

কুসুম এ কয়দিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানারকম বড়, ছোট, খুচরা কাজে সারাদিন লাগিয়া থাকে। হাজারি তাহাকে বাড়ী যাইতে দেয় না, বলে—মা, তুমি তো আমার ঘরের লোক, তুমি থাকলে আমার কত ভরসা। এখানেই থাক এ ক'টা দিন।

বিবাহের পূর্ব্বদিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল। সে কৃষ্ণনগর লোকালে আসিতেছে, স্টেশনে যেন লোক থাকে।

আর কেহ অতসীকে চেনে না, কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়া আনিবে, হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল।

ইণ্টার ক্লাস কামরা হইতে অতসী আর তাহার সঙ্গে একটি যুবক নামিল। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্ত্তে মুছিয়া লেপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুর সম্মুখে।

অতসীর বিধবা বেশ।

অতসী হাজারির পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কাকাবাবু, ভাল আছেন? ইনি কাকাবাবু—সুরেন। এ আমার ভাসুরপো। কলকাতায় পড়ে। অমন ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—না—মা—ইয়ে, চলো—এস।

—ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি। দিয়েছিলাম একরকম বিয়ের ক'রে আবার এসে পড়েছে শাত বোঝা নিয়ে—এই না? বাবা-কাকারা এমন নিষ্ঠুর বটে!

হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এক প্ল্যাটফর্ম্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যে তাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। মনের কোন স্থান যেন হঠাৎ বেদনায় টন্ টন্ করিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। অতসীই তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল। রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরেন উঁহাদের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সে হাজারির দিকে চাহিয়া দেখিল হাজারির চোখ রাঙা, কেমন এক ভাব মুখে। অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়াও সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কারণ টেঁপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিল ইতিমধ্যে—সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল। অতসীদি বিধবা হইয়াছে এ কথা তো কেহ বলে নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়া অতসী টেঁপিকে লইয়া বাড়ীর ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল। দুজনে বহুকাল পরে দেখা—সেই এঁড়োশোলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি, কত কথা যে জমা হইয়া আছে!

টেঁপি চোখের জল ফেলিল বাল্যসখীর এ অবস্থা দেখিয়া। অতসী বলিল—তোরা যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি, তা হ'লে কিন্তু চলে যাব ঠিক বলছি। এলাম

বাপ-মায়ের কাছে, বোনের কাছে একটু জুড়ুতে, না কেবল কান্না আর কেবল কান্না—সরে আয়, তোর এই দুল জোড়াটা পর তো দেখি কেমন হয়েছে—আর এই ব্রেসলেটটা, দেখি হাত—

টেঁপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—এ তোমার ব্রেসলেট অতসী-দি, এ আমায় দিতে পারবে না—কক্ষনো না—

—তা হ'লে আমি মাথা কুটবো এই ছাদে, যদি না পরিস্—সত্যি বলছি। আমার সাধ কেন মেটাতে দিবি নে?

টেঁপি আর প্রতিবাদ করিল না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, ওদিকে অতসী তাহার ডান হাত ধরিয়া তখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেসলেট পরাইতেছে।

হাজারি অনেক রাত্রে তামাক খাইতেছে, অতসী আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল —কাকাবাবু!

হাজারি চমকিয়া উঠিয়া বলিল—অতসী মা? এখনও শোও নি?

—না কাকাবাবু। আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয় নি, তাই এলাম।

হাজারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা। আমি কিছুই শুনি নি। কতদিন গাঁয়ে যাই নি তো! তোমার এ বেশ চোখে দেখতে কি নিয়ে এলাম মা তোমায়?

অতসী চুপ করিয়া রহিল। হাজারির স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের সান্নিধ্যের নিবিড়তায় সে যেন তাহার দুঃখের সান্ত্বনা পাইতে চায়।

হাজারি সস্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। পরে অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজেই উন্নতি হবে—মনে আছে?

—সব মনে আছে অতসী মা। ভুলি নি কিছুই। আর যা কিছু এখানকার ইটাইপত্তর— সব তো তোমার দয়াতেই মা—তুমি দয়া না করলে—

অতসী তিরস্কারের সুরে বলিল—ওকথা বলবেন না কাকাবাবু, ছিঃ—আমি টাকা দিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টাকা বাড়তো? তিন বছরের মধ্যে এত বড় জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনাড়ি লোক? আমি কিছুই জানতুম না কাকাবাবু, এখানে এসে সব দেখে শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ক্ষমতাবান পুরুষমানুষ কাকাবাবু।

—এখন তুমি এঁড়োশোলায় যাবে মা, না আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে?

—এঁড়োশোলাতেই যাবো। বাবা-মা দুঃখে সারা হয়ে আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবো। জানেন কাকাবাবু, আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব, যাতে সাধারণের উপকার হয়। বাবার টাকা সব এখন আমিই পাব, শ্বশুরবাড়ী থেকেও

টাকা পাব। কিন্তু এ টাকায় আমার কোন দরকার নেই কাকাবাবু। পাঁচজনের উপকারের জন্যে খরচ করেই সুখ।

—যা ভাল বোঝ মা করো। আমি তোমায় কি বলব?

—কাকাবাবু, আপনি বম্বে যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ মা।

অতসী ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল—আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? বেশ বাপেঝিয়ে থাকবো, আপনাকে রেঁধে দেব—আমার খুব ভালো লাগে দেশ বেড়াতে।

—দেও মা, এবারটা নয়। আমি তিন বছর থাকব সেখানে। দেখি কি রকম সুবিধে অসুবিধে হয়। এর পরে দেও।

—ঠিক কাকাবাবু? কেমন মনে থাকবে তো?

—ঠিক মনে থাকবে। যাও এখন শোও গিয়ে মা, অনেক কষ্ট হয়েছে গা তে, সকাল সকাল বিশ্রাম কর গিয়ে।

পরদিন বিবাহ। টেঁপির নরম হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ পেশীবদ্ধ হাতে স্থাপন করিবার সময় হাজারির চোখে জল আসিল।

কতদিনের সাধ—এতদিনে ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিলেন।

বংশীধর ঠাকুর বরকর্তা সাজিয়া বিবাহ-মজলিসে বসিয়া ছিল। সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা!

কাছাকাছি সব হোটেলের রাঁধুনী বামুনেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বরযাত্রী সাজিয়া আসিয়াছে। এ বিবাহ হোটেলের জগতের, ভিন্ন জগতের কোনো লোকের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাতে। ইহাদের উচ্চ কলরব, হাসি, ঠাট্টা ও হাঁকডাকে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কনে বিদায় হইয়া গেল। বেশীদূর উহারা যাইবে না। এই রাণাঘাটেরই চূর্ণীর ধারে বংশীধর একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়াছে পাঁচ দিনের জন্য। সেখানে দেশ হইতে বংশীধরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি (বংশীধরের স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন) আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে। বৌভাত সেখানেই হইবে।

হাজারি একবার রেলওয়ে হোটেলে কাজ দেখিতে যাইতেছে, বেলা আন্দাজ দশটা, বেচু চক্কত্তির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল। কোর্টের পিওন, বেলিফ, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পালচৌধুরী জমাদার। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্কত্তির হোটেল নীলাম হইতেছে।

হাজারি কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুরোনো মনিবের হোটেল, এইখানে সে দীর্ঘ সাত বৎসর সুখে-দুঃখে কাটাইয়াছে। এত দিনের হোটেলটা আজ উঠিয়া গেল!

একটু পরে পদ্মঝি দু হাতে দুটি বড় বাল্‌তি লইয়া হোটেলের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করিল। বেলিফ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল—এই দেখুন মশায়, ওই মেয়েলোকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, এটা বে-আইনী। আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে।

পেয়াদারা গিয়া বাধা দিয়া বলিল—বাল্‌তি রেখে যাও—

পরে আরও কাছে গিয়া হাঁক দিয়া বলিল—শুধু বাল্‌তি নয় বাবু, বাল্‌তির মধ্যে পেতল কাঁসার বাসন রয়েছে।

পদ্মঝি ততক্ষণে বাল্‌তি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল—এ বাসন আমার নিজের—হোটেল চক্কত্তি মশায়ের, আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পেয়াদারা ছাড়িবার পাত্র নয়। অবশ্য পদ্মঝিও নয়। উভয় পক্ষে বাক্‌বিতণ্ডা, অবশেষে টানাহেঁচড়া হইবার উপক্রম হইল। মজা দেখিবার লোক জুটিয়া গেল বিস্তর।

একজন মহাজন পাওনাদার বলিল—আমি এই সকলের সামনে বলছি, বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতের আইন অমান্য করবার জন্যে আমি তোমাকে পুলিশে দেবো।

একজন সাক্ষী বলিল—তা দেবেন কেমন করে বাপু? ওর নামে তো ডিক্রি নেই আদালতের। ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন?

বেলিফ্ বলিল—তা নয়, ওকে চুরির চার্জ্জে ফেলে পুলিশে দেওয়া চলবে। এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের। তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবার রাইট কি? ওকে জিজ্ঞেস করো ও ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা—

পদ্মঝি তা দিতে রাজী নয়। সে আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছে বাল্‌তি দুটি। বেলিফ্ বলিল—কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে—বদমাইশ মাগী কোথাকার—ভাল কথায় কেউ নয়!

পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল। পুনরায় একচোট ধস্তাধস্তির সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—পদ্মদিদি, বাসন ওদের দিয়ে দাও।

লজ্জায় ও অপমানে পদ্মঝিয়ের চোখে তখন জল আসিয়াছে। জনতার সামনে দাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই। এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—এই দেখো না ঠাকুর মশায়, তুমি তো কতদিন আমাদের হোটেলে ছিলে—এ আমার জিনিস না? বলো না তুমি, এ বাল্‌তি কার?

হাজারি সান্ত্বনার সুরে বলিল—কেঁদো না এমন ক'রে পদ্মদিদি। এ হোল আইন-আদালতের ব্যাপার। বাসন রেখে এসো ঘরের মধ্যে, আমি দেখছি তারপর কি ব্যবস্থা করা যায়—

অবশ্য তখন কিছু করিবার উপায় ছিল না। সে আদালতের বেলিফকে জিজ্ঞাসা করিল —কি করলে এদের হোটেল আবার বজায় থাকে?

—টাকা চুকিয়ে দিলে। এ অতি সোজা কথা মশাই। সাড়ে সাতশো টাকার দাবীতে নালিশ—এখনও ডিক্রী হয় নি। বিচারের আগে সম্পত্তি সীল্ না করলে দেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে, তাই সীল্ করা।

আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বেচু চক্কত্তিকে একধারে ডাকিয়া হাজারি বলিল—আমার সঙ্গে চলুন না কর্ত্তা মশায় একবার ইষ্টিশনের দিকে—আসুন, কথা আছে।

রেলের হোটেলে নিজের ঘরটিতে বেচু চক্কত্তিকে বসাইয়া হাজারি বলিল—কর্ত্তা একটু চা খাবেন?

বেচু চক্কত্তির মন খারাপ খুবই। চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই, হাজারি কিছুতেই ছাড়িল না। চা পান ও জলযোগান্তে বেচু বলিল—হাজারি, তুমি তো সাত-আট বছর আমার সঙ্গে ছিলে, জানো তো সবই, হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ। আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি —এখন কোথায় যাই আর কি করি! পৈতৃক জোতজমা ঘরদোর যা ছিল ফুসে-নবলায়, সে এখন আর কিছু নেই, ওই হোটেলই ছিল বাড়ী। এমন কষ্ট হয়েছে, এই বুড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায়? চালাই কী করে?

—এমন অবস্থা হোল কি করে কর্ত্তা? দেনা বাধালেন কী করে?

—খরচে আয়ে এদানীং কুলোতো না হাজারি। দু-বার বাসন চুরি হয়ে গেল। ছোট হোটেল, আর কত ধাক্কা সইবার জান ছিল ওর! কাবু হয়ে পড়লো। খদ্দের কমে গেল। বাড়ীভাড়া জমতে লাগলো—এসব নানা উৎপাত—

হাজারি বেচু চক্কত্তিকে তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল—কর্ত্তা, একটা কথা আছে বলি। আপনি আমার পুরনো মনিব, আমার যদি টাকা এখন থাকতো, আপনার হোটেলের সীল্ আমি খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন অত টাকা আমার হাতে নেই। তাই বলছি, যতদিন বম্বে থেকে না ফিরি, আপনি আমার বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান। পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেবো। (হাজারি মাহিনার কথাটা মনিবকে বলিতে পারিল না।) খাবেন দাবেন হোটেলে, আর পদ্মদিদিও ওখানে থাকবে, মাইনে পাবে, খাবে। কি বলেন আপনি?

বেচু চক্কত্তির পক্ষে ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেলবাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে। পদ্মঝিও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই, সেদিন সন্ধ্যাবেলা সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না, কারণ জীবনে কোনোদিন পদ্মঝি কুসুমের দোর মাড়ায় নাই।

—এসো পদ্মপিসি বসো। আমার কি ভাগ্যি। এই পিঁড়িখানতে বোসো পিসি। পান-দোক্তা খাও? বসো পিসি, সেজে আনি—

পদ্মঝি বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ-গল্প ও-গল্প করিল। পদ্ম বুঝিতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তবে চাকুরি বজায় রাখা। যদিও সে মনে মনে জানে, চাকুরি বেশী দিন তাহাকে করিতে হইবে না। আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে, তবে বিপদের দিনগুলিতে একটা কোনো আশ্রয়ে কিছুদিন মাথা গুঁজিয়া থাকা।

পরদিন পদ্মঝি হোটেলের কাজে ভর্ত্তি হইল। বেচু চক্কত্তিও বসিল গদির ঘরে। ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভাল করিয়াই বুঝিত। তবে কথা এই যে, ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে। বেচু চক্কত্তি দেখাশোনা করিয়াই খালাস।

হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরোনো দিনের হোটেলে আবার কাজ করিতেছে, বেচু চক্কত্তি তাহার মনিব, পদ্মঝিও ছোট মনিব।

পদ্ম যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর মশায়, ইলিশ মাছ আনাব এবেলা না পোনা?—তখন হাজারি পূর্ব্ব অভ্যাসমতই সম্ভ্রমের সঙ্গে উত্তর দিল, যা ভাল মনে করো পদ্মদিদি। পচা না হোলে ইলিশই এনো।

বেচু চক্কত্তি পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশী। সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—হাজারি, একটা কথা বলি, তোমার এখানে ফাস্ট আর সেকেন কেলাসের মধ্যে মোট চার পয়সার তফাৎ রেখেচ, এটা ভাল মনে হয় না আমার কাছে। এতে করে সেকেন কেলাসে খদ্দের কম হচ্চে, বেশী লোক ফাস্ট কেলাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না। গত এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কিনা! নরেন বাবাজী ছেলেমানুষ, সে হিসেবের কি বোঝে?

হাজারি কথাটার সত্যতা বুঝিল। বলিল—আপনি কি বলেন কর্ত্তা?

—আমার মত হচ্চে এই যে ফাস্ট কেলাস হয় একদম উঠিয়ে দাও, নয়তো আমার হোটেলের মত অন্ততঃ দুআনা তফাৎ রাখো। শীতকালে যখন সব সস্তা, তখন এ থেকে যা লাভ হবে, বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফাস্ট কেলাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই লাভের খানিকটা খেয়ে গিয়েও যাতে কিছু থাকে, তা করতে হবে। বুঝলে না?

—তাই করুন কর্ত্তা। আপনি যা বোঝেন, আমি কি আর তত বুঝি?

বেচু চক্কত্তি খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে। ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই হাজারির নম্র কথাবার্ত্তা—যেন তিনিই মনিব, হাজারি তাঁর চাকর। যদিও পদ্মঝি ও তিনি দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে, সবই কপালের গুণে, আসলে তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই, তবুও দুজনেই এখন মনে ভাবে, বুদ্ধি যত থাক আর না-ই থাক,—বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না—লোক হিসাবে হাজারি কিন্তু খুবই ভাল।

সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়টা

সকলের অগোচরে সে একবার গাঁজা খাইয়া থাকে, হোটেলে গিয়া আজকাল সে-সুবিধা ঘটে না। এমন সময় অতসীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাঁজার কলিকা ও সাজসরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল।

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি মা?

—কাকাবাবু, আপনি কবে বম্বে যাচ্ছেন?

—আসচে মঙ্গলবার যাব, আর চার দিন বাকি।

—আমার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এঁড়োশোলা যাব, আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জলখাবার এনে দেব—যাবেন কাকাবাবু?

হাজারির চোখে জল আসিল। কিন্তু তুচ্ছ সাধ! মেয়েদের মনের এই সব অতি সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষাই কি সব সময়ে পূর্ণ হয়? কি করিয়া সে এঁড়োশোলা যাইবে এখন? ছেলেমানুষ, না হয় বলিয়া খালাস!

মুখে বলিল—মা, সে হয় না। কত কাজ বাকি এদিকে, সে-তো মা জান না। নরেন ছেলেমানুষ, ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিয়ে—

—আজ চলুন আমায় নিয়ে। গরুর গাড়ীতে আমরা বাপে-মেয়েতে চলে যাই—কাল বিকেলে চলে আসবেন। তা ছাড়া টেঁপিও বলছিল একবার গাঁয়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে। চলুন কাকাবাবু, চলুন—

—তা নিতান্ত যদি না ছাড় মা, তবে পরশু সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পরে ফিরতে হবে। থাকবার একদম উপায় নেই—কারণ তার পরদিনই বিকেলে রওনা হতে হবে আমার। বোম্বাইয়ের ডাকগাড়ী রাত আটটায় ছাড়ে বলে দিয়েছে।

বৈকালে চূর্ণীর ধারের নিমগাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল। পাশের চুন-কয়লার আড়তে হিন্দুস্থানী কুলিরা সেই ভাবে সুর করিয়া সমস্বরে ঠেট্ হিন্দীতে গজল গাহিতেছে, চূর্ণীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে-নব্‌লার হাটের হাটুরে লোক পারাপার হইতেছে—পুরোনো দিনের মতই সব।

সে কি আজও বেচু চক্কত্তির হোটেলে কাজ করিতেছে? পদ্মঝিয়ের মুখনাড়া খাইয়া তাহাকে কি এখনি সন্ত আঁচ বসানো কয়লার উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া ও-বেলার রান্নার ফর্দ্দ বুঝিয়া লইতে হইবে?

সেই পদ্মদিদি ও সেই বেচু চক্কত্তির সঙ্গে সকালবেলাও তো কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। দাড়ি-পাল্লার পাল্লা বদল হইয়াছে, পুরোনো দিনের সম্বন্ধগুলি ছায়াবাজির মত অন্তর্হিত হইল কোথায়? বোম্বাই···বোম্বাই কত দূরে কে জানে? টেঁপিকে লইয়া, অতসী বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত! ইহারা যে-কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলাত পর্য্যন্ত যাইতে পারে—দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় বিনা আশঙ্কায়, বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতে পারে।

তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকার মত দিন তাহার জীবনে আসিবে?

নরেনকে যেদিন প্রথম দেখে সেইদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর ছবিটি—টেঁপি লাল চেলি পরিয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দের হাসি—তখন মনে হইয়াছিল এসব দুরাশা, এও কি কখনও হয়?

সবই ঠাকুর রাধাবল্লভের দয়া। নতুবা সে আবার কবে ভাবিয়াছিল যে সে বোম্বাই যাইবে দেড়-শ টাকা মাহিনার চাকুরি লইয়া?

পরদিন অতসী আসিয়া আবার বলিল—কবে এঁড়োশোলা যাবেন কাকাবাবু? টেঁপিও যাবে বলছে, কাকীমাও বলছিলেন গাঁয়ে থেকে সেই আজ দু-বছর আড়াই বছর এসেছেন আর কখনও যান নি। ওঁরও যাবার ইচ্ছে। একদিনের জন্যেও চলুন না?

আবার স্বগ্রামে পৌঁছিয়া উহাদের গাড়ী ঢুকিল বহুদিন পরে। হাজারিদের বাড়ীটা বাসযোগ্য নাই, খড়ের ঘর এত দিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ঝড়ে খড় উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিব্যি চোখে পড়ে।

অতসী টানাটানি করিতে লাগিল তাহাদের বাড়ীতে সবসুদ্ধ লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু টেঁপির মা রাজী নয়, নিজের ঘরদোরের উপর মেয়েমানুষের চিরকাল টান—ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেঁপির সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেজে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল। টেঁপিকে বলিল—তুই বস্ মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেয়ারাতলার ঘাটে কতদিন নাই নি!

পুকুরের ঘাটে গিয়ে এ-পাড়ার রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধূর সঙ্গে প্রথমেই দেখা। সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেঁপির মায়ের সমান, দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল। টেঁপির মাকে দেখিয়া সে তো একেবারে অবাক বাসন মাজা ফেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ওমা, দিদি যে! কখন এলে দিদি? আর কি আমাদের কথা মনে থাকবে তোমার? এখন বড়লোক হয়ে গিয়েছ সবাই বলে। গরীবদের কথা কি মনে পড়ে?

দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধু চাটুজ্জের পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া টেঁপির মা ঘাট হইতে ফিরিল। মেয়েটি বাড়ী ঢুকিয়া টেঁপিকে বলিল—চিনতে পারিস মা?

—ওমা, কাকীমা যে, আসুন আসুন—

—এস মা, জন্ম-এইস্ত্রী হও, সাবিত্রীর সমান হও। হাঁা গা তা তোমার কেমন আক্কেল? মেয়েকে আনলে, অমনি জামাইকেও আনতে হয়-না? শুনেছি চাঁদের মত জামাই হয়েছে। এ চুড়ি কে দিয়েছে—দেখি মা। ক ভরি! একে কি বলে? পাশা? দেখি দেখি—কখনও শুনিও নি এসব নাম। তা একটা কথা বলি। তোমাদের রান্না এ-বেলা এখানে হওয়ার উপায়ও নেই—আমাদের বাড়ীতে তোমরা সবাই এ-বেলা দুটো ডালভাত—

টেঁপি বলিল—সে হবে না কাকীমা। অতসী-দি এসেছে আমাদের সঙ্গে জানেন না? অতসীদি সবাইকে বলেছে খেতে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলছিল আমাদের—মা গেল না,

জানেন তো মার সাত প্রাণ বাঁধা এই ভিটের সঙ্গে—রাণাঘাটের অমন বাড়ী, কলের জল—শহর জায়গা, সেখানে থাকতেও মা শুধু বাড়ী-বাড়ী করে—আহা বাড়ীর কি ছিরি! ফুটো খড়ের চাল, বাড়ী বললেও হয়, গোয়াল বললেও হয়—

—বাপের বাড়ীর নিন্দে করিস নে, যা যা—আজ না হয় বড়লোক শশুর হয়েছে, এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মানুষ হয়েছ মা!

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই কখন কাটিয়া গেল। ইহাদের আসিবার খবর পাইয়া এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েমহলের সবাই দেখা করিতে আসিল। জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল।

টেঁপির মা বলিল—জামাইয়ের আসবার যো নেই যে! রেলের হোটেলের দেখাশুনো করেন, সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে। উপায় থাকলে আনি নে মা?

অতসীর দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্ব্বে জানিত। গ্রামসুদ্ধ লোক তাহার জন্য দুঃখিত। সবাই একবাক্যে বলে, অমন মেয়ে—দেবীর মত মেয়ে। আর তারই কপালে এই দুঃখ, এই কচি বয়সে!

সন্ধ্যার দেরি নাই। অতসীদের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারি কথা-বার্ত্তা বলিতেছিল। হরিচরণবাবু কন্যার অকাল-বৈধব্যে বড় বেশী আঘাত পাইয়াছেন। হাজারির মনে হইল যেন এই আড়াই বৎসরের ব্যবধানে তাঁর দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েকে দেখিয়া আজ তবুও একটু সুস্থ হইয়াছেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এই দেখ তোমার বয়সে আর আমার বয়সে—খুব বেশী তফাৎ হবে না। তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে—না-হয় এক-আধ বছর বাকি। কিন্তু তোমার জীবনে উত্তম আছে, আশা আছে, মনে তুমি এখনও যুবক। কাজ করবার শক্তি তোমার অনেক বেশী এখনও। এই বয়সে বঙ্গে যাচ্ছ, শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি! বাঙালীর মধ্যে তোমার মত লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত জাতটা ততই জাগবে। এরা পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরী হয়—দেখছ না আমাদের গাঁয়ের দশা? ইহকালই দেখলি নে, ভোগ করলি নে, তোদের পরকালে কি হবে বাপু? সেখানেও সেই ভূতের ভয়। পরকালে নরকে যাবে। তুমি কি ভাবো অকর্ম্মা, অলস, ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান?

এই সময় পুরানো দিনের মত অতসী আসিয়া উঁহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া বলিল—খান কাকাবাবু, চা আনি, বাবা তুমিও খাও, খেতে হবে। সন্ধ্যের এখনও অনেক দেরি—

কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল। পিছনে আসিল টেঁপি। সেই পুরোনো দিনের মত সবই—তবুও কত তফাৎ! অতসীর মুখের দিকে চাহিলে হাজারির বুকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করে। তবুও তো মা বাপের সামনে অতসী বিধবার বেশ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়াছে। মা বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতে-ফিরিতে পারিবে না।

ইহাতে পাপ হয় হইবে।

হরিচরণবাবু সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল—কেমন মা, তোমার সাধ যা ছিল, মিটেছে?

—নিশ্চয়ই কাকাবাবু। টেঁপি কি বলিস্? কতদিন ভাবতুম গাঁয়ে তো যাবো, সেখানে টেঁপিও নেই, কাকাবাবুও নেই। কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলবো?

—কাল আমার সঙ্গে রাণাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা।

—বাঃ, সে আমি বাবা-মাকে বলে রেখেছি। আপনাকে উঠিয়ে দিতে যাব না কি রকম? কাকাবাবু, টেঁপি এখন দিনকতক আমার কাছে এখানে থাক্ না? তাহলে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন।

নরেনের কথা বলাতে টেঁপি বাপের অলক্ষিতে অতসীকে এক রাম-চিমটি কাটিল।

—কাকাবাবু পুজোর সময় আসবেন তো! এবার আমাদের গাঁয়ে আমরা ঠাকুর পুজো করব।

—পুজোর তো অনেক দেরি এখন মা। যদি সম্ভব হয় আসবো বই কি। তবে তুমি যদি পুজো করো তবে আসবার চেষ্টা করব।

টেঁপি বলিল—তোমাকে আসতেই হবে বাবা। মা বলেচে এবার প্রতিমা গড়িয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজা করবে। এখনও তিন-চার মাস দেরি পুজোর—সে-সময় ছুটি নিয়ে আসবে বাবা, কেমন তো?

রাধু মুখুয্যের পুত্রবধূ নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল, রাত্রে তাহাদের বাড়ীতে সকলকে খাইতে হইবেই। টেঁপির মা সন্ধ্যাবেলা হইতেই রাধু মুখুয্যের বাড়ী গিয়া জুটিয়াছে, মোচা কুটিয়া, দেশী কুমড়া কুটিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়াগাঁয়ের এ জীবন তাহার অনেক ভাল লাগে। সে বলিতেছিল—ভাই, শহরে-টহরে কি আমাদের পোষায়? এই যে কুমড়োর ডাঁটাটুকু, এই এক পয়সা। এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা। সে ফালি কাটতে বোধ হয় পোড়ারমুখো মিন্সেদের হাত কেটে গিয়েছে। আমার ইচ্ছে কি জান ভাই, উনি চলে গেলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে আবার গাঁয়ে আসব, পুজো পর্য্যন্ত এখানেই থাকব। মেয়ে-জামাই থাকল রাণাঘাটের বাসায়, ওরাই সব দেখাশুনো করুক, ওদেরই জিনিস। আমার সেখানে ভাল লাগে না।

স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল—তোমার ইচ্ছে যা হয় করো—কিন্তু তার আগে ঘরখানা তো সারানো দরকার। ঘরে জল পড়ে ভেসে যায়, থাকবে কিসে?

টেঁপির মা বলিল—সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। আমি অতসীদের বাড়ী থেকে কি ওই মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে ঘর সারিয়ে নেব। জামাইকে বলে যেও খরচ যা লাগে যেন দেয়।

● ●

রাধু মুখুয্যের বাড়ী রাত্রে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট—খিচুড়ি, ভাজাভুজি, মাছ, ডিমের ডালনা, বড়াভাজা, টক, দই, আম, সন্দেশ। অতসীকেও খাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই। টেঁপি ডাকিতে গেলে কিন্তু অতসী বলিল, তাহার মাথা ভয়ানক ধরিয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

শেষরাত্রে দুখানা গাড়ী করিয়া সকলে আবার রাণাঘাট আসিল। দুপুরের পর হাজারি একটু ঘুমাইয়া লইল। ট্রেন নাকি সারারাত চলিবে, কখনও সে অতদূর যায় নাই, অতক্ষণ গাড়ীতেও থাকে নাই। ঘুম হইবে না কখনই। যাইবার সময়ে টেঁপির মা ও টেঁপি কাঁদিতে লাগিল। কুসুমও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অতসী সকলকে বুঝাইতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, ওকি কাকীমা? বিদেশে যাচ্ছেন একটা মঙ্গলের কাজ, ছিঃ টেঁপি, অমন চোখের জল ফেলো না ভাই।

হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে, সামনেই পদ্মঝি।

পদ্মঝি বলিল—এখন এই গাড়ীতে যাবেন ঠাকুর মশায়?

—হ্যাঁ, পদ্মদিদি এবেলা খদ্দের কত?

—তা চল্লিশ জনের ওপর। সেকেন কেলাস বেশী।

—ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো?

পদ্মঝি হাসিয়া বলিল—ওমা, তা আর বলতে হবে? যতদিন বাজারে পাই, ততদিন ইলিশের বন্দোবস্ত। আষাঢ় থেকে আশ্বিন—দেখেছিলাম তো ও হোটেলে।

—হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো? তুমি হোলে গিয়ে পুরোনো লোক। বেশ হুঁশিয়ার থেকো পদ্মদিদি। ভেবো তোমার নিজেরই হোটেল।

পদ্মঝি এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝুঁকিয়া নীচু হইয়া বলিল—দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাক, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। এ কি হইয়া গেল! পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধুলা লইতেছে; এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবার দুঃসাহসও কখনো তাহার হয় নাই। কোন্ সৌভাগ্যটা বাকী রহিল তাহার জীবনে?

স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলে—তা ছাড়া অতসী, টেঁপি, নরেন। বাহিরের লোকের মধ্যে যদু বাঁড়ুয্যে। যদু বাঁড়ুয্যে সত্যই আজকাল হাজারিকে যথেষ্ট মানিয়া চলে। তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি এখনও অনেক বেশী উন্নতি দেখাইবে, এই তো সবে শুরু।

অতসী পায়ের ধুলা লইয়া বলিল—আসবেন কিন্তু পুজোর সময় কাকাবাবু, মেয়ের বাড়ীর নেমন্তন্ন রইল। ঠিক আসবেন—

টেঁপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খাবারের পুঁটুলিটা ওপরের তাক থেকে নামিয়ে কাছে রাখো বাবা, নামাতে ভুলে যাবে, তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু। আজ রাত্তিরেই খেও,

ভুলো না যেন। কাল বাসি হয়ে যাবে, পথেঘাটে বাসি খাবার খবরদার খাবে না। মনে থাকবে? তোমার চিঠি পেলে মা বলেচে রাধাবল্লভতলায় পূজো দেবো

চলন্ত ট্রেনের জানালার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতেছিল পদ্মদিদি যে আজ তাহার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি।

ঠাকুর রাধাবল্লভ, জাগ্রত দেবতা তুমি, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। তুমিই আছ। আর কেহ নাই। থাকিলেও জানি না।

বিপিনের সংসার

১

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমন সময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠিহাতে লম্বা চেহারার কে যেন হন হন করিয়া উহাদের বাড়ীর দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিন্সে এদিকে আসছে!

বিপিন বলিল, জমিদার-বাড়ীর দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপর ডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক।

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধর আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি?

বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়া দাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি-হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দুদিন যে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি-বাইশ দিন কি তার বেশি। তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমি ব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকটে একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও—যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পার—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি।

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকু দিয়ে দিলাম।

বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই করে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন ক'রে খাবে?

—মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের ক'রে দিতে—তাই দিয়ে কর।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বল গিয়ে। বুড়ো মানুষ; একাদশী আছে, দোয়াদশী আছে—ঐ তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়ে গিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজ রোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেই ভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি! বেশ, সে পলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে। আর বাড়ী থাকিয়া লাভ কি? বাড়ীর কেহই তেমন পছন্দ করে না যে, সে বাড়ী থাকে।

এমন সময় বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ী আছ হে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশ্যে বলিল, কেষ্ট কাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃত স্বর চড়াইয়া বলিল, আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।

কৃষ্ণলালের বয়স চুয়াল্লিশ বছর, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্দ্ধেক দাঁত পড়িয়া যাওয়ার দরুন, দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কে এসেছিল হে, তোমার বাড়ী একজন খোট্টা-মত?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে ব'সে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সেজন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে একদিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্রমাগত লোক আসছে; ক্রমাগত লোক আসছে,—ক্রমাগত টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হ'লে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব নাকি?

কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে ব'লেই তো আরো মুশকিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকার আমলে তা চলে না, কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছে সবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবার জন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নী ঘুণ একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বল! পরের চাকরি করার তো কোন দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা ক'রে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে শুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বল?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা লাউয়ের চারা দিতে পারেন? আছে বাড়ীতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, মা ডাকছে, একবার রান্না-ঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ শুনিতে হইবে—মা নয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তাঁর চলিবে না, অনেক কাজ তাঁর।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে বসে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বল না কেন? কি নেই?

—কিছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারি নে। এক বেলা উপোস ক'রে সব প'ড়ে থাক।

মনোরমা কড়াস্বরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজের জন্যে বলি নি। মা কাল একাদশীর উপোস ক'রে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস ক'রে পড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কাল একাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায় নি তা ব'লে?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর······অকাট্য।

বিপিন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলার ছায়ায় একখানা যে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না? একটি পয়সা নাই হাতে। বাজারের কোন দোকানে ধার দিবে না। বহু জায়গায় দেনা। উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। বাড়ীর এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, দিনরাত মনোরমার মধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি তো শুনিতে হইবে না? প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য।

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার-পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকে দেখানো হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তার আশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্ত্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

২

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইলখানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ী নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ী কবে নিয়ে যাবে বল।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ ব'লেই তো। আচ্ছা, আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবার পথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাই নি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বৌদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—

নার্স এদেশী খ্রীষ্টান, পূর্ব্বে কৈবর্ত্ত ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়—ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরাকাঠের মধ্যে না রাখলে যা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে। মাংস।

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদার-বাড়ীর সর্ব্বত্র অবাধ গতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরে এস এস বিপিন, কখন এলে? তারপর, তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গিয়ে করলে দুমাস। এ রকম ক'রে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি—

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা,

মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্য কোন গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এস এস, বেঁচে থাক। তোমাকে তাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকীকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুশকিলে প'ড়ে যেতে হবে। সেইজন্যে কর্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁর বয়স ষাটের উপর, বর্তমান গৃহিণী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীর এখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দান্ত জমিদার বলিয়া ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকী আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দুমাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝি নে! তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল আর এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা আদায় হয় না। তুমি কাল সকালেই চ'লে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কি মনে করবে? আদর-যত্ন করবো কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়ো, বেগুন, থোড় কিংবা মোচা আর যদি পায় ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকসব্জি আনবে। ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এনো আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এই সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনা মূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া। নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি? 'যদি পাও' কথার মানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিস এমনই যোগাইতে পার, খুব খুশি। দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া ভুগিতেছে। এই সব জন্যই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

৩

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ী ব্যবস্থা করিবেন তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিপিন কাছারি পৌছিল। কাছারি-ঘরে ক্যানেস্ত্রা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিক বারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা

উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চার-পাঁচটা ইঁদুরের গর্ত্ত হইয়াছে রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু রাত্রে কি খাবা?

—কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হ'তি পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন ক'রে? একটু দুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায়, বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড় বাদাম গাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা ৺হরিনাথ চৌধুরী কাছারি-বাড়ীতে এটি শখ করিয়া পুঁতিয়াছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, মশা বিন্ বিন্ করিতেছে কানের কাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জ্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে! বাড়ী হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল। মনোরমার ঝাঁঝালো টক্ টক্ কথাবার্ত্তা। সংসারের ঘোর অনটন। বাজারে হেন দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল, তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদার-বাড়ী লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনার যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরীব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা আদায় হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নী তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখ ভারী হইবে তাঁদের! কি বিষম মুশকিলেই সে পড়িয়াছে। অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থা ছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এই জমিদারদের কাজে! যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়ীতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে, কতক গেল তাহারই বদ্‌খেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার।

তখনও পর্য্যন্ত যতটুকু নামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড় গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরাজীতে কোনও রকমে নাম সই করিতে পারে

মাত্র। মনোরমা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরের অবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া; স্বামীর সহিত সদ্ভাব জন্মিতে পাইল না যে, ইহাতে বিপিন মনেপ্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে নায়েববাবু কখন আলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ, জাততে মুচি, শুওরের ব্যবসা করিয়া হাতে দুপয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এস নরহরি, বড় মুশকিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি ক'রে করি বল তো? বাবুর জামাই-মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দুমাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে!

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল বেনবেলা আমি আসপো কাছারিতে—তখন হবে।

ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়া ফিরিল। নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন নায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্তা হবে। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল ক'রে আগড় বন্ধ ক'রে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কডা দিন।

বিপিন সকালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এতদিন পরে যখন সে আসিয়াছে। তাহা হইলে অন্ততঃ আশি টাকার আপাততঃ দরকার, এই তিনদিনের মধ্যে।

তিনটি দিন বাকী মোটে। এখন কোন ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবে কোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকা তারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনরটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না। বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশি হওয়া বর্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলে অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ—হাতে মোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে ছেলের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ-বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহ করিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

বাবা, তারে তুমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখাও—ওখানে বাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াভাকে তোমরা সবাই মেরে ফেলবা দেখছি।

—করি কি মাসীমা, জান তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মত জুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্ত্তার দেনার জন্যে যায় নি—গিয়েছে তোমার উড়ন্চুড়ে স্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু? কর্ত্তা যা রেখে গিয়েছিলেন ক'রে, তাতে তোমাদের দুই ভায়ের ভাতের ভাবনা হ'ত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে ব'সে খেয়েছিল—কম বিষয়ভা ক'রে গিয়েছিলেন কর্ত্তা? তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মত লোক তোমরা হ'লে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোন ত্রুটির উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিত হয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসী তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছে কিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথা যাক মাসীমা, কিছু টাকা দিতে পার, এই গোটা চল্লিশ টাকা। কিস্তির সময় আদায় ক'রে আবার দেব।

কামিনী পূর্ব্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার? সেবার এক কাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড়-হাত করলে না, আর একবার দেলাম কুড়ি টাকা পুজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হ'লেই—মাসী মাসী। বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়ে ছিলাম কুড়ি-পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসীমা বলে?

বিপিন কামিনী মাসীকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বা প্রৌঢ়াদের দুর্ব্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব ব'লে সব ঠিক মাসী, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল; তোমার টাকাকড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হ'ত।

কামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা, হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। কদিন আছ এখানে?

—মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসীমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ। টাকাটা যদি যোগাড় ক'রে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হ'ত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বল!

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিও, পেঁপে পেকেছে সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। ঘোপাখালির হাট হইতে জমিদার-গিন্নীর ফরমাশমত জিনিসপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষ রাত্রির দিকে গরুর গাড়ী করিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌঁছিল।

জমিদার-বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বে শুনিল, জামাইবাবু কাল রাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই। জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ী আছে—পৈতৃক বাড়ী, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপাড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুর গাড়ী হইতে নামাইতে দেখিয়া জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা।

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ ক'রে না আনলেই হ'ত। মহল থেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাই বলতে রাইও তো কখনও দেখি নে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা।

জমিদার-গিন্নী বিরক্তির মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলে আড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহলে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরিতরকারি মাছে দু' টাকার ওপর খরচ ক'রে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি।

বিপিন বলিল, দু' টাকার ওপর কি বলছেন? সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেই এক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা ক'রে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নী রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি ওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ?

বিপিন খুশির সহিত ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ'লে পয়সা খরচ হয়েছে ব'লে। কি কঞ্জুস আর কি ছোট নজর রে বাবা!

মুখে সে কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, একটু হৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজী কাগজ পড়িতেছিলেন। বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজ পড়িয়া যাইতে লাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড়লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড়লোকের জামাই, তা আমার কি ?

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাশ বিছানো চৌকির এক পাশে বসিয়া রহিল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না বা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্ব্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্ব্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাঁহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক করিয়া দিল, যখন সেই লোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন ? চিনতে পারেন ? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি ? নিন না, আমার কাছে আছে।

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাঁহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য।

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছে আমার কাছে।—বলিয়া পকেট হইতে রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটি সিগারেট ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টা অপমানের অন্য কোন ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবুর ও কি সিগারেট ? একটা এদিকে দিন দিকি !

বাড়ীর গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে ? বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্যও করে না; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্ম্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া

তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু কবে এলেন?

—কাল রাত্রে।

—বাড়ীর সব ভাল তো?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন?

—হুঁ।

—বেশ বেশ। দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি?

—হুঁ।

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বা খবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেন না।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শহুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্য কোনও উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে সুলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছু বেশি নয়, বা সুলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও সুলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজ নামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমেই জানেন, কিন্তু জমিদার-বাড়ীর মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী ব'লেই জানি কিনা। আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ী হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শহুরে জামাইবাবুর চালবাজি সে ভাঙিয়া দিয়াছে। বিপিনকে এখনও ও চেনে নাই। চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহার সামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুন বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছু খাবেন?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জ লোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে? ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরন। সাধে কি সে এখানে থাকিতে নারাজ!

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরনের ব্যাপার অন্য রূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহারে খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতের চারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিসই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিন বিকাল হইতেই খুশির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথা সে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নী তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন।

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নী বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব!

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচি আনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট। চক্ষুলজ্জা করিলে তাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নী আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়া তাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে কখানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল চক্ষুলজ্জায় পড়িয়া। কারণ, ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নী ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব!

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ব্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুশকিলে পড়া গেল! লুচি দেব, লুচি দেব! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখে অমন বলার কি দরকার?

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোন কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতে পারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসীমা, লুচি খাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হ'লে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

জমিদার-গিন্নী ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন। বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানালার কাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল, ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদে ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মত ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মত মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরণের একখানি রঙিন শাড়ি ও

হাফহাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটশৌরে সাজ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের স্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গে বাল্যকালে কত আসিত এঁদের বাড়ীতে, মানীর তখন নয়-দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ত ও কুলের আচার চুরি করিয়া দুইজনে সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে। বিপিনের পৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়া দিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কত বড় হইয়া গিয়াছে! ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারে অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিক জন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোন নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। এক সময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ। মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে। তবে সে আজ ছয়-সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ-আটাশ।

বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী?

—বিপিনদা, ওরকম ক'রে কথা বলছ কেন? আমি কি নতুন লোক এলাম?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনো 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়া আসিয়াছে; এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগেঁয়ের ছোট্ট মানীটি আছিস?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনও দোষ নেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধর লেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায় আর আমি চিনি নে? বিনোদকাকা যে রকম ক'রে কাজ ক'রে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কি তেমন পারবে? আজই কি সব করেছ, দু তিন টাকা খরচ ক'রে দিয়েছ—মা

বলছিলেন বাবাকে। বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই ক'রে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস্ এতকাল পরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুইই বা কি ভাববি?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহাল থেকে মাছ আনলে না কেন?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোদের মহালে? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছে নাকি? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে। তোর মা কি সে খবর রাখেন?

—তা নয়, বিনোদকাকার মত ডানপিটে হুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমি ভালমানুষ ধরনের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমত জমিদার চালের কথাবার্ত্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই, সংস্কৃত তো পড় নি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতীর মুণ্ডু খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াই নি কখনও। আচ্ছা, আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোন শোন, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয় আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল ক'রে শিখলে না? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর করে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি ক'রে খেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম?

মানী বলিল, তা আর মনে নেই! সে সব একদিন গিয়েছে! কিন্তু আমার কথা ওভাবে চাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বল?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ৎ তলবকারিণী রে!

পরে ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই। তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস? বাবা মারা গেলেন বিস্তর বিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা রেখে। আমি তখন সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউ নেই। টাকা উড়ুতে আরম্ভ ক'রে দিলাম, পড়াশুনো ছাড়লাম, বিষয়সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলাম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনও সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হ'লেও কোনও কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন?

কিন্তু এখন বয়স হ'য়ে বুঝেছি, কি ক'রেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে ক'রে বিসর্জ্জন দিয়েছিলাম তখন!

—তারপর?

—তারপর ওই যে বলছিলাম, নানা রকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দ্দশায়। খেতে পাই নে—এমন দশায় এসে পৌঁছুলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরণের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয় তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভালো লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না। মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এই রকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হ'ল আমার ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি, অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে?

—কি?

—আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বল?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয় এবার বাড়ী থেকে আসতাম না। তবে যে কদিন তুই আছিস, সে কদিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছি নে।

—চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা। নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন। আমার কথা একটিবার রাখ বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখ। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমায় ভালোর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি। এমন মূর্ত্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না মানী?

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার!

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা। রাগ করিস নে।

—কথা দিলে?

এই সময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রদ্দুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হলেই মেয়েরা সব ভুলে যায়!

বিপিনের পৌরুষগর্ব্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়া এমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহারই সঙ্গেই নির্জ্জনে কথা বলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল।

দুই-তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাবপত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারি হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ীর মধ্যে যায়, খাইয়া আসিয়াই কাছারি-বাড়ীতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্ত্তা বেশি বলেন না। জমিদারির কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি!

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে-খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি কর। কিস্তির আর দেরি কি? এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরি না থাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমড়-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওড়ে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচ টাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বাঁক হাড়ীকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবার ঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এস।

এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুরে ছুটিতে হইবে। নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ী তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোন জমিদারিতে? ইহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক-পেয়াদার মধ্যে বাঁক হাড়ী এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা

খরচ ইঁহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ দুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজে বাহির হইতে পারে নাই। কোমড়-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

২

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ীর মধ্যে। গিন্নীও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইয়া বসিলেন। চার টাকা মোটে! বল কি? এঃ, এর নাম আদায়? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নী বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক-আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এস! মেয়ে-জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁশ-পব্ব আছে? সেদিন বললাম ধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাৎলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনে হাজির!

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি-পয়সায় মাছ আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরচে না মামীমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই।···বিপিন সামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সে অপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নী বলিলেন, আর বার-বাড়ীতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও।

ইঁহাদের বাড়ীতে রাঁধুনী আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া গিন্নী নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনি নরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতে বসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে সে জানে, ইঁহারা কৃপণের একশেষ, জামাইয়ের জন্য কোনও রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানো চাই! খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়ীতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, কদিন দেখি নি ?

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে ? আজ পোলাও কেমন খেলে ?

—বেশ।

—না, সত্যি বল না ? ভাল হয়েছিল ?

—কেন বল্ তো ?

—আগে বল না, কেমন হয়েছিল ?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে, মনে আছে ?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও ? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল। আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের হাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্ন বিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ু-উড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না। বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমন যাই যাই করে না! হয়তো ঘুম পাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে।

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতে ঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্ব্বেও সে কিস্তির সময় কয়েকদিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্ন গোয়ালাবাড়ী, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়ীতে অতিথি। বাড়ীর সকলে হাতজোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারের মান থাকে ? এমন হয়েছেন আমাদের জমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না। অথচ এই মহলে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয় ; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়ে যাবে! ওরে বাবা রে!

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদার-বাড়ী ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছে অনাদিবাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ীর ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা!

—এই যে মানী, কেমন ? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসীমার মুখে ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে ?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কেন ব'লে গেলে আমার কাছে ? তুমি পোলাও খেয়েছিলে সেদিন ?

মেয়েমানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে ! মানী কাহুপি ঘাঁটা ওদের স্বভাব। দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল ! মানীর যেমন পাগলামি !

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন ? খাই নি, তাতে কি ?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝালো সুরে বলিয়া উঠিল, তাতে কিছু না। কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন ব'লে গেলে ? বললেই হ'ত, খাই নি। আমি তোমায় ফাঁসি দিতাম ?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হ'ত ? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হ'ত না ?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছে এতে ? শোন না, ও মানী !

কোনও সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ীর দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান—যেমন মনোরমা, তেমনিই মানী। আচ্ছা, কি করলাম, বল তো ? দোষটা কি আমার ?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপর রাগ করিল ? কথাই বা যায় কি ? মানী তাহার প্রতি এতটা টানে, তাহা বিপিন কি জানিত ? জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

৩

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ীর মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নী আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে কি পোলাও দিই নি ?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন ?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে ?

—কেন বলুন তো ?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিলে দুজনে, তোমায় পোলাও দিই নি কেন, তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিই নি, বল তো বাবা ?

—কেন দেবেন না ? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে

না মাসীমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অতশত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দু হাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ঐ শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না? কার মুখে কি শুনিস, আর তোর অমনিই মহাভারতের মত বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়ীতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি ক'রে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি পোলাও পাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে। বিপিন কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদার-গৃহিণী যে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটিতে যাইবার সময় দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, কেমন হ'ল, বিপিনদা?

—চমৎকার হয়েছে! সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল! খুব খাওয়া গেল! কে রেঁধেছিল, তুই?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বল না, কে?

—তুই।

—ঠিক ধরেছ। তা হ'লে আজ খুশি তো? মনে কোনও কষ্ট থাকে তো বল।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে। তবে কষ্ট একটা আছে।

—কি, বল না?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ? আমার কি দোষ ছিল?

মানী স্থিরদৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতে বললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনও কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স থেকে চাকু-ছুরি প'ড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বল নি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে?

—উঃ, সে কতকালের কথা! তোর মনে আছে এখনও?

মানী সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেই তুমি জীবনে এই প্রথম আমার কাছে কথা গোপন করলে! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পার? তুমি মুরে রেখে চলতে পারলে যেন বাঁচ।

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মায় বিরুদ্ধে বলা হ'ত নয় কি?

ছেলেমানুষি ক'রো না, অন্ত কথা গোপনে আর এ কথা গোপনে তফাৎ নেই ?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রূপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যা বলি, তাই শোন।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়া জানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

৪

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদার-বাড়ী থাকিতে, বিশেষত মানীর সঙ্গে পুনরায় আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্ত অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্ত করেন নাই।

সমস্ত দিন মহালের কাজে টো টো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারির ভৃত্যটি রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল-নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকাল মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্দ্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীর মুখ কতবার মনে পড়িত!

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি!

এ কথা সত্য, মানীর ষোল বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার কয়েকদিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে মেয়েদের মুখে পরিবর্ত্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়-অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামের গোয়ালপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুব সস্তা, এজন্য অনাদিবাবু নায়েবকে ঘি যোগাড় করিবার ভার দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বদিন বৈকালের ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিন ঘানি-ভাঙ্গা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদার-বাড়ী রওনা হইলেন। বিপিন কিছুতেই যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনর স্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াছিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে! তাহার বাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল! বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সা হাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে সে সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানক অভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জ্জন করা তত সহজ নয়। টাকা যেখানে-সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে বাবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হইল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকে চাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায় তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়ের সম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজার খরচের জন্যও নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই হয়তো অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ী পলাশপুর হইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ, ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণ কষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার-পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি করিয়াছে; সে আমোদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডা

দেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ অনেক দিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়ীতে থাকিতে বাড়ীতেই দুই বেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। এই দুরবস্থার উপরও বিপিন তাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট হয় নাই, জমিদারবাবু ও তাঁহার গৃহিণীর মত।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি, গোয়ালা, জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলে তাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই। নির্জ্জন কাছারি-ঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোন কোন দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটু গল্প-গুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদাম গাছটার পাতায় বাতাস লাগিয়া কেমন একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলে-পাড়ার গদাধর পাড়ুইয়ের বাড়ীতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণ রান্না-বান্না সারিয়া বিপিন খাইতে বসে।

৫

এক একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া বলে, খেতে বসলে নাকি বাবা?

—এস মাসী, এস। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আর রান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসী? এস তুমি। ব'স এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চৌকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলা বাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজ এবেলা?

—আলু ভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষ খেতে পারে? না খেয়ে-খেয়ে তোমার শরীর ঐরকম রোগাকাঠি। একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন ক'রে? তোমার বাবার আমলে দুধ-ঘিয়ের সোত ব'য়ে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ। তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসী বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্তার মাঝখানে। সে কথা না উঠাইয়া বুড়ী যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসীর পক্ষে তাহা আর এতটুকু অগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ, বাতাসের রং অন্য রকমই ছিল, দুধ ঘি অপর্য্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের আমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসীর অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসী প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোন দিন বা এক ছড়া পাকা কলা খাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপন মনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়। সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতে হয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ী হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না। বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে, দাদাকে বলো বউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ী নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানে থাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজের কথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটি ভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়ীতেই ছিল, মনোরমার কোনও প্রয়োজন ঘটে নাই

তাহাকে চিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীর নিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায় এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে ?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিনী স্ত্রীরা বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ী আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নভেলে সে এইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরের মধ্যে ? পাঁচ-ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সার অনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষে সহজ নন। সে যাক, কিন্তু সেই চার-পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না ? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ী এস, তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে। রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ী যাইতে চায়, ভরসা করিয়া দাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতেই হইবে। সে পলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ী থেকে, আবার এখুনি বাড়ী কেন ?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্ব্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকে হাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ী গেলে আর আসতে চাও না। জামাই চ'লে গিয়েছেন, মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু তিন টাকা খরচ। তুমি মহাল থেকে চ'লে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি প'ড়ে যাব বিষম বিপদে ; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, ব'লে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও বিপিন দেখিল, তাহা একরূপ অসম্ভব। সে থাকে বাড়ীর মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্ব্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মামীমা, কোথায় গেলেন, ও মামীমা ?

ঝি বলিল, মা ওপরে পূজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বললেন।

বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই। রাণাঘাট হাসপাতালে যেতে হবে। একটা কথা ছিল, আচ্ছা আর কেউ আছে ? কথাটা না হয় বলে যেতাম।

—দিদিমণিকে ডেকে দোব ? দিদিমণি রান্না-বাড়ীতে রয়েছে, দেখব ?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও. কথাটা ব'লেই যাই।

ঝি বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে ?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হ'ল। কর্ত্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী যাচ্ছি।

ঝি তখনও রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো হিমি, ওপরে আমার ঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুনকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা এসেছ বাইরে ? কই, আমি তো শুনি নি! চা খেয়েছ ?

—না।

—তুমি কখন যাবে ? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ী যাচ্ছ যে ?

বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ৎ তোমার বাবার কাছে দিতে হয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি ?

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমি তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন ?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে ? সে একবার কেবল বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। ব'স, আমি ক'রে আনি।

বিপিন রাজী হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এই অবেলায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—যদি আমার আসতে দু-এক দিন দেরি হয় কর্ত্তাবাবুকে ব'লে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি ?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সুরে বলিল, নির্ভয়ে চ'লে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, দিন তিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এস। বাবাকে শান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ভয়াই ? চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না। কোন্ সকালে ধোপাখালি থেকে খেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এস, ব'স উঠে।—বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনও হয় নাই। সেদিন সে সে-ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরি দেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমি চায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা ক'রে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়ীতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নী! মানী বেচারী হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি, এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে আবার দুইখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট—তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল। কোথা হইতে নারিকেল মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুঁজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়ে মাখ না। আস্তে আস্তে ব'সে খাও, আবার কখন খাবে তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকে দেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় ও তৃপ্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল। এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না—তাহা নয়। সে অন্য ধরণের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ীর কৃষাণের দিকে পর্য্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারে পাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোন দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, মাসিমার সঙ্গে দেখা হ'ল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এস। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে?

—দুমাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বহাল রইল? বাঃ রে, আমি বলেছি তিন দিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধর দশ দিন।

—না হয় ধর এক মাস।

—না হয় ধর তিন মাস। সে সব হবে না, সোজা কথা শোন বিপিনদা। আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, কদিনে আসবে। না, সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হাঁা, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমার ভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হ'লে? বেশ, এখন এস তা হ'লে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারী ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জমিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার! দেনা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবার সময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যাণ্ডনোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকুরিতে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারি নীলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখও হইল। বেচারী মানী!

২

রাণাঘাট হাসপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?

বিপিন কৈবর্ত্তের মেয়ে সেই নার্সটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ী যেতে চাইছে, কান্নাকাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্য্যন্ত জ্বালাতন করে তুলেছে বাড়ী যাব বাড়ী যাব ক'রে। নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানে মিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে!

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ী নিয়ে গিয়ে একটু সাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ী, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের [illegible] দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলোর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়া গিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চার সাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এস, আপনি কি বলছেন?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোর দিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ নম্বর ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারি? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ী যাবার জন্যে।

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোক্‌রা রুগী! নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে?

—সে পূর্ব্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভাল ভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হ'লে কাল সকালে নিয়ে যাব।

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন? আমার বাড়ীতে থাকুন। আমার এখানে ডিনার খাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ!

—আমার এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাদের বাড়ী বলে এসেছি, সেখানেই থাকব। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয়—কুড়ি-একুশ। রোগ হওয়ার পূর্ব্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেতখামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারের ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল, দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়া ছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠাল-বাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে এক জোড়া বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ী চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিসপত্র গাড়ী বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার ভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারী লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ যদু মুস্তফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানি কর?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হ'ল? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি। কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ী তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট-দশ গাড়ী বালি বয়েছ নদীর ঘাট থেকে সারাদিন। এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরণের ছেলে। বয়সে বড় ভারিক্কি মুস্তফি মহাশয়কে তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে পর্য্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ক করিবে! তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা বিক্রি করছে আর মৌকসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখেনি—সব নেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচবো বলুন তো? এতে তবুও দিন এক টাকা গড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ী ছ আনা ক'রে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্য্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এগারো গাড়ী বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা—চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্ন ভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দ্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জ্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত। বলাই গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানি করিয়া লাঙ্গল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ টাকা লাভ করিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা, বাগদী-পাড়ার নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধান রাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমির ধান এমন কি হবে যে, তার জন্যে অত বড় গোলার দরকার। দামও তো বেশি চাইবে।

বলাই বলিয়াছিল, বারণ ক'র না দাদা। বড় গোলাটা বাড়ী থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে, ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর। ওটাই আনি, কি বল দাদা?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিন দেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামের অনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ, তাহার উপর অনেক দিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরে আজ দাদার সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়ীতে উঠিয়া একবার এ জানালায় একবার ও জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কত কাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে। নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল। এখন না জানি কত বড় হইয়াছে। ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে গাঙের ধারে কদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে, এবং তাহাতে শসা, বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কাপালীপাড়ায় রাইচরণের পিসীর কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হ'লে আমাদের সূর্য্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখ নি সে ঝাল রাঙা টুকটুক করছে, এক একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জান? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেব আমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে!

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে? সে নিজে বিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভাস্থ, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ। গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলা ছিল বাড়ীতে, আজকাল দুটো লক্ষ্মীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না।

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনরো হাতের বেড়, সে গোল বাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

৩

বেলা এগারটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ী পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ী আসিবার কোন সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষতঃ বলাইকে আসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভাস্থ, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ীর তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকী! বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মত।

ভাস্থ টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপর পড়িয়া তাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হ'লে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব? এলাম তো চ'লে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ী নিয়ে যাও, আমায় বাড়ী নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতে পারে! ছেলেমানুষ, তাতে ওর প্রাণ পড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁ গা, ওর অসুখ কেমন? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না। মাকে ব'লে দিও, যেন যা তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

—তবেই হয়েছে। যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণ কঠিন। আর কি জান, বাড়ী এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারা যাবে? তুমি যে কদিন বাড়ী আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসি কাটিয়ে ভাগাভাগি ক'রে বিলি ক'রে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে।

—না না, তা হ'তে দিও না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার বাবাকে চিঠি লিখব, ওসব ছেলেমাতুষি চলবে না।—বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাঁকে উলোর পিসীমা নিয়ে গেছেন আজ দিন পনেরো হ'ল। তিনি এসেছিলেন গঙ্গাচ্চান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তাঁর সংসারে দাসীবৃত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো কর না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমি চ'লে গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না। একদিন এমন হ'ল—দুটিখানি পান্তা-ভাত ছিল, ভানু-টুনিকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস ক'রে রইলাম। কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললুম, উপোস ক'রে মরি সেও ভাল, কারও বাড়ী, কি রায়-গিন্নীর কাছে, কি দুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেও কিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়ীতে পা দিয়াছে, অমনই সতেরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়া মনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরণের তিরস্কার। সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়া গিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে দিয়া বাড়ীর বাহির হয় নাই? স্ত্রীর মুখে তিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল। স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না? স্বামীর অক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না?

৪

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেলতা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এক কাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ী ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ ক'রে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তরতন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ীর সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা ঘুণির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন বাবাঠাকুর, আসুন। কবে আলেন বাড়ী? এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই

আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষণও বিনি কাজে থাকতে দেখি না? চোখে ঠাওর হয়?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা চশমা এনে দিতি পার? চশমা ন'লি আর চকি ভাল ঠাওর পাই নে যে!

—বয়েস তোমার তো কম হ'ল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বল!

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাৎলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব ক'রে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাই বলে। আবার কেহ কেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে কেটে নব্বুই বিরেনব্বুই। একশো! বললেই হ'ল বুঝি।

মাৎলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, চাচা, তুমি অনেক রকম মন্তরতন্তর জান, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন।

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশ বার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশ বৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই একই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া। আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্ব্বের সহিত বলিল, মন্তর? তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে মন্তর্ সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা ব'লে কি হবে, এদিগরের কোন্ লোকটা জানে না আমার নাম? তবে এই শোন। শক্তরে খাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ড জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথা শুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায় এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেক কথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে! এইজন্যই সে বাড়ী থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষে তাহা অতীত কালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই। নাই বলিয়াই তাহা রহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড সোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা কর বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এই শোনবা? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকা ক'রে পেন্সিন খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনির কথা।

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বল তো শুনি? মনে আছে?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল! কবিতা শোনবা? রামায়ণ মহাভারত মুখস্থ ছেল। এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর? এই শোন—

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।
কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ী কথা কত ছলে॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকু বুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরের কবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনিনি তো চাচা? রামায়ণ-মহাভারতের কবিতাই তো বল। এ কোথায় শিখলে?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল যে! বিদ্যেসুন্দরের যাত্রা হ'ত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী কজন পরামর্শ ক'রে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কবিওয়ালার বই। বড় ভাল লেগে গেল। তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পানা চাচা?

—বড্ড হে-পানা; আপনাদের কাছে আর কি বলব? ছেলেছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হ'তি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে ব'লে এক রাজকন্যে, তার সঙ্গে সুন্দর ব'লে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। প'ড়ে দেখো। বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে॥

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাঁহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজের কবিতার উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন।

বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, কারণ সে সাহিত্যরসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনও বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়া তাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তো নয়—মানী। কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছে আসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকে সর্বসৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা তাহার চেয়েও ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ীর পশ্চিমে বেলতার মাঠ, অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারে হরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যে ফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও ছাতারে পাখীর দল কলরব করিতেছে। নিকটে চাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনে তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছে, অকস্মাৎ এক ঝলক-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মত মানীর গত কয় দিনের কার্য্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনে আলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে?

কেহই নয়, অথচ সে-ই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে? ইচ্ছা করিলেই কি তাহার সঙ্গে যখন-তখন দেখা করিবার উপায় আছে?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল!

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চল আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানের ক্ষ্যাতে আমার নাতি ব'সে পাখী তাড়াচ্ছে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারেই কুমড়োর ভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলায় আধশুকনো ধানের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনের কানেস্তারা বাজাইয়া বাবুই পাখী তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশের মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ, যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায় বাহাত্তর-তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভাল গায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিকি বড় একটা যাওয়া আসা কর না বুঝি?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পুবির বেড়ার গায়ে যে কটা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হ্যাদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! স্মুন্দির পাখীগুলো তো বড্ড জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনে পড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্যাতে ক্যাতে ব'সে ধান কাটি
ও মোর মনে জাগে তার নয়ান দুটি—

বাবুইপাখীর ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না; সুতরাং তাহারা নির্ব্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচে নাচের ধরনে উড্ডীয়মান বাবুইপাখীর ঝাঁক, বিলের ধারের জলে সোলাগাছের হলদে ফুলের রাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য্য, সব মিলিয়া তাহার মনে এক অপূর্ব্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহার হাতে পড়িয়াছে, সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিন নিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয় নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্ব্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহার যতটা কাছে অতটা কাছে কেহ কখনও আসে নাই। বিপিন লেখাপড়া মোটামুটি জানিলেও এমন কিছু বেশী নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আর কেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহার মনের এ শূন্যতা

পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা?

হয়তো হইবে।

যে কোন কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনে ইহা একেবারে নূতন।

সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথা বেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতার মাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্ত্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেই হেড-মাস্টারের কাজ করে। বি. এ. পর্য্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না।—বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ী গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্ত্তমানে কর্ম্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্ম্মকারের পোড়ো বাড়ীতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির যোগাড় করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপ্নে যে! আয় আয়, ব'স। কবে এলি রে বাড়ীতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণ জয়কৃষ্ণ স্ত্রীপুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীই উপরওয়ালা হেড-মাস্টারের এক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছে জয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না, উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরে সে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার সুর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ও বিপিনবাবু ?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি। কোন মেয়েমানুষের কথা তো ? বলুন না, একটু শুনি।

বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে, বলছি।

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে শুরু করিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম বিজলী। তাহার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে কলকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায় মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত। একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা ?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ-সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায় ?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ী থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে ?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাঝে মাঝে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্ন করে।

—কি রকম যত্ন করে ?

—এই গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্ন আর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না। মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সেসব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু

নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সেকথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখনো কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আপনমনেই বলিল, আমাদের এ রকম কখনও কেউ চিঠি লেখে নি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোন মেয়ে কিছু বলেও নি, সাহস ক'রে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারি নি মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়স হ'ল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি ক'রে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ী মানুষ হয়েছি দুঃখে-কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখিনি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি ক'রে, হাটবাজার ক'রে অতিকষ্টে ছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, একটা ভাল কথা্ কখনও কেউ বলে নি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিই নি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি, জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী এমন হতাশ সুরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূর হইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর তাহার যেন একটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্দ্ধ-পরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী যেন তাহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রের সমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড় ধনী।

বাড়ীতে আসিয়া প্রথম দিন পাঁচ-ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া আছে—নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটা হবে। সাত আনা ক'রে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ী থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বৌদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংস খাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিল না।

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াও বাড়ী আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ী আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ীর সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনের কানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন এক দিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য শুরু করিয়া দিল। কখনও লুকাইয়া কখনও বা বাড়ীর লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এইভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাঁচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিল। তাহার বাড়ী আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়া ছাইয়া লইবে। এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।

বাড়ী আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ী আসিবার আনন্দ-উৎসাহ এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়ের পাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্য মনের আনন্দে নির্বিচারে পথ্য-অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থা দেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে! সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালে সেবার লইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে যা চেহারা ছিল তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো মুচীপাড়া থেকে আর দুখানা ছিপ নিয়ে আসি।

বলাই উঠিয়া হাঁটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ীর লোকে হয়তো ভাবে, তবে অসুখ এমন কঠিন আর কি!· কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবং উত্থান-

শক্তিরহিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মত বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দাম বড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আর মাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছে জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি ক'রে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে!

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়ের ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে।

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতুহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের মধ্যে ছাৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছ-পালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিক এপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনও কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমন ভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন ক'রে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া ব'লল, না, কিছু না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বা করিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনে ভাবিল, কিছু না, এমনই চেয়ে ছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে আর একবার চোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? কি দেখছিস বল্ তো?

বলাই বলিল, না, কিছু দেখছি না।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটা ঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপ

গাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমুল, শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্য্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানে তাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বনে সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদ-পোড়া ফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিন ভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই; সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন ক'রে? ওদিকে তাকাস নে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ও ফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্ত্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও। সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চল্ বাড়ী চল্। সন্ধ্যে হ'ল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

অসুস্থ ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেন বাঁচে।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হাল্কা ছিল, সর্ব্বদা যেমন কি এক ধরণের আনন্দে ভরপুর ছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠরির মেঝেতে সিমেণ্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহুকাল, জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে এক গাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরানো হুঁকো, একটা পুরানো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ব্ববৎসর দারিদ্র্যের দায়ে বিপিন সস্তা দরে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তাপোশ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়িবার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকীকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরানো তুলো-বার-হওয়া তোশক পাতিয়া বিপিনের জন্য বিছানা করা হইয়াছে; মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনদিন হাতে করিয়া বাড়ী আসে নাই, যাহা হইতে সংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সাঁজাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন শৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপর বিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির সুরে বলিল, এত রাত পর্যান্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে? বলি এখানে মানুষ শোবে না এটা গোয়াল? নিয়ে যাও সরিয়ে।

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল। ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের আভাস অনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে, না আছে, এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া ক'রে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া বিবাদের হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটা ব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকরি হইবার পর হইতেই স্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানারকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত; বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ। বিপিন যেন তাহার সব কিছুতেই দোষ দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা-তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহা মনোরমা ভাবিয়া পায় না।

মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এই সংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ী যায় না, কারণ শ্বশুরবাড়ীতে এমন কেহ আপনার জন নাই যে তাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমার নিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয় সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন তখন ছুতা-নাতোয় এ বাড়ীতে যাতায়াত করে এবং বীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহর-বাজারের মেয়ে, তাহার বাপের বাড়ীতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও-বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপ হইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়ীতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়ীতে তত আসিতে দেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয়-সাত মাস বাড়াবাড়ি। বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনও না কোনও ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই। এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথা-বার্তা বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ী সন্ধ্যার পর চোখে ভাল দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই ওই পোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!

বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়, ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ কি তারও বেশি; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার-পাঁচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে এত

কথাবার্ত্তাই বা তাহার কিসের? বিশেষ যখন বাড়ীতে কোন পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না। বলাই তো এতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ী চোখে দেখেন না, তাঁহার থাকা না-থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোন লাভ নাই। মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে। বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়ীকে বলিয়াও কোন লাভ নাই তিনি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিরেট ভালমানুষ, তাঁহার কথা ঠাকুরঝি শুনিবেও না। বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ী বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপিনকে কথাটা বলিবার। কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেন সর্ব্বদাই চটা, এ কথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে।

মনোরমা সংসারী ধরনের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে। জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়ীতে তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামী বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দশার অভিজ্ঞতা কখনও ছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখন এখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাই জ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছু মনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ী যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই। সবই তাহার অদৃষ্ট!

শাশুড়ীর বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ীর ঘরে তাপ-সেক করিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ীর সেবা করে, বীণার নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা নিজের ধরনে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়া কখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই; মনেপ্রাণে সে যেন এখনও অবিবাহিতা বালিকা। তাহার ধরনধারণ বালিকার মতই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরনের মেয়ে সে কোনও কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনের শূন্যস্থান তিনি কোন কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না; এখনও সে ছেলেমানুষ,

ঠিকমত হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকে চাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামী-পুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে। তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধু ধু মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনই ভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ী হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড় শো টাকা। বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য তাহাই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেই সঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলে পরামর্শ দিল, জমি এখনও যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনা হইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু ক'রে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।

বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোন একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে। আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড় শো টাকা নিলে আর উপুড়-হাত করলে না, আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষে ওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনও ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওই হারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিস নি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি. হার দরকার হয় নাও না, তবে ব'লে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা ছিল অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চ'লে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বৌদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকো ক'রে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব। কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুর গাড়ী নিজে হাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরে, রাত্রে একমুঠা চাল চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ—একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায় পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায় বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্ন আর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সে-ই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয় তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা।

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়া শুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধ ঘণ্টাটাক পড়িয়া শুনাইবার পরে বই হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম 'পাচ্ছে।

আজকাল, বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্যন্ত, রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য। আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সা তো দূরের কথা, বাড়ীতে এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এ বন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়ী রাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমা তাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্ট পায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুশকিল বাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায় তাহাতে সবদিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর। বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সেদিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলট-পালট হইয়া যাইবে মাঝে পড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোন কথা লোকের কানে গেলে ছি ছি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই

হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়া বলিল, শোন, একটা কথা বলি।

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল, কি কথা?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলা তো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাক গে, কাল কি পরশু কি আর একদিন—এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনও কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজ অন্তত দরকার নাই।

৪

কিন্তু পরদিনই একটা ঘটনায় মনোরমার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার হঠাৎ মনে পড়িল, ছাদে একখানা কাঁথা রোদে দিয়াছিল, তুলিতে ভুলিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময়ে সিঁড়ির পাশের ঘুলঘুলি দিয়া দেখিল, বাড়ীর পাশে কাঁঠালতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। চোখের ভুল ভাবিয়া সে সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল এবং ছাদের আলিসা হইতে কাঁথাখানা লইয়া যখন নীচে নামিতেছে, তখন মনে হইল, চিলে-কোঠার আড়ালে যেন কিসের শব্দ হইল। মনোরমা ঘুরিয়া গিয়া দেখিল, চিলে-কোঠার আড়ালে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বীণা, এবং যেন নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। বউদিদির পায়ের শব্দে বীণা চমকিয়া পিছন দিকে চাহিল। মনোরমা বলিল, বীণা-ঠাকুরঝি এখানে দাঁড়িয়ে একলাটি?

বীণা নীরস সুরে বলিল, হাঁ, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

—এস নীচে নেমে। অন্ধকার সিঁড়ি, এর পর নামতে পারবে না।

—খুব পারব। তুমি যাও, বড্ড অন্ধকার এখনও হয় নি। যাচ্ছি আমি।

মনোরমা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঘুলঘুলি দিয়া কি জানি কেন একবার চাহিয়া দেখিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে পড়িল, বাড়ীর বাহিরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কে একজন আসশেওড়ার ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

মনোরমার ভয় হইল। চোর বা কোন বদমাইশ লোক নিশ্চয়ই। সে কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমা দেখিল, সে পটল চাটুজ্জে। পটল টের পায় নাই যে মনোরমা ঘুলঘুলি দিয়া চাহিয়া আছে, সে ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া একবার হাসিয়া নিম্নস্বরে বলিল, চললাম আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাল যেন দেখা পাই, কথা আছে।

মনোরমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন কি কাণ্ড। পটল চাটুজ্জের এরকম লুকাইয়া দেখা করিবার হেতু কি? সন্ধ্যার অন্ধকারে মশার কামড়ের মধ্যে শেওড়াবনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলিবার কোন কারণ নাই, যখন সে সোজা বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রকাশ্যভাবেই বীণার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে, তাহাকে তো কেউ বাড়ী ঢুকিতে নিষেধ করে নাই!

সেই রাত্রেই মনোরমা বিপিনকে কথাটা বলিবে ঠিক করিল। কিন্তু হঠাৎ রাত দশটার সময় বলাইয়ের অসুখ বড় বাড়িল। ঠিক যখন সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবে, সেই সময়। বলাই রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল আর কেবলই বলিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর জ্ব'লে গেল, ও মা!···পাড়ার প্রবীণ লোক গোবর্দ্ধন চাটুজ্জে আসিলেন। পাশের বিপিনদের জ্ঞাতি ও সরিক ধনপতি চাটুজ্জে আসিলেন। পাড়ার ছেলেছোকরা এবং মেয়েরা কেহ কেহ আসিল। প্রকৃত সাহায্য পাওয়া গেল গোবর্দ্ধন চাটুজ্জের কাছে। তিনি পুরানো তেঁতুলের সঙ্গে কি একটা মিশাইয়া বলাইয়ের সারা গায়ে লেপিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতেই দেখা গেল, যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটিল। সারারাত বিপিনের মা রোগীর বিছানায় বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। বীণা রাত একটা পর্য্যন্ত জাগিয়া রোগীর কাছে বসিয়া ছিল, তাহার মায়ের বারবার অনুরোধে অবশেষে সে শুইতে গেল।

মনোরমা প্রথমটা এ ঘরে বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়ের কাছ-ছাড়া হইলেই রাত্রে কাঁদে, বিশেষ করিয়া ভানুটা। বিপিনের মা বলিলেন, বউমা, তুমি ছেলেদের নিয়ে শোও গে, তবুও ওরা একটু চুপ ক'রে থাকবে। সবাই মিলে চেঁচালে বাড়ীতে তিষ্টনো যাবে না। তুমি উঠে যাও।

বিপিন একবার করিয়া একটু শোয়, আবার একটু রোগীর কাছে বসে; এই ভাবে রাত কাটিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

দিন দুই পরে বলাই একটু সুস্থ হইলে বিপিন বাড়ী হইতে রওনা হইয়া পলাশপুরে আসিল। জমিদার অনাদিবাবু বেশ বিরক্ত হইয়াছেন মনে হইল; কারণ প্রায় পনেরো দিন কামাই হইয়া গিয়াছে বিপিনের। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি বিপিনকে জমিদারি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রজাদের নিকট হইতে কিস্তিখেলাপী সুদ আদায় কি ভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বলিলেন, নালিশ মামলা করতে পিছুলে চলবে না। এবার গিয়ে কয়েক নম্বর মামলা রুজু ক'রে দাও, দেখি টাকা আদায় হয় কি না।

বিপিন বলিল, নালিশ করতে গেলেই তো টাকার দরকার। এখন মহলের যেমন অবস্থা, তাতে আপনাদের খরচের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, তার ওপর মামলার

অনাদিবাবু কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বলিলেন, তা বললে জমিদারির কাজ চলে না। টাকা যেখান থেকে পাবে যোগাড় করবে। তোমাকে তবে গোমস্তা রেখেছি কি মুখ দেখতে। সে সব আমি জানি না। টাকা চাই।

বিপিনও বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে। সে কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নয়; বলিল, আজ্ঞে, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওভাবে টাকা আদায় আমার দিয়ে হবে না। এতে যদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হ'লে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, এই সংসারের দুরবস্থায়, বলাইয়ের অসুখের সময়, এ কি কাজ করিল সে? ইহার ফলে এখনই চাকুরি যাইবে।

অনাদিবাবু কিন্তু তখনই তেমন কোন কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিপিন সেখানে বসিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাগটা কাটিয়া গিয়া তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল। অনাদিবাবুর মুখে মুখে অমনতর জবাব দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। চাকুরি গেলে বাড়ী গিয়া খাইবে কি? তবে ইহাও ঠিক, সে সুর নরম করিয়া ছোট হইতে পারিবে না, ইহাতে চাকুরি যায় আর থাকে! এদিকে আর এক মুশকিল। বেলা এগারোটা বাজে। স্নান-আহারের সময় উপস্থিত। যাহাদের চাকুরি একরূপ ছাড়িয়াই দিল এখনই, তাহাদের বাড়ী আহারাদি করিবেই বা কি করিয়া? না, তাহা আর চলে না। খাওয়ার দরকার নাই। এখনই সে রাণাঘাট হইয়া বাড়ী চলিয়া যাইবে। বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনাদিবাবু ভাবিতে পারেন যে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

নিজের ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বিপিন বৈঠকখানা-ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। অল্পদূর গিয়া পথের মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ অনাদিবাবুদের খিড়কি-দোর হইতে যে ছোট পথটা আসিয়া এই পথের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পথের মাথায় গাব গাছটার তলায় মানীকে তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মানী এখানে আছে তাহা সে ভাবে নাই।

মানীদের খিড়কি-দোর খোলা। এইমাত্র কে যেন দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বিপিন কিছু বলিবার আগেই মানী বলিল, কোথায় যাচ্ছ বিপিনদা?

তারপর আগাইয়া আসিয়া বিপিনের সামনে দাঁড়াইয়া আদেশের সুরে বলিল, যাও, গিয়ে বৈঠকখানায় ব'স। আমি তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেলা হয়েছে বারোটা। নাওয়া-খাওয়া করতে হবে না, কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে লোকে?

প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন পরে মানীর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। মানীর কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি যোগাইল না তাহার। সে কোনও কথাই বলিতে পারিল না, শুধু চুপ করিয়া মানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মানী বলিল, আবার দাঁড়িয়ে কেন, বেলা হয় নি?

এতক্ষণে বিপিন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। অপ্রতিভের সুরে আমতা আমতা করিয়া বলিল, কিন্তু—আমি গিয়ে—বাড়ী যাচ্ছি যে।

মানী পূর্ব্ববৎ সুরেই বলিল, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে খুনোখুনি হব এই দুপুরবেলা বিপিনদা? জ্ঞান বুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? যাও ফিরে বৈঠকখানায়।

বিপিন অবাক হইল মানীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া। কতটা টান থাকিলে মেয়েরা এমন জোরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, বিপিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু অনেক কথা বলিবার থাকিলেও সে দেখিল, খিড়কি-দোরের দিকের প্রকাশ্য পথের উপর দাঁড়াইয়া মানীর সঙ্গে বেশি কিছু কথাবার্ত্তা বলা উচিত হইবে না এই সব পল্লীগ্রাম জায়গায়। দ্বিরুক্তি না করিয়া সে ব্যাগ হাতে আবার আসিয়া অনাদিবাবুদের বৈঠকখানায় উঠিল।

বৈঠকখানায় কেহই নাই। অনাদিবাবু সম্ভবত বাড়ীর মধ্যে স্নান করিতেছেন। সে যে বৈঠকখানা হইতে ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইহা মানী কি করিয়া জানিল বিপিন ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে চাকর এক বাটি তেল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিল, নায়েববাবু, নেয়ে নিন মা ব'লে দিলেন।

বিপিন বলিল, কে তোকে তেল আনতে বললে?

—মা বললেন, নায়েববাবুর জন্যে তেল দিয়ে আয় বাইরে। দিদিমণি গিয়ে রান্নাঘরে মাকে বললেন, আপনি বাইরে ব'সে আছেন, তেল পাঠিয়ে দিতে। আমি মাছ কুটছেলাম, আমায় বললেন, দিয়ে আয়। আপনি যে কখন এয়েলেন, তা দেখি নি কি না তাই জানি নে নইলে আমি নিজেই তেল দিয়ে যাতাম। নায়েববাবু কি আজ আলেন? ভাল তো সব বাড়ীর?

এই একমাত্র চাকর জমিদার-বাড়ীর, সে তো তাহার যাতায়াতের কোন খবরই রাখে না, তবে মানী কি করিয়া জানিল, সে ব্যাগ হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং রাগ করিয়াই যাইতেছে?

খাইবার সময় মানীর আঁচলের ডগাও দেখা গেল না কোন দিকে, কারণ রান্নাঘরের বারান্দায় অনাদিবাবুর সঙ্গেই তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। অনাদিবাবু উপস্থিত থাকিলে মানী বিপিনের সামনে বড় একটা বাহির হয় না।

অনাদিবাবু খাইতে বসিয়া এমন ভাব দেখাইলেন যে, বিপিনের সঙ্গে তাঁহার যেন কোনও অপ্রীতিকর কথাবার্ত্তা হয় নাই। জমিদারিসংক্রান্ত কোন কথাই উঠাইলেন না—বিপিনের দেশে মাছের দর আ-কাল কি, ম্যালেরিয়া কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, রাণাঘাটের বাজারে কাহার একখানা দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহাদের আলোচনার মধ্যেই আহার শেষ করিলেন।

রাণাঘাট হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিপিনের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনাদিবাবু বেলা তিনটার আগে বৈঠকখানায় আসিবেন না, মধ্যাহ্নে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তাঁর অভ্যাস,

বিপিন জানে ; সুতরাং সে নিজেও এই অবসরে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, শ্যামহরি, ও শ্যামহরি, বাবু নামবার আগে আমায় ডেকে দিস যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বুঝলি ? আর একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

২

একটু পরে মানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে মানীকে সে আসিতে দেখে নাই কখনও।

মানী বলিল, বিপিনদা, রাগ পড়েছে ?

বিপিন মানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, তুই কি ক'রে জানলি আমি চ'লে যাচ্ছি। কেউ তো জানে না। শ্যামহরি চাকরকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম, আমি কখন এসেছি তা পর্য্যন্ত সে খবর রাখে না।

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টনক আছে মাথায় বিপিনদা; আমি জানতে পারি।

—কি ক'রে বল্ না মানী, সত্যি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোকে দেখে।

মানী তবুও হাসিতে লাগিল। কৌতুক পাইলে সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, বিপিন তাহা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, এবং ইহাও একটা কারণ যে জন্য মানীকে তাহার বড় ভাল লাগে।

—আচ্ছা, হাসি এখন একটু বন্ধ থাক গে। কথার উত্তর দে।

মানী দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, দরজার শিকলটা দুই হাতে ধরিয়া তাহার হাসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বিপিনের মনে হইতেছিল, মানী এখনও যেন তেমনই ছেলেমানুষ আছে, শিকল ছাড়িয়া মানী দরজার পাশে একখানা চেয়ারে বসিল। গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমি কি রকম মানুষ বিপিনদা! এসেছ কখন, তা জানি না। একবার দেখা পর্য্যন্ত করলে না। তারপর বাবা বুড়ো মানুষ কি বলেছেন না বলেছেন, তুমি অমনই চ'টে গেলে, আর এই ঠিক দুপুরবেলা, খাওয়া না দাওয়া না, কাউকে কিছু না ব'লে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঁটুলি হাতে!

—তুই জানলি কি ক'রে ?

—আমি জানব কি ক'রে ? বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মা'র কাছে বললেন যে, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে কি নিয়ে। মাকে বললেন, শ্যামহরিকে দিয়ে তোমার নাইবার তেল পাঠিয়ে দিতে। বাবার মুখে তাই শুনে আমার ভয় হ'ল, আমি তো তোমায় চিনি। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসে দেখি, তুমি ওই বাতাবি-নেবুতলা পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছ। চেঁচিয়ে ডাকতে পারি না তো আর। তখনই ছুটে খিড়কি-দোরে গেলুম, রাস্তার বাঁকে তোমায় আসতেই হবে। বাপ রে, কি রাগ!

—রাগ নয়, মনের দুঃখু তো হতে পারে।

—কি দুঃখু? তুমিই বলেছ বাবাকে যে, না পোষায় আপনি অন্য লোক রাখুন। বাবা তোমাকে তো কিছুই বলেন নি!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। এ কথার জবাব দিতে গেলে অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা সে মানীকে বলিতে চায় না।

মানী বলিল, বিপিনদা, আমার কাছে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

—কি কথা?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে? বলেছিলে না, আমায় না জিজ্ঞেস ক'রে চাকরি ছাড়বে না? কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

—মনে ছিল না, এখন মনে পড়ছে বটে।

—তা নয়, রাগের সময় তোমার জ্ঞান ছিল না, এই হ'ল আসল কথা। উঃ, কি জোর বেরিয়ে যাওয়া হ'ল! দেখতে না দেখতে একেবারে বাতাবিনেবুর গাছের কাছে। ভাগ্যিস আমি ছুটে গেলুম খিড়কির দোরে? নইলে এতক্ষণ রাণাঘাটের অর্দ্ধেক রাস্তা—

—কিন্তু এতক্ষণ পরে একটা কথা বলি মানী, তুই যে এসেছিস বা এখানে আছিস এ কথা আমি কিন্তু কিছু জানি না। আমি তোকে খিড়কি-দোরের পথে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—বাবা কিছু বলেন নি?

—উনি তোর কথা আমার কাছে কি বলবেন? কখনও বলেন, না আমিই জিজ্ঞেস করি?

—তা নয়। আমি থাকলেই তো খরচ বাড়ে, খরচ বাড়লেই জমিদারির তাগাদা জোর ক'রে করবার ভার পড়ে তোমার ওপর। আমি ভেবেছিলুম, বাবা সে কথা তুলেছেন বুঝি; আমি আছি সুতরাং টাকা চাই, এমন কথা যদি বলে থাকেন।

—না, সে কথা ওঠে নি। তুই চ'লে যাবি শিগ্‌গির এ তো জেনেই গিয়েছিলুম, আবার এর মধ্যে আসবি তা ভাবি নি।

—তা ভাববে কেন? দেখতে পেলে বুঝি গা জ্বালা করে? দূরে রাখলেই বাঁচ বুঝি?

—বলেছি কোন দিন?

মানী ঘাড় দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় রাগাচ্ছি বিপিনদা, রাগাচ্ছি। সেই সব তোমার ছেলেবেলার মত এখনও আছে, কিছু বদলায় নি। আচ্ছা, একটা কবিতা বলব শুনবে?

বিপিন হাত নাড়িয়া যেন মশা তাড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, রক্ষে কর। ওসব ভাল লাগে না আমার, বুঝি-সুঝি না। বাদ দাও, জান তো আমার বিদ্যে!

মানী গম্ভীর হইয়া বলিল, বিপিনদা, আমার আর একটা কথা রাখতে হবে। তোমায় পড়াশুনা করতে হবে। তোমায় কতকগুলো ভাল বই দোব, সেগুলো কাছারিতে গিয়ে

পড়বে, প'ড়ে ফেরত দেবে, আমি আবার দোব। বইয়ের আমার অভাব নেই, যত চাও দোব।

বিপিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, বই আমি অনেক পড়েছি, তুই যা। বুড়ো বয়েসে আবার বই পড়তে যাই, আর উনি আমার মাস্টারনী হয়ে এসেছেন!

মানী রাগিয়া বলিল, এসেছিই তো মাস্টারনী হয়ে। পড়তে হবে তোমায়। বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও যদি ভাল চাও। এঃ, একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন আর কি! পড়াশুনো শিকেয় তুলেছেন!

বিপিন হাসিতে লাগিল।

মানী বলিল, সত্যিই বলছি বিপিনদা, নিজের জীবনটা তুমি ইচ্ছে ক'রে গোল্লায় দিলে। নইলে আজ আমার বাবার বাড়ী চাকরি করতে আসবে কেন তুমি? লেখাপড়া শিখলে কাকুড়, তোমায় ভাল চাকরি দেবে কে বল তো? আবার তেজ ক'রে চ'লে যাওয়া হয়! যাও, বই দিচ্ছি, নিয়ে পড় গে, আর একখানা ডাক্তার বই দিচ্ছি, সেখানা যদি ভাল ক'রে পড়তে পার, তবে আর চাকরি করতে হবে না।

ডাক্তারি বইয়ের কথায় বিপিন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ মানীর গুরুমহাশয়-গিরিতে তাহার হাসি আর থামিতেছিল না। বলিল, বেশ, ভালই তো। কি বই পড়তে হবে এনে দিও, দেখি চেষ্টা ক'রে।

—মানুষ হও বিপিনদা, আমার বড্ড দুঃখ হচ্ছে। তোমার বুদ্ধি আছে, কিছু কাজে লাগালে না তাকে। ডাক্তারি যদি শিখতে পার, ভেবে দেখ, কারও চাকরি তোমায় করতে হবে না। আমার এক দেওর ডাক্তারি পাস করেছে, বীজপুরে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে, দেড়শো টাকার কম কোনও মাসে পায় না।

—সে সব পাস-করা ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে। আচ্ছা, বাংলা বই প'ড়ে ডাক্তার হওয়া যায়?

—কেন হওয়া যাবে না? খু-উ-ব যায়। তোমায় বই আমি আরও দোব। তারপর আমার সেই দেওরকে ব'লে দোব, তার কাছে ছ মাস থেকে শিখলে তুমি পাকা ডাক্তার হয়ে যাবে। সে কথা পরে হবে, এখন তোমায় বই এনে দিই। সেগুলো নিয়ে কাছারি যেও, আর রোজ প'ড়ো। কবে যাবে সেখানে?

—কাল সকালেই যেতে হবে, দেরি আর করা চলবে না।

—আচ্ছা, ব'স, আমি বই বেছে বেছে নিয়ে আসি।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকার হাসিয়া চলিয়া গেল। মানীর এ হাসি বিপিনের পরিচিত। ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

মনে মনে ভাবিল, মানীটা বড় ভাল মেয়ে। এতটুকু ঠ্যাকার নেই, বেশ মনটি। তবে মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে আমায় এ বয়েসে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে!

মানী একরাশ বই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিপিনের সামনে বইয়ের বোঝা নামাইয়া বলিল,

দেখে ভয় হচ্ছে নাকি ? কিছু ভয় নেই। এর মধ্যে দুখানা শরৎবাবুর নভেল আছে, 'শ্রীকান্ত' আর 'দত্তা' প'ড়ে দেখো, কি চমৎকার !

—উঃ, তুই দেখছি আমায় রাতারাতি পণ্ডিত না ক'রে ছাড়বি না মানী !

মানী আর একখানা মোটা বই হাতে লইয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, এইখানা সেই ডাক্তারি বই। এ আমার শ্বশুরবাড়ীর জিনিস। তোমায় দিলাম। এ থেকে তুমি ক'রে খেতে পারবে।

বিপিন পড়িয়া দেখিল, বইখানির নাম 'সরল চিকিৎসা-বিজ্ঞান'। গ্রন্থকারের নাম ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এল. এম. এস.।

মানীর দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ ভাল বই ?

মানী ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলিল, খুব ভাল বই। এতে সব আছে ডাক্তারি ব্যাপারের। বাকিটুকু হয়ে যাবে এখন, আমার সেজ দেওরের কাছে থেকে কিছুদিন শিখলে। আমি সব ঠিক ক'রে দোব এখন।

—আর ওগুলো কি বই ?

—এখানা শরৎবাবুর 'দত্তা', বললুম যে। চমৎকার বই, প'ড়ে দেখো— উপন্যাস। উপন্যাস পড় নি কখনও ?

—আমাদের বাড়ীতে ছিল বাবার আমলের 'ভুবনমোহিনী' ব'লে একখানা উপন্যাস। সেখানা পড়েছি।

—ওসব বাজে বই, ভাল বই তুমি কিছুই পড় নি, খোঁজও রাখ না বিপিনদা। আজকাল মেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জান না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।

—শরৎবাবু ভাল লেখক ? নাম জানি নি তো ?

—তুমি কার নাম শুনেছ ? বঙ্কিমবাবুর নাম জান ? রবি ঠাকুরের নাম জান ?

—নাম শুনেছি ওই পর্যন্ত। পড়ি নি কোনও বই। আছে তাঁদের বই ?

—এগুলো আগে প'ড়ে শেষ কর। পরে দোব। শোন, আমি শ্যামহরি চাকরকে ব'লে দিচ্ছি, তোমার পুঁটুলি আর বই দত্তপাড়ায় কাছারিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। নইলে তুমি নিয়ে যাবে কি করে ?

—ওতে দরকার নেই মানী, তোমার বাবা কি মনে করবেন ! আমার মোট বইবার জন্যে চাকরকে বলবার কি দরকার !

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বললে বাবা কিছু বলবেন না। আজই যাবে ?

—এখুনি বেরুব। অনাদিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই বেরিয়ে পড়ব।

—বাবা ঘুম থেকে উঠলেই আমি চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে দোব এখন, চা খেয়ে যেও।

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়। অনাদিবাবুর এখনও উঠিবার সময় হয় নাই, মানী আরও কিছুক্ষণ থাকুক না।

বিপিন কহিল, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি মানী, নইলে আর কার সঙ্গেই বা করব! বলাইকে নিয়ে বড় বিপদে প'ড়ে গিয়েছি, ওর অসুখ আবার বেড়েছে, এদিকে এই তো অবস্থা, বাড়ীতে থাকলে কুপথ্যি করে, কারও কথা শোনে না। কি করি বল্ তো, এমন দুর্ভাবনা হয়েছে ওর জন্যে! এই যে আসতে দেরি হয়ে গেল বাড়ী থেকে, সে ওরই অসুখ বাড়ল ব'লে। নইলে তোর কাছে যা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগেই আসতাম।

বলাইয়ের অসুখের ভাবনা বিপিনের মনে যেন পাথরের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছে সব সময়, মানীর কাছে সে বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়াও সুখ! মানীকে সে মনে মনে বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া শ্রদ্ধা করে, অন্তত সে মানীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মেয়ে কখনও দেখে নাই, সেইজন্য মানী কি পরামর্শ দেয় জানিবার নিমিত্ত বিপিন উৎসুক হইল।

মানী বলিল, ওকে তো সেবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে আবার নিয়ে এস না।

—হাসপাতালের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তারা ওকে হাসপাতালে রাখতে চায় না। বলে, ও রুগী হাসপাতালে রেখে উপকার হবে না।

মানী একটু ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে কি জান, আমার দেওরকে না হয় একখানা চিঠি লিখি। বীজপুরে রেলের হাসপাতাল আছে, সেখানে যদি কোন বন্দোবস্ত করা যায়, দেওর তো ওখানে ডাক্তার। কালই চিঠি লিখব।

এই সময় বাড়ীর মধ্যে অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দোতলার বারান্দায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানী বলিল, ওই বাবা উঠেছেন, আমি আসি, চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর বইগুলো পড়তে হবে আর আমাকে বলতে হবে সব কথা, যেন ভুলে যেও না।

বিপিন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ওরে আমার মাস্টারনী রে!

—বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা, ব'লে দিচ্ছি। আর ডাক্তারি বইখানার কথা যেন খুব ক'রে মনে থাকে। জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা ক'র বিপিনদা, কেন চিরকাল পরের দাসত্ব করবে?

মানীর কথায় বিপিনের হাসি পাইল। কি মুরুব্বিই হইয়া উঠিয়াছে মানী এই অল্প বয়সে! কথার খই ফুটিতেছে মুখে। বলিল, দাঁড়া মানী, একটা কথা, তুই ব্রেহ্মসমাজের মত বক্তৃতা দিবি নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখছি মানুষ হয়ে গেলি।

—আবার বাজে কথা! চুপ। কি কথা বলছিলে বলবে? এই বাজে কথা, না আর কোন কথা আছে?

—ইয়ে, তুই আর কতদিন আছিস এখানে?

—ঠিক নেই। যতদিন ওরা রাখে—ওদের মর্জি। কেন?

বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এবার এলে তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাই বলছিলাম।

—খুব দেখা হবে। কতদিনের মধ্যে আসছ ? বেশিদিন দেরি না-ই বা করলে ?

—খুব দেরি করা না-করা আমার হাত নয়। যদি আদায় হয় চট ক'রে এই হপ্তাতেই আসতে পারি, নয়তো পনরো বিশ দিন দেরিও হতে পারে।

মানী বলিল, আচ্ছা, যাই !

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়, কিন্তু অনাদিবাবু উঠিয়া হয়তো ওপরের বারান্দায় পায়চারি করিতেছেন, এ অবস্থায় তাহাকে আর ধরিয়া রাখাও উচিত নয়। সুতরাং সে বলিল, আচ্ছা, এস, তোমার বাবা আসছেন বাইরে।

কিন্তু মানী চলিয়া যাইবামাত্র বিপিনের মনে হইল মানীর শেষ কথাটি—'আচ্ছা, যাই !'

মানী যখন চোখের সামনে থাকে, তখন বিপিন মানীর সব কথা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। এখন বিপিন হঠাৎ দেখিল, মানী এ কথা তাহাকে আর কখনও বলে নাই, অর্থাৎ বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কি জানি কেন, মানীর এ কথা বিপিনের ভারী ভাল লাগিল।

একটু পরে শ্যামহরি চাকর চা আনিয়া দিল, আর আনিল ছোট একটা রেকাবিতে খানকতক পেঁপের টুকরা ও একটা সন্দেশ।

এ মানীর কাজ ছাড়া আর কারও নয়, বিপিন তাহা জানে। এ বাড়ীতে মানী যখন ছিল না, বাহিরের ঘরে এক আধ পেয়ালা চা যদি বা কালেভদ্রে আসিয়াছে, খাবার কখনও যে আসে নাই, এ কথা সে হলপ করিয়া বলিতে পারে।

৩

কাছারি-ঘরে একা বসিয়া সন্ধ্যার সময় বিপিনের আজকাল বড়ই খারাপ লাগে।

ধোপাখালিতে সে আসিয়াছে আজ প্রায় দেড় মাস পরে। এতদিন দেশে ছিল নিজের পরিবারের মধ্যে, নির্জ্জনে বসিয়া আকাশের তারা গুনিবার বিড়ম্বনা সেখানে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিশেষ করিয়া মানীর সঙ্গে দেখা হইবার পরে দিনকতক এই নির্জ্জনতা যেন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে। আবার কিছুদিন পরে সহিয়া যায়।

কাছারির উঠানের সেই বাদাম গাছটার ডালপালার মধ্যে কেমন একপ্রকার শব্দ হয়, বিপিন দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

মানী যে বলিয়াছিল, 'জীবনে উন্নতি ক'র বিপিনদা'—কথাটা বিপিনের বড় মনে লাগিয়াছে। তখন হাসি পাইলে কি হইবে, এখন সে বুঝিয়াছে, মানীর এই কথাটা তাহার মনে অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

জীবনে উন্নতি তাহাকে করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে কাছারির চাকরটা আলো জ্বালাইয়া রান্নার যোগাড় করিতে রান্নাঘরে ঢোকে। কিন্তু বিপিন এবেলা বড় একটা রান্নাবান্নার হাঙ্গামাতে যায় না। ওবেলার বাসি তরকারি থাকে, চাকরকে দিয়া খানকতক রুটি করাইয়া লয় মাত্র। খাইয়া আসিয়া মানীর দেওয়া বইগুলি পড়িতে বসে। এ সময়টা একরকম মন্দ কাটে না।

বইগুলি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, মানী সত্যই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি বইখানা প্রথম প্রথম সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমে এই বইখানাই তাহার গাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মানুষের শরীরের মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে, সে কোন দিন ভাবে নাই। দেহের নানা রকম যন্ত্রের ছবি বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া আছে, বিভিন্ন যন্ত্রের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের চেয়েও বিপিনের কাছে সে সব বেশি চমকপ্রদ মনে হইল।

তিন চার দিন বইখানা পড়িবার পরেই বিপিন ঠিক করিয়া ফেলিল, ডাক্তারি সে শিখিবেই। এতদিন পরে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবার জন্য।

দিন পনেরো লাগিল বইখানা শেষ করিতে।

শেষ করিয়া একটা কথা তাহার মনে হইল, কি অন্যায় সে করিয়াছে পৈতৃক অর্থের অপব্যয় করিয়া! আজ যদি হাতে টাকা থাকিত, সে চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় কোন ডাক্তারি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিত। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি ব্যবসায় শেখানো হয়, এমন স্কুল কলিকাতায় আছে—এই বইখানার মধ্যেই সে স্কুলের বিজ্ঞাপন আছে শেষের পাতায়।

তাহার মনে হইল মানী মেয়েমানুষ, কিছু তেমন জানে না, তাই সে বলিয়াছিল বীজপুরে তাহার দেওরের কাছে ছয় মাস থাকিলে বিপিন ডাক্তারি-শাস্ত্রে পটু হইয়া যাইবে। বেচারী মানী!

এ সে জিনিস নয়, বইখানা আগাগোড়া পড়িবার পরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারি শেখা ছয় মাস এক বছরের কর্ম্ম নয়। ভাল ডাক্তার হইতে হইলে কোনও ভাল স্কুলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে না পড়িলে কিছুই হইবে না। বহু ব্যাপার শিখিবার আছে, এ বিষয়ে মানীর দেওর কি শিখাইবে?

বিপিনের আরও মনে হইল, ডাক্তারি সে ভাল পারিবে। তাহার মন বলিতেছে, এই কাজে নামিয়া পড়িলে যশ অর্জ্জন করিবে সে। এই একখানা মাত্র বই পড়িয়া সে অনেক কিছু বুঝিয়াছে, বইতে যা বলে নাই, তাহার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছে।

মানীর সঙ্গে দেখা করিয়া এসব কথা তাহাকে বলিতে হইবে। মানীর সঙ্গেই পরামর্শ করিতে হইবে, ডাক্তারি শিখিবার আর কি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। তাহার ভাল মন্দ মানী যেমন বোঝে, সে নিজেও যেন তেমন বোঝে না।

বিপিন পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া রাণাঘাট হইতে কুইনাইন, লাইকার আর্সেনিক, লাইকার অ্যামোনিয়া, এসিড এন. এম. ডিল. প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আনাইল, যাহা সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রেসক্রিপশনে লাগে বলিয়া বইতে লিখিয়াছে। অ্যালক্যালি-মিক্শ্চারের উপকরণও ওই সঙ্গে কিছু আনাইল।

আনাইবার পরদিনই কামিনীর প্রতিবেশিনী হাবু ঘোষের দিদিমা আসিয়া বলিল, ও নায়েববাবু, কামিনীর বড় অসুখ হয়েছে আজ তিন চার দিন হ'ল, একবার আপনারে যেতে বলেছে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রথম রোগী দেখিতে ছুটিল। যদিও হাবুর দিদিমা ডাক্তার হিসাবে তাহাকে আহ্বান করে নাই, সে যে ডাক্তারি বই পড়িয়া ভিতরে ভিতরে ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছে, এ খবর কেহ রাখে না।

বিপিন এবার যখন কাছারিতে আসে, আজ দিন কুড়ি আগের কথা, কামিনী সেই দিনই গিয়া বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তারপর দুপুরের পরে প্রায়ই বুড়ী কাছারিতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অভ্যাসমত কয়দিন দুধ ও ফলমূলও নিজে লইয়া আসিয়াছে। আজ সাত আট দিন হইল কামিনী কাছারিতে আসে নাই, বিপিনের এখন মনে পড়িল। সে নিজেকে লইয়া এমন মশগুল যে, বুড়ী কেন আজকাল কাছারিতে আসিতেছে না—এ প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই।

গোয়ালাপাড়ার মধ্যেই কামিনীর বাড়ী।

দুইখানা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল। খুব পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোঁছা। এক দিকে গোহাল, আগে অনেকগুলি গরু ছিল। বিপিন ছেলেবেলায় কামিনীর বাড়ীতে আসিয়াছে, কামিনী কাছারি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিত এবং ওই বড় ঘরের দাওয়ায় বসাইয়া কত গল্প করিত, খাবার খাইতে দিত, সে কথা বিপিনের আজও মনে আছে। তবে সে কামিনীর বাড়ীতে আসে নাই আর কখনও সেই বাল্যদিনগুলির পরে, আসিবার আবশ্যকও হয় নাই।

কামিনী ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর শুইয়া আছে।

বিছানাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিল, কামিনীর সচ্ছল দিন আর নাই। এক সময়ে এই ঘরের মধ্যে এক হাত পুরু গদির উপরে তোশক ও ধপধপে চাদর পাতা চওড়া বিছানা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। ঘরে নানা রকম ছবি টাঙানো থাকিত, এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিয়া দুইচারখানা ছবি ঝুল কালি মাখানো অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলিতেছে—কালী, দশমহাবিদ্যা, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রঙিন ছবি, গোষ্ঠবিহার।

কামিনী ময়লা কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এস বাবা,

এস, ওই পিঁড়িখানা পেতে দে তো ভাই।

হাবুর দিদিমা পিঁড়ি পাতিয়া দিল। সে-ই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বিপিনকে।

বিপিন বলিল, দেখি হাতখানা, জ্বর হয়েছে, তা আমায় আগে জানাও নি কেন? আজ গিয়ে হাবুর দিদিমা বললে, তাই জানতে পারলাম।

—তুমি ব'স ব'স, ভাল হয়ে ব'স। আমার কথা বাদ দাও, অসুখ লেগেই আছে। বয়েস হয়েছে, এখন এই রকম ক'রে যে কদিন যায়।

বিপিন হাত দেখিয়া বুঝিল, জ্বর খুব বেশি। মনে মনে ভাবিল, কি ভুলই হয়েছে! একটা থার্মোমিটার না পেলে কি জ্বর দেখা যায়? একদিন রাণাঘাট গিয়ে একটা থার্মোমিটার আনতেই হবে, নইলে রোগী দেখা চলবে না।

বিপিন হাবুর দিদিমাকে বলিল, একটা শিশি নিয়ে চল, ওষুধ দিচ্ছি।

কামিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, তুমি ওষুধ দেবে কোথা থেকে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, বা রে, তুমি বুঝি জান না, আমি ডাক্তারি করি যে আজকাল।

কামিনী কথাটা বিশ্বাস করিল না। বলিল, আহা, কেবল পাগলামি আর খেয়াল!

হাবুর দিদিমা শিশি ধুইতে বাহিরে গিয়াছিল, এই সুযোগে কামিনী বলিল, স'রে এসে ব'স কাছে।

বিপিন মলিন কাঁথা-পাতা বিছানার একপাশে বসিল।

কামিনী সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিরকালটা একরকম গেল। কামিনী আড়ালে আবডালে যে তাহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করে, ইহা বিপিনের অনেকদিন হইতেই জানা আছে। সেও হাসিয়া বলিল, না, সত্যি বলছি, আমি ডাক্তারি শিখছি। শুনবে তবে, কে আমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে? আমাদের জমিদারের মেয়ে।

কামিনী অবাক হইয়া বলিল, আমাদের বাবুর মেয়ে! সে আর কতটুকু, আমি তাকে দেখি নি যেন! কর্ত্তা থাকতে একবার দোলের সময় জমিদারবাবুদের বাড়ী গিয়েছিলাম, তখন সে খুকীকে দেখেছি, কর্ত্তামশায় তাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, আমাদের বাবুর মেয়ে। ওই এক মেয়েই তো! কর্ত্তা বলতেন—। আচ্ছা, কর্ত্তা ইদানীং একটু চোখে কম দেখতেন, না?

বিপিন দেখিল, বুড়ী তাহার বাবার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, হঠাৎ থামিবে না, এখন বাবার সম্বন্ধে বুড়ীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার মত মনের অবস্থা তাহার নাই। সে হাসিয়া বলিল, তুমি সে কতকাল আগে দেখেছিলে, তোমার খেয়াল আছে? সে মেয়ে কি চিরকাল তেমনই খুকী থাকবে? এখন তার বয়েস কুড়ি বাইশ। অনাদিবাবুদের বাড়ী দোল হ'ত আজকের কথা নয়, আমার ছেলেবেলার কথা।

—বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায়?

—কলকাতায় এক উকিলের সঙ্গে।

—তা সে মেয়ে তোমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে কেমন কথা? সে ডাক্তারি জানলে কোথা থেকে?

বিপিনের ইচ্ছা, মানীর সম্বন্ধে কথা বলে। অনেকদিন মানীর বিষয়ে সে কথা বলে নাই, তাহাকে দেখেও নাই, তাহার মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত মানীর বিষয় লইয়া কিছু বলিয়াও সুখ। কিন্তু ধোপাখালির প্রজাদের নিকট তো আর জমিদারবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করা চলে না!

কামিনীর কথার উত্তরে বিপিন যাহা বলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধার প্রশ্নের সঠিক উত্তর নয়, মানীর রূপগুণের একটি দীর্ঘ বর্ণনা।

কামিনী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বিপিনের কথা শেষ হইয়া গেলে বলিল, বেশ মেয়ে। তোমার সামনে বেরোয়?

—কেন বেরুবে না? ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, আমার সামনে বেরুবে না?

—একটা কথা বলি, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমারও ঘরে সোনার পিরতিমের মত বউ। আমার একটা কথা শোন বাবা। তুমি তার সঙ্গে আর দেখাশুনো ক'র না। তুমি কালকের ছেলে; কি জান আর কিই বা বোঝ! তোমার মাথায় এখনও অনেক রকম পাগলামি ঢুকে আছে। তোমায় জানতে আমার বাকি নেই বাবা, কর্তামশায়ের তো ছেলে! তুমি ও-মেয়ের ত্রিসীমানায় ঘেঁষো না, নিজে কষ্ট পাবে, তাকেও কষ্ট দেবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

দুপুরের পরে বিপিন কাছারিতে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছে, নিবারণ গোয়ালার ছেলে পাঁচু আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, কামিনী পিসী একবার আপনাকে ডেকেছে।

বিপিন গিয়া দেখিল, কামিনীর অসুখ বাড়িয়াছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশি, জ্বরের ধমকে বৃদ্ধা যেন হাঁপাইতেছে, বেশি কথা বলিবার শক্তি নাই।

বিপিন বলিল, কি খেয়েছ?

কামিনী ক্ষীণস্বরে বলিল, নিবারণের বউ একটু জলসাবু ক'রে দিয়ে গেল, দুপুরের আগে তাই একচুমুক—মুখে ভাল লাগে না কিছু।

—আচ্ছা, আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তুমি আমায় আজ দেখতে আস নি কেন?

কথাটা কেমন যেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল; বেশ একটু অভিমানের সুরও বটে।

বিপিন মনে মনে অনুতপ্ত হইল। দেখিতে আসা খুব উচিত ছিল; সকালে কাছারিতে

জনকতক প্রজার সঙ্গে গোলমাল মিটাইতে দেরি হইয়া গেল, নতুবা ঠিক আসিত। কামিনীর কেহ নাই, বৃদ্ধা হয়তো আশা করে, বিপিন তাহার অসময়ে পুত্রবৎ দেখাশোনা করিবে ; যদিও বিপিন কামিনীর মনের এত কথা বুঝিতে পারে না, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরের দিকে চাহিবার অবসর তাহার কোথায় ?

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বিপিন বলিল, এখন যাই, প্রজাপত্তর আসবে, আর আমায় একবার গদাধরপুর যেতে হবে একটা জমির মীমাংসা করতে। সন্ধ্যের পর আবার আসব।

কামিনী উঠতে দেয় না, হাত বাড়াইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, যেও না, যেও না, ও বাবা বিপিন, যেও না, ব'স, ব'স।

বিপিনের কষ্ট হইল বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতে। কিন্তু সত্যই তাহার থাকিবার উপায় নাই। গদাধরপুরে কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে, তাহারা স্থানীয় বাঁওড়ের দখল লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার ফলে কাছারির খাজনা আদায় হইতেছে না। বিপিন নিজে গিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিলে তাহারা মানিয়া লইবে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং যাইতেই হইবে তাহাকে। অনাদিবাবুর কানে যদি কথা যায়, তবে এতদিন সে যায় নাই কেন, এজন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়া পাঠাইবেন।

আড়ালে পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল, পাঁচু, তোমার মাকে বল এখানে একটু থাকতে। আমি আবার আসব এখন, একবার কাজে যাব গদাধরপুরে। আর একবার একটু সাবু ক'রে খাইয়ে দিতে ব'ল তোমার মাকে। খরচপত্তর যা হবে, সব আমার। আমি সব দোব। আচ্ছা, একটা লোক দিতে পার, রাণাঘাট থেকে কমলালেবু আর বেদানা কিনে আনবে ?

বিপিন কাছারির নায়েব বটে, কিন্তু সে ভালমানুষ নায়েব। লোকে সেজন্য তাহাকে তত ভয় করে না। বিপিনের বাবার আমলে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, মুখের কথা খসাইয়া হুকুম করিলেই চলিত।

পাঁচু বলিল, আচ্ছা বাবু, আমি দেখছি যদি হাবুল যায়, ব'লে দেখছি।

—এই আট আনা পয়সা রাখ। হাবুলকে পাও বা যাকে পাও, দিয়ে ব'ল ভাল বেদানা আর কমলালেবু আনতে ; আর যে যাবে তার জলখাবার আর মজুরি এই নাও চার আনা।

বিপিন কাছারি আসিয়া গদাধরপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, এমন সময় পাঁচু আসিয়া বলিল, কেউ গেল না নায়েববাবু, আমি নিজেই চললাম রাণাঘাট। ফিরতে কিন্তু আমার রাত হবে, তা ব'লে যাচ্ছি।

বিপিন বুঝিল, মজুরি ও জলখাবারের দরুন চারি আনা পয়সার লোভ সম্বরণ করা পাঁচুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে ; তারপর বাকি আট আনার ভিতর হইতে অন্তত চার ছয় পয়সা উপরিই বা কোন্ না হইবে ?

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

গদাধরপুর এখান হইতে তিন চার মাইল পথ। বিপিন জোরে হাঁটিতে লাগিল। বজরাপুর পর্যান্ত সে ও পাঁচু একসঙ্গে গেল। তারপর রাণাঘাটের রাস্তা বাঁকিয়া পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া

গিয়াছে। পাঁচু সেই রাস্তায় চলিয়া গেল। গদাধরপুর যাইবার কোনও বাঁধা-ধরা পথ নাই। মাঠের উপর দিয়া সরু পায়ে-চলার পথ, কখনও বা ফুরাইয়া যায়, কিছু দূরে গিয়া অন্য একটা পথ মেলে। মাঠে লোকজনও নাই যে, পথ জিজ্ঞাসা করা যায়। নানা সরু সরু পথ নানাদিকে গিয়াছে, কোন্ পথ যে ধরিতে হইবে জানা নাই। বিপিন এক প্রকার আন্দাজে চলিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। রোদের তেজ কমিয়া গেল।

মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে। সোঁদা, রোদপোড়া মাটি ও শুকনো কাশঝোপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ফাঁকা মাঠ, গাছপালাও বেশি নাই, কোথাও হয়তো বা একটা নিমগাছ, মাঝে মাঝে খেজুরগাছ।

অবশেষে দূর হইতে জলাশয় দেখিয়া বিপিন বুঝিল, এই গদাধরপুরের বাঁওড়, সুতরাং সে ঠিক পথেই আসিয়াছে।

গদাধরপুরের প্রজারা বিপিনকে খাতির করিয়া বসাইল। গ্রামের মধ্যে একটা কলু-বাড়ীর বড় দাওয়ায় নূতন মাদুর পাতিয়া দিল বিপিনের জন্য। এ গ্রাম অনাদিবাবুর খাস তালুকের অন্তর্গত, গোটা গ্রামখানার সব লোকই কাছারির প্রজা।

বাঁওড়ের দখলের মীমাংসা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

দুই তিনজন প্রজা বলিল, নায়েববাবু, বলতে আমাদের বাধ-বাধ ঠেকে, কিন্তু আপনার একটু জল মুখে দিলে হ'ত।

বিপিন বলিল, না, সে থাক। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমাকে আবার সব কাজ সেরে ফিরতে হবে এতখানি রাস্তা।

প্রজারা ছাড়িল না, শেষ পর্য্যন্ত বিপিনকে একটা ডাব খাইতে হইল।

একটি চাষাদের বউ কি মেয়ে এক কাঠা ধান হাতে কলুবাড়ীর উঠানে আসিয়া বলিল, হ্যাদে, ইদিকি এস। তেল দ্যাও আধপোয়া আর এক ছটাক নুন, আধপয়সার ঝাল—

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ধান দিয়ে জিনিস কেনো?

মেয়েটি বলিল, হ্যাঁ বাবু, কনে পয়সা পাব? শীতকাল গেল, একখানা বস্তর নেই যে গায়ে দিই। যে ক'বিশ ধান পেয়েলাম, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে খাবার ধান চাট্টি ঘরে ছেল। তাই দিয়ে তেল নুন হবে সারা বছরের, আর খাওয়াও হবে।

—এতে কুলোবে সারা বছর?

—তা কি কুলোয় বাবু? আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকি আবার মহাজনের গোলায় ধামা হাতে যাতি হবে। ধান কর্জ্জ না করলি আর চলবে না তারপর।

কলু-বাড়ীতে একটা ছোট মুদীর দোকানও আছে। আরও কয়েকটি লোক জিনিসপত্র কিনিতে আসিল। মেয়েটি তেল নুন কিনিয়া যাইবার সময় বলিল, মুসুরি নেবা?

হরি কলু বলিল, নতুন মুসুরি? কাল নিয়ে এস।

—মুসুরির বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

বিপিন বলিল, তোমার ঘরে ধান আছে তো চাল নিয়ে কি করবে ?

মেয়েটি উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহার ভাই জন খাটিয়া খায়, কিন্তু তাহার হাঁপানির অসুখ, দশ দিন খাটে তো পনরো দিন পড়িয়া থাকে। সংসারের বড় কষ্ট, সাত জন লোক এক এক বেলায় খায়, দু বেলায় চোদ্দ জন। যে কয়টি ধান আছে, তাহাতে কয় মাস যাইবে ? সামান্য কিছু মুসুরি ছিল, তাহার বদলে চাল না লইলে চলে কি করিয়া ?

এই সব প্রজা। ইহাদের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তাহাকে চাকুরি বজায় রাখিতে হইবে। অনাদিবাবুর চাকরি লইয়া সে মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। এ সব জিনিস তাহার ধাতে নাই। বাবা কি করিয়া কাজ চালাইতেন সে জানে না, কিন্তু তাহার পক্ষে অসম্ভব।

মানী ঠিক পরামর্শ দিয়াছে।

ডাক্তারি শিখিতেই হইবে তাহাকে। ডাক্তারি শিখিলে এই সব গরীব লোকের অনেকখানি উপকার করিতেও তো পারিবে।

এখানকার আর একজন প্রজার কাছে অনেকগুলি টাকা খাজনা বাকি। বিপিন সন্ধ্যার পরে তাহার বাড়ী তাগাদা দিতে গেল। গিয়া দেখিল, খড়ের ঘরের দাওয়ায় লোকটা শয্যাগত, মলিন লেপ কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিন-চারটি পাড়ার লোক নায়েববাবুর আগমন-সংবাদ শুনিয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর বিছানার পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, বিপিনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটির নাম বিশু ঘোষ, জাতিতে কৈবর্ত্ত। বিপিনকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু বিপিন দাওয়ায় উঠিয়া বসিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কে ? ছিরাম ? তামাক দে, ছিরাম খুড়োকে তামাক দে।

বিপিন তো অবাক ! পরে রোগীর চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখ দুইটা জবাফুলের মত লাল। ঘোর বিকার। রোগী মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। বিপিন বলিল, ওর মাথায় জল দাও ! দেখছে কে ?

একজন উত্তর দিল, ফকির সায়েব দেখছেন।

—কোথাকার ফকির সায়েব ? ডাক্তার ?

—আজ্ঞে না, তিনি ঝাড়ফুঁক করেন খুব ভাল। তিনি বলেছেন, উপরিভাব হয়েছে।

বিপিন বুঝিতে না পারিয়া বলিল, উপরিভাব কি ব্যাপার ?

দুই তিন জনে বুঝাইয়া দিবার উৎসাহে একসঙ্গে বলিল, আজ্ঞে, এই দৃষ্টি হয়েছে আর কি, অপদেবতার দৃষ্টি হয়েছে।

—ভূতে পেয়েছে ?

—ভূতে পাওয়া না ঠিক। দিষ্টি হয়েছে আর কি।

বিপিনের যতটুকু ডাক্তারি-বিদ্যা এই কয়দিন বই পড়িয়া হইয়াছে, তাহারই বলে সে

বলিল, ওর ঘোর জ্বর বিকার হয়েছে। লোক চিনতে পারছে না, চোখ লাল, মাথায় জল ঢাল। উপরিস্তাব-টাব বাজে, ওকে ডাক্তার দেখাও, নইলে বাঁচবে না। ফকিরের কর্ম নয় এ সব।

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ দিগরে বরাবর থেকে ফকির সাহেব ঝাড়ান-কাড়ান, তেলপড়া দিয়েই রোগ সারান বাবু। ডাক্তার কোথায় এখানে? ডাক্তার আছে সেই রামনগরের হাটে, নয়তো সেই চাকদার বাজারে। আর এক আছে রাণাঘাটে। ছ কোশ রাস্তা। এক মুঠো টাকা খরচ ক'রে কি গরীবগুরবো লোকে ডাক্তার আনতি পারে?

২

গদাধরপুর হইতে বিপিন যখন বাহির হইয়া ফাঁকা মাঠে পড়িল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, একটু পরেই চাঁদ উঠিবে। চাঁদ ওঠার জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল।

মাঠে জনপ্রাণী নাই। অপূর্ব্ব তারাভরা রাত্রি। আকাশের দিকে বিপিনের নজর পড়িত না, যদি চাঁদ কখন ওঠে, ইহা দেখিবার প্রয়োজন তাহার না হইত। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়া নক্ষত্রভরা অন্ধকার আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জীবনে এই বোধ হয় প্রথম বিপিনের বড় ভাল লাগিল।

কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন একটা রহস্যময় ভাব রাত্রির এই নিস্তব্ধতায়! এত ভাল লাগিবার প্রধান কারণ, এই সময় মানীর কথা তাহার মনে পড়িল।

আজ যে এই সব দরিদ্র রোগপীড়িত মানুষদের সে চোখের উপর অজ্ঞতার ফলে মরণের পথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিল, মানীই তাহাকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, সৎপরামর্শ দিবার মানুষ নাই, কঠিন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, সম্পূর্ণ অসহায়। জলপড়া, তেলপড়ার চিকিৎসা চলিতেছে। ওদিকে কামিনী-মাসীর ওই অবস্থা, তাহার ভাইয়ের ওই অবস্থা।

মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে।

গরীব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীর বাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো নাইই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।

মানী তাহাকে জীবনে আলো দেখাইয়াছে।

একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে।

মানীর সঙ্গে ভালবাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্ততঃ বিপিনের মনের দিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই। বিপিনের স্বভাবই তা নয়, সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনও ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহার নিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না ?

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরণের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্ব্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিসের কারবার ছিল না সেখানে। হয়তো মন জিনিসটাই ছিল না সে ধরণের মেয়েদের।

কিন্তু মনোরমা ? বিপিন জানে না। মনোরমার মন সম্বন্ধে বিপিনের কখনও কৌতূহল জাগে নাই। তেমন ভাবে মনোরমা কখনও বিপিনের সঙ্গে মিশে নাই। হয়তো সেটা বিপিনের দোষ, মনোরমার মনকে বিপিন সে ভাবে চাহিয়াছে কবে ? যে সোনার কাঠির স্পর্শে মনোরমার মনের ঘুম ভাঙিত, বিপিনের কাছে সে সোনার কাঠি ছিল না।

বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।

দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে। বিপিন একটা খেজুরগাছের তলায় ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। ভারী ভাল লাগিতেছিল, কি যে হইয়াছে তাহার, কেন আজ এত ভাল লাগিতেছে—এই আধ-অন্ধকার মাঠ, পূব-আকাশে উদীয়মান চন্দ্র, মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় সাদা আকন্দফুল, হুহু হাওয়া—কখনও তেমন ভাবে বিপিন এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, আজ যেন কি হইয়াছে তাহার।

বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে হইবে, তাহাদের গ্রামের দোকানে সে সন্ধ্যার পর গোপনে তাড়ি পর্য্যন্ত খাইয়া দেখিয়াছে—কি রকম মজা হয়! এই বছর পাঁচ আগেও। বাবা তখন অল্পদিন মারা গিয়াছেন। হাতে কাঁচা পয়সা, বিপিন তখন খুব উড়িতেছে। অবশ্য কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়াই খাইয়াছিল। খানিকটা বাহাদুরিও বটে। ভোলা মুতাবের ছেলে হাবুলের সহিত বাজি ফেলা হইয়াছিল।

এ সব কথা বিপিনের আজ এমন করিয়া কেন মনে হইতেছে ?

সে মানীর বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়। নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বিপিনের তাহাই মনে হইল। নিজেকে সে কলঙ্কিত করিয়াছে নানা ভাবে। মানী নিষ্পাপ নির্ম্মল।

বিপিন উঠিয়া পথ চলিতে লাগিল। বোধ হয় সে অপেক্ষা করিতেছিল চাঁদ ভাল করিয়া উঠিবার জন্য।

একটা নীচু খেজুরগাছে এক ভাঁড় খেজুর রস দেখিয়া সে ভাঁড় পাড়িয়া রস খাইল, সন্ধ্যার টাটকা রস সাধারণত মেলে না। ভাঁড়টা আবার গাছে টাঙাইয়া রাখিবার সময় সে ভাঁড়টার মধ্যে দুইটি পয়সা রাখিয়া দিল। পল্লীগ্রামে এত ধার্ম্মিক কেহ হয় না, কিন্তু আজ বিপিনের

মনে হইল, চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়া দাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা চাকরটা তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

বিপিন বলিল, এই ওঠ, উনুন ধরাগে যা। দুধ দিয়ে গিয়েছে এবেলা?

চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবা। কত রাত ক'রে আলেন নায়েববাবু? আমি বলি রাত্তিরি বুঝি থাকবেন সেখানে।

—কামিনী-মাসী কেমন আছে রে? রাণাঘাট থেকে লেব নিয়ে ফিরেছে কিনা জানিস?

—জানি নে বাবু।

৩

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া কামিনীকে দেখিতে গেল।

বেশ জ্যোৎস্নাভরা রাত। কিন্তু গাঁয়ের লোক প্রায় সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গোয়ালা-পাড়ার মধ্যে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ নাই।

কামিনীর ঘরের দোর ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা পিলসুজের উপরে মাটির পিদিম টিম টিম জ্বলিতেছে, বোধ হয় পাঁচুর মা জ্বালিয়া রাখিয়া দিয়া গিয়াছে। রোগী কাঁথামুড়ি দিয়া একলাটি শুইয়া বোধ হয় ঘুমাইতেছে।

বিপিন ডাকিল, ও মাসী, কেমন আছ, ও মাসী?

সাড়াশব্দ নাই।

বিপিন বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। নাড়ী দেখিয়া মনে হইল, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ। খুব ঘাম হইতেছে, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ঘামে। বৃদ্ধা ঘুমাইতেছে, না ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছে, বোঝাও কঠিন।

যাই হোক, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে কামিনী চোখ মেলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। কি যেন বলিল, বোঝা গেল না, ঠোঁট যেন নড়িল।

বিপিন বলিল, কি মাসী, কেমন আছ? বলছ কিছু?

কামিনীর জ্ঞান নাই। সে দৃষ্টিহীন নেত্রে বিপিনের দিকে চাহিল, ঘরের বাঁশের আড়ার দিকে চাহিল, আলনায় বাঁধা পুরানো লেপকাঁথার দিকে চাহিল। বৃদ্ধার এই ঘরে ৺বিনোদ চাটুজ্জে নিয়মিত আসিতেন, কামিনী তখন দেখিতে বেশ ফর্সা ও দোহারা চেহারার স্ত্রীলোক ছিল, কালাপেড়ে কাপড় পরিত, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখিত, হাতে সোনার বালা ও অনন্ত পরিত, কালো চুলে খোঁপা বাঁধিত, এ কথা বিপিনের অল্প অল্প মনে আছে। বাইশ

তেইশ বছর আগের কথা। এই যে বৃদ্ধা বিছানার সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং হাজিয়া আধকালো, দাঁত পড়িয়া গালে টোল খাইয়া গিয়াছে, বিশেষত জ্বরে ভুগিয়া বর্তমানে তাড়কা রাক্ষসীর মত চেহারা হইয়া উঠিয়াছে যাহার, এই যে সেই একদিনের হাস্যলাস্যময়ী সুন্দরী কামিনী, যাহার চটুল চাহনিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে কথা?

প্রথম যৌবনে তুইজনের দেখাশোনা হয়। কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা-চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, গলার স্বর গম্ভীর ও ভারী—পুরুষের মত শক্ত-সমর্থ চেহারা। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের কথা, তখন নায়েববাবুই ছিলেন এ অঞ্চলের দারোগা, নায়েববাবুই ম্যাজিস্ট্রেট।

কামিনী বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিবে, এ বিচিত্র কথা কি?

সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়া কামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে তাহার জীবন শূন্য হইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র কথা নয়।

হয়তো এইমাত্র জ্বরঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য কামিনীর মন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহার প্রথম যৌবনের সেই পাখী-ডাকা, ফুল-ফোটা, আলো-মাখা মাধবী রাত্রির প্রহরগুলি অনুসন্ধান করিয়া, আবার মনে মনে সেখানে বাস করিয়া, হারানো রাত্রির শিশিরসিক্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধন করিয়া।

হয়তো মনে পড়িতেছিল প্রথম দিনের সেই ছবিটি।

ষোড়শী বালিকা তাহাদের বাড়ীর সামনের বেগুন ক্ষেত হইতে ছোট্ট চুপড়ি করিয়া বেগুন তুলিয়া ফিরিতেছিল।

পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সবাই বলাবলি করিত, নায়েববাবুর কাছে গেলে সব জব্দ হয়ে যাবে এখন! নায়েব এসেছে যা জবর! কোন ট্যাঁ-ফোঁ খাটবে না সেখানে। নায়েবের মত নায়েব।

সে কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল। বেশ মনে আছে, বেগুনের ক্ষেতের কঞ্চি-বাঁধা আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া।

লম্বা, সুপুরুষ, টকটকে ফর্সা, মাথায় ঢেউ-খেলানো কালো চুল—তবে বয়স খুব কম নয়। ত্রিশ-বত্রিশ হইবে, কিংবা তারও কিছু বেশি।

নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডান হাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত?

সে লজ্জায় সঙ্কোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোন রকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত।

—তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে ?

—হ্যাঁ।

—বেগুন কি বিক্রি কর তোমরা ?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায় ?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে। বাড়ী আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা গিয়াছিল) বলিল, আইমা ওই বুঝি কাছারির নতুন নায়েব ? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুন বিক্রির ? কি জাত, আইমা ?

তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জান না পোড়ারমুখ মেয়ে! চাইলেন কিনতে, বেগুন কটা দিয়ে দিলেই হ'ত। আমার তো মনে থাকে না, তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

এক চুপড়ি ভাল কচি বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিন বিকেলবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু হায়! সে প্রেমমুগ্ধা তরুণী পল্লীবালিকা আর নাই, সে সুপুরুষ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েববাবুও আর নাই।

অনেক কালের কথা এ সব। সেকালের কথা।

*   *   *   *

বিপিন পড়িল মহা মুশকিলে।

কামিনী যখন মারা গেল, তখন রাত দেড়টার কম নয়। মৃতদেহ ফেলিয়াই বা কোথায় সে যায় এখন ? বাধ্য হইয়া ভোর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। মুক্তার মৃতদেহ এ ভাবে ফেলিয়া সে যাইতে পারিবে না, মনে মনে সে মায়ের মতই ভালবাসিত কামিনীকে। ভোর হইল। কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিতেই বিপিন গিয়া হাঁকডাক করিয়া লোকজন উঠাইল। পাঁচু কাল অনেক রাত্রে রাণাঘাট হইতে কমলালেবু লইয়া ফিরিয়াছিল, সকালে দিতে আসিতেছিল, পথে দেখা। তাহাকে পাঠাইয়া ওপাড়া হইতে গোয়ালার পুরোহিত বামনদাস চক্কত্তিকে আনাইল। এ সব পাড়াগাঁয়ে 'প্রাচিত্তির' না করাইলে মড়া কেহ ছুঁইবে না, বিপিন জানে। কামিনীর আপনার বলিতে কেহ ছিল না, দূর সম্পর্কের এক বোনপো আছে রাণাঘাটে, তাহাকে খবর দিবার জন্ম লোক পাঠাইল। তাহাকে দিয়াই শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। সব কাজ শেষ করাইয়া দাহ করিতে বেলা একটা বাজিল।

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, পলাশপুর হইতে জমিদারবাবুর পত্র লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। নানা রকমের কাজের তাগাদা চিঠির মধ্যে, বিশেষ করিয়া টাকার তাগাদা—ত্রিশটি টাকা এই লোকের হাতে যেন আজই পাঠানো হয়।

লোকটাকে বিপিন বলিল, আজ কাছারিতে থাক। এখন টাকা অবেলায় কোথায় পাব? কাল যাবে। দেখি, নরহরি দাসকে ব'লে।

লোকটা আর একখানি ক্ষুদ্র খামের চিঠি বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, মনে ছেল না নায়েববাবু, দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলেছেলেন। আমি যখন আসি, খিড়কি-দোরের পথে এসে দিয়ে গেলেন।

মানীর চিঠি! কখনও তো সে বিপিনকে চিঠি দেয় নাই! কি লিখিয়াছে মানী? বিপিন নিজেকে সামলাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব উদাসীন মুখে বলিল, ও, বোধ হয় বড় মাছ চাই! বাবাকে লুকিয়ে মাঝে মাঝে মাছ চেয়ে পাঠায় বটে। আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর।

বাদামতলায় দাঁড়াইয়া মানীর চিঠি খুলিয়া পড়িল। ছোট্ট চিঠি। লেখা আছে—

"বিপিনদা,

প্রণাম নেবে। অনেকদিন গিয়েছ, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে। নায়েবি কাজের যেন গলদ না হয়, তাগাদাপত্র ঠিকমত হচ্ছে তো? নইলে কৈফিয়ৎ তলব করব, মনে থাকে যেন। আমিও জমিদারের মেয়ে।

আর একটি বিশেষ কথা। আমি এই মাসেই চ'লে যাব, আমার ছোট দেওরের বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়েছে। যাবার আগে তুমি অবিশ্যি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে। একবার এসেই না হয় চ'লে যেও, কিন্তু আসাই চাই। আবার কবে আসব, তার ঠিকানা নেই। চিঠির কথা কাউকে ব'ল না। ইতি—

মানী"

৪

পরদিন অনাদিবাবুর লোক বিপিনের একখানা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বিপিন লিখিল, টাকা আদায় হইলেই কাল কিংবা পরশু নাগাত সে নিজে লইয়া যাইতেছে। মানীর সঙ্গে দেখা করিবার এই উত্তম সুযোগ।

সন্ধ্যা হইল। বাদামগাছের পাতায় হাওয়া লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হইতেছে। অন্ধকার রাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিবার দেরি আছে।

কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছে, পুরাতন দিনের সঙ্গে ঐ একটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল চিরকালের জন্য।

আজ তাহার মনে হইল, এই প্রবাসে বৃদ্ধা তাহার সুখদুঃখ যত বুঝিত, এত আর কে বুঝিত? তাহার খাওয়ায় কষ্ট, শোওয়ায় কষ্ট হইলে কামিনীর মনে তাহা বাজিত, সাধ্যমত চেষ্টা করিত সে কষ্ট দূর করিতে। টাকার দরকার হইলে বিপিন যদি হাত পাতিত, কামিনী তাহাকে বিমুখ করিত না কখনও। গতবার যে পঞ্চাশটি টাকা সে ধার দিয়াছিল বিপিন একবার দুইবার চাওয়ামাত্র, সে দেনা বিপিন শোধ করে নাই। পুত্রহীনা বৃদ্ধা তাহাকে সন্তানের মতই স্নেহ করিত।

তাহার বাবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা আর কোনও কথা বলিতে ভালবাসিত না। কতবার এ ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করিয়াছে। তরুণ মনের স্পর্দ্ধিত ঔদাসীন্যে হয়তো বিপিন এই ব্যাপারে কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিয়াছে বরাবর, আজ তাহার মনে হইতেছে, বৃদ্ধা কি ভালই বাসিত তাহার স্বর্গগত পিতা বিনোদ চাটুজ্জেকে! আগে যাহা সে বুঝিত না, আজকাল তাহা সে ভাল করিয়াই বোঝে। মানী তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে নানা দিকে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মানীকে সে কখনও এ ভাবে দেখে নাই। এই কয় মাসে যে মানীকে সে দেখিতেছে, সে কোন্ মানী? ছেলেবেলার সাথী সেই মানী কিন্তু এ নয়। বালক-বালিকা হিসাবে সে খেলা তো বিপিন অনেক মেয়ের সঙ্গেই করিয়াছে; অন্ত পাঁচটা ছেলে-বেলার সঙ্গিনী মেয়ের সহিত যেমন ভাব হয়, মানীর সহিত তাহার বেশি কিছু হয় নাই, এ কথা বিপিন বেশ জানে।

মধ্যে সে হইয়া গিয়াছিল জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে সুলতা।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া কোন মেয়ে-স্কুলে মানী পড়িত। খুব সম্ভব ম্যাট্রিক পাসও করিয়াছিল—সে কথা বিপিন ঠিকমত জানে না; বাবা মারা গিয়াছেন তখন, বিপিন আর পলাশপুরে জমিদারবাটিতে আসে নাই।

তবে সুলতার কথা মাঝে মাঝে বিপিনের মনে পড়িত—বাল্যপ্রীতির দিক দিয়া নয়, সুলতা সুন্দরী মেয়ে এইজন্য। না জানি সে এতদিনে কেমন সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। সেই সুন্দরী সুলতা আবার 'মানী' হইয়া দেখা দিল তো সেদিন!

টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই পলাশপুর জমিদারের বাড়ী যাওয়া যায়। কিন্তু এখনও এমন টাকা যোগাড় হয় নাই, যাহা হাতে করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। এদিকে বেশি দেরী হইলে যদি মানী চলিয়া যায়!

কামিনী মাসী থাকিলে এসব সময়ে সাহায্য করিত।

উপায় অন্য কিছু না দেখিয়া নরহরি মুচিকে সন্ধ্যার পর ডাকিয়া পাঠাইল। নরহরি আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, নায়েব মশাই, কি জন্যি ডেকেচ? দণ্ডবৎ হই।

—এস নরহরি, ব'স। গোটা কুড়ি টাকা কাল যেখান থেকে পার দিতে হবেই। জমিদারবাবু চেয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।

নরহরি চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, বিষম হ্যাঙ্গনামায় ফ্যাললেন যে! কুড়ি টাকা এখন কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি। কাল বেনবেলা এস্তক যদি যোগাড়যন্তর করতে পারি,

তবে সে কথা বলব। হ্যাঁ, একটা কথা বলি নায়েব মশাই—

—কি ?

—কামিনী পিসীর কিছু টাকা ছেল। সিন্দুক-প্যাটরা খুলে দেখেছেলেন ? ওর বেশ টাকা ছেল হাতে, আমরা যদ্দুর জানি। আপনি তো সে রাত্তিরি ওর কাছে ছেলেন, আপনাকে কিছু ব'লে যায় নি ?

বিপিনের এ কথা বাস্তবিকই মনে হয় না। কামিনীর টাকা ছিল, সে শুনিয়াছে বটে ; কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময়ে বা তাহার পরে এ কথা বিপিনের মনে উদয় হয় নাই যে, তাহার টাকাগুলি কোথায় রহিল বা সে টাকার কি ব্যবস্থা কামিনী করিতে চায়।

আর যদি থাকেই টাকা, তাহাতেই বা বিপিনের কি ? কামিনী বিপিনের নামে উইল করিয়া দিয়া যায় নাই, সুতরাং অত গরজ নাই বিপিনের কামিনীর টাকা কোথায় গেল তাহা জানিতে। মুখে বলিল, ছিল ব'লে জানতাম বটে, তবে আমায় কিছু ব'লে যায় নি। কেন বল তো ?

কথাটা বলিয়াই বুঝিল নরহরি যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার বিশেষ অর্থ আছে। নরহরি বৃদ্ধ ব্যক্তি, তাহার বাবার সঙ্গে কামিনীর সম্পর্ক যে কি ছিল, এ গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা সবাই জানে, কামিনীর টাকার যদি কেহ ন্যায্য ওয়ারিশন থাকে, তবে সে বিপিন। সেই বিপিন কামিনীর মৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল অথচ টাকার কথা সে কিছু জানে না, পাড়াগাঁয়ে ইহা কে বিশ্বাস করিবে ?

—কামিনীর বাড়ীডায় ভাল চাবিতালা লাগিয়ে দেবেন, নায়েব মশাই। রাতবিরেতের কাণ্ড, পাড়াগাঁ জায়গা। কখন কি হয়, কার মনে কি আছে, বলা তো যায় না। আচ্ছা, কাল আসব বেন্‌বেলা। এখন যাই।

নরহরি চলিয়া গেলে বিপিন কথাটা ভাবিল। সিন্দুক তোরঙ্গ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিবে। টাকাকড়ি এ সময় পাইলে কিছু সুবিধা ছিল বটে। কিন্তু বাক্স ভাঙিয়া টাকা হাতড়াইতে গেলে শেষে কি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া যাইবে। যদি কামিনীর কোন দূর সম্পর্কের ভাসুরপো বাহির হইয়া পড়ে, তখন ? না, সে দরকার নাই। বরং মানীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে। তার কি মত জানিয়া তবে যাহা হয় করিলে চলিবে।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বিপিনের জীবনে।

বিপিন কখনও কাহারো জন্ত চোখের জল ফেলে নাই। সে এই দিক দিয়া বেশ একটু কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় চোখের জল ফেলিবার মত নরম মন নয় তাহার। আজ হঠাৎ একা বসিয়া কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য্য হইল, কামিনী দাসীকে সে এতখানি ভালবাসিত।

আজ সে স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাই, যে দুধের বাটি, কি লাউটা শসাটা হাতে আনিয়া তাহাকে

খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে।

নিঃসঙ্গ ঘরের রোগশয্যায় একা মরিল, কেহ আপনার জন ছিল না যে একটু মুখে জল দেয়।

কে জানে, তাহার পিতা স্বর্গগত বিনোদ চাটুজ্জে পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে অদৃশ্য চরণে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কি না?

বুড়ী ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত। বিনোদ চাটুজ্জে মহাশয় পরলোকগমন করিলে পর আর সে ভাল করিয়া হাসে নাই, ভাল করিয়া আনন্দ পায় নাই জীবনে।

তাহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিত এইজন্য যে, তাহার মুখে-চোখে হাবে-ভাবে স্বর্গীয় নায়েব মহাশয়ের অনেকখানি ফুটিয়া বাহির হয়। কর্তা মহাশয়েরই ছেলে, কর্তা মহাশয়ের তরুণ প্রতিনিধি। তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়াও সুখ।

আজ সে বোঝে, এই যে মানীর সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কাহারও সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণ সেকথা বলিয়াও সুখ, না বলিলে মন হাঁপাইয়া উঠে, দেখা তো হইতেছেই না, তাহার উপর তাহার সম্বন্ধে কথা না বলিলে কি করিয়া টিকিয়া থাকা যায়—এ রকম তো কামিনী মাসীরও হইত তাহার বাবার সম্বন্ধে!

অভাগিনী যে আনন্দ হয়তো পায় নাই প্রথম জীবনে, ৺বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের সাহচর্যে তাহা সে পাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিতা নারী-হৃদয়ের সবটুকু কৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারে ঢালিয়া দিয়াছিল তাই নায়েব মহাশয়ের চরণযুগলে। কি পাইয়াছিল, কি না পাইয়াছিল, আজ তাহা কে বুঝিবে? ত্রিশ বছর পরে কে বুঝিবে মানী তাহার জীবনে কি অমৃত পরিবেশন করিয়াছিল একদিন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

বেলা পড়িলে বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় শ্যামহরি চাকর ঝাঁট দিতেছিল, বিপিন বলিল, বাবু কোথায় রে?

—রাণাঘাট গিয়েছেন আজ সকালবেলা। সন্ধের সময় আসবেন ব'লে গিয়েছেন।

—রাণাঘাটে কেন?

—উকিলবাবু পত্তর দিয়েছেন, বলছিলেন গিন্নীমাকে—কি মামলার কথা আছে। আপনার কথাও হচ্ছিল।

—আমার কথা?

—হাঁা, বাবু বলছিলেন, ধোপাখালির কাছারি থেকে আপনি টাকা নিয়ে এলি আপনাকে রাণাঘাট পাঠাবেন। টাকার বড্ড দরকার নাকি—

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—গিন্নীমা আছেন, দিদিমণি আছেন। দিদিমণিকে নিতে আসবেন কিনা জামাইবাবু, তাই বাবু বলছিলেন আপনার নাম ক'রে, আপনি এই সময় টাকা নিয়ে এসে পড়লে ভাল হয়, খরচপত্তর আছে।

—ও। তা এর মধ্যে আসবেন বুঝি ?

—আজ্ঞে, পরশু বুধবারে তো শুনছিলাম আসবেন।

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাবে এখন এই সময় তা হ'লে। তুই যা দিকি বাড়ীর মধ্যে। গিন্নীমাকে বল, আমি এসেছি। আর আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে কিনা। সেগুলো কি তাঁর হাতে দোব, না বাবু এলে বাবুকে দোব, জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

শ্যামহরি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিবার একটু পরেই স্থানীয় পুরোহিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি বৈঠকখানায় উঁকি দিয়া বলিলেন, কে ব'সে ? বিপিন ? বাবু কোথায় ?

বিপিন আশা করিতেছিল এই সময় অনাদিবাবু বাড়ী নাই, মানী তাহার আসিবার খবর শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিতে পারে। কিন্তু মানীর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ বটুক ভটচাজকে দেখিয়া বিপিনের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মুখে বলিল, আসুন ভটচাজ মশাই, বাবু নেই, রাণাঘাটে গিয়েছেন মামলার তদারক করতে। কখন আসবেন ঠিক নেই, আজ বোধ হয় আসবেন না।

এই উত্তর শুনিয়া বুড়া চলিয়া যাইবে এই আশা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না গিয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিয়া গেল। বিপিন প্রমাদ গণিল, বৃদ্ধ অত্যন্ত বকবক করে সে জানে, বকুনি পাইলে উঠিতে চায় না—মাটি করিল দেখিতেছি! বাহিরের ঘরে অন্য লোকের গলার আওয়াজ পাইলে মানী সেখানে পা দিবে না। অনাদিবাবু বাড়ী নাই—এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে, সাধারণত তিনি কোথাও বাহির হন না। মানীও চলিয়া যাইতেছে, এমন একটা সুবর্ণ-সুযোগ যদি বা ঘটিল তাহার সহিত নির্জ্জনে দুইটা কথা বলিবার, তাহাও যাইতে বসিয়াছে। বটুক ভটচাজ বলিল, মামলা ? কিসের মামলা ?

বিপিন উদাস নিস্পৃহ স্বরে বলিল, আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না। শুনলাম, উকিল সুরেনবাবু চিঠি লিখেছিলেন।

—সুরেন উকিল ? কোন্ সুরেন ? সুরেন মুখুজ্জে ?

—আজ্ঞে না, সুরেন তরফদার।

—কালী তরফদারের ছেলে ? সুরেন আবার কি হে! ওকে আমরা পটলা ব'লে জানি। ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়ীতে আমার যাতায়াত, অবিশ্যি আমি ক্রিয়াকর্ম্ম কখনও করি নি ওদের বাড়ী। শূদ্রযাজক হতে পারতাম যদি, তা হ'লে আজ এ দুর্দ্দশা ঘটত না। কিন্তু আমার কর্ত্তা মশায়ের নিষেধ আছে। তিনি মরবার সময় ব'লে গিয়েছিলেন,

বটুক, না খেয়ে কষ্ট যদি পাও, সেও ভাল, কিন্তু নারায়ণ-শিলা হাতে শুদ্দুরের বাড়ী কখনও ঢুকো না। আমাদের বংশে ও কাজ কখনও কেউ করে নি, বুঝলে ?

বিপিন বলিল, হুঁ।

—তা সেই পটলা আজ উকিল হয়েছে, কালী তরফদার মারা যাওয়ার পর হাতে কিছু টাকাও আজকাল পেয়েছে শুনেছি। তা ছাড়া টাকা জমাতে কি করে হয়, তা ওরা জানে। হাড় কঞ্জুষ ছিল সেই কালী তরফদার, তার ছেলে তো ? ওদের আদি বাড়ী শান্তিপুর, তা জান তো ? ওর জ্যাঠামশায় এখনও শান্তিপুরের বাড়ীতেই থাকে। জমিজমা আছে শান্তিপুরে। বেশ বড় বাড়ী, দোমহলা।

—ও।

—অনেকদিন আগে একবার শান্তিপুর গিয়েছি রাস দেখতে, ভারি যত্ন-আত্তি করলে আমাদের। শান্তিপুরের রাস দেখেছ কখনও ? দেখবার মত জিনিস ; অত বড় মেলা এ দিগরে হয় না কোথাও।

—ও।

—এখানে তামাক-টামাক দেবার কেউ নেই ? বল না একটু ডেকে। আর একটু চা যদি হয়, কাউকে ব'লে পাঠাও না। আমি এসেছি শুনলেই বউমা চা পাঠিয়ে দেবেন। তবে শোন, একটা রাসের মেলার গল্প করি। সেবার হ'ল কি জান—ওই যে চাকরটা যাচ্ছে—ও শ্যামহরি, শোন্ একবার এদিকে বাবা, বাড়ীর মধ্যে যা তো, বলগে, ভটচাজ্যি মশাই একটু চা খেতে চাইছেন, আর একবার এক কলকে তামাক দিয়ে যা তো বাবা। বিপিন চা খাবে কি ? ও কি, উঠছ কোথায় ? ব'স, ব'স।

—আজ্ঞে, আপনি ব'সে চা খান। আমি একটু তাগাদায় যাব ওপাড়ায়, বাবু ব'লে গিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এখন না গেলে হবে না ; সন্ধ্যে হয়ে এল। আমি আসি।

বিপিন বাহির হইয়া পড়িল। বটুক ভটচাজের সঙ্গে বসিয়া গল্প করা বর্তমানে তাহার মনের অবস্থায় সম্ভব নয়।

সব নষ্ট হইয়া গেল। অনাদিবাবু সন্ধ্যার পরই আসিয়া পড়িবেন। তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মুখ বুজিয়া খাইতে হইবে ; তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতে হইবে। হয়তো সে সময়ে অনাদিবাবু গড়গড়া হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে জমিদারী সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিবেন, তাহাও শুনিতে হইবে। তারপর কাল সকালে আর সে কোন্ ছুতায় পলাশপুরে বসিয়া থাকিবে ? তাহার তো আসার কথাই ছিল না। টাকা আনিবার ছুতায় সে আসিয়াছে। টাকা ইরশালে ধরা হইয়া গিয়াছে, তাহার কাজও শেষ হইয়াছে। যাও চলিয়া ধোপাখালির কাছারি। মিটিয়া গেল।

বিপিন উদভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই। হয়তো এতক্ষণ অনাদিবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা, সে একটু দেরি করিয়াই যাইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর-ঘোর হইতে বিপিন ফিরিল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বটুক ভটচাজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছে কিনা। না, কেহই নাই। অনাদিবাবুও আসেন নাই, কারণ উঠানে তাহা হইলে গরুর গাড়ী থাকিত। বাড়ীর গরুর গাড়ী করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ফিরিবেন।

গাড়ী উঠানে না দেখিয়া বিপিন যে খুব আশ্বস্ত হইল, তাহা নয়। আসেন নাই বটে, কিন্তু আসিলেন বলিয়া। আর বেশি দেরি হইবার কথা নয়, দুই ক্রোশ পথ গরুর গাড়ী আসিতে।

বিপিন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার আগে একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল—মানী।

বিপিনের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের মত কি একটা খেলিয়া গেল। সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মানী বলিল, আচ্ছা, কি কাণ্ড বল তো বিপিনদা? এলে সেই ধোপাখালি থেকে তেতে-পুড়ে—শ্যামহরি চাকর গিয়ে বললে—চা ক'রে নিয়ে আসছি, এসে দেখি ভটচাজ জ্যাঠা-মশাই ব'সে আছেন, তুমি নেই। ভটচাজ জ্যাঠামশাই বললেন, কোথায় তাগাদায় বেরুলে এইমাত্র। তারপর দুবার এসে খুঁজে গেলাম—কোথায় কে? এলে—চা খাও, জিরোও, তারপর তাগাদায় গেলে হ'ত না কি? প্রজারা পালিয়ে যাচ্ছে না তো।

বিপিনের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল মানীকে দেখিয়া, আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়—তা বেশ ভাল—মেসোমশাই কি রাণাঘাটে—

মানী বলিল, দাঁড়াও, আগে তোমার চা আর খাবার আনি।

মানী কথাটা ভাল করিয়া শেষ না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

বিপিন দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, মানী, শোন শোন, যাস নি, দুটো কথা বলি আগে দাঁড়া।

মানী বলিল, দাঁড়াচ্ছি চা-টা আনি আগে। কতক্ষণ লাগবে? স্টোভ ধরাব আর করব। আগে যে চা ক'রেছিলুম, তা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

আবার সে চলিয়া যায়। এদিকে অনাদিবাবুও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। হঠাৎ বিপিন বেদনাপূর্ণ আকুল মিনতির সুরে বলিল, মানী, চা আমি খাব না। তুই যাস নি, একবার আমার কথা শোন্। তুই চা আনতে যাস নি।

মানী বিস্মিত হইয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন বিপিনদা? চা খাবে না কেন? কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

বিপিন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সত্যই তাহার কণ্ঠস্বরটা তাহার নিজের কানেই স্বাভাবিক শোনায় নাই কিন্তু সে কি করিবে। মেয়েমানুষ কি কথা শোনে? চা আনিবার ঝোঁক যখন করিয়াছে, তখন চা সে আনিবেই। ধোপাখালি হইতে পথ হাঁটিয়া বিপিন এখানে চা খাইতে আসিয়াছিল?

নিজেকে খানিকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানী, যাস নি।

মানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—অনেকদিন তোকে দেখি নি, কথাও বলি নি, এলি আর চ'লে যাবি চা করতে? চা কি এত ভাল জিনিস যে, না খেলে দিন যাবে না। আমি যেতে দোব না তোকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

মানী শান্তস্বরে মৃদু হাসিমুখে বলিল, বিপিনদা, মেয়েমানুষের একটা কর্ত্তব্য আছে। তুমি তেতে-পুড়ে এসেছ রাস্তা হেঁটে, আর আমি তোমার মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা না ক'রে সঙের মত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব—এ হয় না। তুমি একটু ব'স, আমি আগে চা আনি, খেয়ে যত খুশি গল্প ক'র। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমারও কি ইচ্ছে নয় তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার?

মিনিট পনরো—প্রত্যেক মিনিট এক একটি দীর্ঘ ঘণ্টা—কাটিয়া গেল। মানীর তবুও দেখা নাই।

অনাদিবাবু কি আসিলেন? বাহিরে গরুর গাড়ীর শব্দ হইল না? না, কিছু নয়। অন্য গরুর গাড়ী রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে মানী আসিল। একটা থালায় খানকতক পরোটা, একটু আলু-চচ্চড়ি, একটু গুড়। বিপিনের সামনে থালা রাখিয়া বলিল, ততক্ষণ খাও, আমি চা আনি। কতক্ষণ লাগল? এই তো গিয়ে ময়দা মেখে বেলে ভেজে নিয়ে এলুম। চায়ের জল ফুটছে, এখুনি আনছি ক'রে। সব কখানা কিন্তু খাবে, নইলে রাগ করব, আস্তে আস্তে খাও।

বিপিনের সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। পরোটা কখানা সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল।

অনাদিবাবু বুঝি আসিলেন? গরুর গাড়ীর শব্দ না?

চা করিতে এত সময় লাগে? কত যুগ ধরিয়া মানী কেটলিতে চায়ের জল ফুটাইতেছে—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চায়ের জল ফুটিতেছে।

মানী আসিল। এক পেয়ালা চা এক হাতে, অন্য হাতে একটি ছোট খাগড়াই কাঁসার রেকাবে পান।

—কই, দেখি কেমন সব খেয়েছ? বেশ লক্ষ্মী ছেলে। এই-নাও চা, এই-নাও পান।

বিপিন হাসিয়া বলিল, ভারী খিদে পেয়েছিল, সত্যি বলছি। আঃ, চা-টুকু যে কি চমৎকার লাগছে?

মানী বলিল, মুখ দেখে বুঝতে পারি বিপিনদা। তোমার যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি, তা যদি তোমার মুখ দেখে বুঝতে না পারলুম, তবে আবার মেয়েমানুষ কি?

—দাঁড়িয়ে কেন, ব'স ওই চেয়ারখানায়। ভাল কথা, মেসোমশাই তো এখনও এলেন না?

—বাবা ব'লে গিয়েছিলেন কাজ সারতে পারলে আজ আসবেন নয়তো কাল আসবেন। বোধ হয় আজ এলেন না, এলে এতক্ষণ আসতেন।

ওঃ, এত কথা মানীর পেটে ছিল! মানী জানিত যে বাবা আজ ফিরিবেন না, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চা ও খাবার করিতে গিয়াছিল! আর মূর্খ সে ছটফট করিয়া মরিতেছে!

সে বলিল, মানী, তুই অমন ভাবে চিঠি আর আমায় পাঠাসনে। পাড়াগাঁ জায়গার ভাব তুমি জান না, থাক কলকাতায়, যদি কেউ দেখে ফেলে বা জানতে পারে, তাতে নানা রকম কথা ওঠাবে। তোমার সুনাম বজায় থাকে এটা আমি চাই। কেউ কোন কথা তোমাকে এই নিয়ে বললে আমি তা সহ্য করতে পারব না মানী।

মানী বলিল, আমাদের চাকরের হাতে দিয়েছিলুম, সে নিজে চিঠি পড়তে পারে না। তার কাছ থেকে নিয়েই বা কে পড়বে পরের চিঠি, আর তাতে ছিলই বা কি ?

—তুমি আমায় আসতে বলছ এ কথাও আছে। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, ওর অনেক রকম মানে বার করত! দরকার কি সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে ?

মানী চুপ করিয়া শুনিল, তারপর গম্ভীর মুখে বলিল, শোন বিপিন-দা, আমিও একটা কথা বলি। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, তার কি মানে বার করত আমি জানি। তারা বলত, আমি তোমায় দেখতে চেয়েছি, তোমায় নিশ্চয়ই ভালবাসি তবে। এই তো ?

বিপিন অবাক হইয়া মানীর মুখের দিকে চাহিল। মানী এমন কথা মুখ ফুটিয়া কোন দিন বলে নাই। কোন মেয়ে কখন বলে না। 'তোমাকে ভালবাসি' অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু এই কথা কয়টির কি অদ্ভুত শক্তি, বিশেষত যখন সেই মেয়েটির মুখ হইতে এ কথা বাহির হয়, যাহাকে মনে মনে ভাল লাগে। প্রণয়পাত্রীর মুখে এই স্পষ্ট সহজ উক্তিটি শুনিবার আশ্চর্য্য ও দুর্ল্ভ অভিজ্ঞতা বিপিনের জীবনে এই প্রথম হইল।

মানীর উপরে সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত ধরনের স্নেহ ও মায়াও হইল। এতদিন যেন সেটা মনের কোণেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বাহিরে ফুটিয়া প্রকাশ পায় নাই। ওগো কল্যাণী, এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তোমারই দান, বিপিন সেজন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানী বলিল, বিপিনদা, কথা বললে না যে ? ভাবছ বোধ হয়, মানীটা বড্ড বেহায়া হয়ে উঠেছে দেখছি, না ?

বিপিন তখনও চুপ করিয়া রহিল। সে অন্য কথা ভাবিতেছিল, মানীর বিবাহিত জীবন কি খুব সুখের নয় ? স্বামীকে কি তাহার মনে ধরে নাই ?

খুব সম্ভব। বেচারী মানী! অনাদিবাবু বড় ঘরে বিবাহ দিতে গিয়া মানীর ভাল লাগা-না-লাগার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, মেয়েকে ভাসাইয়া দিয়াছেন হয়তো ধনীর সহিত কুটুম্বিতার লোভে।

মানী মৃদু হাসিমুখে বলিল, রাগ করলে বিপিনদা ?

বিপিন বলিল, রাগের কথা কি হয়েছে যে রাগ করব ? কিন্তু আমি ভাবছি মানী, তোর মত মেয়ে আমার ওপর—ইয়ে—একটুও স্নেহ দেখাতে পারে, এর মানে কি ? আমার কোন্ কথা তোর কাছে না বলেছি। কি চরিত্রের মানুষ আমি ছিলাম,

তুই তো সব জানিস। সে হীনচরিত্রের লোককে তোর মত একটা শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে যে এতটুকু ভাল চোখে দেখতে পারে, সেইটেই আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য মনে হয়।

মানী বলিল, থাক ও কথা বিপিনদা।

বিপিনের যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, আপন মনে বলিয়াই চলিল, না মানী, আমার মনে হয়, আমার সব কথা তুই জানিসনে। কি ক'রেই বা জানবি, ছেলেবেলার পর আর তো দেখা হয়নি! তোকে সব কথা বলি। শুনেও যদি মনে হয়, আমি তোর স্নেহের উপযুক্ত, তবে স্নেহ করিস, ধন্য হয়ে যাব। আর যদি—

মানী বলিল, আমি শুনতে চাইছি বিপিনদা?

—না, তোকে শুনতে হবে। তুমি আমাকে ভারী সাধুপুরুষ ভেবে রেখেছ, সেটা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। রাণাঘাটে বা বনগাঁয়ে এমন কোন কুস্থান নেই, যেখানে আমি যাতায়াত করিনি। মদ খেয়ে বাবার বিষয় উড়িয়েছি, স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে অন্য মেয়েমানুষের আবদার রেখেছি। যখন সব গেল, মদ জোটেনি, তাড়ি খেয়েছি, হয়তো চুরি পর্য্যন্ত করতাম, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রবংশের রক্ত ছিল ব'লেই হোক বা যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত করা হয়নি! তাও অন্য কিছু চুরি নয়, একখানা শাড়ি। শামকুড় পোস্ট-আপিসের বারান্দায় শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া ছিল, বোধ হয় পোস্ট-মাস্টারের স্ত্রীর। আমার হাতে পয়সা নেই, শাড়িখানা নতুন আর বেশ ভাল, একজনকে দিতে হবে। সে চেয়েছিল, কিন্তু কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। চুরি করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরলাম, পাড়াগাঁয়ের ব্রাঞ্চ পোস্ট-আপিস, পোস্ট-মাস্টার আপিস বন্ধ ক'রে ছেলে পড়াতে গিয়েছে। কেউ কোন দিকে নেই। একবার গিয়ে এক দিকের গেরো খুললাম—

মানী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি চুপ করবে, না আমি এখান থেকে চ'লে যাব?

—না শোন, ঠিক সেই সময় একটা ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বাঁধানো পুকুরঘাট। মেয়েটাকে দেখে আমি ডাকঘরের রোয়াক থেকে নেমে বাঁধাঘাটে গিয়ে বসলাম। মেয়েটা চলে গেল, আমি আবার গিয়ে উঠলাম রোয়াকে। এবারে কাপড় নেবোই এই রকম ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ছিঃ, আমি না বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে? আমার বাবা কত গরীব দুঃখী লোককে কাপড় বিলিয়েছেন আর আমি কিনা একখানা অপরের পরনের কাপড় চুরি করছি? তখন যেন ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল, ঠিক সেই সময় বাড়ীর মধ্যে থেকে একটা ছেলে বার হয়ে এসে বললে, কাকে চান? বললাম, খাম কিনতে এসেছি। খাম পাব? ছেলেটা বললে, না, ডাকঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন চ'লে এলাম সেখান থেকে।

মানী বলিল, বেশ করেছিলে, খুব বাহাদুরি করেছিলে। নিজে আর নিজের গুণ ব্যাখ্যায় দরকার নেই, থাক। আমার দেওয়া বইগুলো পড়েছিলে?

—ওই যে বললাম, সব পড়া হয় নি। 'দত্তা'খানা পড়েছি, বেশ চমৎকার লেগেছে।

—'শ্রীকান্ত' পড়নি?

—সময় পাইনি। সেখানা আনিওনি সঙ্গে, এর পর পড়ব ব'লে রেখে এসেছি কাছারিতে। 'দত্তা'খানা ফেরত এনেছি।

—তোমার কাছে সবই রেখে দাও না, মাঝে মাঝে প'ড়। একলাটি থাক কাছারিতে। আমার সঙ্গে আরও যে সব বই আছে, যাবার সময় তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি সেখানে প'ড় ব'সে। আচ্ছা, বল তো বিজয়া কে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, ও! একজামিন করা হচ্ছে বুঝি? মাস্টারনী এলেন আমার।

মানী কৃত্রিম রাগের সুরে অথচ ঈষৎ লাজুক ভাবে বলিল, আবার! উত্তর দাও আমার কথার।

—বিজয়া তোমার মত একটি জমিদারের মেয়ে।

—তারপর?

—তারপর আবার কি? নরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হ'ল।—কথাটা বলিয়াই বিপিনের মনে হইল মানী পাছে কি ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নাই, মানীও তো জমিদারের মেয়ে! 'তোমার মত' কথাটা না বলিলেই চলিত। কিন্তু মানীর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছে, পড়েছ। ভাল, পড়লে মানুষ হয়ে যাবে। এইবার রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' ব'লে কবিতার বই আছে, সেখানা থেকে কবিতা মুখস্থ ক'র। খুব ভাল ভাল কবিতা।

বিপিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, কবিতা আবার মুখস্থও করতে হবে। উঃ, তুই হাসালি মানী, পাঠশালায় ইস্কুলে যা কখনও হ'ল না, উঃ, এই বুড়ো বয়সে বলে কি না, হি-হি, বলে কি না—

—হাঁ, মুখস্থ করতে হবে। আমার হুকুম। শুনতে বাধ্য তুমি। মানুষ বলে যদি পরিচয় দিতে চাও তবে তা দরকার। যা বলি তাই শোন, হাসিখুশি তুলে রাখ এখন—

কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকের প্রাবল্যে বিপিনের হাসি তখনও থামিতে চায় না। মানী মাস্টারনী সাজিয়া তাহাকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছে—এই ছবিটা তাহার কাছে এতই আমোদজনক মনে হইল যে, সে হাসির বেগ তখনও থামাইতেই পারিল না।

এবার মানীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বড্ড হাসির কথাটা কি যে হ'ল তা তো বুঝিনে। আমার কথাগুলো কানে গেল, না গেল না?

—খুব গিয়েছে। আচ্ছা, তোর কবিতা মুখস্থ আছে?

—আছেই তো। 'চয়নিকা'র অনেক কবিতা মুখস্থ আছে।

—সত্যি? একটা বল না?

—এখন কবিতা বলবার সময় নয়। আর বললেই বা তুমি বুঝবে কি ক'রে, রসবোধ আছে কি না? তুমি তো জান ঢেঁকি, কি ক'রে ধরবে?

—তাতেই তো তোর সুবিধে, যা খুশি বলবি, ধরবার লোক নেই।

মানী মুখে কাপড় দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ওমা, কি দুষ্টু বুদ্ধি!

—তা বল একটা শুনি।

—শুনবে? তবে শোন। দাঁড়াও, কেউ আসছে কি না দেখে আসি, আবার বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছি শুনলে কে কি মনে করবে!

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া মানী স্কুলের ছাত্রীর কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া শুরু করিল—

'অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ও গো মরণ হে মোর মরণ!'

বিপিন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! মানীর কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ার কায়দা! যেন থিয়েটারের অ্যাক্‌টো করিতেছে। অথচ হাসিবার জো নাই, মুখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে শান্ত ছেলেটির মত। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! মানীটা চিরদিনই একটু ছিটগ্রস্ত।

কিন্তু খানিকটা পরে মানীর আবৃত্তি বিপিনের বড় অদ্ভুত লাগিতে লাগিল।—

'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ও গো মরণ হে মোর মরণ!'

এই জায়গাটাতে যখন মানী আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন বিপিনের হাসিবার প্রবৃত্তি আর নাই, সে তখন আগ্রহের সঙ্গে মানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ, বেশ লাগিতেছে তো পদ্যটা! মানী কি চমৎকার বলিতেছে! অল্পক্ষণের জন্য মানী বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চোখে মুখে অন্য এক রকমের ভাব। কবিতা যে এমন ভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত না, কখনও শোনে নাই।

—বাঃ, বেশ, খাসা। চমৎকার বলতে পারিস তো?

মানী যেন একটু হাঁপাইতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, বড় কষ্ট হয় পদ্য আবৃত্তি করিতে, বিশেষত অমনি হাত-পা নাড়িয়া। ভারী সুন্দর দেখাইতেছে মানীকে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, একটু রাঙা হইয়াছে মুখ, বুক ঈষৎ উঠিতেছে নামিতেছে। এ যেন মানীর অন্য রূপ, এ রূপে কখনও সে মানীকে দেখে নাই।

—নেবু খাবে বিপিনদা?

—কি নেবু?

—কমলানেবু, সেদিন কলকাতা থেকে এক টুকরি এসেছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

—যাস নি মানী, তুই চ'লে গেলে আমার নেবু ভাল লাগবে না।

মানী যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাজে কথা ব'ল না বিপিনদা।

বিপিন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, বাজে কথা কি বললাম?

—বাজে কথা ছাড়া কি? যাক, দাঁড়াও, নেবু আনি।

মানী একটু পরে দুইটি বড় বড় কমলানেবু ছাড়াইয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া যখন

হাজির করিল, বিপিনের তখন লেবু খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই, অভিমানে তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, নেবু আমি খাব না। নিয়ে যা।

—কি, রাগ হ'ল অমনিই? তোমার তো পান থেকে চুন খসবার জো নেই, হ'ল কি?

—না না, কিছু হয় নি, তুই যা। মিটে গেল গণ্ডগোল।

—কেন, কি হয়েছে বল না?

—আমার সব কথা বাজে। আমার কথা তোর কি শুনতে ভাল লাগে? আমি যখন বাজে লোক তখন তো বাজে কথা বলবই। তবে ডেকে এনে অপমান করা কেন?

মানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীরস্বরে বলিল, দেখ বিপিনদা, আমি যা ভেবে বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে এমন কথা ভাবতে না বা বলতেও না। তোমার কথাকে কেন বাজে কথা বলেছি, তা বুঝবার মত সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে কথায় কথায় অত রাগও আসত না।

বিপিন চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়, বলিল, জানিস তো আমার মোটা বুদ্ধি, তবে আর—

মানী পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই এখন আমার, তুমি ব'স। কমলানেবু এই রইল, খাও তো খেও, না খাও রেখে দিও, শ্যামহরি এসে নিয়ে যাবে, আমি চললুম।

কথা শেষ করিয়া মানী এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইল না।

২

বিপিন কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের তাহার মনের সে আনন্দ আর নাই, জগৎটা যেন এক মুহূর্ত্তে বিস্বাদ হইয়া গেল। মানী এমন ধরণের কথা কখনও তাহাকে বলে নাই। মেয়েমানুষ সবই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনে মনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগী কম নয়, এখন দেখা যাইতেছে। স্বরূপ কি আর দুই একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। যাক্। ওসব কথায় দরকার নাই। সে আজই—এখনই ধোপাখালি কাছারিতে ফিরিবে। কত রাত আর হইয়াছে। সাতটা হয়তো। দুইঘণ্টা জোর হাঁটিলে রাত নয়টার মধ্যে খুব কাছারি পৌঁছানো যাইবে। কমলানেবু খাওয়ার দরকার নাই আর।

কিন্তু একটা মুশ্‌কিল হইয়াছে এই, অনাদিবাবু এখনও রাণাঘাট হইতে ফিরিলেন না। সঙ্গে যে টাকা আছে, তাহা ইস্তফা না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? সে আসিয়া কেন চলিয়া গেল হঠাৎ, না খাইয়া রাত্রিবেলাতেই চলিয়া গেল, একথা যদি অনাদিবাবু

জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে কি জবাব দিবে? তাঁহার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একথা বলিতে পারিবে না!

বিপিন ঠিক করিল, আর একটু অপেক্ষা করিয়া সে দেখিবে অনাদিবাবু আসেন কিনা। দেখিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ীর মধ্যে মানীর মায়ের কাছে টাকা দেওয়া চলে না, তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন এত রাত্রে সে না খাইয়া কেন কাছারি ফিরিবে। খাইতে দিবেন না, পীড়াপীড়ি করিবেন। সব দিকেই বিপদ।

মানী কেন ও কথা বলিল? বড্ড হেঁয়ালির ধরণের কথাবার্তা বলে আজকাল। কি গূঢ় অর্থ না জানি উহার মধ্যে নিহিত আছে! আছে থাকুক, গূঢ় অর্থ মাথায় থাকুক, সে এখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অনাদিবাবু আসিলেন না। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া যায়। একবার শ্যামহরি চাকর আসিয়া বলিল, মা ব'লে পাঠালেন আপনি একা খেয়ে নেবেন, না বাবু এলে খাবেন?

বিপিন বলিল, বলগে বাবু এলে খাব এখন একসঙ্গে। কিন্তু রাত দশটা বাজিয়া গেল, তখনও অনাদিবাবুর দেখা নাই। অগত্যা সে বাড়ীর মধ্যে একাই খাইতে গেল।

মানীর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, মানী সেখানে নাই। বিপিনের মন ভাল ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। যেন খাওয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

মানীর মা বলিলেন, বিপিন, টাকাকড়ি কিছু এনেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মাসিমা, মেসোমশাই তো এলেন না রাণাঘাট থেকে, আমি কাল খুব ভোরে চ'লে যাব ধোপাখালি কাছারি। টাকা আপনি নিয়ে রাখুন। খেয়ে উঠে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালেই কাছারি যাবে কেন? কর্ত্তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে না? তিনি ব'লেই গিয়েছিলেন, আজ যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই আসবেন সকাল আটটার মধ্যে।

—আমার থাকা হবে না মাসিমা, কাজ আছে।

—কাল জামাই আসবেন মানীকে নিতে, এদিকে দেখ বাবা, মেয়ে কি হয়েছে সন্ধ্যের পর থেকে। ওপরে শুয়ে আছে, খায়নি দায়নি। ওর আবার কি যে হ'ল! এদিকে কর্ত্তা নেই বাড়ী, তুমি যাচ্ছ চ'লে, আমি আথান্তরে প'ড়ে যাব তা হ'লে।

বিপিন ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়াছিল, মুখে না দিয়া সেই অবস্থাতেই মানীর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বলিল, কি হয়েছে মানীর?

—কি হয়েছে কি জানি বাবা। দুবার ওপরে গেলাম, বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে, উঠলও না। বললে, আমার শরীর ভাল না, রাত্তিরে খাব না কিছু। বললুম, একটু গরম দুধ খাবি? বললে তাও খাবে না। কি জানি বাবা, কিছুই বুঝলুম না। একালের ধাতের মেয়ে, ওদের কথা আদ্ধেক থাকে পেটে, আদ্ধেক মুখে, কি হয়েছে না হয় বল, তাও বলবে না।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইবার এতটুকু ইচ্ছা মনে জাগিল না। মানীর মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট দিয়াছে, মানীর অসুখবিসুখ কিছুই নয়, বাহিরের ঘর হইতে গিয়াই সে উপরের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। কেন? কি বলিয়াছিল সে মানীকে? সে চলিয়া গেলে লেবু ভাল লাগিবে না—এই কথার মধ্যে প্রেমনিবেদনের গন্ধ পাইয়া কি মানী নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়াছে? কিন্তু এ ধরণের কথা সে তো ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার মানীকে বলিয়াছে, তাহাতে তো মানী চটে নাই!

বিপিনের মন বলিল এ কারণ আসল কারণ নয়। অন্য কোনও ব্যাপার আছে ইহার মধ্যে। তা ছাড়া মানীর অত যত্নে দেওয়া লেবু সে খাইতে চাহে নাই, রাগের মাথায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মানীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। ছিঃ ছিঃ, কি অন্যায় সে করিয়া বসিয়াছে! মানীর মত তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জগতে খুব বেশি আছে কি?

রাত তিনটে পর্য্যন্ত বিপিনের ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে যদি এখনই একবার দেখা হইত! সত্যই, সে বড় আঘাত দিয়াছে মানীর মনে। মানীর নিকট ক্ষমা না চাহিয়া সে ধোপাখালি যাইতে পারিবে না। কে জানে হয়তো এই মানীর সঙ্গে শেষ দেখা। এ চাকুরি কবে আছে, কবে নাই। আজ সে অনাদিবাবুর নায়েব, কালই সে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। মানী হয়তো কতদিন এখন আর আসিবে না। অনুতাপের কাঁটা চিরদিনই ফুটিয়া থাকিবে বিপিনের মনে।

সকাল হইলে যে-কোন ছুতায় মানীর সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। না হয়, দুপুরে আহারাদি করিয়া কাছারি রওনা হইলেই চলিবে এখন। মানীর মনের কষ্ট না মুছাইয়া সে এ স্থান ত্যাগ করিবে না।

৩

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। শেষরাত্রের দিকে বিপিনের ঘুম আসিয়াছিল, কাহাদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে উঠানের দিকে চাহিয়া দেখিল, একখানা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়া হাঁকডাক করিতেছে, অনাদিবাবু ছইয়ের ভিতর হইতে নামিতেছেন।

শ্যামহরি চাকরও বৈঠকখানায় শোয়, বিপিন তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। অনাদিবাবু বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বিপিন! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বড্ড জরুরি কাজে রাণাঘাট যেতে হবে তোমাকে কাল সকালেই। আজ রাত্রেই তোমায় কাগজপত্র দিয়ে দিই, কাল বেলা আটটার মধ্যে উকিল-বাড়ী দাখিল ক'রে দিতে হবে। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে পাঠাই। তুমি এ সময়ে এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। ব'স, আমি আসছি

ভেতর থেকে। সেখান থেকে বেরিয়েছি রাত দশটার পরে। নতুন গরু, চলতে পারে না পথে, এখন রাত তো প্রায়—। আঃ, কি কষ্টই গিয়েছে সারারাত!

বাড়ীর ভিতর হইতে তখনই ফিরিয়া অনাদিবাবু বিপিনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি, তুমিও শোও। এখনও ঘণ্টা দুই রাত আছে। ভোরে উঠে চ'লে যেও। যদি উকিলবাবু ছেড়ে দেন, তবে কালই ওখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে বিকেল নাগাৎ এখানে চ'লে এস। কাল আবার আমার মেয়েকে নিতে জামাই আসছেন কলকাতা থেকে, পার তো কিছু মিষ্টি এন সাধুচরণ ময়রার দোকান থেকে। এই একটা টাকা নিয়ে যাও।

খুব ভোরে উঠিয়া বিপিন রাণাঘাট রওনা হইল। যাইবার সময় সারাপথ দেখিল, খুব ভোরে উঠিয়া চাষারা জমি নিড়াইতেছে। এবার বৈশাখের প্রথমে বৃষ্টি হইয়া ফসল বুনিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, এখন বৃষ্টি আদৌ নাই, জমিতে জমিতে নিড়ানি দেওয়া চলিতেছে। হয়তো এবার জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বর্ষা নামিবে—এই ভয়ে চাষারা শীঘ্র শীঘ্র ছাঁটার কাজ শেষ করিতে চায়। সারাপথ দুইধারে মাঠে ধান-পাটের ক্ষেতে চাষারা জমি নিড়াইতেছে।

ভোরের অতি সুন্দর মিষ্টি বাতাস। মাঠে ও পথের ধারে ছোট বড় গাছে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, বিশেষ করিয়া কানসোনার মাঠে। রেলের ফটক পার হইয়া আবাদ তত নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে চারিধারে শুধুই সোঁদালি ফুলের গাছ।

কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বিপিন একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল। প্রতিবার রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে এইটা তাহার বিশ্রামের স্থান। বিশ্বাসদের বাড়ীর সকলেই বিপিনকে চেনে। বিশ্বাসদের বড়কর্ত্তা রাম বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পাটের দড়ি পাকাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে আসুন চাটুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। আজ যে বড্ড সকালে রাণাঘাট চলেছেন, মোকদ্দমা আছে না কি? উঠে বসুন ভাল হয়ে। একটু চা ক'রে দিক?

—না না, চায়ের দরকার নেই। একটু তামাক খাই বরং।

—আরে, তামাক তো খাবেনই, চা একটু খান। অত সকালে তো চা খেয়ে বেরোননি? এখন সাতটা বাজে, আমিও তো চা খাব। বসুন, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছেন এর মধ্যে, কষ্ট কম হয়েছে? একটু জিরোন।

মানীর সঙ্গে ফিরিয়া আজ দেখা হইবে কি? আর দেখা হওয়া সম্ভবও নয়। দেখা হইলেও কথাবার্ত্তা তেমন ভাবে হইবে না। জামাইবাবু আসিবেন, কর্ত্তা বাড়ী রহিয়াছেন। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশ্বাস মহাশয় চা ও মুড়ি আনিয়া দিলেন। বিপিন খাইতে খাইতে বলিল, এবার পাট ক'বিঘে বুনলেন বিশ্বেস মশায়?

—তা ধরুন, প্রায় বারো-চোদ্দ বিঘে হবে। বুনলে কি হবে, খরচা পোষায় না, দশ টাকা করে জুটো কিষাণ, তা বাদে জন-মজুর তো আছেই। পাটের দর তো উঠল না। ওই

দেখুন ছত্রিশ সালে পাটের দর ভাল পেয়ে উত্তরের পোতায় বড় ঘরখানা তুলতে গিয়েছিলাম, আদ্ধেক গাঁথুনি হয়ে দেখুন প'ড়ে আছে, আর দর পেলাম না, তা কি হবে ?

—আপনার বড়ছেলে কোথায় ?

—সে ওই বীজপুরে কারখানায় ত্রিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছে, রং মিস্ত্রী। আমি বলি, ও কেন, বাড়ীতে এসে কলাও ক'রে চাষ-বাস লাগা। মেসে খায়, একটু দুধ ঘি পেটে যায় না, শরীর মাটি। ওমাসে বাড়ী এসেছিল, আমার স্ত্রী এক বোতল ঘরের গাওয়া ঘি সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে আবার। ঐ খাটুনি, দুধ ঘি না খেলে শরীর থাকে ? উঠলেন ? ফিরবার পথে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। না হয় এখানেই ফিরবার সময় দুটো স্বপাকে আহার ক'রে যাবেন এখন।

—না না, আমি সেখানেই খাব। উকিলের কাজ মিটতে বেলা এগারোটা বাজবে। তারপর হয়তো একবার কোর্টেও যেতে হবে স্ট্যাম্পভেণ্ডারের কাছে। ফিরতে তো তিনটের কম হবে না। আচ্ছা, আসি।

—আজ্ঞে আসুন, প্রণাম হই।

রাণাঘাট কোর্টে বিপিনের স্বগ্রামের নিবারণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নিবারণ মুখুজ্জে বিপিনকে দূর হইতে দেখিয়া কাছে আসিলেন, বিপিন প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

—কে বিপিন ? কোর্টের কাজে এসেছিলে বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা। আপনি ?

—আমিও এসেছিলাম একবার একটা কাগজের নকল নিতে। আমার আবার একটু ব্রহ্মোত্তর জমি নদীয়ার এলাকায় পড়ে কিনা ? সেজন্যে রাণাঘাট ছুটোছুটি করতে হয়। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা। দেখা হ'ল ভালই হ'ল। একটু আড়ালের দিকে চল যাই, গোপনীয় কথা।

বিপিন একটু কৌতূহলী হইয়া নিবারণ মুখুজ্জের সহিত লোকজন হইতে একটু দূরে গেল।

—বাবা, কথাটা খুব গুরুতর। তোমার বাড়ীর সম্বন্ধেই কথা। তুমি থাক বার মাস বিদেশে, নিশ্চয়ই তোমার কানে এখনও ওঠেনি। বড্ড গুরুতর কথা আর বড় দুঃখের কথা।

বিপিন আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল। বাড়ীর সম্বন্ধে কি গুরুতর, আর কি দুঃখের কথা ! প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া গেল—কাকাবাবু, বেঁচে আছে তো ?

তাহার বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিবার ভঙ্গিতে সে আকুল ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিবারণ মুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিবারণ মুখুজ্জে বলিলেন, না না, সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বলেই ফেলি। এই গিয়ে তোমার বোনকে নিয়ে গাঁয়ে কথা উঠেছে - মানে ওপাড়ার পটলের সঙ্গে সর্ব্বদাই মেলামেশা করে আসছে তো অনেকদিন থেকেই—সম্প্রতি একদিন নাকি সন্দেবেলা তোমাদের বাড়ীর পেছনে বাগানে কাঁটালতলায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল

—যে দেখেছিল সে-ই বলেছে। এই নিয়ে গাঁয়ে খুব কথা চলছে। এই সময় তোমার একবার যাওয়া খুব দরকার বলে মনে করি।

বিপিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তাহার বোন অসঙ্গত কিছু করিতে পারে ইহা তাহার মাথায় আসে না। তাহাকে বিপিন নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া জানে—আচ্ছা, যদি পটলের সঙ্গে কথাই ব'লিয়া থাকে তাহাতে দোষ বা কি আছে?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল বাড়ী যাওয়াটা খুব দরকার বটে এসময়। পলাশপুরে এমন কোনো জরুরী দরকার নাই, যে আজ না ফিরিলেই চলিবে না। বরং একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা যাক।

৪

বৈকালের দিকে বিপিন গ্রামে পৌছিল। বাড়ী ঢুকিতেই প্রথমে মনোরমার সঙ্গে দেখা। স্বামীকে হঠাৎ এভাবে আসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—কখন এলে, কোন্ গাড়ীতে? চিঠি তো দাও নি? ভাল আছ তো?

বিপিন পুঁটুলিটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—ধরো এটা। মার জন্যে বাতাসা আছে, ভেঙ্গে না যায় দেখো। লেবেঞ্চুস্ আছে, ছেলেপিলেদের ডেকে দাও। তোমরা কেমন আছ? বলাই কোথায়?

—বলাই গিয়েছে মাছ ধরতে।

—কেমন আছে সে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

—কেমন আছে বলাই?

—ভালো না। আমার কথা কেউ তো শোনে না, যা পাচ্চে তা খাচ্চে, রোজ নদীর ধারে মাছ ধরতে গিয়ে জলের হাওয়ায় বসে থাকে। জর হয় রোজ রাত্তিরে—তার ওপর খায়-দায়। ওষুধবিষুধ কিছুই না।

—মুখ হাত পা কেমন আছে?

—বেজায় ফোলা। এলেই দেখে বুঝতে পারবে। আর একটা কথা শুনেচ?

—হ্যাঁ, নিবারণ কাকার মুখে শুনলাম রাণাঘাটে। কি ব্যাপার বলো তো?

—যা শুনেছ, সব সত্যি। আমার কথা ঠাকুরঝি একেবারে শোনে না—কতদিন বারণ করেছি। মাকেও বলে দিইছি, মা শুনেও শোনেন না। এখন গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছে—এখন আমার কথা হয় তো তোমাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে। দাসী-বাঁদীর মত এ বাড়ীতে আছি বই তো নয়?

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও না আগে। তুমি

নিজের চোখে কিছু দেখেছ?

—কত দিন। তোমাকে বললেই তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলিনি—যাকে বলে কি হবে—বলা না বলা দুই সমান।

—আচ্ছা থাক্। বীণাকে একবার ডেকে দাও—আমি তাকে দুএকটা কথা বলি। তুমি এ ঘর থেকে যাও।

কিন্তু মনোরমা ঘর হইতে চলিয়া গেলেও বীণার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ ব্যাপার লইয়া সে কি বলিবে? বীণা তাহার ছোট বোন। কখনও তাহাকে সে রূঢ় কথা জীবনে বলে নাই—বিশেষ করিয়া বীণা বিধবা হইবার পরে বিপিন সাধ্যমত চেষ্টা করে ছেলেমানুষ বীণাকে কি করিয়া একটুখানি সুখী করা যায়। বিপিন ভাবিতে লাগিল—বীণার দোষ কি? অল্প বয়সে বিধবা! ওর মনের কোন্ সাধই বা পুরেছে? পটলকে হয়তো ওর চোখে ভাল লেগেছে—সম্পূর্ণ সম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই পটলের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, আর কেউ না জানুক, আমি জানি। যদি পটলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয় —তা আমি বারণ করি বা কি ভাবে!…তবে বীণা ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানে! কত বিপদ আছে কত দিকে, সে কি তার খবর রাখে? না—আমার কাজ নয়। মনোরমাকে দিয়ে বলাতে হবে।

হঠাৎ তাহার মনে আসিল মানীর কথা।

সেও তো এই রকম ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। মানী বিবাহিতা, তার স্বামী শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র যুবক। তবে মানী কেন তাহার সহিত কথা বলিতে আসে? কেন তাহাকে দেখিবার জন্ম মানীর এত আগ্রহ?

এসব কথার কোন মীমাংসা নাই। মীমাংসা হয় না। এই যে সে আজ বাড়ী আসিয়াছে—সারা পথ. সারা ট্রেনে কাহার কথা সে ভাবিয়াছে?

নিজের মনকে চোখ ঠারা চলে না। ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে? তাহার বাবা কি করিয়াছিলেন?

যাক ওসব কথা। মনোরমাকে দিয়া বীণাকে বলাইতে হইবে। গ্রামে কোন কুৎসা রটে বীণার নামে—তাহা কখনই হইতে দেওয়া চলিবে না। আবশ্যক হইলে বীণাকে এখান হইতে সরাইয়া খোপাখালি কাছারিতে নিজের কাছে কিছুদিন না হয় রাখিবে।

এই সময় বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকছিলে দাদা?

বিপিন চোখ তুলিয়া বীণার দিকে চাহিল। অনেক দিন ভাল করিয়া সে বীণাকে দেখে নাই। বীণার মুখশ্রী আজকাল এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে বীণা! চোখ দুটি যেমন ডাগর. তেমনি স্নিগ্ধ। মুখখানি এখনও ছেলেমানুষের মতই। এ চোখে ও মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে?

বিপিন বলিল—বলাই কোথায়?

—ছোড়দা মাছ ধরতে গিয়েছে।

—তোর শরীর ভাল আছে তো ?

—হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে ?

—এম্‌নি। রাণাঘাটে এসেছিলাম কাজে—ভাবলুম একবার বাড়ী ঘুরে যাই। হ্যাঁ, মা কোথায় ?

—মা বড়ির ডাল ধুতে গিয়েছেন পুকুরের ঘাটে। ডেকে আনবো ?

—থাক এখন ডাকার দরকার নেই, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি বল না ?

—তুই পটলের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করিস্ নে। গাঁয়ে ওতে পাঁচরকম কথা উঠছে —আমরা গরীব লোক, আমাদের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

বিপিন কথাটা মরীয়া হইয়া বলিয়াই ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারিল না, পটলের কথা বলিতেই বীণার চোখ মুখের ভাব যেন কেমন হইয়া গেল—যে ভাব সে বীণার মুখে-চোখে কখনও দেখে নাই।

মনোরমার কথা তাহা হইলে মিথ্যা নয়—নিবারণ মুখুজ্জেও বাজে কথা বলেন নাই। পূর্ব্বে হইলে হয় তো বিপিন বীণার এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিত না—কিন্তু গত কয়েক মাসের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বিপিন এসব লক্ষণ বুঝিতে পারে এখন।

বীণা কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবেই বলিল—যা বলো দাদা। পটল-দা আসে, কথাবার্ত্তা বলে—তাই বলি। না হয় আর বলবো না।

বিপিন বুঝিল ইহা মিথ্যা আশ্বাস। বীণা ছলনা করিতেছে—পটলের সঙ্গে তাহার কিছুই নাই, ইহা সে দেখাইতে চায়—আর একটি খারাপ লক্ষণ। ছেলেমানুষ বীণা ভাবিয়াছে ইহাতেই দাদার চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে- যাইতও যদি মানীর সঙ্গে পলাশপুরের বাড়ীতে তাহার দেখা না হইত।

ইহা ঠিকই যে বীণা মিথ্যা কথা বলিতেছে। পটলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সে বন্ধ করিবে না। লুকাইয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। বিপিন বুঝিল, সে বীণা আর নাই, তাহার ছোট বোন সরলা ছেলেমানুষ বীণা এ নয়, এ প্রেমমুগ্ধা তরুণী নারী, প্রেমিকের সহিত মিশিবার সুবিধা খুঁজিতে সব রকম ছলনা এ অবলম্বন করিবে। সহোদরা বটে, কিন্তু বীণাকে আর বিশ্বাস নাই। বীণা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বিপিন তবুও হাল ছাড়িল না। বীণাকে কাছে বসাইয়া তাহাদের বংশের পূর্ব্ব গৌরব সবিস্তারে বর্ণনা করিল। গ্রাম্য কুৎসা যে ভয়ানক জিনিস, তাহাতে একটি গৃহস্থের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, দু একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বীণা খানিকক্ষণ মন দিয়া শুনিল - কিন্তু ক্রমশঃ সে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে, দু একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে সাহস পাইতেছে না—দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলে যেন বাঁচে—এরূপ ভাব তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই সময়ে বলাই আসিয়া পড়াতে বিপিনের বক্তৃতা আপনা আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। বলাই ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা, কখন এলে? মাছ ধরে এনেছি দেখবে এস—মস্ত একটা শোল মাছ আর দুটো ছোট ছোট বান—

বিপিন বলাইয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ আরও ফুলিয়াছে, শরীরে রক্ত নাই—পায়ের পাতা বেরিবেরি রোগীর মত দেখিতে, চোখের কোণ সাদা। অথচ এই চেহারা লইয়া বলাই দিব্য মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে, খাওয়া-দাওয়া করিতেছে।

ভগবান এ কি করিলেন? চারিদিক হইতে তাহার জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে বাকি নাই। বলাই বাঁচিবে না। নেফ্রাইটিসের রোগীর শেষ অবস্থা তাহার চেহারায় পরিস্ফুট—অথচ সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বিপিন বলাইকে কিছু বলিল না। বলিয়া কোন ফল নাই—যেমন বীণাকে বলিয়া কোন ফল নাই। কেহই তাহার কথা শুনিবে না। সে চাকুরি করিতে বাহির হইলেই উহারা যাহা খুশী তাহাই করিবে। এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে না—সবাই স্বার্থপর, যাহার যাহা ভাল লাগে—সে তাহাই করে, অন্ত কারো মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারাজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে—এখনও করিতেছে—অপরের দোষ দিয়া লাভ কি?

দুপুরের পর সে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি?

—না ঘুমুই নি। বসো।

মনোরমা বিছানার এক কোণে বিপিনের মাথার কাছে বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—বীণাকে বল্লে কিছু নাকি?

—বলেছি।

—ও কি বল্লে?

—বল্লে, পটলের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

—একটা কথা বলি শোন। ওরকম করলে হবে না কিছু। বীণা ঠাকুরঝি যাই বলুক, পটলের সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তুমি বাড়ী থেকে বেরুতে যা দেরি। তার চেয়ে এক কাজ করো, পটলকে একবার বলে যাও কথাটা। ওকে ভয় দেখাও, বাড়ী আসতে বারণ করে যাও—তাতে কাজ হবে। বুঝলে আমার কথা?

বিপিন মনে মনে মনোরমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। মেয়েমানুষের মন সে অনেক বেশি বোঝে তাহার নিজের চেয়ে।

মনোরমা আবার বলিল—না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তাদের সামনে পটলকে দুকথা বল। এ বাড়ী আসতে মানা করে দাও। তাতে দুকাজই হবে। গাঁয়ের লোক

জানুক তুমি বাড়ী এসে দুজনকেই শাসন করে দিয়েছ—পটলেরও একটা ভয় আর লজ্জা হবে—সে হঠাৎ এ বাড়ীতে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তাতে একটা বিপদ আছে। গাঁয়ের লোকের কথা আমিই বা অনর্থক গায়ে মেখে নিতে যাই কেন? তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে না?

—কিছু উল্টো উৎপত্তি হবে না। বেশ, ভয় দেখিয়ে, না হয় মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলো পটলকে। যখন এরকম একটা কথা উঠেছে—তখন ভাই আমাদের বাড়ী আর তোমার যাওয়া-আসাটা ভাল দেখায় না—এই ভাবে বল।

—তাই তবে করি। এদিকে আর একটা কথা বলি শোনো। বলাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। আজ দেখে বুঝলাম ও আর বেশী দিন নয়।

—বল কি গো? অমন বলতে নেই।

—আর বলতে নেই! মনোরমা, সামনে আমার অনেক বিপদ আসছে আমি বুঝতে পেরেছি। এই বীণার ব্যাপার, বলাইয়ের চেহারা—এ সব দেখে তোমারই বা কি মনে হয়? আমার এখন পলাশপুরে যাওয়া হয় না।……

সেই রাত্রেই বিপিনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইল। শেষ রাত্রি হইতে বলাই হঠাৎ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে চিৎকার করে, মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। প্রতিবেশীরা অনেকে দেখিতে আসিলেন—নানারকম টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করিলেন—কিছুতেই কিছু হইল না। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বলাইএর মুখের বুলিই হইল—জলে গেল, জলে গেল!……যন্ত্রণায় বলাই যেন পাগলের মত হইয়া উঠিল, মুখে যাহা আসে বকে, হাত-পা ছোঁড়ে, আর কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতে যায়।

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিল। কত রকম তেল-পড়া, জল-পড়া, ঝাড়-ফুঁক যে যাহা বলে তাহাই করা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় হইতে বলাইয়ের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—কি করচো?

মনোরমার চক্ষু রাত জাগিয়া লাল, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—বৃদ্ধা শাশুড়ী রাত জাগিতে পারেন না—বিপিনও আয়েসী লোক, রাত একটা পর্য্যন্ত কায়ক্লেশে জাগিয়া থাকে—তারপর গিয়া শুইয়া পড়ে। মনোরমা সারারাত জাগিয়া থাকে রোগীর পাশে - আর থাকে বীণা।

মনোরমা বলিল—গোয়ালে আজ চারদিন ঝাঁট পড়েনি, গোয়ালটা একটু ঝাঁট দিচ্ছি।

বিপিন বলিল—গোয়াল ঝাঁট থাকুক। সকাল সকাল নেয়ে এসে দুটো যা হয় রেঁধে ছেলেপিলেদের খাইয়ে দাইয়ে নাও—বীণাকে আর মাকে খাইয়ে দাও। বলাইয়ের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন গো—ঠাকুরপোর অবস্থা খারাপ?

—তা দেখে বুঝতে পারছ না? আজই হয়ে যাবে। আর দেরি নেই। শীগ্‌গির করে ঘাটে যাও।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিল—কেঁদে কি হবে, এখন যা করবার আছে করে ফেল। মায়ের সামনে যেন কেঁদো না, ঘাটে যাও চলে।

মনোরমার একটা অভ্যাস সংসারের মধ্যে যে যে আছে তাহাদের সকলকেই সে ভালবাসে, স্নেহ করে—মা, বীণা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপো,—সকলেরই সুখসুবিধা দেখা তাহার চিরকালের অভ্যাস। এই সাজানো সংসারের মধ্য হইতে বলাই ঠাকুরপো চলিয়া গেলে সংসারের কতখানি চলিয়া যাইবে!··· সে চিন্তা মনোরমার পক্ষে অসহ্য।

বিপিন ভাইয়ের সামনে গিয়া বসিল। বীণাকে বলিল—যা বীণা, ঘাটে যা—আমি আছি বসে। মাকে নিয়ে যা।

সত্যি, এতটুকু মেয়ে বীণা কয়দিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সমানে রাত জাগিতেছে—মা ও উহার বৌদিদির সঙ্গে। দেবীর মত সেবা করিতেছে ভাইয়ের, অথচ কি অভাগিনী! জীবনে সে কখনো যাহা পায় নাই—অথচ যার জন্ত তার বালিকা মন বুভুক্ষু, অপরের নিকট হইতে তারই এককণা পাইবার নিমিত্ত অভাগিনীর কি ব্যর্থ আগ্রহ! নিজেকে দিয়া বিপিন বোঝে এ নিদারুণ বুভুক্ষা।

সকলে আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া বলাইয়ের কাছে বসিল। বলাইয়ের গত দুই দিন কোনো জ্ঞান ছিল না—যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ চিনিতে পারে না। বিপিনের মা খুব শক্ত মেয়ে—তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত তাঁহার চোখে জল পড়ে নাই—বরং বীণা ও মনোরমা কাঁদিলে তিনি কালও বুঝাইয়াছেন। আজ কিন্তু দুপুরের পর হইতে তিনি অনবরত কাঁদিতেছেন। বীণা ডোবার ধারে বাসন লইয়া গিয় ছিল।

ডোবার ওপারের ঘাটে রায়-বৌ ও নিবারণ মুখুজ্জের বড়মেয়ে নলিনী কথা বলিতেছিল। নলিনী হাত পা নাড়িয়া বলিতেছে—তা হবে না ওরকম? বাড়ীতে বিধবা মেয়ের ওই রকম অনাচার ভগবান সহ্যি করেন! জলজ্যান্ত ভাইটা ধড়ফড় করে মরলো চোখের সামনে। এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন—অনাচার ঢুকলে সে সংসারে মঙ্গল হয় কখনো!

বীণা জলে নামিতে পারিল না—জলের ধারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

উহারা বীণাকে দেখিতে পায় নাই—বীণা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসন লইয়া চলিয়া আসিল—চোখের জল সামলাইতে পারিল না ফিরিবার সময়। পটলদা'র সঙ্গে কথা বলা অনাচার! এ ছাড়া আর কি অনাচার সে করিয়াছে? ভগবান তো সব জানেন। তাহারই পাপে ছোড়দা মরিতে বসিয়াছে—একথা যদি সত্য হয়—সে পিতল-কাঁসা হাতে শপথ করিয়া বলিতেছে, আর কোন দিন সে পটলদার মুখ দেখিবে না। ভগবান ছোড়দাকে বাঁচাইয়া দিন।

কিন্তু ভগবান তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। বৈকাল পাঁচটার সময় বলাই মারা গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বলাইয়ের দাহকার্য্য সম্পাদন করিয়া বিপিন রাত্রি দুপুরের পর বাড়ী আসিল। বাড়ীশুদ্ধ সবাই চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওপাড়া হইতে কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া ছিলেন, বিপিনের মাকে নানারকম বুঝাইতেছিলেন—তিনি বুঝিলেন, এ সময় সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা, সুতরাং হুঁকা হাতে রোয়াকের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন বলিল, কাকা, কখন এলেন? তামাক পেয়েছেন?

—আর বাবা তামাক! তামাক তো আছেই। এখন যে বিপদে পড়ে গেলে তা থেকে সামলে উঠলেই বাঁচি। বৌদিদিকে বোঝাচ্ছি সেই সন্দে থেকে, উনি মা, ওঁর কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না—এসো বাবা—পরে বিপিনের চোখে জল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন—আহা হা, তুমি অধৈর্য্য হোলে চলবে কেন বাবা? এদের এখন তোমাকেই ঠাণ্ডা করতে হবে—বোঝাতে হবে—বৌদিদি, বৌমা, বীণা—তোমাকে দেখে ওরা বুক বাঁধবে—তোমার চোখের জল পড়লে কি চলে? ··

এমন সময় আরও দু-পাঁচজন প্রতিবেশী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। একজন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিনের মাকে বোঝাইতে গেলেন। একজন বিপিনের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন।

—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো সব। সকলেরই শরীর খারাপ, কেঁদেকেটে আর কি হবে বলো বাবা, যা হবার তা হয়ে গেল। সবই তাঁর খেলা, দুনিয়াটাই এইরকম বাবা, আজ আমার, কাল আর একজনের পালা—শুয়ে পড়ো—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী রাত্রি এখানেই কাটাইবেন। ইহারা একা থাকিবে তাহা হয় না। আজ রাত্রে অন্ততঃ বাড়ীতে অন্য কেহ থাকা খুব দরকার। বিপিন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কৃষ্ণলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় রাত কাটিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন—তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ বাবাজি?

—আজ্ঞে ছুটি তো নয়। রাণাঘাট কোর্টে এসেছিলাম কাজে-সেখান থেকে বাড়ী এলাম একদিনের জন্যে। তারপর তো বলাইয়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠলো আর যাই কি করে—আটকে পড়লাম। তবে জমিদার বাবুকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি—এ কথাও লিখে দেবো কাল। এখন ধরুন এদের ফেলে হঠাৎ কি করে বাড়ী থেকে যাই? মায়ের ওই অবস্থা, আমি কাছে থাকলেও একটা সান্ত্বনা, তারপর ছোঁড়াটার শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যবস্থাও আমি না থাকলে কি করে হয় বলুন?

—শ্রাদ্ধশান্তি আর কি, তিলকাঞ্চন করে বারশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও—এ তো জাঁকিয়ে শ্রাদ্ধ করার কিছু নেই। কোনরকমে শুদ্ধ হওয়া।

সকালের দিকে মা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিপিন বাড়ী হইতে বাহির

হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ীতে যাইতে ভাল লাগে না —সকলে সহানুভূতি দেখাইবে, 'আহা' 'উঁহুঁ' করিবে —বর্ত্তমান অবস্থায় বিপিনের তাহা অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আইনদ্দির বাড়ীতে গেল, পাশের গ্রামে। আইনদ্দির বয়স একশত বছর হইলেও (অন্ততঃ সে বলে) বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। বাড়ীর উঠানে একটা আমড়া-গাছের ছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধ জালের সুতা পাকাইতেছিল।

--বাবাঠাকুর সকালে কি মনে করে? বোসো—তামাক খাবা? সাজি দাঁড়াও। আইনদ্দির সঙ্গেই তামাক খাইবার সরঞ্জাম মজুত। সে চকমকি ঠুকিয়া সোলা ধরাইয়া হাতে করিয়া সোলার টুকরাটি কয়েকবার দোলাইয়া লইয়া কলিকায় কাঠকয়লার উপর চাপিয়া ধরিল।

বিপিন বলিল—চাচা, দেশলাই বুঝি কখনো জ্বালও না?

—ও সব আজকাল উঠেছে বাবাঠাকুর—ও সব তোমাদের মত ছেলেছোকরারা কেনে। সোলা চকমকির মত জিনিস আর আছে? আপনি ভাল হয়ে বোসো। সেকালের দু একটা গল্প করি শোনো। ওই যে খ্যাথ্‌চো অশথ গাছ, ওর পাশের জমিটার নাম ছেল ফাঁসিতলার মাঠ। নীলকুঠীর আমলে ওখানে লোকের ফাঁসি হোত। আমার জ্ঞানে আমি ফাঁসি হতে দেখেছি। তুমি আজ বলচো দিশলায়ের কথা—দিশলাই ছেল কোথায় তখন? তুঁষের আর ঘুঁটের আগুন মাগীন্‌রা মালসা পুরে রেখে দিত ঘরে—আর পাকাটির মুখে গন্ধক মাখিয়ে এক আঁটি করে রেখে দিত মাল্‌সার পাশে। এই ছেল সেকালের দিশলাই বাবাঠাকুর—তবে তামাক খাতি সোলা চকমকির রেওয়াজ ছেল। চাঁদমারির বিলি সোলার জঙ্গল—এক বোঝা তুলে এনে শুকিয়ে রাখো, ভোর বছর তামাক খাও। একটা পয়সা খরচ নেই আর এখন? একটা দিশলাই এক পয়সা, একটা দিশলাই দেড় পয়সা—হুঁ—

কথা শেষ করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনদ্দি একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—আচ্ছা চাচা, তুমি তো অনেক মন্তরতন্তর জানো—মানুষ ম'লে তাকে এনে দেখাতে পারো?

আইনদ্দি বিপিনের হাতে কলিকা দিয়া বলিল—ধরো, একটা সোলা ফুটো করে তোমার হুঁকো বানিয়ে দিই। মন্তরতন্তর অনেক জানি বাবাঠাকুর তোমার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে। শূ'ন্ত ভরে উড়ে যাবো, আগুন খাবো, কাটা মুণ্ডু জোড়া দেবো—

বিপিন এই কথা অন্ততঃ ত্রিশবার শুনিয়াছে বৃদ্ধের মুখে।

—কিন্তু মরা মানুষ আনতে পারো চাচা?

—মলে কি মানুষ ফেরে বাবাঠাকুর? আসমানে তারা হয়ে ফুটে থাকে—নয়তো শেয়াল কুকুর হয়ে জন্মায়। তবে একটা গল্প বলি শোনো—

ইহার পর আইনদ্দি একটা খুব বড় আজগুবি গল্প ফাঁদিল—কিন্তু বিপিনের সে দিকে মন

ছিল না—সে আইনদ্দির বাড়ীর উত্তরে সুবিস্তৃত বেল্‌তার মাঠ ও চাঁদমারির বিলের ধারের সবুজ পাতি ঘাসের বনের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। যখনই এখানটিতে আসিয়া বসে, তখনই তাহার মনে কেমন অদ্ভুত ধরণের সব ভাব আসিয়া জোটে।

বলাই চলিয়া গেল!···কতদূরে, কোথায় কে জানে? সে-ও একদিন যাইবে, বীণাও যাইবে, মনোরমাও যাইবে···মানী···মানীও যাইবে।

কেন খাটিয়া মরা? কেন দুমুঠো অন্নের জন্য অনর্থক লোকপীড়ন করিয়া পরের অভিশাপ কুড়ানো? আজ গেল বলাই···কাল তাহার পালা।

একটা জিনিস তাহার মনে হইতেছে। মানী তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল···মানীর নিকট একজন্য সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

বলাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। গরীব লোক এমনি কত আছে এই সব পাড়াগাঁয়ে—যাহারা অর্থের অভাবে রোগের চিকিৎসা করাইতে পারে না। সে ডাক্তারি বই পড়িয়া কিছু শিখিয়াছে, বাকিটা না হয় মানীকে বলিয়া, তাহার দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তাহার অধীনে কিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লইবে। ডাক্তারিই সে করিবে—প্রজাপীড়ন কার্য্য তাহার দ্বারা আর চলিবে না।

তাহার বাপ বিনোদ চাটুজ্জে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেষ্ট জমিজমা করিয়াছিলেন—যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি, যথেষ্ট খাতির। আজ সে সব কোথায় গেল? বিনোদ চাটুজ্জে আজ মাত্র সতেরো আঠারো বছর মারা গিয়েছেন—ইহার মধ্যেই তাঁহার পুত্রবধূ খাইতে পায় না—পুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—বিধবা কন্যার সম্বন্ধে গ্রামে নানা বদনাম ওঠে। অসৎ উপায়ে উপার্জনের পয়সাই বা আজ কোথায়—কোথায় বা জমিজমা।

মানী তাহার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে নানাদিক দিয়া।

জীবনে মানীকে সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে চায় বহুবার, বহুবার। সারাজীবন ধরিয়া।

বিপিন উঠিল। আইনদ্দি বলিল—কি নিয়ে যাবা হাতে করে বাবাঠাকুর? দুটো মুরগীর আণ্ডা নিয়ে যাবা? না, তোমরা বুঝি ও খাও না। তবে দুটো শাকের ডাঁটা নিয়ে যাও। ভাল শাকের ডাঁটা হয়েল বাবাঠাকুর, সুমুন্দিদের গরুর জন্যি বাড়তি পারলো না। ও মাখন—হ্যাদে ও মাখন—

বিপিন প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত সুবিস্তীর্ণ বেল্‌তার মাঠের দিকে চাহিয়া ছিল। চমৎকার জীবন! এই রকম বাঁশতলার ছায়ায়···এই রকম সকালের বাতাসে বসিয়া চুপ করিয়া মানীর কথা ভাবা···

কিন্তু ইহা জীবন নয়। ইহা পুরুষমানুষের জীবন নয়। ৺বিনোদ চাটুজ্জে পুরুষমানুষ ছিলেন—তিনি পৌরুষদীপ্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—হৈ হৈ, হল্লা, কঠিন কাজ, মামলা, মোকদ্দমা, জমিদারী শাসন, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিপিন জানে সে এই সব কাজের উপযুক্ত নয়। সে শাসন করিতে পারে না তাহা নয়—সে দুর্ব্বল বা ভীরু নয়—কিন্তু তাহার ধাতে সহ্য হয়

না ওসব। বিশেষতঃ মানীর সংস্পর্শে আসিয়া সে আরো ভাল করিয়া এসব বুঝিয়াছে। জীবনে অনেক ভাল জিনিস আছে—ভাল বই, ভাল গান, ভাল কথা—খাওয়া-দাওয়ার কথা মামলা মোকদ্দমা বা পরচর্চ্চা ছাড়াও আরও ভাল কথা জগতে আছে, মানী তাহাকে দেখাইয়াছে।

জমিদারী শাসন ছাড়াও পুরুষমানুষের জীবন আছে—রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষমানুষের কাজ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেই সে।

২

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। বিপিনকে বলাইয়ের শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ী থাকিতে হইল। বীণার ব্যাপার একটু আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইল বিপিনের কাছে। মনোরমা প্রায়ই বলে, দুজনে গোপনে দেখাশোনা এখনও করে—মনোরমা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বীণাকে বিপিন এজন্য তিরস্কার করিয়াছে, কড়া কথা শোনাইয়াছে, বীণা কাঁদিয়া ফেলে ছেলেমানুষের মত, বলে—ও সব মিছে কথা দাদা। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমি পটলদার সঙ্গে আর দেখাই করিনে।

কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল।

বলাইয়ের মৃত্যুর পর বীণার ধারণা হইল, পটল-দার সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার এ লোভ ভাল নয়, এ সব অনাচার, বিধবা মানুষের করা উচিত নয় যাহা, তাহা সে করিতেছে বলিয়াই আজ ভাইটা মরিয়া গেল।

বলাই মারা যাওয়ার ছ'দিন পরে পটল একদিন তাহাদের বাড়ীতে আসিল। বীণার মা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল—বলাইয়ের মৃত্যু-সংক্রান্ত কথাই বেশী। বীণা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে পটল-দা জানালার দিকে আগ্রহ-দৃষ্টিতে চাহিতেছে। অন্য অন্য বার এতক্ষণ বীণা মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়, পটলের সঙ্গে কথা শুরু করে—কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। আর কখনো সে পটলদার সামনে বাহির হইবে না। বেড়াইতে আসিয়াছ, ভালোই, মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করো, চলিয়া যাও—আমার সঙ্গে তোমার কি? বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি?

প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া পটল যেন নিরাশ মনে চলিয়া গেল। পটল যেমন বাড়ীর বাহির হইল—বীণার তখন মনে পড়িল ছাদের উপর ওবেলা বৌদিদির রাঙা পাড় শাড়ীটা রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—তুলিয়া আনা হয় নাই। ছাদে উঠিয়া কাপড় তুলিতে তুলিতে সে নিজের অজ্ঞাতসারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই তো পটলদা চলিয়া যাইতেছে···তেঁতুল

গাছটার কাছে গিয়াছে···সে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে···যদি পটল-দা হঠাৎ ফিরিয়া চায়? বীণা কি লজ্জায় পড়িয়া যাইবে! পটল-দাকে একটা পান সাজিয়া দিলে ভাল হইত—দেওয়া উচিত ছিল, মা যেন কি! লোক বাড়ীতে আসিলে তাহাকে শুধু মুখে বিদায় করিতে নাই। ইহা ভদ্রতা। তাহাকে ডাকিয়া পান সাজিয়া দিতে বলিলেই সে পান দিত।

কাপড় তুলিয়া বীণা নামিয়া আসিল। তাহার মন খুব হালকা—ভালই হইয়াছে, আজ সে বুঝিয়াছে—পটলের সঙ্গে দেখা না-করা এমন কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই হয়। একটা কঠিন কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে।

বলাইয়ের শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে পটল আর একদিন আসিল। বীণা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, মুখ তুলিয়া কে আসিতেছে দেখিয়াই সে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তাহার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়াই মনে হইল, ছিঃ, অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসা উচিত হয় নাই।—পটলদা কি দেখিতে পাইয়াছে? বোধ হয় পায় নাই, কারণ তখনও সে তেঁতুলতলার মোড়ে; তেঁতুলগাছের গুঁড়িটার আড়ালে। যাহা হউক, পটল-দা তো বাঘ নয়, ভালুকও নয়—অমনভাবে ছুটিয়া পলাইবার মানে হয় না। সহজভাবে মায়ের সামনে গিয়া কথা বলাই তো ভালো। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তোলাই ভালো।

কিন্তু বীণা একদিনও বাহিরে আসিল না—এমন কি যখন পটল জল খাইতে চাহিল—বীণার মা বলিলেন, ওমা বীণা, তোর পটলদাদাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বীণা নিজে না গিয়া বিপিনের বড়ছেলে টুনুর হাতে দিয়া জলের গ্লাস পাঠাইয়া দিল।

তাহার হাসি পাইতেছিল। মনে মনে ভাবিল—সব দুষ্টুমি পটল-দার। জলতেষ্টা না ছাই পেয়েছে! আমি আর বুঝিনে ও সব যেন!

সে যাইবে না, কখনও যাইবে না। জীবনে আর কখনো পটল-দার সঙ্গে দেখা করিবে না। শেষ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

৩

ইহার পাঁচ ছ'দিন পরে বীণা একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে শুকাইতে দেওয়া মুসুরির ডাল তুলিতে গিয়াছে—ছাদের আলিসার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পটল-দা নীচে বাগানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া ওপরের দিকে চাহিয়া আছে।

বীণার সমস্ত শরীর দিয়া যেন কি একটা বহিয়া গেল! হঠাৎ পটল-দাকে এ ভাবে দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ কয়দিন বীণা দুপুরে ও বিকালের দিকে নির্জ্জনে থাকিলেই ভাবিয়াছে পটল-দার কথা। অন্য কিছু নয়, সে শুধু ভাবিয়াছে এই কথা—আচ্ছা

এই যে দু'দিন সে পটল-দার সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিল না, পটল-দা কি ভাবে লইয়াছে জিনিসটা? খুব চটিয়াছে কি? কিংবা হয়ত তাহার কথা লইয়া পটল-দা আর মাথা ঘামায় না। তাহাকে মন হইতে দূর করিয়া দিয়াছে। দিয়া যদি থাকে, খুব বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছে। পটল-দা কষ্ট পায়, তাহা বীণা চায় না। ভুলিয়া যাক্, সেই ভালো। মনে রাখিয়া যখন কষ্ট পাওয়া, ভুলিয়া যাওয়াই ভালো।

দুপুরে এ কথা ভাবিয়া বীণা দেখিয়াছে বেলা যত পড়ে সেই কথাই মনের মধ্যে কেমন একটা—ঠিক বেদনা বা কষ্ট বলা হয়তো চলিবে না—কিন্তু কেমন একটা কি হয় ঠিক বলিয়া বোঝানো কঠিন—কি বলিয়া বুঝাইবে সে ভাবটা?··· যাহোক, যখন সেটা হয়, বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে, যখন বড় তেঁতুল গাছটায় কালো কালো বাদুড়ের দল ঝাঁক বাঁধিয়া ফেরে, সন্তুদের নারকেল গাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র ওঠে, বৌদি সাঁজালের মালসা হাতে গোয়ালঘরে সাঁজাল দিতে ঢোকে, একটু পরেই ঘুঁটের ধোঁয়ায় উঠানের পাতিলেবুতলাটা অন্ধকার হইয়া যায়,—তখন ছাদের ওপর একা দাঁড়াইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বীণার যেন কান্না আসে···কোথাও কিছু যেন নাই কোথাও কিছু নাই···

এ ভাবটা সে বেশীক্ষণ মনে থাকিতে দেয় না—তখনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নীচে নামিয়া আসে। নিজের কান্নাতে নিজে লজ্জিত হয়, ভীত হয়।

অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। কাহারও নিকট একটু সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। মা নয়, বৌদিদি নয়। কাহারও কাছে কিছু বলা চলিবে না, বীণা বোঝে। এ তার নিজস্ব কষ্ট, অত্যন্ত গোপন জিনিস—গোপনেই সহ্য করিতে হইবে।

হঠাৎ এ সময় পটলদাকে এ ভাবে দেখিয়া বীণা যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পটল গাছের গুঁড়িটার দিকে আর একটু হটিয়া গেল। বীণার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল—বীণা, আমার ওপর তোমার রাগ কিসের?

বীণা এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল—রাগ কে বল্লে?

—দুদিন তোমাদের বাড়ী গেলাম, বাইরে এলে না, দেখা করলে না—রাগ নয়তো কি?

—রাগ নয় এমনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—মিথ্যে কথা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটু বাইরে আসা যায় না কি? না সত্যি বলো লক্ষ্মীটি, আমি কি দোষ করেছি?

—তুমি পাগল নাকি পটল-দা? আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসেছ আবার, লোকে দেখলে কি মনে করবে—তোমায় একদিন বারণ করে দিইছি মনে নেই! যাও বাড়ী যাও—

বীণা কথাটা বলিল বটে—কিন্তু তাহার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ আসিয়া জুটিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, জোনাকীজ্বলা অন্ধকার, সাঁজালের ঘুঁটের চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়ায় ঘনীভূত অন্ধকার।···

তাকে কেহ চায় নাই জীবনে এমন করিয়া—সে কথা কহে নাই বলিয়া ছুটিয়া আপসেওক্কা

বিছুটিবনের আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে, সাপে খায় কি ব্যাঙে খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকে নাই কখনো—কাঙালের মত, একটুখানি মিষ্ট কথার প্রত্যাশী হইয়া—বিশেষ করিয়া যখন সে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছে, সামনে বাহির হয় নাই, কথা কয় নাই—তাহার পরেও,—এক পটল-দা ছাড়া।

পটল মিনতির সুরে বলিল—কেন এমন করে তাড়িয়ে দেবে, বীণা? আমি কি করেছি বলো—

—তুমি কিছু করোনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা আর চলবে না—

—কেন চলবে না বীণা?

—কেউ পছন্দ করে না।

- কেউ মানে কে কে, শুনতে পাবো না?

—না—তা শুনে কি হবে? ধরো আমার বাড়ীর লোক। আমি তো স্বাধীন নই—তাঁরা যদি বারণ করেন, অসন্তুষ্ট হন, আমার তা করা উচিত নয়।

—তুমি আমায় ভালবাসো না?

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—আমার কথার উত্তর দাও, বীণা!

—আচ্ছা পটল-দা, ও কথার উত্তর শুনে লাভই বা কি? আমার আর তোমার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। তুমি কিছু মনে কোরো না পটল-দা, এখন বাড়ী যাও, লোকে কি মনে করবে বলো তো। সন্ধ্যেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ দেখলে বৌদি এখুনি ছাদের ওপর আসবে, তুমি যাও এখন।

—আচ্ছা এখন যাচ্ছি, কাল আসবো?

—না।

—পরশু আসব?

—না।

—কবে আসবো, আচ্ছা তুমিই বল বীণা।

—কোনোদিন না। কেন আমায় এসব কথা বলাচ্ছ পটল-দা? আমি এক কথার মানুষ—যা বলেছি, তা বলেছি। এখন যাও।

—তাড়াবার জন্যে অত ব্যস্ত কেন বীণা, যাবোই তো, থাকতে আসিনি। বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয় তবে চল্লাম—এ-ও বলে রাখছি, জীবনে আর কখনও আমায় দেখতে পাবে না।

—না পাই না পাবো, তা আর কি হবে? না পটল-দা, আর বকিও না, কথায় কথা বাড়ে, আমি নীচে নেবে যাই, বৌদিদি কি মনে করবে—কতক্ষণ ছাদের ওপর এসেছি।

পটল আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বীণা যেমন সিঁড়ির মুখে নামিতে যাইবে দেখিল অন্ধকারের মধ্যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে। বৌদিদির ভাব দেখিয়া

বীণার মনে হইল সে বেশীক্ষণ আসে নাই—এবং সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ কথা শুনিয়াছে।

আসলে মনোরমা কিছুই শুনিতে পায় নাই—কিন্তু ছাদে উঠিবার সময় বীণা কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কথা কহিতেছে জানিবার জন্য সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। এবং অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পরেই বীণা কথা বন্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইল।

মনোরমা বলিল—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি ?

বীণা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—জানিনে—সরো—রাস্তা দাও—উঠে এসে দাঁড়িয়ে তো আছ দিব্যি অন্ধকারে! বাবারে, সবাই মিলে পাও আমাকে—খেয়ে ফেল—বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গিয়া মায়ের ঘরে একখানা ছেঁড়া মাদুর এককোণে পাতিয়া সোজাসুজি শুইয়া পড়িল।

মনোরমা মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিল। বীণা আবার গোপনে পটলের সঙ্গে দেখাশুনা করিতেছে তাহা হইলে! নিশ্চয়ই পটল ও—আর কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদ হইতে চাপাস্বরে কথাবার্ত্তা বলিবে সে! ঠাকুরঝির রাগের কারণই বা কি আছে তাহা সে বুঝিয়া পাইল না! সে আড়ি পাতিয়া কাহারো কথা শুনিতে যায় নাই সিঁড়ির ঘরে। কি কথা হইতেছিল, কাহার সহিত কথা হইতেছিল তাহাও সে জানে না—তবে আন্দাজ করিয়াছিল বটে। দুশ্চিন্তায় মনোরমার রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ঠাকুরঝি দিনকতক পটলের সামনে বাহির হইত না, তাহাতে মনোরমা খুব খুশী হইয়াছিল মনে মনে। কিন্তু এত বলার পরেও আবার যখন শুরু করিল তাও আবার লুকাইয়া, তখন ফল ভাল হইবে না।

কি করা যায়, কি করিয়া সংসারে শান্তি আনা যায় ? তাহাদের বাড়ীটাকে যেন অলক্ষ্মীতে পাইয়া বসিয়াছে। দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু···অনাচার···কুৎসা কলঙ্ক··বীণা ঠাকুরঝি যে রাগ করে, নতুবা কাল দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সে বেশ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতে পারে। বলিতে পারে যে, এসব ব্যাপারের ফল কখনও ভাল হয় না। পটল বিবাহিত লোক, তাহার স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমান, বীণাকে লইয়া নাচানো ছাড়া তাহার আর কি ভাল উদ্দেশ্য থাকিতে পারে ? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ মানিয়া চলিতে হয়—বীণা বিধবা, বিশেষত ছেলেমানুষ, অনেক বুঝিয়া তাহাকে এখন সংসারে চলিতে হইবে।···কিন্তু বীণা শুনিবে কি তাহার হিতোপদেশ ?

ইহার পর পটল আর একদিন আসিল। অমনি সন্ধ্যাবেলা, অমনি ভাবে লুকাইয়া। কিন্তু এদিন বীণা গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল, ছাদে যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া যায় নাই। ছাদে গিয়াছিল মনোরমা। সিঁড়ির মুখে নামিবার সময় দেখিতে পাইল পটল কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই পটল গুঁড়ির আড়ালে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহাকেই বীণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে নাকি? মনোরমার হাসিও পাইল। ভাবিল—পোড়ার মুখো ড্যাকরার কাণ্ড ছাখো। জঙ্গলের মধ্যে এই ভর্ সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে মরছেন মশার কামড় খেয়ে। খ্যাংরা মারো মুখে—। বীণাকে সে কিছুই বলিল না নীচে নামিয়া। তাহাকে চোখে চোখে রাখিল, বীণা চুপি চুপি ছাদে যায় কিনা। ওদের মধ্যে নিশ্চয় পূর্ব হইতে বলা-কওয়া ছিল।

রাত্রে শুইবার সময় সে কৌশল করিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—আজ হয়েছে কি জানো ঠাকুরঝি, ওপরে তো ছাদে গিয়েছি সন্ধ্যের সময়—দেখি কে একজন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—ভাল করে চেয়ে দেখি—

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—পটল-দা?

মনোরমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির ধমকে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পটল-ই বটে।"

—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বৌদি, আমি কিছুই জানি নে।

বীণা কিন্তু একথা কিছুতেই বলিতে পারিল না যে সে পটল-দাকে সেদিনই আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সেকথা তাহার আর পটল-দার মধ্যে গুপ্ত থাকিবে—বাহিরের লোককে তাহা জানাইলে পটল-দার অপমান হইবে। লোকের সামনে পটল-দা'কে সে ছোট করিতে চায় না। তাহার মন তাহাতে সায় দেয় না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এত বলার পরও পটল-দা আবার আসিয়াছিল! রাত্রে শুইয়া শুইয়া কতবার পটলের উপর রাগ করিবার···দারুণ রাগ করিবার চেষ্টা করিল। ভারি অন্যায় পটল-দা'র, যখন সে বারণ করিয়া দিয়াছে, তখন কেন আবার দেখা করিবার চেষ্টা পাওয়া? ছিঃ ছিঃ, বৌদিদি না দেখিয়া যদি অন্য লোক দেখিত? পটল-দা লোক ভাল নয়। ভাল লোক নয়। খারাপ চরিত্রের লোক। ভাল চরিত্রের লোক যারা তারা এমন করে না।

আচ্ছা, একটা কথা—তাহারই সঙ্গে বা পটল-দা দেখা করিবার অত আগ্রহ কেন দেখায়? আরও তো কত মেয়ে আছে। এই অন্ধকারে·· আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া—সত্যি যদি সাপে কামড়াইত? কথাটা মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে পটলের উপর এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের সহানুভূতি আসিয়া জুটিল বীণার মনে। মাগো, পটল-দাকে সাপে কামড়াইত! না, ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহারই জন্য পটল-দাকে সাপে কামড়াইত তো? আর কেহ তো তাহার

জন্য ভাবে না, তাহার মুখের কথা শুনিবার অত আগ্রহ দেখায় না, সংসারে কে তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে ? কোন্ আলো আছে তাহার জীবনে ?···

এই শূন্য, অন্ধকার জীবনের মধ্যে তবুও পটল-দা তাহার সঙ্গে একটু কথা কহিবার ব্যাকুল আগ্রহে রাত্রি, অন্ধকার, সাপের ভয়, মশার কামড়, লোকনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া থাকে, ভাঙা কোঠার পাশের জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে বিছুটি জঙ্গল এমন ঘন যে দিনমানেই যাওয়া যায় না! তাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা ফিরিয়া গেল। চোখের দেখাও তো তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

নিজের স্বামীকে বীণা মনে করিতে পারে—খুব সামান্য, অস্পষ্টভাবে। এগার বৎসর বয়সে বীণার বিবাহ হয়। এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী থাকিতেই একদিন সে শুনিল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে, বেশ ছেলেটি। খুব অল্পদিন দেখাশোনা হইয়াছিল। কোথায় স্কুলে পড়িত, শ্বশুরশাশুড়ী তাহাকে বাড়ী বেশীদিন থাকিতে দিতেন না—স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠাইয়া দিতেন।

সে-সব আজকার কথা নয় -বীণার বয়স এখন তেইশ চব্বিশ—বারো বছর আগের কথা, স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বীণা দেখিল সে কাঁদিতেছে—হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে, বালিশের একটা ধার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে চোখের জলে।

৫

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার জো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্ত্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজ খবর যা লইবার, তিনিই লইয়া থাকেন, অন্য লোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপুর যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন ? বেরিয়ে পড়, চলে যাও এবার। তোমার দোষ একবার বাড়ী এসে চেপে বসলে তুমি নড়তে চাও না।

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকুরি গিয়েছে আজ মাস খানেক হোল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিই নি।

—চিঠির উত্তর দাও নি ? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্ছ সে ভালো খুব, না ? তোমার উপায় যে কি হবে আমি কিছু বুঝি নে বাপু! না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরি এখনও যায় নি। নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়।

—বেরিয়ে পড়্‌বো কাকা, তবে সে দিকে নয়। আমি ডাক্তারি করবো ভেবে রেখেচি অনেক দিন। ওই সোনাতনপুর, কামার গাঁ, শিপ্‌লিপাড়া এ সব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসব অজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুরে বসবো ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বসবো। দেখি কি হয়। জমিদারী শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর করচি নে কাকা। বলাই মারা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেচি ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদ্‌খেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

—ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথা বলচেন, কেন বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদার বাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারি বই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সেই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল, তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে—ও-ই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটিও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাই বলিবার ঝোঁক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথা বলা। কৃষ্ণকাকার সামনে!

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদার বাবুর মেয়ে? বিয়ে হয়েছে? তোমার সঙ্গে কি ভাবে আলাপ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে বৈকি। বাইশ তেইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কি না! বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ী ছেলেবেলায় যেতাম, তখন থেকেই আলাপ। একসঙ্গে খেলা করেচি। এখনও আমাকে যত্নআত্যি করে বড্ড, আর কিসে আমার ভাল হয় সর্ব্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার স্বরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য্য হইয়া উঁহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, বিপিন আবার দেখিল সে মানীর সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেন অদ্ভুত নেশা! মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরত তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা। মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিস চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে, লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন?

৬

দিন পনেরো পরে।

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বললেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েচে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্ছি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর-ওর বাড়ী থেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়েমানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আর কি করি, কাল থেকে তাই করবো! ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখে দেখতে পারবো না!

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সে ঝাঁজের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারবো না তো। না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ী ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে! চাকুরি তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরি ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তর দিকের ভাঙা জানালাটার ধারেই তক্তপোশখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তপোশের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরের কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারীর ক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল। এখন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারীর ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্-বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার সহানুভূতি হইল। বেচারী অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের মেয়ে,

তাহাদের বাড়ীতে অনেক আশা করিয়াই উহার জ্যাঠামশাই বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতে পায় না পেট ভরিয়া দুবেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বৌ-ঝিয়ের সঙ্গে কমই মেশে, কারণ গরীব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ীর আঁচলটা মাদুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যই কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ী থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবো ভেবেছি। তুমি কি বলো? পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষীবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছু পাবো। তুমি কি বলো?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিস বটে। সে একটু আশ্চর্য্য হইল, খুশীও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি?

—বই পেয়েছিলাম জমিদার-বাড়ীর ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ী।

মনোরমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি? লাইব্রেরি তো বলে! আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠীমা বই আনাতেন, আমরা দুপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হোলো, হোলো। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো না কেন সেখানে? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পুজোর পরেই নিয়ে আসবো এখন। কি বলো?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন্ মুখ নিয়ে? নিজের বাবা মা থাকলে অন্য কথা ছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছ। শুধু গায়ে শুধু হাতে তাদের সেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, দুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বউদিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়ে এখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার উপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড়্ হুড়্ করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয়। দুদিন একটু আমার নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেক্ষডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি এস গিয়ে, আমাদের ভাবনা আমরা ভাব্‌বো।

— ঠিক? সে ভার নেবে তো?

—না নিয়ে উপায় কি বল।

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্ব্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। সকালে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ের কামিজটি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ী দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরানো কোঠাবাড়ী, বহুকাল মেরামত হয় নাই, কার্নিসে স্থানে স্থানে বট অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে! শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন।

দত্ত মহাশয়কে পূর্ব্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন; তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধা বাধা ঠেকিতে লাগিল, বাহিরবাটী চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেস্‌টি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারের উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটি সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়। নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটা কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তপোশের উপর একটা পুরানো শপ্ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাক খাইবার উপকরণ—টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোন আসবাব চণ্ডীমণ্ডপে নাই।

রামনিধি দত্ত খবর পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণের চরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে পাশেই নদী, ওই বাঁশ-ঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গণিল। কচুরীপানার দামে স্নানের ঘাটের জল পর্য্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়া উঠিলে গা চুলকায়। কোনরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোলকোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকাল সকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর এক পাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে

নিন্‌, সেই কখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান-আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কম হয়েছে ! ওরে, জল আনলি নে ? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধ্যে-আহ্নিক হয়েছে কি ?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সে বলিল, সন্ধ্যে-আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা তো হোল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ ভাগ্যে সে বাড়ীতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই ! তাহা হইলে এ বাড়ীতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে।

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা ?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

১

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্ত মহাশয় বাড়ী হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধ বাধ ঠেকিলেও উপায় নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু, আজ তোমার মাকে বল, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না। রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিসপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়া চলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে, আট দশখানি গ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরে টিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরানো শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমত ডিস্‌পেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল দুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালে উঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, দুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হইবার পূর্ব্বেই দত্তবাড়ী ফিরিয়া যায়, কারণ পথের দুধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড়-ফুঁক শিকড়-বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া উপায় কি? তাহার মত হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ শহরে স্থান হইবে?

বাড়ীতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়া ছিল, সেটা সে সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোন রোগীর বাড়ী যাইবার সময়ে সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমার কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসা দেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়েই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইত মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে বসে। তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষী, চশমা-পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, স্যালাম ডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিনসিন্ ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড্ড ডাক্তার গো। ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি' ব্যামো সারে। চেহারাখানা দ্যাখচ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। পসার যে খুব বেশী জমে, তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরীব, পয়সা দিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই।

২

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যাতি হবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গীন। নরোত্তমপুরের বদু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনে বললেন আপনারে ডাকৃতি। সলাপলামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। বদু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মত হাতুড়ে বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব কনসাল্ট করার ফি আলাদা। সে আপনি দিতে পারবেন?

—কত লাগবে বাবু? যত্নবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যত্নবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? তিনটাকা ফি দিতে পারবে?

—হাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবাহ্ন। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে?

এত সহজে লোকটা রাজী হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিল দেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ী নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

রোগীর বাড়ী পৌছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন রোগা মত প্রৌঢ় লোক বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কালো সার্জ্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আঁটা জুতা। বুঝিল ইনিই যত্ন ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে টিপ টিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি। বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষী লোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোন দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তার-বাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলেমেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড় হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ও পসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যে করিয়াই হউক।

যত্ন ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায়?

বিপিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিল যত্ন ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকীল মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্ত্তার সুর ও ধরণ অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া যেন সম্মুখের নারিকেল গাছের মাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমাসুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উঁচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও! কোন্ বছর পাশ করেছেন?

—আজ তিন বছর হ'ল।

—এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়ের সময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ী সে এতকাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিত বলিল, আই এসসি পাশ করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি।

যত্ন ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিসটা বড়

সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত, যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ীর পেশেন্টের রোগটা কি?

—রেমিটেন্ট ফিভার। সঙ্গে রক্ত-আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার।

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ীর মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ-কুড়ির বেশী নয়, চেহারা রোগের পূর্ব্বে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকে পিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্য করেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়্কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহ দেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেন্টা দেওয়া উচিত হয় নি। প্রেস্‌ক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের।

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দুখানা প্রেস্‌ক্রিপশন বিপিনের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়ে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরণের কত রকমের চিকিৎসা-প্রণালীর সহিত পরিচিত। কি ভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে! যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশী উচিত নয়। যদু ডাক্তারকে হাতে রাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক সুবিধা। এ-অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীর স্বরে বলিল, চমৎকার প্রেসক্রিপ্‌শন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদ্‌লাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্ব্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেন্ট করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবছি—

—আর একবার জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ, নিশ্চয়ই। আমিও তা—

ফিরিবার পূর্ব্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কি না।

৩

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস দুই রোগী হইয়াছিল, যদু ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্ত তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয় হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয় করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারি উপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যদু ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অস্‌লারের বিখ্যাত বইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতে করিয়া সে অস্‌লারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

'প্রথম দুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, দুই সপ্তাহের মধ্যে সে-ই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর-দোকানে বাকী পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিস দেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত!

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনের ডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরার রোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সব লইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের। সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চল, পাঁচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

— চলেন বাবু আপুনি। যত্নবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়ীতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকট হইতে পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যত্ন ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধা নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়ে এসেছে যত্নবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিকবে?

যত্ন ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এই অঞ্চলে বহু রোগী ও বহু প্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, স্যালাইন দিন আপনি—টিকে যেতে পারে।

বিপিনের জিদ্ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জলে গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতে হবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যে মারা না যায়—

আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাস-করা ডাক্তার ভয় খাইত, বিপিন তাহা অনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল।

যত্ন বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—কত সি. সি. দেবেন বিপিন বাবু?

—সি. সি.-ফি. সি. কি মশাই এতে? বাংলা নুনগোলা জল, তার আবার সি. সি.। দেখুন আমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না।

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরণের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যত্ন ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়।

—হয় নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইন্‌জেক্‌শন করিল, যত্ন ডাক্তারের বারণ শুনিল না।

যত্ন বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, যত্নবাবু, সব সময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তে হয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী—আমার যা ভাল মনে হচ্ছে, তা করে যাবো।

যত্ন ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দুবার ইন্‌জেক্‌শন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না।

তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না। আরও আধ ঘণ্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানের গোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথা বলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো! আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল, বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকে টেনে বার করলেন মশাই।

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায় একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটি দড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামসুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তার লোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজেও খাতির পাইবে, নতুবা লোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে। সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনের সামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মত সাহস কোন ডাক্তারের দেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা? ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটাচারেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল, আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রোগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরী আছে তো?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীব্বাদে দশটা নারিকেলের গাছ বাড়ীতে। বাবু, শহর বাজার হ'লি এই গাছ কডার ফল বিক্রী করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই। কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা তাও খদ্দের নেই।

৪

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়ে সবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট না লওয়া যায়?

বিপিন বলিল তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাটবার। ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে। লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এ পথে নামাইয়াছে, যদি সে কোন গরীব রোগীর প্রাণ দান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচড় দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমত বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট হাট, সবসুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরা ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়া পাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকানে হ্যারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈল আর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ী যাবে না?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাবো, কালকের তাগাদার ফর্দ্দ তৈরী করবো, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম।

—কে করলে সুখ্যাত?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সব কথা বলছিল। সবারই মুখে ঐ এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌ কখনো ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেল অন্য ধরণের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জ্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকে সম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরীব বলে এক পয়সা নেন নি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীর! মানুষ না দেবতা! গরীব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এলেন বাবু।

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জালিয়া দুধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায় দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ী ফিরিল।

দত্ত মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোশের উপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়ীতে আমার জামাই-মেয়ে এসেছে অনেক দিন পরে। আজ একটু খাওয়া-দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দুখানা লুচি না হয় অমনি গরীবের বাড়ী—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই!

—বাড়ীর মধ্যে গিয়েচেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা, সন্দে-আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত-পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তপোশের এক পাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে-বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলে তো চলে না। এখন তাগাদা-পত্তরের সময়, নিজে না দেখলে কাজ হয় না। পরশু যাবো ভাবচি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয় শুধু রামায়ণ মহাভারতের কথা বলেন। আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তাঁর খেয়াল হইল তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলে বসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া-দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

৫

কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাতা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকে চাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম কর মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর এক দিনের কথা। মানীদের বাড়ী, সেও এই রকম জামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল। সেদিন আড়ালে ছিল মানী—দেড় বৎসর আগের কথা।

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখাসাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে। আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। ইহারা কে? ওই যে শ্যামা মেয়েটি আধ ঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না। অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোন দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোন যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি একমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাঁহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেন না, তবে কেন তাঁহাকে লুচি দেওয়া হইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্ব্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুনই হউক বা যে জন্যই হউক, তাঁহার খাওয়া-দাওয়া একটু শৌখীন ধরনের। তাঁহার জমিতে সাধারণতঃ মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতে পারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেন সোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ী হইতে। বারমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়া খান না। বাড়ীর আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোটা চালের ব্যবস্থা। তবে অতিথিসজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়া ঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছালো করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাঁহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্ত মহাশয় একটু বেশী সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরা শ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলেও বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাত সাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতে যাইতে দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল—মানী দাঁড়াইয়া আছে? কেহ নাই। রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এইরূপ জানালার ধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাইভস্ম সে ভাবিতেছে। এটা কি মানীদের বাড়ী যে মানী দাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জট পাকানো অন্ধকার কিন্তু ক্রমশঃ স্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশে হাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছ করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোকমুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহার দৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া দিয়াছিল সে আজ কোথায়?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ীর এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ীর তিন বৎসর পূর্ব্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গে তাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্ত এত মন-কেমন করে কেন?

বিপিন কত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে। এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিসটা।

৬

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা? তোমার জন্তে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত, অতি প্রিয় মুখ!

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে। তুই আমায় বাঁচা, আমায় ডাক্তারি শেখাবি নে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে,

এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দু-মাত্র না দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ীর আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছে সে, বাড়ীর কোন মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহার সামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল? তবে হাঁ, শান্তি তো আর ঘরের বউ নয়, বাড়ীর মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবা-পরায়ণা ও শান্ত। চেহারার মধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন?

পরবর্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমত রোগীর ভিড় জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজ্‌ন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুদে প্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, যদু ডাক্তারের পসার একেবারে মাটি হইয়া গেল নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পসার হবে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগীর রোগ আদ্ধেক সেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ। কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ী যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সিজ্‌ন্ এখনও পুরাদমে চলিবে আরও অন্ততঃ এক মাস। এই সময়ে একবার বাড়ী ঘুরিয়া আসা দরকার।

দশম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন বিপিন বাড়ী যাইবার ঠিক করিয়াছে, সেদিন সকালে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে জলখাবার দিতে আসিল। একখানা কাঁসিতে চালভাজা ও নারিকেল-কোরা, ইহাই জলখাবার। চা ইহারা বাঁধা নিয়মে খায় না, কচিৎ কখনো সর্দি কাশি হইলে ঔষধ হিসাবে খাইয়া থাকে। সুতরাং মেয়েটি যখন জলখাবারের কাঁসি নামাইয়া সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে চা খাইবে কি না, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—চা হচ্চে?

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি খান তো করে নিয়ে আসি।

—না, শুধু আমার খাওয়ার জন্যে দরকার নেই।

কেন দরকার নেই, নিয়ে আসচি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা আনিয়া দিল। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে তাহার সহিত এত কথা ইহার পূর্ব্বে কখনো বলে নাই, যদিও আর দু-একবার তাহাকে জলখাবার দিতে আসিয়াছিল। বিপিন ইহাদের বাড়ীর আবরু কড়া বলিয়াই জানে।

মেয়েটি চা দিয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিপিন ভাবিল পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্যই সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ব্যগ্রভাবে গরম চায়ের পেয়ালায় প্রাণপণে চুমুকের পর চুমুক দিতে দেখিয়া মেয়েটি হঠাৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে তাড়াতাড়ি অত গরম খাওয়ার দরকার কি? আস্তে আস্তে খান—

বিপিন কথা বলিবার জন্যই বলিল, তুমি আর কত দিন আছ?

—এ মাসটা আছি।

—ও!

—আপনি নাকি আজ বাড়ী যাবেন?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন থাকবেন?

—দিন পনেরো হবে।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—অত দিন?

পরক্ষণেই যেন কথাটা ও তাহার সুরটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—রুগীপত্তরও তো আছে আবার এদিকে—

—যদু ডাক্তার দেখবে আমার রুগী—একটা মোটে আছে।

—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা আছেন, আমার একটি বোন আর আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে।

—আপনার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, না?

—না:, কি কষ্ট ! বেশ আছি, তোমার বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন, বড় ভাল লোক।

—তবে আমাদের এখানেই থাকুন।

—আছিই তো। কোথায় আর যাবো ধরো—

—যদি আমাদের গাঁয়ে বাস করেন, আমি বাবাকে বলে আপনাকে জমি দেওয়াবো। আসবেন ?

বিপিন বিস্মিত হইল। কখনো এ মেয়েটি তাহার সম্মুখে এত দিন ভাল করিয়া কথাই কয় নাই—আজ এত কথায় তাহাকে পাইয়া বসিল কোথা হইতে ? বলিল—তা কি করে হয়, পৈতৃক বাড়ী রয়েচে সেখানে—

—কিন্তু ডাক্তারি তো এখানেই করতে হবে—

—সে তো বটেই।

—আপনি আজ বাড়ী যাবেন কখন ?

—খেয়েদেয়ে যাবো দুপুরে।

—আমি চলে যাবার আগে আসবেন কিন্তু—

—ঠিক আসবে.—নিশ্চয়ই আসবে:—

মেয়েটি চায়ের পেয়ালা ও কাঁসি লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন ভাবিল কেমন চমৎকার মেয়েটি। মনে বেশ মায়া আছে। হবে না কেন, কি রকম বাপের মেয়ে ! দত্তমশায়ও চমৎকার মানুষ।

২

চা খাইয়া ডিস্‌পেন্‌সারিতে গিয়াই বিপিন যদু ডাক্তারের কাছে একখানি পত্র দিয়া একজন লোক পাঠাইয়া দিল—তাহার হাতের রোগীটি দেখিবার জন্ত, যত দিন সে না ফেরে। তাহার পর দোর বন্ধ করিয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে দরজার এক পাশে মেঝের উপর একখানা খামের চিঠি পড়িয়া আছে দেখিয়া সেখানা তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে কখন পিয়ন আসিয়া চিঠিখানা বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। খামখানার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল। এ লেখা মানীর হাতের লেখার মত বলিয়া মনে হয় যেন ! বাড়ীর ঠিকানা ছিল, গ্রামের পোস্টমাস্টার সে ঠিকানা কাটিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। নিশ্চয়ই মানীর চিঠি নয়—সে অসম্ভব ব্যাপার।

চিঠি খুলিয়া প্রথম দুই চার ছত্র পড়িয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না, নিচের নামটা একবার পড়িয়া লইতে গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানীরই চিঠি। মানী লিখিয়াছে :—

আলিপুর

শ্রীচরণকমলেষু, সোমবার

বিপিনদা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। কাল শেষ রাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমাদের বাড়ীর মাঝের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলচো। মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, তাই এই চিঠি লিখছি তোমার বাড়ীর ঠিকানায়। পাবে কিনা জানিনে।

বিপিনদা, কত দিন সারারাত জেগেছি তোমার কথা ভেবে। সর্বদা ভাবি, একটা কি যেন হারিয়েচি, আর কখনো পাবো না। যদি পলাশপুরের চাকুরী না ছাড়তে, তবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। আমি শ্বশুরবাড়ী এসে বাবার চিঠিতে জানলাম তুমি আর আমাদের ওখানে নেই। আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি বলেছিল'ম আমাকে না জানিয়ে চাকুরী ছেড়ে দিও না। কেনই বা রাখবে? আমার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার জন্যে কখনও কোনো দিন একটুকু ভাবো কি না। হয়তো ভুলে গিয়েচ এতদিনে। হয়তো আমার এ চিঠি পাবেই না. যদি পাও, আমার কথা একটু মনে কোরো বিপিনদা। তুমি আজকাল কি করো, জানতে বড় ইচ্ছে হয়।

আমার ঠিকানা দিলাম না, এ পত্রের উত্তর চাই না। কত বাধা জানো তো সবই। তুমি যদি আমায় একটুও মনে করো চিঠিখানা পেয়ে, তাতেই আমার সুখ। আমার প্রণাম নিও। আশীর্ব্বাদ করো, আর বেশী দিন না বাঁচি। ইতি—

মানী

বিপিন চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ডিস্‌পেনসারির ভাঙা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এ কি অসম্ভব কাণ্ড সম্ভব হইয়া গেল। মানী তাহাকে চিঠি লিখিবে, একথা কখনও কি সে ভাবিয়াছিল? এতখানি মনে রাখিয়াছে তাহাকে সে!

অনেক দিন পরেই বটে। মানীর সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই। আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর সহিত আবার দেখা হইল। এতদিন কি নিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে নিজেকে—সে নিঃসঙ্গতা যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। মানী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই সংসারে?

মানী লিখিয়াছে, সে কি করিতেছে জানিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যদি বলিবার সুবিধা থাকিত, তবে সে বলিত, মানী, কি করচি জানতে চেয়েচ, তুমি যে পথের সন্ধান আমায় দয়া করে দিয়েছিলে, সেই পথই ধরেচি। তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছিল, তাকে সার্থক করে তুলবো আমি প্রাণপণে। তুমি যদি এসে দেখতে, এখানে ডাক্তারিতে আমি কেমন নাম করেচি, তা হোলে কত আনন্দ পেতাম আজ। কিন্তু তা যে হবার নয়। কোনো রকমে যদি সে কথাটা জানাতে পারতাম!

বাড়ী ফিরিতেই দত্ত মহাশয়ের মেয়েটি তখনি আসিল। বলিল, উঃ কত বেলা হয়ে গেল, আপনি কখন আর রান্না করবেন, কখনই বা খাবেন আর কখনই বা বেরুবেন?

—এই এখুনি তাড়াতাড়ি নিচ্ছি।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি দুধ জ্বাল দিয়ে এনে দিচ্ছি, আর বাবার জন্যে সরু চিঁড়ে তোলা থাকে তাই এনে দিচ্ছি। রান্নার হাঙ্গামা এখন আর করবেন না।

—তাই হবে এখন তবে।

—নেয়ে আসুন, তেল দিয়ে যাই।

মেয়েটির এই নূতন ধরনের যত্ন বিপিনের ভাল লাগিতেছিল। বিদেশে বিভূঁয়ে এমন যত্ন কে করে?

স্নান করিতে গেল নদীতে—ক্ষীণকায় নদী, স্থানীয় নাম মাৎলা, কচুরিপানার দামে বুজিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন আর ফাঁকা মাঠ, এপারে নদীর ঘাটে যাইবার সুঁড়িপথের দুধারে কেলে-কোঁড়া ও শাম্‌লা লতার ঝোপ। শাম্‌লা লতায় এ সময় ফুল ফোটে, ভারি সুগন্ধ বাতাসে। ওপারে বাঁশবনে কুকো পাখী ডাকিতেছে? ঘোপাখালি কাছারি থাকিতে একজন প্রজা একজোড়া কুকো পাখী তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, বেশ সুস্বাদু মাংস।

মাৎলা নদীর যতখানি কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, ততখানি জুড়িয়া সবুজ দামের উপর নীলাভ বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে বড় বড় ডাঁটায়—যতদূর দেখা যায়, ততদূর ফুল, কি চমৎকার দেখাইতেছে!

আজ যেন সবই সুন্দর লাগিতেছে চোখে। যে মানীর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, তারই হাতের লেখা চিঠিখানা! কি অপূর্ব আনন্দ আর সান্ত্বনা বহন করিয়াই আনিয়াছে সেখানা আজ। সুপ্রভাত—কি অপূর্ব সুপ্রভাত!

দত্ত মহাশয়ের মেয়ে একবার বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল—জায়গা করি?

—করো, আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া জায়গা করিয়াছে, শুধু একখানা আসন দেখিয়া বিপিন বলিল, দত্ত মশায় খাবেন না?

—বাবা বাড়ী নেই, ওপাড়ায় বেরুলেন। তা ছাড়া এখনও রান্না হয়নি, শুধু আপনার চিঁড়ে দুধের ফলার—তাই আপনাকে খাইয়ে দিই। এতটা পথ আবার যাবেন—

সে একটি বড় কাঁসিতে ভিজানো চিঁড়ে লইয়া আসিল। বলিল, আপনি নাইতে গেলেন দেখে আমি চিঁড়েতে দুধ দিইচি—সরু ধানের চিঁড়ে, বেশি ভিজলে একেবারে ভাতের মত হয়ে যায়—দাঁড়ান, কলা নিয়ে আসি—

কত যত্নের সহিত সে কলা ছাড়াইয়া দিল, গুড়ের বাটি হইতে গুড় ঢালিয়া দিল।

বিপিন খাইতে আরম্ভ করিলে বলিল, তেঁতুলের ছড়া-আচার খাবেন? বেশ লাগবে চিঁড়ের ফলারে। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল, আসিতে কিছু বিলম্ব হইতে লাগিল দেখিয়া বিপিন ভাবিল, বোধ হয় আচার ফুরাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জানিত না, লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে বেচারী।

কিন্তু প্রায় দশমিনিট পরে সে একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে দু'তিন রকমের আচার

আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলিল, আচারের হাঁড়ি, যে সে কাপড়ে তো ছোঁবার জো নেই, দেরি হয়ে গেল। এই যে করমচার আচার, এ আমি আর বছর করে রেখে গিয়েছিলাম, বাবা খেতে বড় ভালবাসেন। দেখুন তো চেখে, ভাল আছে?

—বাঃ, বেশ আছে। তুমি আচার করতে জানো বড় চমৎকার দেখচি যে—

মেয়েটি লাজুক হাসি হাসিয়া বলিল, এমন আর কি করতে জানি, মা থাকতে শিখিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ীতে আমার শাশুড়ীও অনেক রকম আচার করতে জানেন। এঁচড়ের আচার পর্যন্ত।

—আর কি কি আচার জানো?

—আমের জানি, নেবুর জানি, নংকার জানি—

—নংকার আচার বড় চমৎকার হয়, একবার খেয়েছিলাম—

—চিঁড়ে আর দুটো নেবেন?

—পাগল! পেট ভরে গিয়েচে, দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েছে একেবারে ঘন ক্ষীর করে—

খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মত বসে বসে খাওয়ালে।

মানীর কথা মনে পড়িল। মানী ও এই মেয়েটি যেন এক ছাঁচে ঢালাই, তবে প্রভেদও আছে, মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একটা নেকড়ায় জড়ানো গোটাকতক পান আনিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, পান ক'টা নিয়ে যান, রদ্দুরে জলতেষ্টা পাবে। পথের জল খাবেন না কোথাও। কবে ফিরবেন?

বিপিন উঠানেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, আজ আর বাড়ী যাবো না ভাবচি।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, যাবেন না?

—না, তাই বেলা দেখছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। এত দেরিতে বেরুলে পথেই রাত হবে।

—তবে যাবেন না আজ। মিছিমিছি চিঁড়ে খেলেন কেন, কষ্ট পাবেন সারাদিন।

—ফাঁকি দিয়ে চিঁড়ের ফলার করে নিলাম। রোজ তো অদৃষ্টে এমন ফলার জোটে না—

মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তা কেন, ভালবাসেন চিঁড়ের ফলার? কালই আবার খাবেন।

বিপিনের ভারি ভাল লাগিল মেয়েটির এই কথাটা। এই অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়েটি তার সরস মন ও কথাবার্তার গুণে বিপিনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেও বিপিনের মনে হইতে লাগিল, আবার যদি সে আসে, তবে বেশ ভাল হয়। বিপিনের এ ধরণের মনের ভাব হয় নাই অনেক দিন।

কিন্তু বহুক্ষণ সে আসিল না। না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এই সব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া?

মানী আলেয়া বটে—কিন্তু তার আলো তাহার মত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে। খুবই কষ্ট হয় মানীর জন্ম, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যেও কি ব্যথাভরা অপূর্ব্ব আনন্দ আসে তাহার মুখখানি, তাহার সেই সপ্রেম দৃষ্টি মনে করিলে। সর্ব্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে এ মনের ভাব থাকিত না, এ কথা এখন সে বোঝে।

৩

দত্ত মহাশয় দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, শান্তি বলছিল,—আপনি বাড়ী যাবেন বলে শুধু ছুটি চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট-পাচ্ছেন সারাদিন—

—বলেছে বুঝি? কষ্টটা কি? না না—বেলা বেশি হোল বলে আর যেতে পারলাম না। আপনার বড় মেয়ে যত্ন করেছে ওবেলা। বড় ভাল মেয়েটি—

—যত্ন আর কি করবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাদের সেবাযত্ন করব সে তো আমাদের ভাগ্যি। সে আর এমন বেশি কথা কি—

দত্ত মহাশয় সেকেলে ধরণের গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার অসাধারণ ভক্তি, কাজেই কথাটা তিনি অন্যভাবে লইলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া জমিজমাসংক্রান্ত গল্প করিবার পর বলিলেন, এখানে কিছু ধানের জমি করে দিই আপনাকে। জমি সস্তা এখানে। বছরের ভাতের ভাবনা দূর হবে। ডাক্তারির ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে পসার সেখানে বাস।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন বাড়ীর মধ্যেই। কিছুক্ষণ পরে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে আসিয়া বলিল, বাবা বললেন, আপনি কিছু খেয়ে যান—

—কি খাব এখন?

—পরোটা ভেজেচি খানকতক, আপনি আর বাবা খাবেন—ভাত খান নি ওবেলা, খিদে পেয়েচে—

বিপিন স্বাস্থ্যবান যুবক, সত্যই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। এ সব ধরণের মেয়েমানুষে মনের কথা জানিতে পারে—মানীকে দিয়া সে দেখিয়াছে। অগত্যা সে বাড়ীর ভিতর উঠিয়া গেল। মেয়েটি ওবেলার মত যত্ন করিয়া খাওয়াইল—কিন্তু খুব বেশি কথা বলিল না, বোধ হয় দত্ত মহাশয় আছেন বলিয়াই।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার ওবেলা খাওয়া হয় নি বলে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখি আমার মেয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। আমি তো বিকেলে কিছু খাইনে। বললাম, কি হবে রে ময়দা এখন? তাই বললে, ডাক্তারবাবু ওবেলা ভাত খান নি, ওঁর জন্যে খানকতক পরোটা ভাজব। আমি তো তাতেই জানলাম।

ইতিমধ্যে গ্লাসে করিয়া একবার জল দিতে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে কাছে আসিল। তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিপিনের মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল।

মেয়েটি দেখিতে ভালই, মুখশ্রীও বেশ। এই নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে এমন একটি স্নেহপরায়ণা নারীর সান্নিধ্য পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা।

বৈকালে সে নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছে, মেয়েটি আসিয়া বলিল, চা খাবেন? বার বার তাহাকে খাটাইতে বিপিনের কুণ্ঠা হইল। সে বলিল, না থাক। একটা পান বরং—

পান তো আনবই, চা-ও আনি। আপনি লজ্জা করেন কেন, চা তো আপনি খান—বললেই তৈরি করে দিই।

মিনিট কুড়ি পরে বিপিন চা খাইতে খাইতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহার কাছে মানীর কথা বলিবার জন্য। এর মন সহানুভূতিতে ভরা, এ তাহার মনের কষ্ট বুঝিবে। বলিয়াও সুখ।

ইচ্ছা হইল বলে— শোন শান্তি, তোমার মত একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ। সে আমাকে খুব ভালবাসে, তোমার মতই করুণাময়ী, মমতাময়ী সে। আজ তোমার সেবাযত্ন দেখে তার কথা কত মনে হচ্ছে জান শান্তি?

শান্তি বলিবে, বলুন না তার কথা, বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে —

তারপর চোখে আগ্রহভরা দৃষ্টি লইয়া শান্তি তাহার সামনে বসিয়া পড়িবে, আর সে মানীর সহিত তাহার বাল্যের পরিচয়ের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষ সাক্ষাতের দিন পর্য্যন্ত সব কথা বলিয়া যাইবে। বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা নামিবে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নামিবে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশবনের মাথায় জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র উঠিবে, গাছপালা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িবে, গ্রাম নিষুতি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, ডোবার ধারের জগডুমুর গাছের খোড়লে রোজকার মত লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকিবে, তখনও শান্তি গালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনিয়া যাইতেছে ও মাঝে মাঝে আর্দ্র চক্ষু আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আর সে অনবরত বলিয়াই চলিয়াছে—তবুও হয়তো বলা শেষ হইবে না, হয়তো বা বলিতে বলিতে পূবে ফরসা হইয়া যাইবে, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, ভোরের ধুয়াশায় বাৎলার ধারের আম-শিমুলের বাগান অস্পষ্ট দেখাইবে, অথচ শান্তি উঠিবে না, শেষ পর্য্যন্ত ঠায় বসিয়া শুনিবে।

একথা বলা যায় কার কাছে? যে মন দিয়া শোনে, যে ভালবাসে, সহানুভূতি দেখায়—যার মনে স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে। সে বুঝিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

তেমনি মেয়ে এই শান্তি।

কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মত মেয়েরা, মানীর মত মেয়েরা, পৃথিবীতে জন্ম নেয়!

চা খাওয়া হইলে শান্তি পান আনিল।

বিপিন বলিল, তুমি এখানে আর কতদিন থাকবে শান্তি?

—এ মাসটা আছি।

—তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু বিপিনের মনে হইল, মেয়েটিকে এরূপ বলা উচিত হয় নাই। এ সব ধরণের কথা বলা হয়, যখন পুরুষ নারীমনের মুকুলিত প্রেমকে ফুটাইতে চায়। বিবাহিতা মেয়ে, কাল শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইবে—প্রেম জাগিলে মেয়েটিই কষ্ট পাইবে। বিপিন আর ও পথে পা দিবে না। মেয়েটি বোধ হয় সহজ ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিল, নতুবা তাহার চোখে লজ্জা ঘনাইয়া আসিত। মানীকে দিয়া বিপিন ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

সে সরল ভাবেই বলিল, কেন ?

বিপিন ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল—দুধ চিঁড়ের ফলার ঘন ঘন যোগাড় হবে না।

বলিয়াই যেন পূর্ব্ব কথাটা পেটুক লোকের খেদোক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, প্রমাণ করিবার জন্য সে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনেক সময় প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে সরলা পল্লীবালা, লোককে খাওয়াইয়া মাখাইয়া সে হয়তো খুশি—একটা লোক কোন একটা বিশেষ জিনিস খাইতে ভালবাসে, অথচ সে চলিয়া গেলে লোকটা তাহার প্রিয় সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে ইহা তাহার মনে সত্যকার করুণা জাগাইল।

সে মনে মনে ভাবিল, আহা, ডাক্তারবাবু সরু ধানের চিঁড়ে খেতে এত ভালবাসেন! আমি চলে গেলে কে দেবে ? উনি যে মুখচোরা, কাউকে বলতেও পারবেন না।

মুখে বলিল, আমার শ্বশুরবাড়ীতে কনকশালে ধানের চিঁড়ে হয়, খুব ভাল সরু চিঁড়ে আর কি সুগন্ধ! চিঁড়ে ভেজালে গন্ধ ভুর ভুর করে ঘরে। আমাদের বাড়ীর চেয়েও ভাল। আমি গিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেবো।

বিপিন ভাবিল, তা দেবে তা জানি! তোমাদের আমি চিনি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া শান্তি দ্রুতপদে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেই দিনের ব্যাপারের পর হইতে বছর খানেক কাটিয়া গিয়াছে, পটল আর বীণার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাতে প্রথম প্রথম বীণা খুব স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সপ্তাহ যখন পক্ষে এবং পক্ষ যখন মাসে এমন কি বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল—পটলের টিকি কোনদিকে দেখা গেল না, তখন বীণার মনে হইল তাহার মনের এই যে নিরঙ্কুশ স্বস্তি,

ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজলভ্য জিনিস—বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত এই বৈচিত্র্যহীন স্বস্তি সে বরাবর ইস্তকনাগাৎ পাইয়া আসিয়াছে—ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে ছিল, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

খুব অল্পদিনের জন্য—কতদিন? বছর দুই? হাঁ, প্রায় দুই বছরের জন্য তাহার জীবনে এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। পটলদা তাহাদের বাড়ীতে আসে—আসিত, মায়ের সঙ্গে কি বলাইয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া হয়তো বা একটা পান কিংবা একগ্লাস জল, কখনো বা দুইই, চাহিয়া খাইয়া চলিয়া যাইত।

মায়ের ডাকে বীণাই পান জল আনিয়া দিত—কেননা মনোরমা ঘরের বউ, স্বামীর বন্ধুস্থানীয় লোকের সম্মুখে বাহির হইবার নিয়ম তাহাদের সংসারে নাই।

হয়তো পান দিতে আসিয়া পটল দুই একটা কথা বলিত, বীণা জবাব দিত। হয়তো পটল এক আধটা ছোটখাটো গল্প করিল, বীণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিত—ভাল লাগিত শুনিতে। হয়তো মা উঠিয়া যাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক করিতে—বীণা ও পটল রোয়াকে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিত।

ক্রমে পটলদা যেন একটু ঘন ঘন আসিতে আরম্ভ করিল। পটলের সাড়া পাইলে বীণারও যেন কি হয়। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, রান্নাঘরে বউদিদির কাছে বসিয়া কুট্‌না কুটিতে, কি তেঁতুল কাটিতে, কি বাটনা বাটিতে আর ভাল লাগে না। ছুটিয়া গেলে কে কি মনে করিবে, ধীরে ধীরেই যাইত—অন্য ছুতায় যাইত।

—মা, আজ কি বেগুন পোড়াতে আছে? বউদিদি বলছিল, আমি বললাম, আজ বুধবার, দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

—আচ্ছা মা, পাকানো সলতেগুলো কুলুঙ্গিতে রেখে দিইচি, তার কি একটাও নেই—তুমি নাও নি?

—তোমার কলসীতে জল আনতে হবে না মা? বলো তো এখুনি আনি, আবার সন্ধ্যে হয়ে গেলে তখন—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর কে জানে আধঘণ্টা, কে জানে একঘণ্টা, সে আর পটলদা গল্পই করিতেছে, গল্পই করিতেছে। যতক্ষণ পটলদা বাড়ীতে থাকিবে বীণা নড়িতে পারিত না সেখান হইতে।

ক্রমে পটলদা চাহিত একটু আড়ালে দেখা করিতে, বীণা তাহা বুঝিত।

বীণার কৌতূহল তখন বেশ বাড়িয়াছে, পুরুষ মানুষ একা থাকিলে কি রকম কথাবার্ত্তা চলে। পটলদা মজার মজার কথা বলে বটে। বীণার হাসি পায়, আনন্দও হয়। মা উপস্থিত থাকিলে পটলদা এ ধরণের কথা বলে না। হয়তো বীণার শোনা উচিত নয় এসব কথা, কিন্তু লাগে মন্দ নয়।

তারপর গ্রামে কথা উঠিল, দাদা বাড়ী আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, বউদিদিই

দাদার কানে উঠাইল এসব কথা, বলাই মারা গেল, পটলদা সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশে বাগানে অন্ধকারে লুকাইয়া দেখা করিতে শুরু করিল, তাহাও একদিন বউদিদির চোখে গেল পড়িয়া—বীণার জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কোনদিক হইতে। একটুকু আলো আসিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে যাই—অমনি সবাই মিলিয়া হৈ হৈ করিয়া জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

২

সেদিন একাদশী।

বীণা সারাদিন মায়ের সঙ্গে নির্জলা একাদশী করিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের অনুরোধে একটু দুধ ও দুই-একটা ফল খায়। একদিন ঘরে ফলের যোগাড় ছিল না—পাড়াগাঁয়ে থাকে না—মনোরমা বৈকালে বলিল, ও ঠাকুরঝি, মন্থর মার কাছ থেকে এক পয়সার পাকা কলা নিয়ে এসো তো? আমি ঘাটে বলেছি ওকে। গিয়ে নিয়ে এস।

বীণা এ পাড়ার সকলের বাড়ীতেই একা যাতায়াত করে—ও পাড়ায় কখনও একা যায় না। মন্থর মা থাকে এই পাড়ারই সর্বশেষ প্রান্তে, মধ্যে পড়ে ছোট একটা আমবাগান, সেটা পূর্বে ছিল বীণার বাবা বিনোদ চাটুজ্জের নীলাম-খরিদা সম্পত্তি, আবার ওপাড়ার শ্রীশ গাঙ্গুলী বিপিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একটি আমগাছের নাম 'সোনাতলী', বীণা ছেলেবেলায় এখানে আম কুড়াইতে আসিত—যখন তাহাদের নিজেদের বাগান ছিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি চমৎকার আম ছিল সোনাতলীর। কত বছর এ গাছের আম খাই নি—এবারে খুড়ীমাদের কাছ থেকে দুটো চেয়ে আনবো আমের সময়।

হঠাৎ সে দেখিল পটলদা বাগানের পথ দিয়া বাগানে ঢুকিতেছে। বীণার বুকের রক্ত যেন টল্ খাইয়া উঠিল। এখন সে কি করে? বাড়ী ফিরিয়া যাইবে? পটলদা তাহাকে দেখিতে পায় নাই—কারণ সে বাগানের কোণাকুণি পথটা বাহিয়া বোধ হয় মুচিপাড়ার দিকে যাইতেছে। পটলদার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই।

হঠাৎ বীণা নিজের অজ্ঞাতসারে ডাক দিল, ও পটলদা?

পটল চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে দেখিয়া বীণার হাসি পাইল।

—এই যে, ও পটলদা!

পটল বিস্মিত ও আনন্দিত মুখে কাছে আসিল।

—তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই। তুমি ভাল আছ?

—তাতে তোমার কি? আমি ম'রে গেলেই বা তোমার কি?

—বাজে বোকো না পটলদা। ওসব কথা বলতে নেই।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল !

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার কথা একটুও ভাবতে বীণা ? সত্যি বল।

—বলে লাভ কি পটলদা ? যা হবার হয়ে গিয়েছে।

— আমিও তো সেইজন্যে আর যাই না। তোমার নামে কেউ কিছু বললে আমারি ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখলাম, দেখা না করাই ভাল, কিন্তু তা বলে ভেবো না যে তোমায় ভুলে গিয়েছি।

বীণা কোন কথা বলিল না।

পটল বলিল, আচ্ছা বীণা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—আমবাগানের মধ্যে কথা কইতে দেখলে কে কি ভাববে—যে আমাদের গাঁয়ের লোক—এসো তুমি—

—তুমি আজকাল সেই কোথায় চাকরি করতে সেখানে করো না ?

—সে চাকরি গিয়েছে। এখন ব'সে আছি।

—কতদিন চাকরি নেই ?

—প্রায় তিন মাস। সংসারে বড টানাটানি চলেছে—তাই যাচ্ছি মুচিপাড়ায় রঘু মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—গিয়ে বলি, খাজনা না দিস তো দুখানা গুড়ই দে।

—আচ্ছা, এসো পটলদা।

৩

বীণা বাড়ী ফিরিয়া সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক রহিল। পটলদার চাকুরি গিয়াছে। তাহার সংসারে বড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে ইচ্ছায় কি কাজ হইবে ? ইচ্ছা থাকিলেও বীণার এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই।

তাহাকে কি পটলদা কিছু দিয়াছিল ?

প্রথমে বীণা লইতে রাজী হয় নাই। বিধবা মানুষে সাবান কি করিবে ? একশিশি গন্ধ তেল শেষ পর্য্যন্ত লইয়াছিল, লুকাইয়া লুকাইয়া নারিকেল তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া একশিশি গন্ধতেল দুই তিন মাস চালাইয়াছিল।

এক আধটা সহানুভূতির কথা বলা উচিত ছিল। ভুল হইয়া গিয়াছে, অত তাড়াতাড়ি আমবাগানের মধ্যে কি সব কথা মনে আসে ? পটলদার সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়, বেচারী চালাইতেছে কি করিয়া ? আহা !

সন্ধ্যাবেলার দিকে মনোরমা নদীর ঘাট হইতে আসিল। ছেলেমেয়ে খাই খাই করিয়া জ্বালাতন করিতেছে, মনোরমা বলিল, ঠাকুরঝি, ওদের জন্যে একখোলা চাল ভেজে দাও না ? ভাত হতে এখন অনেক দেরি। থাক ততক্ষণ গুড় দিয়ে। মরছে খিদে খিদে করে।

বীণা বলিল, কোন্ চাল ভাজব বউদি? সেদিনকের সেই মোটা নাগরা আছে। দিব্যি ফোটে—তাই ভাজি, হ্যাঁ?

বীণার মা বলিলেন, আগে সন্ধ্যেটা দেখা না তোরা, অন্ধকার তো হয়ে গেল মা—আর কখন—

মনোরমা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফর্সা কাপড় পরিয়া উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে গিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, ও ঠাকুরঝি, আমায় কিসে কামড়াল, শীগগির এস—

বীণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া গেল, কি হল বউদি?

সে রোয়াক হইতে উঠানে পা দিবার পূর্ব্বেই মনোরমা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! সাপ! অজগর গোখরো—গোলার পিঁড়ির মধ্যে, ও মা, ও ঠাকুরঝি—

বীণা ততক্ষণ ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে কিছু দেখিতে পাইল না। মনোরমা উঠানে বসিয়া পড়িয়াছে তাহার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকাইয়া উঠানে পড়িয়া তেল সলিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মনোরমা বলিল, আমার গা ঝিম্ ঝিম্ করছে ঠাকুরঝি—আমায় ধর।

বীণার মা বলিলেন, শীগগির কেষ্ট ঠাকুরপোকে ডাক, জীবনের মাকে ডাক, ওমা, আমার কি হ'ল গো মা মা শীগগির মা, হে ঠাকুর হে হরি, রক্ষে কর বাবা—

বীণা বলিল, চেঁচিও না মা, আমি ডেকে আনছি, এখানে তার আগে দুটো বাঁধন দিই, গামছাখানা দাও—

মিনিট পনরো মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল বিপিনের বউকে সাপে কামড়াইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল বিপিনদের উঠানে। ভীম জেলে ভাল ওঝা, সে আসিয়া গাঁটুলি করিল, মন্ত্র পড়িল, ঝাড়ফুঁক চালাইল, মনোরমা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথায় ঘড়া করিয়া জল ঢালা হইয়াছে, তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি জলে কাদায় লুটাইতেছে, সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না, রোগিণীর অবস্থা লইয়া সকলে ব্যস্ত।

কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে বলিলেন, সতীশ ডাক্তারের কাছে কে গেল? ও হরিপদ, তুমি একবার সাইকেলখানা নিয়ে ছোট।

পটলও আসিয়াছিল, সে ভাল সাইকেল চড়িতে জানে, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকা। হরিপদ ভাই, তোমার সাইকেলখানা—

বীণা দেখা গেল খুব শক্ত মেয়ে। সে অমন বিপদে হাত-পা হারায় নাই, ছুটাছুটি করিয়া কখনও জল, কখনও নুন, কখনও দড়ি আনিতেছে, সম্প্রতি বৌদিদির মাথাটা উঠানে লুটাইতেছে দেখিয়া সে মাথা কোলে লইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

বিপিন দুপুরের পূর্ব্বেই সোনাতনপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল, বেলা ছোট, আমতলীর বাঁওড়ের কাছে আসিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বিড়ি নাই পকেটে, ফুরাইয়া গিয়াছে, পথের পাশেই শরৎ ঘোষের মুদির দোকান। এখনও প্রায় আধক্রোশ পথ বাকী তাহাদের গ্রামে পেঁছিতে, বিড়ি কিনিতে সে দোকানে ঢুকিল। শরৎ বলিল, দাদাঠাকুর এলেন নাকি আজ? তামাক ইচ্ছে করুন—বসুন, বসুন।

—না আর তামাক খাব না সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এক পয়সার বিড়ি দাও আমায়।

—তা দিচ্ছি, দাদাঠাকুর বসুন না। তামাকটা খেয়ে যান, এতটা হেঁটে এলেন।

বিপিন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, আখের গুড়ে এবার কেমন হ'ল শরৎ?

—কিচ্ছু না, কিচ্ছু না দাদাঠাকুর। পুঁজিপাটা সব খেয়ে গেল—ন' ন' আনা মণ কিনলাম. বেচলাম সাড়ে সাত, আট। সেদিন আর নেই দাদাঠাকুর, ডাহা লোকসান। তবে কি করি, লেখাপড়া তো শিখি নি আপনাদের মত। খাই কি ক'রে বলুন?

—আইনদ্দি চাচার খবর জান? ভাল আছে?

—বেশ আছে, পরশু বেলতার মাঠে বিচুলি তুলতে গিয়ে দেখি বুড়ো দিব্যি খুঁটির মত ব'সে ধানের শাল পাহারা দিচ্ছে।

—আচ্ছা, আসি শরৎ।

—দাঁড়ান দাদাঠাকুর, পাকাটির মশাল আমার করাই আছে, একটা জ্বেলে নিয়ে যান—ওরে, নিয়ে আয় তো গোলার তলা থেকে একটা মশাল! ক'দিন থাকবেন বাড়ী?

—থাকব আর কই? তিন চার দিনের বেশি—রুগীপত্তর ফেলে –

সদর রাস্তা দিয়া গেলে খুব ঘুর হয় বলিয়া সে গ্রামে ঢুকিয়াই নদীর ধারের রাস্তাটা ধরিল। এ দিকটা জনহীন, শুধু বৈচিবন, নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান। সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে এ পথে বড় কেহ একটা হাঁটে না, যদিও বাঘ নাই, কিংবা কালেভদ্রে এক আধটা কেঁদো বাঘ বাহির হইবার জনশ্রুতি শোনা যায় মাত্র। সুতরাং বিপিনের সহিত কাহারও দেখা হইল না।

বাড়ীর কাছাকাছি তাহাদের নিজেদের জমির সীমানায় ঘাটের পথের চালতা গাছটার তলায় যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা গোলমাল ও কান্নার রব তাহার কানে গেল। কোন্‌দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে ভাল ঠাহর করিতে পারিল না। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়া শুনিল।

এ কি! তাহাদেরই বাড়ীর দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে না? তাহার বুকের ভিতরটা এক মুহূর্ত্তে যেন ভয়ে অসাড় হইয়া গেল। কি হইয়াছে তাহাদের বাড়ীতে? না—তাহাদের বাড়ী নয়, ও যেন কেষ্ট কাকাদের কিংবা পরান নাপিতের বাড়ীর দিক হইতে—তাই হইবে, তাহাদের বাড়ী নয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতপদে দুরু দুরু বক্ষে বাড়ীর দিকে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিল।

আর কিছু দূর গিয়া বিপিনের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। এ কান্নার রব যে তাহার মায়ের গলার! পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে সে বাড়ীর পিছনের পথে আসিতেই তাহাদের

উঠানে ভিড় দেখিতে পাইল। তাহাকেও দুই চারজন দেখিয়াছিল তাহারা ছুটিয়া আসিল তাহার দিকে। সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে।

—এসো এসো বিপিন, বড় বিপদ—এসো—

বিপিনের গলা দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে কেমন হইয়া গিয়াছে। বলিল, কি—কি, কেষ্ট কাকা, ব্যাপার কি?

ভিড়ের ভিতর হইতে বীণা কাঁদিয়া উঠিল, ও দাদা, শীগগির এসো, বৌদিদি যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো।

মনোরমা? মনোরমার কি হইয়াছে? বিপিন ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া ইহার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই তিন জন হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, আহা, সতীলক্ষ্মী বউ বটে, স্বামীও একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির—এদেরই বলে সতীলক্ষ্মী—

বিপিন গিয়া দেখিল উঠানে তুলসীতলার কাছেই মনোরমা মাটিতে শুইয়া। মাথার চুল মাটিতে লুটাইতেছে। সারাদেহ অসাড়, নিস্পন্দ।

বিপিন আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। বলিল, কি হয়েছে কেষ্ট কাকা?

—সাপে কামড়েছিল। যাচ্ছিলেন বৌমা পিদিম দিতে নাকি তুলসীতলায়—

চার পাঁচজন লোক একসঙ্গে ঘটনাটা বলিতে গিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে লাগিল। বিপিনের মা তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীণা কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নাড়ী দেখিয়া বলিল, নাড়ী নেই বটে—কিন্তু কেষ্ট কাকা, এ মরে নি এখনও। বীণা, শীগগির জল গরম করে নিয়ে আয়—সতীশ ডাক্তারের কাছে একজন যা তো কেউ—

বলিতে বলিতে সতীশ ডাক্তারকে লইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ ডাক্তার ও বিপিন দুইজনে কিছুক্ষণ দেখিল। বিপিন বলিল, আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি? ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে দেখা যাক্ নাড়ী আসে কিনা—এ রকম রোগী আমি একটা দেখেছিলাম অবিকল এই লক্ষণ। এ মরে নি এখনও।

—ইথার ইন্ ক্লোরোফর্ম্ম দিয়ে কি হবে? ছাখো দিয়ে—

—এ মরে নি সতীশবাবু! কতকটা ভয়ে, কতকটা বিষের ক্রিয়ায় এমন হয়েছে—আমার মনে হয় গোখরো সাপ নয়—এ ঠিক শেকড়চাঁদা সাপ— এই রকম লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। কেউ দেখেছিল সাপটা?

বীণা বলিল, বউদিদি বলেছিল অজগর গোখরো সাপ—গোলার পিঁড়িতে ছিল—আমি কিছু দেখিনি অন্ধকারে—

সতীশ ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না, ভয়ে অনেক সময় ও রকম হয়। উনি ভয়ে তখন চারিদিকে গোখরো সাপ তো দেখবেনই। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছেন—

মনোরমাকে ধরাধরি করিয়া রোয়াকে লইয়া যাওয়া হইল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত সতীশ ডাক্তার রহিল। পটল যথেষ্ট উপকার করিল, ছোটাছুটি করা, ইহাকে উহাকে ডাকাডাকি করা। রাত দুপুর পর্য্যন্ত সে বিপিনদের বাড়ীতেই রহিল। বিপদের সময় অন্ত কথা মনে থাকে না—গরম জল আনিতে পটল কতবার রান্নাঘরে গেল—বীণা যেখানে একাই ছিল, ছেলেমেয়েদের ও দাদার জন্ত রান্না না করিলে তাহারা খাইবে কি? বীণার মা বউয়ের শিয়রে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

৪

চারদিন পরে বিপিন মনোরমাকে বলিল—কাল যাব গো, এসেছিলাম দুটো দিন থাকবো বলে—তুমি যে ভয় দেখিয়ে দিলে, তাতে দেরি হয়েই গেল এমনি—

মনোরমা হাসিয়া বলিল, ম'লেই বেশ হোত, না?

—না না, ওসব কথা বলতে নেই। ঘরের লক্ষ্মী মরতে যাবে কেন? ছিঃ!

মনোরমা একটু অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। এত আদরের কথা সে স্বামীর মুখে কতকাল শোনে নাই। ভাগ্যিস সাপে কামড়াইয়াছিল! উঃ—

মুখে বলিল, ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট—নয়তো আর কি? তোমায় রেখে যেতে পারা তো ভাগ্যির কথা গো।

বিপিন বলিল. আর আমার জন্তে বুঝি কিছু না?

মনোরমা হাসিল। সে গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না কোনো কালেই, মনের মধ্যে কি আছে বুঝাইতে পারে না। সে বোঝে কাজকর্ম, খাওয়ানো মাখানো, নিখুঁতভাবে সংসার চালানো। স্বামীকে সে ভালবাসে কি না বাসে, তা কি মুখে বলা যায়? ছেলেমেয়ের মা, এখন সে গিন্নিবান্নি মানুষ, অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা তাহার আসে না।

বলিল, না গো তা নয়। আমি মরে গেলে তুমি আর একটা বিয়ে করে সুখী হতে পারো - কিন্তু ওরা আর মা পাবে না।

বিপিন দুঃখিত হইল। সত্যিই আজ যদি মনোরমা মারা যাইত! কখনো সে মনোরমাকে একটা মিষ্টি কথা কি ভালবাসার কথা বলিয়াছে? না পাইয়া না পাইয়া মনোরমার সহিয়া গিয়াছে। ও সব আর সে প্রত্যাশা করে না, পাইলে অবাক্ হইয়া যায়। মনে ভাবিল—আমার হাতে পড়ে ওর দুর্দ্দশার একশেষ হয়েছে। ভাল খাওয়া কি ভাল কাপড় একখানা কোনদিন—বা কখনও কিছু দেখলেও না। সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে জীবনটা কাটলো ওর।

সে বলিল, হ্যাঁ, ভাল কথা। কাল দুটো ভাত সকালে সকালে যেন হয়। পিপ্‌লিপাড়া যাব কাল।

মনোরমা বলিল, তা কেন ? কাল যেও না। বিদেশে থাকো, একদিন একটু পিটে-নাটা করি, সেখানে কে করে দিচ্ছে, খেয়ে যেও।

বিপিন জানে মনোরমা মিষ্টি কথা কহিতে জানে না বটে, কিন্তু এ সব দিকে তাহার খুব লক্ষ্য। কিন্তু তাহার থাকিবার উপায় নাই। মনোরমাকে বুঝাইয়া বলিল, হাতে রোগী আছে, পিঠে খাইবার জন্ম বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলিল, যাবে আমার সঙ্গে সেখানে ? চল পিঠে খাওয়ানোর লোক নিয়ে যাই—

মনোরমা বলিল, ওমা, আমি আবার বুড়োমাগী সংসার ফেলে, গরুবাছুর ফেলে, মা বীণা এদের রেখে তোমার সঙ্গে বাসায় যাবো কি করে ?

যেন এ প্রস্তাবটা নিতান্তই আজগুবি।

মনোরমা বলিতে পারিত, চল তোমার সঙ্গেই যাই, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাবো। তোমার কাছে আমার কেউ নয়।

বিপিনের খুব ভাল লাগিত তাহা হইলে।

বিপিন ভাবিল—মনোরমার শুধু সংসার আর সংসার ! ওই এক ধরণের মেয়েমানুষ—

৫

পিপ্‌লিপাড়ায় পৌঁছিল প্রায় সন্ধ্যাবেলা। দত্ত মশায় বাড়ী নাই, আজ দিন দুই হইল বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ী কুমারপুরে গিয়াছেন কি কাজে। দত্ত মহাশয়ের ছেলে অবনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু! দুটো রুগী এসে ফিরে গিয়েছে কাল। এত দেরি হোল যে ? হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করুন।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শান্তি এক হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও অন্য হাতে একটা বাটিতে মুড়ি ও নারিকেল-কোরা লইয়া আসিল। বাটিটা বিপিনের হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, এত দেরি করলেন যে।

—উঃ, সে আর বোলো না শান্তি। কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম।

শান্তি উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি ? কি ?

—আমার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছিল।

—সাপে! কি সাপ ?

—রক্ষে যে জাত সাপ নয়, শেকড়চাঁদা বলেই আমার ধারণা। সে কি ঘটনা হোল শোনো—সেদিন তো এখান থেকে গেলাম সেই—

বলিয়া বিপিন সেদিনকার তাহার বাড়ী যাওয়ার পথে কান্নাকাটির রব শোনা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া গেল, শান্তি অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন। নইলে কি হোত আজ বলুন দিকি? মুড়ি খান, আমি চা নিয়ে আসি—কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলেন!

শান্তি চা আনিয়া দিল। বলিল, আজ আর রাঁধতে হবে না আপনাকে—আমাদের তো রান্না হবেই—ওই সঙ্গে আপনাকে দুখানা পরোটা ভেজে দিতে এমন কিছু ঝঞ্ঝাট হবে না।

—রোজ রোজ তোমাদের ওপর—

—ওসব কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি পর ভাবেন, কিন্তু আমি—

—না না, সে কথা না—পর ভাববো কেন শান্তি? তা হবে এখন—দিও এখন—

শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিল। কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় ইহার সঙ্গে। বেশির ভাগ কথা মনোরমাকে লইয়াই। মনোরমার কথা আজ আসিবার সময় বিপিন সারাপথ ভাবিয়াছে। তাহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনাটা যতই মনে হইতেছে, বিপিনের মন ততই মনোরমার প্রতি স্নেহে ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

শান্তি বলিল, দেখাবেন একদিন বৌদিদিকে?

—কি করে দেখাবো শান্তি! সে তো এখানে আসছে না।

—আমায় একদিন নিয়ে চলুন সেখানে।

—তুমি যাবে কি করে?

—আপনার সঙ্গে যাবো। গরুর গাড়ী একখানা না হয় দুটাকা ভাড়া নেবে।

—আমার সঙ্গে একা যাবে?

—কেন যাবো না?

বিপিন আশ্চর্য্য হইল শান্তির নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া। মেয়েটি শুধু সরলা নয়, ইহার মনে সাহস আছে। অবশ্য সে শান্তিকে সত্যই লইয়া যাইতেছে না, বহু বাধা তাহাতে, সে জানে। তবুও শান্তি যে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত যাইতে চাহিল—ইহাতেই উহার মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে, সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু শান্তির সামনে সে কথা বলিতে তাহার বাধিল।

শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলবো? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলের ক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না—তাই নয়? আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যিই অযাত্রা?

বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, কে বলেছে ওসব কথা? এ কথা তোমার মাথায় উঠলো কেন হঠাৎ?

—না, কিছু না, এমনি মনে পড়ে গেল। আপনাদের গাঁয়ের দিকে এ নিয়ম আছে, না?

—শুনেছি বটে, বললাম তো। বলে বটে। তবে মেয়েরা অযাত্রা এ কথা যে কেউ বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েরা অনেক উপকার করেছে আমার জীবনে। এই ধরো, আমি তোমার দিয়েই বলি—কেমন চিঁড়ের ফলার খাওয়ালে সেদিন—খেয়েদেয়ে নিন্দে করবো এমন মহাপাতকী আমি নই।

বলিয়া বিপিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, আপনার ওই এক কথা। যান।

—না, যাবো কেন, আমি অন্যায় কথা কি বলেছি বলো। তোমার যত্নের কথা যখন ভাবি শান্তি, তখন—সত্যিই বলচি—অমন খাওয়ানো অন্ততঃ—

—আচ্ছা, আচ্ছা থাক। আর আপনার ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি যাই, বৌদিদি একা রান্নাঘরে—গিয়ে ময়দা মাখবো—

—একটা পান পাঠিয়ে দিও গিয়ে। পেয়ালাটা নিয়ে যাও।

—না থাকুক। আপনার পান নিয়ে আসি, পেয়ালা নিয়ে যাবো।

বিপিনের মনে একটি অদ্ভুত তৃপ্তি। এ ধরণের সেবা সে চায়—মানীই কেবল সে সাধ মিটাইয়াছিল কিছু দিন—আবার এই শান্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে।

বেচারী মনোরমা এ ধরণটা জানে না। সেও সেবা করে, কিন্তু সে অন্যরকমের। তাহা পাইয়া এমন আনন্দ হয় না কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন সকালে বিপিন রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া ঔষধ বিক্রীর হিসাবের খাতা দেখিতেছে, এমন সময় শান্তি পিছন হইতে এক প্রকার চুপি চুপি আসিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় বিপিনকে চমকাইয়া দেওয়া বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সাহচর্য্যের আনন্দ দান করা। উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্ট না হইলেও সে এমনি প্রায়ই করে আজকাল। বিপিনও শান্তির সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পূর্ব্বের মত সঙ্কোচ বা জড়তা অনুভব করে না।

সামনে ছায়া পড়িতেই বিপিন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল শান্তি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া। বিপিন কিছু বলিবার পূর্বে শান্তি বলিল—কি করচেন?

বিপিন বলিল—এসো শান্তি, হিসেব দেখচি—

—একটা কথা বলতে এলাম, কাল চলে যাচ্ছি এখান থেকে—

বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কোথায়? কোথায় যাবে!

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল--বাঃ, কোথায় কি! আমার যাবার জায়গা নেই! এখানে কি চিরকাল থাকবো? বলেচি তো সেদিন আপনাকে।

—ও! শ্বশুরবাড়ী যাবে?

—হুঁ, উনি আসবেন কাল সকালে।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। দু একটা কথা যাহা সে ঝোঁকের মুখে বলিতে যাইতেছিল চাপিয়া গেল। মেয়েদের ভালবাসা লইয়া সে আর নাড়াচাড়া করিবে না। যাহা হইয়াছে যথেষ্ট। শান্তি বিবাহিতা মেয়ে, তাহাকে সে কিছুই বলিবে না ওসব কথা। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষই কষ্ট পায়। না, উহার মধ্যে আর নয়।

শান্তি যেন একটু দুঃখিত হইল। সে যাহা বিপিনের মুখে শুনিবার আশা করিয়াছিল তাহা না শুনিতে পাইয়া যেন নিরাশ হইয়াছে। বলিল—এখন আর অনেক দিন আসবো না—

বিপিন বলিল—কবে আসবে?

—তার কিছু কি ঠিক আছে? তা বেশ, যখনই আসি, আসি আর নাই আসি, আপনার আর কি!

শান্তি এ ধরণের কথা কেন বলিতে আরম্ভ করিল হঠাৎ! কি জবাব দিবে এ কথার সে?

তবুও বিপিন বলিল--না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়, তোমায় বলেচে! আমার খাওয়ার মজাটা তো সকলের আগে নষ্ট হোল।

—বৌদিদিদের বলে যাচ্চি, সে-সবের জন্য কিছু কষ্ট হবে না আপনার। তা বলে আর কোন কষ্ট রইল না-তো?

বলা চলিত এবং বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল, শান্তি তুমি চলে গেলে আমার এ জায়গা আর ভাল লাগবে না। দিনের মধ্যে সব সময় তোমার কথা মনে হবে। কেন আমায় আবার এ ভাবে জড়ালে শান্তি?

বিপিন সে ধরণের কথার ধার দিয়াও গেল না। বলিল--তা তোমাদের বাড়ী যত্ন যথেষ্টই পেয়ে আসছি, তোমাদের বাড়ীতে আশ্রয় না পেলে আমার এখানে ডাক্তারি করাই হোত না—

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—আপনার কেবল ওই সব কথা। কি করচি আমরা? আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিইচি—অমন কথা বুঝি লোকে বলে? সত্যি, বলবেন না আর ও কথা। বলতে নেই।

পরদিন শান্তির স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন ডিসপেন্সারি হইতে ফিরিয়া দুপুরে নিজের ছোট্ট চালায় রাঁধিতে বসিয়াছে, শান্তি সেখানে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া দুই পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—যাচ্চি।

—যাচ্চি বলতে নেই, বলতে হয় আসচি।

—যদি আর না-ই আসি?

—বলতে নেই ও কথা। এসো, আসবে বৈ কি—

—বললেন আসতে তো! তা হোলে আসবো, ঠিক আসবো। শান্তি কথা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, বিপিনের মনে হঠাৎ বড় করুণা ও সহানুভূতি জাগিল ইহার উপর। যাইবার সময় একটা কথা শুনিয়া যদি সে খুশি হয়, আনন্দ পায়! মুখের কথা তো, কেন এত কৃপণতা!

সে বলিল—তুমি চলে যাচ্ছ, সত্যি, মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড।

শান্তি বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এক ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিল —আপনার মন খারাপ হবে? ছাই!

বিপিন অবাক হইয়া গেল শান্তির চমৎকার ফিরিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া।

সে উত্তর দিল—ছাই না, সত্য সত্য বলচি।

শান্তি হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আসি।

কথা শেষ করিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

পলকে প্রলয় ঘটাইয়া দিয়া গেল শান্তি। ইহাও ওই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল! বিপিন ভাবেও নাই কোন দিন। ওর এ অদ্ভুত নায়িকামূর্ত্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল কেমন করিয়া? মেয়েরা পারে—ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষে দশমহাবিদ্যার মত এক রূপ হইতে কটাক্ষে অন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।

শান্তি চলিয়া গেলে গোটা বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যার সময় শান্তি চা করিয়া আনিত সে ডাক্তারখানা হইতে ফিরিলেই। আজ সন্ধ্যায় আর কেহ আসিল না। দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূদের অত দায় পড়ে নাই। বিপিন নিজেই একটু চা করিয়া লইল। সংসারের ব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইব না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায়? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে!

সন্ধ্যায় উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বিপিন রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া খানিক বসিল। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তিন চার দিন আগেও শান্তি এ সময়টা তাহাকে চা দিতে আসিয়া গল্প করিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, রোজই করিত। আজ সত্যই ফাঁকা ঠেকিতেছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। শান্তি তাহার কে? কেউ নয়, দুদিনের আলাপ—এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মত ভালবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনো হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আর কাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—এ কথা কিছুদিন পূর্ব্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাস করিত? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়ই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন্ পথে কখন তাহার গতি।

বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আজকাল সন্ধ্যার পর বাহিরে আসেন না। আজ কি মনে করিয়া তিনি বিপিনের রান্নাঘরে আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্পগুজব করিলেন। শান্তির কথাও একবার তুলিলেন, মেয়েটি আজ চলিয়া গেল। কন্যা-সন্তানের মত সেবা-যত্ন কে করে, পুত্রবধূরাও তো আছে, তেমনটি আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

বিপিন বলিল—শান্তি বড় ভাল মেয়েটি।

—অমন চমৎকার সেবা আর কারো কাছে পাইনে ডাক্তারবাবু। আমার এই বুড়ো বয়সে এক এক সময় সত্যই কষ্ট পাই সেবার অভাবে। কিন্তু ও এখানে থাকলে—আর ব্রাহ্মণের ওপর বড় ভক্তি। আপনার চাটুকু, জলখাবারটুকু ঠিক সময়ে সব দেওয়া, সেদিকে খুব নজর। বাড়ীতে যদি কোন দিন ভাল কিছু খাবার তৈরি হয়েছে, তবে আগে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিত।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া গেলে বিপিন খাইতে বসিবার উদ্যোগ করিল। এ সময়টা দু-একদিন শান্তি দালানের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিত, ও ডাক্তারবাবু, একটু দুধ আজ বেশী হয়েছে আমাদের, আপনার খাওয়া হয়েছে. না—হয় নি? নিয়ে আসবো?

মানী গেল, শান্তি গেল। এই রকমই হয়। কেহ টিকিয়া থাকে না শেষ পর্য্যন্ত।

২

পরদিন সকালে ডাক্তারখানায় আসিল ভাসানপোতা মাইনর স্কুলের সেই বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিপিন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। শেষবার যখন তাহার সঙ্গে দেখা, তখন মানীদের বাড়ী সে চাকুরী করে. মানীর গল্প করিয়াছিল ইহার কাছে। বিশ্বেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কোনো নারীর প্রেম জোটে নাই। বিশ্বেশ্বর কি করিয়া জানিল সে পিপ্‌লিপাড়ার হাটতলায় ডাক্তারখানা খুলিয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল—আপনি খবর রাখেন না বিপিনবাবু. আমি আপনার সব খবর রাখি। আপনাদের গাঁয়ের কৃষ্ণ চক্কোত্তির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ভাসানপোতায় ওঁর বড়মেয়ের বিয়ে দিয়েচেন না? তাঁর মুখেই আপনার সব কথা শুনেচি। তা আপনার কাছে এসেচি একটা বড় দরকারী কাজে। আপনাকে একটি রুগী দেখতে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিপিন বলিল—কোথায়?

—এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে—জেয়ালা-বল্লভপুর।

—জেয়ালা-বল্লভপুর? সে তো চাষা-গাঁ। সেখানকার লোককে আপনি জানলেন কি করে? রুগী আপনার চেনা?

বিশ্বেশ্বর কেমন যেন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—হাঁ, তা জানা বই কি। চলুন একটু শীগগির করে তা হোলে।

দুপুরের কিছু পূর্ব্বে দুজনে হাঁটিয়া উক্ত গ্রামে পৌঁছিল। বিপিন পূর্ব্বে এ গ্রামে কখনো আসে নাই তবে জানিত জেয়ালার বিল এ অঞ্চলের খুব বড় বিল এবং গ্রামখানি বিলের পূর্ব্ব পাড়ে। বিলের মাছ ধরিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে এরূপ জেলে ও বাগ্দী এবং কয়েক ঘর মুসলমান ছাড়া এ গ্রামে কোনো উচ্চবর্ণের বাস নাই।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু গ্রামের মধ্যে গেল না। বিলের উত্তর পাড়ে গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তাহার তলায় ছোট একটি চালাঘরের সামনে বিশ্বেশ্বর তাহাকে লইয়া গেল।

বিপিন বলিল রুগী এখানে নাকি?

— হ্যাঁ, আসুন ঘরের মধ্যে। সোজা চলুন, অন্য কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন দেখিল একটি স্ত্রীলোক, জাতিতে বাগ্দী কিংবা দুলে, ঘরের মেজেতে পুরু বিচালির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। স্ত্রীলোকটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে, রং কালো, চুল রুক্ষ, হাতে কাচের চুড়ি, পরণে ময়লা শাড়ি। জ্বরের ঘোরে রোগিণী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

বিপিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—এর নিমোনিয়া হয়েচে—দুদিকই ধরেচে। খুব শক্ত রোগ। খুব সেবা-যত্ন দরকার। বড্ড দেরীতে ডেকেচেন আমাকে—তবুও সারাতে পারি হয়তো কিন্তু এর লোক কই? খুব ভাল নার্সিং চাই—নইলে—

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ বিপিনের দুই হাত ধরিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—বিপিনবাবু, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে রুগীকে—যে করেই হোক, আপনার হাতেই সব, আপনি দয়া করে—

বিপিন দস্তুরমত বিস্মিত হইল। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এত মাথাব্যথা কিসের তাহা ভাল বুঝিতে পারিল না। এ বাগ্দী মাগী মরে বাঁচে তা বিশ্বেশ্বরের কি? ইহার আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় গেল?

বিশ্বেশ্বর বলিল—চলুন গাছতলাটার ধারে মাদুরটা পেতে দি, ওখানটাতে বসুন—তামাক সাজবো?

বিপিন গাছতলায় গিয়া বসিল। বিশ্বেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটি বিপিনকে দিবার পূর্ব্বে মলিন জামার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিতে গেল। বিপিন বলিল—আগে বলুন মেয়েটা কে—আপনি এর টাকা দেবেন কেন, এর লোকজন কোথায়?

বিশ্বেশ্বর বলিল—কেন, আপনি শোনেন নি কোনো কথা?

—না, কি কথা শুনবো?

বিশ্বেশ্বর মাদুরের এক প্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল—ওর নাম মতি। বাগ্দীদের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মানুষ আপনি আর দেখবেন না। ভাসানপোতায় ওর বাপের বাড়ী অল্প বয়সে বিধবা হয়। আপনি তো জানেন আপনাকে বলেছিলাম মেয়েমানুষের ভালবাসা কি জীবনে কখনও জানিনি। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পারি নে ডাক্তারবাবু। ও বাগ্দী হোক, দুলে হোক ওই আমায় সে জিনিস দিয়েছে—যা আমি কারু কাছে পাইনি কোনো দিন। তারপর সে অনেক কথা। ভাসানপোতা ইস্কুলের চাকুরীটি সেই জন্যে গেল। ওকে নিয়ে আমি এই জোয়ালা-বল্লভপুরে এলাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম ইস্কুলের

প্রভিডেন্ট ফণ্ডের, তাতেই চলছিল। আর ও মাছ বেচে, কাঠ ভেঙে, শাক তুলে আর কিছু রোজগার করতো। তারপর পুজোর আগে আমি পড়লাম অসুখে। টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেল। ও কি করে আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে সে অসুখ থেকে! তারপর এই রোজ সকালে ঠাণ্ডা বিলের জলে শাক তুলে তুলে এই অসুখটা বাধিয়েচে! এখন ওকে আপনি বাঁচান—এ সব কথা নিয়ে তাসানপোতায় তো খুব রটনা—আমায় গালাগাল আর কুচ্ছো না করে তারা জল খায় না। তাই বলচি আপনি শোনেন নি কিছু ?

বিপিন অবাক হইয়া বিশেশ্বরের কথা শুনিতেছিল। এমন ঘটনা সে কখনো শোনে নাই। শুনিয়া তাহার সারা মন বিশেশ্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি, ছি, ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া শেষকালে কি না বাগ্দী মাগীর সঙ্গে—নাঃ, আজ কি পাপই করিয়াছিল সে, কাহার মুখ দেখিয়া না জানি উঠিয়াছিল!

সে বলিল—টাকা রাখুন, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু দামী ওষুধ কিছু লাগবে। অ্যান্টিফ্লজিস্টিন একটা কিনে আনুন, আমার কাছে নেই, লিখে দিচ্ছি আনিয়ে নিন। প্রেস্‌ক্রিপশন একটা করে দিই—শক্ত রোগ—

বিশেশ্বর ব্যাকুল ভাবে বলিল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

—নার্সিং চাই ভাল। আর পথ্যি—

বিশেশ্বর বিপিনের হাতে ধরিয়া—ওষুধগুলো আপনি লিখে দিয়ে গেলে হবে না, আনিয়ে দিন। এ গাঁয়ের কোন লোক আমার কথা শুনবে না। এই ঘটনার জন্যে সবাই—বুঝলেন না ? কেউ উঁকি মেরে দেখে যায় না। আপনিই ভরসা, ডাক্তারবাবু।

বিপিন বিরক্ত হইল। ভাল বিপদে পড়িয়াছে সে! সে নিজে এখন সেই রাণাঘাট হইতে অ্যান্টিফ্লজিস্টিন আনিতে যাইবে ? টাকাই বা দিতেছে কে ?

সে বলিল—আমার ডাক্তারখানায় যদি থাকতো তবে আলাদা কথা ছিল। আমার কাছে ও সব থাকে না। আপনি এক কাজ করুন, গরম খোলের পুলটিশ দিন। রাই সর্ষের খোল হলে খুব ভাল হয়। তাও যদি না পান, গরম ভাতের পুলটিশ দিন। আর আমার ডাক্তারখানায় আসুন, ওষুধ দিচ্ছি।

বিশেশ্বর বিপিনের সঙ্গে আবার ডাক্তারখানায় আসিল। ডাক্তার হিসাবে বিপিন এ কথাও ভাবিল যে, ওই কঠিন রোগীর মুখে জল দিবার কেহই রহিল না কাছে, বিশেশ্বর যাতায়াতে চার ক্রোশ হাঁটিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে দুই ঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগাইবে, এ সময়টা একা পড়িয়া থাকিবে ওই মেয়েটা ?

পরক্ষণেই ভাবিল—তুমিও যেমন! দুলে বাগ্দী জাত, ওদের কঠিন জান্—ওদের এই অভ্যেস।

বিশেশ্বর কিন্তু সারাপথ মত্তি বাগ্দিনীর নানা গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিল। অমন মেয়ে হয় না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিশেশ্বরের গত অসুখের সময় বুক দিয়া সেবা করিয়াছে—প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা খরচ করিতে দেয় না, নিজে শাক পাতা তুলিয়া, বুনিতে

মাছ ধরিয়া বেচিয়া যাহা আয় করে, তাহাতেই সংসার চালাইতে বলে। অমন ভালবাসা বিশ্বেশ্বর কখনো কাহারও কাছে পায় নাই।

হঠাৎ বিপিন বলিল - রাঁধে কে ?

—ওই রাঁধে! আমি ওর হাতেই খাই—ঢাকবো কেন? যে আমায় অত ভালবাসে, তার হাতে খেতে আমার আপত্তি কি? ও আমার জন্যে কম ছেড়েচে? ওর বাবা ভাসান-পোতা বাগ্দী পাড়ার মধ্যে মাতব্বর লোক, গোলায় ধান আছে, চাষী গেরস্থ। খাওয়া-পরার অভাব ছিল না, সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে এক কাপড়ে চলে এসেচে। আর এই কষ্ট এখানে —হিম জলে নেমে শাক তুলে রোজ চিংড়াঘাটায় বাজারে বিক্রি করে আসে কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধান ভানে। এত কষ্ট ওর বাপের বাড়ী ওকে করতে হোত না—তাও কি পেট পুরে খেতে পায়? আর ওই তো ঘরের ছিরি দেখলেন—ইস্কুলের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে পঞ্চান্নটি টাকা পেয়েছিলাম—তা আর আছে মোট বাইশটি টাকা – আর ঘরখানা করেছিলাম দশ টাকা খরচ করে, আমার অসুখের সময় ব্যয় হয়েছে বারো তেরো টাকা – আর বাকী টাকা বসে বসে খাচ্ছি আজ চার মাস —তাহোলে বুঝুন পেট ভরে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে!

লোকটার জাত নাই। বাগ্দিনীর হাতের রান্নাও খায়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার দায়ে কিনা শেষে জাতিকুল বিসর্জ্জন দিল!

ঔষধ লইয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেল, কাল একবার বিপিন যেন অবশ্য করিয়া গিয়া রোগী দেখিয়া আসে।

৩

বিপিন পরদিন একাই রোগী দেখিতে গেল। জেয়ালা পৌছিতে প্রায় বৈকাল হইয়া আসিল, সম্মুখে জ্যোৎস্না রাত—এই ভরসাতেই দুপুরে আহারাদি করিয়া রওনা হইয়াছে। ঘরখানার সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না। অগত্যা সে ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে রোগিণী কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি অঘোর অবস্থায় বিচালি ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। বিশ্বেশ্বরের চিহ্ন নাই কোথাও। ব্যাপার কি, মেয়েটিকে এ অবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায়?

বিপিন বিছানার পাশে বসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ?

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল আছি।

বিপিন থার্মমিটার দিয়া দেখিল জ্বর প্রায় ১০৪-র কাছাকাছি। সে জানে, রোগীরা প্রায়ই এ অবস্থায় বলে যে সে ভাল আছে। মাথায় জল দেওয়া দরকার, তাই বা কে দেয়?

সে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বর কোথায় ?

মেয়েটি বিপিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর টানিয়া টানিয়া বলিল —অ্যাঁ—অ্যাঁ—

—বিশ্বেশ্বর বাবু কোথায়—বিশ্বেশ্বর ?

রোগিণী এবার বোধহয় বুঝিতে পারিল। বলিল—ক'নে গিয়েচেন।

ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক বুঝিয়া বিপিন একটা জলপাত্রের সন্ধানে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। এখনি ইহার মাথায় জল দেওয়া দরকার। এককোণে একটা মেটে কলসীতে সম্ভবতঃ খাবার জল আছে, বিপিন সন্ধান করিয়া একখানা মানকচুর পাতা আনিয়া রোগিণীর মাথার কাছে পাতিয়া কলসীর জলটুকু সব উহার মাথায় ঢালিল। পরে বিল হইতে আরও জল আনিয়া আবার ঢালিল। বার কয়েক এরূপ করিবার পর রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব যেন খানিকটা কাটিল। বিপিন থার্মমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে। ডাক্তারি করিতে আসিয়া এ কি বিপদ! এমন হাঙ্গামাতে তো সে কখনও পড়ে নাই।

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মানীর মুখখানা। এই সব দুঃখী, অসহায়, রোগার্ত লোকদের ভাল করিবার জন্যই তো মানী তাহাকে ডাক্তারি পড়িতে বলিয়াছিল। মেয়েদের সেবা পাইয়া আসিয়াছে সে চিরকাল। ইহাকে ফেলিয়া গেলে মানীর, শান্তির, মনোরমার অপমান করা হইবে—কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল। বিশ্বেশ্বর যদি ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়া থাকে! তবে এখন উপায় ?

সে আবার রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গিয়েছে জান? কতক্ষণ গিয়েছে ?

মেয়েটি বলিল—জানিনে।

বিপিন আর এক কলসী জল আনিতে গেল। জেয়ালার বিস্তৃত বিলের উপর সূর্য্যাস্তের ঘন ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ পাড়ের তালগাছের মাথায় এখনও রাঙা রোদ। দূর জলের পদ্মফুলের বনে পদ্মপাতা উলটিয়া আছে, যদিও এখন পদ্মফুল চোখে পড়ে না। বল্লভপুরের দিকে জেলেরা ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিতেছে। একদল জলপিপি ও পানকৌড়ি জলের ধারে শোলাগাছের বনে গুগ্‌লি খুঁজিতেছে। বিপিনের মনে কেমন এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। যদি বিশ্বেশ্বর ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়াই থাকে, তবে তাহাকে থাকিতে হইবে এখানে সারারাত। অর্থ উপার্জন করিলেই কি হয় ? তাহার বাবা ৺বিনোদ চাটুয্যে কম উপার্জন করেন নাই—অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত পয়সা বলিয়াই টেকে নাই। কাহারও কোন উপকার হয় নাই তাহা দিয়া।

ঘরে রোগীর পথ্য কিছু নাই। ডাব ও ছানার জল খাওয়ানো দরকার এরকম রোগীকে। কিছুই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নিকটবর্ত্তী দুলেপাড়া হইতে একটি লোক ডাকিয়া আনিল। বলিল—গোটাকতক ডাব নিয়ে আসতে পারবে ? দাম দেবো।

লোকটা বলিল—বাবু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পিপলিপাড়ার ডাক্তারবাবু দাম আপনাকে দিতে হবে না। তবে বাবু ভাব রাত্তিরে পাড়া যাবে না তো? তা আপনি কেন —সে বামুনঠাকুর কোথায় গেল? দেখুন তো বাবু, মেয়েডারে টুইয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসে তিনি এখন পালালেন নাকি? এইডে কি ভদ্দরনোকের কাজ?

একপ্রহর রাত্রে বিশ্বেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। সে ফেলিয়া পালায় নাই—চিংড়িঘাটার বাজার হইতে কিছু ফল, খৈল ও সাবু মিছরী কিনিতে গিয়াছিল। বিপিনকে দেখিয়া বলিল—আপনি এসেছেন? বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি বলে গেলেন খোলের পুলটিশ দিতে, এখানে পেলাম না—তাই বাজারে গিয়েছিলাম এই সব জিনিসপত্র আনতে। কতক্ষণ এসেছেন?

দুজনে মিলিয়া সারারাত রোগীর সেবা করিল। সকালের দিকে বিপিন বলিল—আমি ডাক্তারখানা খুলবো গিয়ে—বসুন আপনি—একে একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি ওবেলা আবার আসব।

একটা অদ্ভুত আনন্দ লইয়া সে ফিরিল। এই সব পল্লী-অঞ্চলের যত অসহায়, দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করিবার জন্যই যেন সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—এই রকমের একটা মনোভাব সারাপথ তাহাকে তাহার নিজের চোখে মহৎ ও উদার করিয়া চিত্রিত করিল।

আবার ওবেলা যাইতে হইবে। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর নীচ-জাতীয়া প্রণয়িনীকে বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—দুজনেই ওরা নিতান্ত দুঃস্থ অসহায়। যদি কখনো মানীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারিবে—আমায় মানুষ করে দিয়েচ মানী। সেই গরীব, অসহায় মেয়েটির রোগশয্যার পাশে তুমিই আমার মনের মধ্যে ছিলে।

সেই দিনই রাত্রে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তীর ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া সে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা বিশ্বেশ্বরবাবু, আত্মীয়-স্বজন ছাড়লেন এর জন্যে, চাকরীটা গেল, জেয়ালার বিলের ধারে এইভাবে রয়েছেন, এতে কষ্ট হয় না?

—কি আর কষ্ট! বেশ আছি, এখন যদি ও বেঁচে ওঠে তবে। ও আমায় যা দিয়েছে, আমার নিজের সমাজে বসে আমাকে তা কেউ দিয়েছে?

—দেয়নি মানে কি? বিয়ে করলেই তো পারতেন।

—আমার সাহস হয়নি ডাক্তারবাবু, সামান্য পণ্ডিতি করি—ভাবতাম সংসার চালাতে পারবো না। এ নিজের দিক মোটেই ভাবেনি বলেই আমার সঙ্গে চলে আসতে পেরেছে।

—শুধু তাই নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, ও বাগ্দী। আপনাকে অন্য চোখেই দেখত, কারণ আপনি উচ্চবর্ণের। কি করে আপনি আলাপ করলেন এর সঙ্গে?

—আমাদের ইস্কুলের কাঁটাল গাছ ওর বাবা জমা রেখেছিল। তাই ও আসতো কাঁটাল পাড়তে। এই সূত্রে আলাপ। এখন ওর অসুখ—ওর চেহারা বেশ ভাল দেখতে, যদি বেঁচে ওঠে তবে দেখবেন ওর মুখের এমন একটা শ্রী আছে—

বিপিন অন্য কথা পাড়িল—সে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানে, প্রণয়ীদের মুখে

প্রণয়িনীদের রূপগুণের বর্ণনায় আদি-অন্ত নাই। হইলই বা বাগ্দী বা দুলে। প্রেম মানুষকে কি অন্ধই করে!

বিশ্বেশ্বরের উপরে বিপিনের করুণা হইল। তাহার সারাজীবনের তৃষ্ণা—এ অবস্থায় পানাপুকুরের জলও লোকে পান করে তৃষ্ণার ঘোরে।

বিপিন বলিল—এর বাড়ীতে আপনার লোকজনের কাছে খবর পাঠান। যদি ভালমন্দ কিছু হয়, তারা আপনাকে দোষ দেবে। এরও তো ইচ্ছে হয় আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে।

—তারা কেউ আসবে না। ওর বাবা অবস্থাপন্ন চাষী গেরস্থ। তারা বলেচে ওর মুখ দেখবে না আর।

অনেক রাত্রে বিপিন একবার জল তুলিতে গেল বিলে। ধপধপে জ্যোৎস্না চারিদিকে, অদ্ভুত শোভা স্তব্ধ গভীর নিশীথিনীর। পদ্মবনে রাত-জাগা সরাল পাখী ডাকিতেছে। দূরে বিলের ধারে জেলেদের মাছ চৌকি দেওয়ার কুঁড়ের কাছে কাঠকুটো জ্বালিয়া আগুন করিয়াছিল, এখন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বরের দুর্ভাগ্য, হয়তো মেয়েটি আজ শেষ-রাত্রে কাবার হইবে। বিশ্বেশ্বরকে বিপিন সে কথা বলে নাই, জ্বর অতি দ্রুত নামিতেছে, ক্রাইসিস্ আসিয়া পড়িল, নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিপিন যাহা করিবার করিয়াছে, আর করিবার উপযুক্ত তোড়জোড় নাই তাহার! বাঁচান যাইবে না।

এই শুক্ল রাত্রির সীমাহীন রহস্য তাহার মনকে অভিভূত করিল। বিপিন কখনো ও সব ভাবে না, তবুও মনে হইল, মেয়েটি আজ কোথায় কতদূরে চলিল, তখনো কি সে জাতে বাগ্দীই থাকিয়া যাইবে? উচ্চবর্ণের প্রতি প্রেমের দায়ে তাহার এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহা কি সম্পূর্ণ বৃথা যাইবে? কোথাও কোনো পুষ্পমাল্য অপেক্ষা করিয়া নাই কি তাহার সাদর অভিনন্দনের জন্য?

মানী যদি থাকিত, এসব কথা তাহার সঙ্গে বলা চলিত। মানী সব বোঝে, সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। শান্তি সেবাপরায়ণা বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা নাই, সে খাওয়াইতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সে আনন্দ পাওয়া যায় না। মানী আজ কোথায়, কি ভাবে আছে? আর কখনো তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? যাক্, সে যেখানেই থাক, সে বাঁচিয়া আছে। নিমোনিয়ার ক্রাইসিস খড়্গ লইয়া বলি দিতে উদ্যত হয় নাই তাহাকে। সে বাঁচিয়া থাকুক। দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর মাটি মানীর পায়ের স্পর্শ পায় যেন, মাটিতে মাটিতেও যেন যোগটা বজায় থাকে।

শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে এক দিকে বিপিন, অন্য দিকে বিশ্বেশ্বর ধরিয়া মৃতদেহকে কুটীরের বাহির করিল। বিলের চারিধারে ঘনীভূত কুয়াসা। শ্মশান বিলের ওপারে, প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। বিপিনের খাতিরে বল্লভপুরের বাগ্দীপাড়া হইতে দুজন লোক আসিল। বিপিন এবং বিশ্বেশ্বরও ধরিল। সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়, প্রেমের মান রাখা চাই, বিপিনের দৃষ্টি সেদিকে।

স্নান করিয়া যখন বিপিন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, ও ডাক্তারবাবু, কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে? রুগী ছিল? শান্তি যে আপনার জন্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'রকমের আচার পাঠিয়ে দিয়েচে। যে গাড়োয়ান গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, সে কাল রাত্রে ফিরে এসেচে কিনা—সেই গাড়ীতেই আপনার জন্যে এক হাঁড়ি আচার আলাদা করে—ব্রাহ্মণের ওপর বড্ড ভক্তি আমার মেয়ের—

বিপিন যেন শক্ত মাটি পাইল অনেকক্ষণ পরে। শান্তি আছে, সে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সে দেহমুক্ত জীবাত্মা নয়—শান্তি তাহাকে আচার পাঠাইয়াছে। আবার হয়তো একদিন আসিয়া হাজির হইবে, আবার চা করিয়া আনিয়া দিবে তাহার হাতে।

হতভাগ্য বিশ্বেশ্বর!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে আবার বল্লভপুর গেল। বিশ্বেশ্বর কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার। গিয়া দেখিল, ঘরের দোর খোলা; বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ভাত চড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল, কে?

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি। এখন অবেলায় রাঁধছেন যে?

বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া মনে হয় না, সে কোনো শোক পাইয়াছে। বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলাম—রুগীর ঘর, বুঝলেন না? আবার নেয়ে এলাম এই সব করে, তখন বেলা তিনটে। তারপর এই ভাত চড়িয়েচি এইবার দুটো খাবো, বড় খিদে পেয়েচে।

বিপিন চাহিয়া দেখিল ঘরের কোথাও কোনো বিছানা নাই। যে ছেঁড়া কাঁথা ও বিচালির শয্যায় রোগিণী শুইয়া থাকিত, তাহা শবের সঙ্গে গিয়াছে, এখন এই ঠাণ্ডা রাত্রে বিশ্বেশ্বর শুইবে কিসে? ওই একটিমাত্র বিছানাই সম্বল ছিল নাকি?

বিশ্বেশ্বর ভাত নামাইয়া বড় একখানা কলার পাতায় ঢালিল। শুধু দুটি বড় বড় কয়লা সিদ্ধ ছাড়া খাইবার অন্য কোনো উপকরণ নাই। তাহা দিয়াই সে যেমন গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল, বিপিন বুঝিল, লোকটার সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বটে। বেচারী চাকুরীটা হারাইয়া বসিল প্রেমের দায়ে পড়িয়া, এখন খাইবেই বা কি, আর করিবেই বা কি। তাও এমন অদৃষ্ট, একূল ওকূল দুকূলই গেল।

প্রথম যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বেশ্বর তত কথা বলে নাই, দুটি কয়লা সিদ্ধের মধ্যে একটা কয়লা সিদ্ধ দিয়া আন্দাজ অর্দ্ধেক পরিমাণ ভাত খাওয়ার পরে বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল। বিপিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আজ দিনটা কি বিপদের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল। এক একদিন অমন হয়। বড্ড খিদে পেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

বিপিন বলিল—তা তো হোল, কিন্তু আপনি এখন শোবেন কিসে? বিছানা তো নেই দেখচি।

—ও কিছু না, গায়ের কাপড়খানা আছে, বেশ মোটা, শীত ভাঙে খুব। আর দু আঁটি বিচালি চেয়ে আনবো এখন পাড়া থেকে।

—না চলুন, আমার ওখানে রাত্রে শুয়ে থাকবেন। এমন কষ্টে কি কেউ শুতে পারে?

—না, না, কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু। ও আবার কষ্ট কিসের? ওসব কষ্টকে কষ্ট বলে ভাবিনে। দিব্যি শোবো এখন, একটু আগুন করবো ঘরে। তবে প্রথম দিনটা, হয়তো একটু ভয় ভয় করবে।

—আমি আপনার ঘরে থাকবো আজ আপনার সঙ্গে?

—কোনো দরকার নেই। আপনি না হয় একদিন শুয়ে রইলেন, কিন্তু আমাকে সইয়ে নিতে হবে তো? সে তো ভালবাসতো আমায়, তার ভূত এসে আর আমার গলা টিপবে না। আচ্ছা, সত্যি ডাক্তারবাবু, কোথায় সে গেল, বলুন তো?

—নিন, আপনি খেয়ে নিন। ওসব কথা পরে হবে এখন।

বিশেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া তামাক সাজিল। নিজে দু চার বার টানিয়া বিপিনের হাতে হুঁকাটি দিল। বিপিন প্রথম দিন ইতস্তত, করিয়াছিল, লোকটা বাগ্‌দিনীর হাতের রান্না খায়, ইহার জাত নাই, এ হুঁকায় তামাক খাইবে কি না। কিন্তু কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতি তাহার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে যেমন ইহার প্রতি, তেমনি ছিল ইহার মৃতা প্রণয়িনীর প্রতি। সুতরাং এখন ওকথা তাহার আর মনেই ওঠে না।

বিপিন বলিল, এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—একটা পাঠশালা করবো ভাবচি, এই জেয়ালা-বল্লভপুরে অনেক নিকিরি আর জেলে-মালোর বাস। ওদের ছেলেপিলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে, চলবে না?

—ওদের সঙ্গে কথা হয়েচে কিছু?

—কথা এখনো তুলিনি কিছু। কাল একবার পাড়ার মধ্যে গিয়ে দু-এক জনের কাছে পাড়ি কথাটা।

বিপিন বুঝিল, ইহা নিতান্তই অস্থির-পঙ্কের ব্যাপার। কিছুই ঠিক নাই। কোথায় বা পাঠশালা, কোথায় বা ছাত্রদল! ইহার মস্তিষ্কে ছাড়া তাহাদের অস্তিত্ব নাই কোথাও।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ভূত মানেন?

—না, যা কখনো দেখিনি, তা কি করে মানবো? ওসব আর ভেবে কি করবেন বলুন?

বিশেশ্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন অবাক হইয়া গেল পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদিতে পারে, তাহা সে নিজেকে দিয়া অন্ততঃ ধারণাই করিতে পারিল না। ভাল বিপদে ফেলিয়াছে তাহাকে বিশেশ্বর পণ্ডিত।

দুঃখও হইল। লোকটার লাগিয়াছে খুব। লাগিবারই কথা বটে। কে জানে, হয়তো মনের দিক দিয়া মানীর সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, মৃতার সহিত ইহারও সেই সম্বন্ধ ছিল। হতভাগ্য

বিশেশ্বরের প্রতি সে অবিচার করিতে চায় না।

ইহাকে একা এই শোকের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। রাত্রিটা বিপিন রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের ডাক্তারখানায় সম্প্রতি মাসখানেক একটিও রোগী আসে নাই।

রোজই সকালে বিকালে নিয়মিত ডাক্তারখানায় গিয়া তীর্থের কাকের মত বসিয়া থাকে। হাতের পয়সাকড়ি ফুরাইয়া গেল। কোনো দিকে রোগবালাই নাই, দেশটা হঠাৎ যেন মধুপুর কি শিমুলতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জীবনটাও যেন বড় ফাঁকা ফাঁকা। সকাল সন্ধ্যা একেবারে কাটে না। দত্ত মশায় অবশ্য আছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, আর ভাল লাগে না।

মনোরমার জন্য মন কেমন করে আজকাল। মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর পর হইতে বিপিন লক্ষ্য করিতেছে স্ত্রীর উপর তাহার মনোভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনে হয় মনোরমা তো চলিয়া যাইতেছিল, একদিনও সে মনোরমাকে মুখের একটি মিষ্ট কথাও বলে নাই, এ অবস্থায় যদি সেদিন সে সত্যই মারা পড়িত বিপিনকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইত সে সব ভাবিয়া। সুখের মুখ কখনো সে দেখে নাই, বিপিন তাহাকে এবার সুখী করিবে। মানুষের মনের এই বোধ হয় গতি, বড় বড় অবলম্বন যখন চলিয়া যায়, তখন যে আশ্রয়কে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত, তাহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় অতি প্রিয়, অতি প্রয়োজনীয়। মনোরমার চিন্তা কখনো আনন্দ দেয় নাই, আজকাল দেয়। তাহার প্রতি একটা অনুকম্পা জাগে, স্নেহ হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার এ সব!

বিপিন মাস দুই বাড়ী যায় নাই, কিছু টাকা হাতে আসিলে একবার বাড়ী যাইত। কিন্তু এই সময়ই হাত একেবারে খালি।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, ডাক্তারবাবু, শান্তি কাল পত্র লিখেচে, আপনার কথা জিগ্যেস করেচে, আপনি কেমন আছেন, ডাক্তারি কেমন চলচে। আর একটা লিখেচে, ওর শ্বশুরের চোখ অস্ত্র হবে কলকাতা বা রাণাঘাটের হাসপাতালে। আপনি সে সময়ে সময় করে দুদিনের জন্যে ওদের ওখানে থেকে শ্বশুরের সঙ্গে রাণাঘাট বা কলকাতা যেতে পারবেন কি না লিখেচে। শান্তি থাকবে, আমার জামাই থাকবে। অবিশ্যি আপনার ফি এবং যাতা-

রাতের খরচা ওরা দেবে। একটা দিন কিংবা দুটো দিন লাগবে। আপনি থাকলে ওদের একটা বলভরসা। ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, হাসপাতালের খুলুক সন্ধান কিছুই জানে না। আপনার কত বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, আপনি পড়েচেন সেখানে। তাই আপনাকে নিয়ে যেতে চায়।

বিপিন বলিল, বেশ লিখে দেবেন আমি যাবো. তবে কি দিতে চাইলে যাবো না। যাতা-য়াতের খরচ দিতে চান, দেবেন তাঁরা, কিন্তু ফির কথা যেন না ওঠান।

দত্ত মশায় আর কিছু বলিলেন না।

দিন পাঁচ ছয় পরে দত্ত মশায় একদিন সকালে বিপিনকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন। পূর্ব্ব রাত্রে শান্তির শ্বশুরবাড়ী হইতে লোক আসিয়াছে, রাণাঘাট হাসপাতালে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যাওয়া হইবে, বিপিনকে আজ এখনি রওনা হইতে হইবে, বেশী রাত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া দত্ত মশায় বিপিনকে গত রাত্রে কিছু বলেন নাই।

সাত ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে অতিক্রম করিয়া প্রায় বেলা দুইটার সময় বিপিন শান্তির শ্বশুরবাড়ী গিয়া পৌঁছিল। শান্তির স্বামী গোপাল প্রথমেই ছুটিয়া আসিল। বলিল, ওঃ, এত বেলা হয়ে গেল ডাক্তারবাবু! বড্ড কষ্ট হয়েচে, এই রোদ্দুর! ও কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যে নাইবার জল চানের যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

বিপিন গিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ্, ঢিপ্, করিতেছে, এখনি আজ শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে। বিপিন ভাবিয়া অবাক হইল, শান্তির সঙ্গে দেখা হইবার আগ্রহে মনের এই রকম অবস্থা—এ কি কল্পনা করা সম্ভব ছিল এক বছর পূর্ব্বেও? মানী নয়, শান্তি। কে শান্তি? ক'দিন তাহার সহিত পরিচয়? উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যেও কেমন এক প্রকার অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

শান্তি একটু পরেই আধ ঘোমটা দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। হাসিমুখে বলিল—আমি বেলা দশটা থেকে কেবল ঘরবার করচি—এত বেলা হবে তা ভাবিনি। একটু জিরিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে ডাব খান।

—তোমার শ্বশুর মহাশয়কে একবার দেখবো।

—এখন না। বাবা খেয়ে ঘুমুচ্চেন একটু, বুড়োমানুষ। আপনি নেয়ে নিয়ে রান্না চড়িয়ে দিন, তারপর—

বিপিন বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি শান্তি! রান্না চড়িয়ে দেবো কি? এত বেলায়—

শান্তি হাসিয়া বলিল—ও সব চলবে না এখানে। ব্রাহ্মণ মানুষকে আমরা কিছু বেঁধে দিতে পারিনে। আমি সব যোগাড় করে দেবো, আপনি শুধু নামিয়ে দেবেন। আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না আপনার সেজন্যে।

শান্তির আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যাহাতে বিপিনের মন একেবারে লঘু ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল। শান্তি সেবাপরায়ণা মেয়ে বটে, কাজের মেয়েও

বটে, তাহার উপর নির্ভরশীলতা কেমন যেন আপনিই আসে।

গোপাল আসিয়া বলিল—চলুন, নদীতে নাইয়ে নিয়ে আসি।

বিপিন বলিল—নদী পর্য্যন্ত আপনার কষ্ট করে যাওয়ার কি দরকার। আমায় দেখিয়ে দিলেই তো…! গোপাল তাহাতে রাজি নয়, বিপিন বুঝিল শান্তিই বলিয়া দিয়াছে তাহাকে নদীর ঘাটে লইয়া গিয়া স্নান করা য়া আনিতে। শান্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখানে খুব বেশী, এমন কি মনে হইল বাপের বাড়ী অপেক্ষা বেশী।

স্নানাহারের পর শান্তি বাহিরের ঘরে নিজে বিপিনের বিছানা করিয়া দিল। বিপিন বলিল—শান্তি, আমি দুপুরে ঘুমুই নে তুমি জানো, বিছানা কিসের—তার চেয়ে বোসো এখানে দুটো কথাবার্ত্তা বলি।

শান্তি হাসিয়া বলিল—না তা হবে না, একটু বিশ্রাম করে নিতেই হবে। কাল আবার এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা গরুর গাড়ীতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

—ও কষ্ট কিছু না, তোমার শ্বশুর উঠেছেন কি না দেখ। একবার তাঁর চোখটা দেখি। বিপিন চোখের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবুও তাহাকে ভান করিতে হইল যে সে অনেক কিছু বুঝিয়েছে। শান্তির শ্বশুরের দুই চারিটি চক্ষুপীড়া সংক্রান্ত অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তরও তাহাকে দিতে হইল।

গ্রামখানি বিকালে ঘুরিয়া দেখিল, পিপলিপাড়া বা সোনাতনপুরের মতই জঙ্গলে ভরা, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই তাই। শান্তিদের বাড়ীর পিছনেই তো প্রকাণ্ড বাগান, চারিধার বাঁশবনে ঘেরা. দিনমানেও রোদ ওঠে না সেদিকটাতে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিল। বাড়ীর পিছনে ঘন বন-বাগানের ধারে একটি বাতাবী লেবুতলায় ঢেঁকি পাতা। সেখানে শান্তি ও আর একটি প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষ চিঁড়ে কুটিতেছে—শান্তি তাহাকে সেখানে ডাকিল। বিপিন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষটি ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, শান্তি ঢেঁকির গড়ে ধান দিয়া যাইতেছে। তাহাকে বসিতে একখানা পিঁড়ি দিয়া হাসিয়া বলিল—বসুন। এখানে বসে গল্প করুন আমি সরু ধান দুটো ভেনে চাল করে নিচ্ছি, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাবা অন্য চাল খেতে পারেন না।

বিপিন চাহিয়া দেখিল বন-বাগানের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতই বড় চাঁদখানা বাঁশবন নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে সন্ধ্যার, খুব নির্জ্জন গ্রামখানা, লোকজন বেশী নাই, পিপলিপাড়ার হাটতলার চেয়েও নির্জ্জন।

কিন্তু বেশ লাগিল এই বন-বাগানের মধ্যে ঢেঁকিশালের জায়গাটা, চাঁদ-ওঠা এই সুন্দর সন্ধ্যা, শান্তির সুমিষ্ট অভ্যর্থনাটি, বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ।

সে বলিল, তুমি ভারি কাজের মেয়ে কিন্তু শান্তি। আবার দিব্যি ধান ভানতেও পারো দেখছি।

শান্তি হাসিয়া ফেলিল। বিধবা মেয়েমানুষটি মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। শান্তি বলিল,

এ না করলে গেরস্ত ঘরে চলে কি, বলুন আপনি ? এখন ধরুন আমার শ্বশুরের তিন গোলা ধান হয় বছরে, রোজ ধান ভানা, চিঁড়ে কোটার জন্মে কাকে আবার খোশামোদ করে বেড়াবো ? ওই মতির মা আছে আর আমি আছি—

—বেশ গাঁখানা তোমাদের, বেড়িয়ে এলাম—

—চড়কতলার দিকে গিয়েছিলেন ?

—চিনি তো নে, কোন্ তলা। এমনি খানিকটা ঘুরলাম—

শান্তি উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি, এখানে বসে খাবেন আর গল্প করবেন, মতির মা রাখো। আমি আসি আগে, যাবো আর আসবো—

চা ও খাবার লইয়া সে খুব শীঘ্রই ফিরিল বটে।

বিপিন বলিল, হালুয়া গরম রয়েচে, এখন করে আনলে নাকি ?

—আমি না, মা করেচেন। আমি শুধু চা করে আনলাম, সেকেলে বুড়ী, চা করতে জানেন না। ভারি আমোদ হচ্ছে আমার, আপনি এসেচেন বলে।

—সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে ? রাত্রে আপনাকে আর রাঁধতে হবে না, আমি লুচি ভেজে দেবো।

—কেন, আমি ভাত রেঁধেই নিতাম, আবার লুচির হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা কিছু না। আমার শ্বশুরবাড়ীরা বড়লোক, এদের এক কাঁড়ি টাকা আছে, খাইয়ে দিলাম বা কিছু টাকা বাপের বাড়ীর লোককে ?

শান্তির কথার ভঙ্গি শুনিয়া বিপিন হাসিয়া উঠিল, প্রৌঢ়া মতির মাও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া (কারণ বিপিনের সামনে হাসা তাহার পক্ষে অশোভন) হাসিয়া বলিল—কি যে বলেন বড় খুড়ীমা আমাদের ! শুনতেই এক মজা।

শান্তি যে এমন হাসাইতে পারে, বিপিন তাহা জানিত না, রসিকা মেয়ে সে খুব পছন্দ করে ; পছন্দ করে বলিয়াই এটুকু জানে, ভাল হাসাইতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশী নয়। শান্তির একটা নূতন দিক যেন সে দেখিল।

শান্তি ছেলেমানুষের মত আবদারের সুরে বলিল, একটা ভূতের গল্প বলুন না ?

—ভূতের গল্প ! নাও ধান ভেনে, আর এখন রাত্তির দুপুরে ভূতের গল্প করে না।

—না বলুন।

বিপিন একটা গল্প বানাইয়া বলিল। অনেক দিন আগে কাহার মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিল, সেটিও বলিল। চাঁদ এবার অনেকদূর উঠিয়াছে, বিপিন শান্তির সহিত গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ভাবিতেছিল মানীর কথা, মৃতা বাগ্‌দী মেয়েটির কথা, মনোরমার কথা, কামিনী মাসীর কথা।

মানীর সঙ্গে এই রকম ভাবে গল্প করিতে পারিত এই রকম সন্ধ্যায় ! না তাহা হইবার নয়। মানীর শ্বশুরবাড়ী এরকম পাড়াগাঁয়েও নয়, মানী এরকম বসিয়া বসিয়া ধানও ভানিবে না।

ইতিমধ্যে মতির মা কি কাজে একটু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা শান্তি—মতির মা বলে ডাকচো, ওর মতি বলে মেয়ে ছিল ?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি ওকে চেনেন ?

—ও কি জাত ?

—বাগ্‌দী কিংবা দুলে। আপনি ওর কথা জানলেন কি করে ?

—বলচি। ওর বাড়ী কি ভাসানপোতা ছিল ?

শান্তি আরও অবাক হইয়া বলিল—ভাসানপোতা ওর শ্বশুরবাড়ী। এ গাঁয়ে ওর বাপের বাড়ী। ওর স্বামী ওকে নেয় না অনেকদিন থেকে। ওর মেয়ে মতি ওর বাপের কাছেই ছিল, তার বিয়ে হয়েছে এই দিকে যেন কোথায়। আমি তাকে কখনো দেখিনি, সে এখানে আসে না।

—আচ্ছা, তুমি জানো মতির সঙ্গে ওর মার দেখা হয়েছিল কতদিন আগে ?

—না। কেন বলুন তো—এত কথা জিজ্ঞেস করচেন কেন ?

—ওকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে ? নয়তো থাক্। আজ জিগ্যেস কোরো না—পরে বলবো এখন। ইতিমধ্যে মতির মা আসিয়া পড়াতে বিপিন কথা বন্ধ করিল। প্রৌঢ়া আবার ঢেঁকিতে পাড় দিতে আরম্ভ করিল। বিপিন ভাবিল, হয়তো এ জানে না তাহার মেয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ঠিক এই পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমার রাত্রে। বল্লভপুরের বিলের ধারের সে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত বিপিন ভুলে নাই। সে রাতটিতে বাগ্‌দীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড় দাগ রাখিয়া গিয়াছে। অন্য এক জগতের সহিত পরিচয় করাইয়া গিয়াছে।

অভাগিনী বৃদ্ধা জানেও না তাহার মেয়ের কি ঘটিয়াছে।

পরদিন শান্তি যখন চা দিতে আসিল, তখন নির্জ্জনে পাইয়া বিপিন মতির কাহিনী শান্তিকে শুনাইয়া দিল। শান্তি যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি দুঃখিত হইল। বলিল—আমার মনে হয় মেয়ে যে ঘর থেকে চলে গিয়েছে একথা ও জানে, কারো কাছে প্রকাশ করে না সেকথা—তবে সে যে মরে গিয়েচে একথা জানে না। জানবার কথাও নয়, বল্লভপুরে ওরা লুকিয়ে এসে ঘর বেঁধে থাকতো, কাউকে পরিচয় তো দেয়নি—কি করে জানবে কোথাকার কার মেয়ে ? ভাসানপোতা থেকে জেয়ালা-বল্লভপুর কতদূর ?

—তা আট ন' ক্রোশ খুব হবে।

—তা হোলে ও কিছুই জানে না, মেয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েচে, একথাও শোনে নি। এতদূর থেকে কে খবর দেবে ! ওকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই।

২

পরদিন বিকালে দুইখানি গরুর গাড়ীতে শান্তি, শান্তির স্বামী গোপাল, বিপিন ও শান্তির শ্বশুর স্টেশনে আসিল এবং সন্ধ্যার পরে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া সিদ্ধান্তপাড়ার বাসায় গিয়া উঠিল। শান্তির এক মামাশ্বশুর বাসা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দুখানি মাত্র ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, ছোট একটু উঠান। ভাড়া পাঁচ টাকা।

শান্তি অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ঢরাজ জায়গায় হাত পা ছড়াইয়া খেলাইয়া বাস করা অভ্যাস, সে তো বাসা দেখিয়া স্বামীকে বলিল—এখানে কেমন করে থাকব হাঁ গা—ওমা, এক উঠোন—আর এইটুকু রান্নাঘরে কি রাঁধা যায়? আর ঐ পাতকুয়োর জলে নাইবো?

রাণাঘাটে বিপিন আসিল অনেকদিন পরে। মানীদের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় কোর্টে তখন আসিতেই হইত। এইজন্যই রাণাঘাটের অনেক জিনিসের সঙ্গে মানীর কথা যেন জড়ানো। গোপালের সহিত বাজার করিতে বাহির হইয়া বিপিন দেখিল পূর্বপরিচিত কত দৃশ্য তাহার মনে কষ্ট দিতেছে—মানীর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার অত্যন্ত নূতন রূপে সে সব দিনের স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। কষ্ট হয়, সত্যই কষ্ট হয়।

সকালে গোপাল এবং শান্তির শ্বশুরকে লইয়া বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে ডাক্তার আর্চারের কাছে গেল। বলাই যখন হাসপাতালে ছিল, তখন আর্চার সাহেবের সঙ্গে বিপিনের আলাপ হয়। আর্চার সাহেব বিপিনকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন—আপনার ভাই কোথা? মারা গিয়েচে?' তা যাবে, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

শান্তির শ্বশুরের চোখ দেখিয়া বলিলেন—এখন এঁকে দশ বারোদিন এখানে থাকতে হবে। চোখে একটা ওষুধ দিচ্চি—চোখ কেমন থাকে, কাল আমায় এসে জানাবেন। কাটাবার এখন দরকার নেই। বলাই যে জায়গাটাতে শুইয়া থাকিত খাটে—বিপিন সেখানটা গিয়া দেখিয়া আসিল। এখন অন্য রোগী রহিয়াছে।

বলাই মানী···কামিনী মাসী···স্বপ্ন···

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন দেখিল শান্তি বাসা বেশ চমৎকার গুছাইয়া লইয়াছে। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বিপিনের একা থাকিবার এবং বড় ঘরটিতে উহারা তিনজনের একত্র থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুটি ঘরই ইতিমধ্যে ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়াছে, মেঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকনো নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিছানাপত্র পাতিয়াছে দুটি ঘরেই, বাহিরে বসিবার জন্য একটি সতরঞ্চি পাতিয়া রাখিয়াছে। উহাদের দেখিয়া বলিল—কি হোল বাবার চোখের?

বিপিন বলিল—চোখ কাটতে হবে না—তবে এখানে দশ বারো দিন এখন থাকতে হবে। ওষুধ দিয়া ছানি নষ্ট করে দেবে বলে। ও: তুমি যে শান্তি, বেশ গুছিয়ে ফেলেছো ঘরদোর।

শান্তি হাসিয়া বলিল—এখন নেয়ে ধুয়ে নিন্ সব। আমি বাবাকে নাইয়ে নি।

শান্তির শ্বশুর চোখে ভাল দেখিতে পান না, শান্তি তাঁহাকে কি করিয়াই সেবা করিতেছে, দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইল। মা যেমন অসহায় ছোট ছেলের সব কাজ নিজে করিয়া দেয়, সকল অভাব-অভিযোগের সমাধান নিজে করে, তেমনি করিয়া শান্তি অসহায় বৃদ্ধকে সকল দিক হইতে আগুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অথচ সে বালিকার মত খুশি শহরে আসিয়াছে বলিয়া। সোনাতনপুরের মত অজ পাড়া গাঁয়ে বাপের বাড়ী, শ্বশুরবাড়ীও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাট শহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিসটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে। সে চিরকাল সংসারে খাটিতেই জানে, কিন্তু বাহিরের আনন্দ কখনও পায় নাই—জীবনে বিশেষ কিছু দেখেও নাই, তাহার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান হয় প্রতি শ্রাবণ মাসে, বৎসরের মধ্যে এই দিনটিই তাহার কাছে পরম উৎসবের দিন। সাজিয়া গুজিয়া মনসাতলার পাড়ার অন্যান্য বৌঝিয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভাসান শুনিতে যাইবে, এই আনন্দে শ্রাবণ মাসের পয়লা হইতে দিন গুনিত। তাহার মত মেয়ের রাণাঘাট শহরে আসিয়া অত্যন্ত খুশি হইবারই কথা।

শান্তির শ্বশুর বিপিনকে বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এখানে টকি বায়োস্কোপ হয় তো?

বিপিনও পাড়াগাঁয়ের লোক, সেও কখনো ওসব দেখে নাই—কিন্তু ইহাদের কাছে সে কলিকাতার পাশ-করা ডাক্তারবাবু, তাহাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত সাজিয়া থাকিলে চলিবে না। সে তখনই জবাব দিল—ও টকি? হয় বৈকি, খুব হয়।

—আপনি বৌমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়ে আনুন। আমার কখন কি দরকার হয়, গোপাল থাকুক। বৌমা কখনও জীবনে ওসব দেখেনি—বেচারী দেখুক একটু—

—কেন গোপালও তো দেখে নি—সে-ই যাক শান্তিকে নিয়ে?

—গোপাল না থাকলে আমার কাজকর্ম—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে দিয়ে তো হবে না ডাক্তারবাবু, তারপর বৌমা আমার কাছে থাকলে—গোপাল একদিন যাবে এখন।

শান্তি রান্নাঘরে রান্না করিতেছে—গোপাল বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, বিপিন গিয়া বলিল—শান্তি, টকি বায়োস্কোপ দেখতে যাবে? মিত্তির মশায় বললেন তোমাকে নিয়ে দেখিয়ে আনতে।

শান্তি বালিকার মত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—কোথায়, কোথায়, কখন হবে? চলুন না, আজই চলুন—কখন হয় সে? আমি কখনো দেখিনি। আমার মেজ ননদের মুখে টকির গল্প শুনেছি, সেই থেকে ভারি ইচ্ছে আছে দেখবার।

বিপিনও টকির খোঁজ বিশেষ কিছু জানে না—দুপুরের পর বাহির হইয়া সন্ধান করিয়া জানিল বড়বাজারে কেরিক্যান রোডের ধারে এক কোম্পানী কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুই টকি দেখাইতেছে—অদ্যকার পালা 'নরমেধ যজ্ঞ', ছটায় সময় আরম্ভ।

বেলা চারিটার সময় সে শান্তির শ্বশুরের ঔষধ কিনিতে ডাক্তারখানায় গেল—যাইবার

সময় শান্তিকে তৈরী থাকিতে বলিয়া গেল। সাড়ে পাঁচটায় সময় ফিরিয়া দেখিল, শান্তি সাজিয়া গুজিয়া অধীর আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছে। বলিল—উঃ, বাপরে, বেলা কি আর আছে। টকি শেষ হয়ে গেল এতক্ষণ। চলুন, শীগগির।

বিপিন বলিল—গাড়ী আনবো, না হেঁটে যেতে পারবে? মিত্তির মশাই কি বলেন?

শান্তির শ্বশুর বলিলেন—আপনিও যেমন, কে-ই বা ওকে চিনচে এখানে, হেঁটেই যাক না।

পথে বাহির হইয়াই শান্তি বলিল—উঃ, পায়ে বড্ড কাঁকর ফুটচে, খালি পায়ে এ পথে হাঁটা যায় না।

অগত্যা বিপিন একখানা গাড়ী করিল। শান্তি বলিল—বাবাকে বলবেন না গাড়ীর কথা, আমি পয়সা দিচ্ছি, আমার কাছে আলাদা পয়সা আছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—তোমার সব দুষ্টুমি শান্তি, আমি সব বুঝি। তোমার ঘোড়ার গাড়ী চড়বার সাধ হয়েছিল কিনা বল সত্যি করে। কাঁকর ফোটা কিছু না, বাজে ছল। ধরে ফেলেচি, না?

শান্তি হাসিয়া ফেলিল।

—পয়সা তোমায় দিতে হবে—একথা ভাবলে কেন?

—আপনি দিতে যাবেন কেন? আমার সাধ হয়েছিল, আপনার তো হয় নি?

—যদি বলি আমারও হয়েছিল?

—বেশ তবে দিন আপনি।

টকি দেখিতে বসিয়া শান্তি বলিল—আচ্ছা বলুন তো আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবে টকি দেখবো একথা কখনো ভেবেছিলেন?

—কি করে ভাববো বলো?

—আপনি খুশি হয়েচেন বলুন।

বিপিন প্রথম হইতেই নিজেকে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া দিয়াছিল মনে মনে। শান্তিকে একা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভালবাসার কথা বলা হইবে না। ও পথে আর নয়। বিশেষতঃ তাহার স্বামী ও শ্বশুর বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন, তখন শান্তিকে একটিও অন্য ধরনের কথা সে বলিবে না।

বিপিন জবাব দিতে পারিত—কেন, আমি খুশি হই না হই তোমার তাতে আসে যায় কিছু নাকি?

কিন্তু সে বলিল—খুশি না হবার কারণ কি? আমিও যে ঘন ঘন টকি দেখি তা তো নয়, থাকি তো সোনাতনপুরে। খুশি হবার কথাই তো। আর এই যে পালাটা হচ্ছে নতুন পালা একেবারে।

কথাটা অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

বিপিন দেখিল শান্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। টকি কখনও না দেখিলেও সে গল্পের গতি

এবং ঘটনা তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছে। অনেক জায়গায় শান্তি এমন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে যে বিপিন কথা বলিলে সে শুনিতে পায় না। একবার দেখিল শান্তি আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিয়া কাঁদিতেছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—ও কি শান্তি? কান্না কিসের?

শান্তি হাসিকান্না মিশাইয়া বলিল,—আপনার যেমন কঠিন মন, আমার তো অমন নয়, ছেলেটার দুঃখ দেখলে কান্না পায় না?

—তা হবে। আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

—তা জানি। আচ্ছা, আমি মরে গেলে আপনি কাঁদবেন?

—ও কথা কেন? ও সব কথা থাক।

শান্তি খপ্‌ করিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া অনেকটা আব্দার এবং খানিকটা আদরের সুরে বলিল,—না বলুন। বলতেই হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই কাঁদবো।

—সতি?

—মিথ্যে বলচি?

পরক্ষণেই সে শান্তির সঙ্গে কোনো ভালবাসার কথা না বলিবার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়া বলিয়া ফেলিল,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?

শান্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—অমন কথা বলতে নেই।

—না, কেন আমার বেলায় বুঝি বলতে নেই। তা শুনবো না, বলতেই হবে।

—না, ও কথার উত্তর নেই। অন্য কথা বলুন।

—এর উত্তর যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলবো না।

—না বলবেন, না বলবেন।

—বলবে না?

—না, আমি তো বলে দিয়েচি।

অগত্যা বিপিন হাল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে ভাবিল—শান্তি বেশ একটু একগুঁয়েও আছে, যা ধরিবে, তাই করিবে।

ইন্টারভ্যালের সময় শান্তি বাহিরে আসিয়া বলিল—সবাই চা খাচ্ছে, আপনি চা খাননি তো বিকেলে, খান না চা, আমি পয়সা দিচ্চি—

—তুমি কেন দেবে! আমার কাছে নেই নাকি—চল দুজনে খাবো।

শান্তির একগুঁয়েমি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল। সে বলিল,—সে হবে না, আপনার চা খাওয়ার পয়সা আমি দেবো, নয়তো আমি চা খাবো না।

বিপিন দেখিল ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা, অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া দুজনে চায়ের স্টলে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শান্তি বলিল, আপনি ওই যে বোতলের মধ্যে কি রয়েচে, ওই দুখানা নিন্—শুধু চা আপনাকে খেতে দেবো না।

—তুমিও নাও, আমি একা খাবো বুঝি ?

বিপিনের এই সময়ে মনে হইল মনোরমার কথা। বেচারী কখনো টকি বায়োস্কোপ দেখে নাই—সংসারে শুধু খাটিয়াই মরে। একদিন তাহাকে রাণাঘাটে আনিয়া টকি দেখাইতে হইবে —বীণাকেও। সে বেচারীই বা সংসারের কি দেখিল! মা বুড়োমানুষ, তিনি এসব পছন্দ করিবেন না, বুঝিবেনও না, তিনি চান ঠাকুরদেবতা, তীর্থধর্ম।

৩

পুনরায় ছবি আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িল। দুজনে আবার গিয়া ভিতরে বসিল। শেষের দিকে ছবি আরও করুণ হইয়া আসিল। এক জায়গায় শান্তি ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া বিপিন বলিল- ও কি শান্তি ? তুমি এমন ছেলেমানুষ! কাঁদে না অমন করে—ছিঃ—চল বাইরে যাবে ?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল-- উঁহু —

—উঁহু তো কেঁদো না। লোকে কি ভাববে ?

ছবি শেষ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি চুপচাপ থাকিয়া পথ চলিতে লাগিল। স্টেশনের কাছে আসিয়া বিপিন বলিল, চলো—ইষ্টিশান দেখবে ?

— চলুন।

আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম দেখিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মত খুশি। শান্তিকে সুন্দরী মেয়ে বলা যায় না, কিন্তু তাহার নিজস্ব এমন কতকগুলি চোখের ভঙ্গি, হাসির ধরন প্রভৃতি আছে যাহা তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে প্রথমটা তত চোখে পড়ে না এসব— বিপিন এতদিন শান্তিকে দেখিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু আজ প্রথম তাহার মনে হইল— শান্তি যে এমন সুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি ?

আসল কথা, কোথা হইতে বিপিন এতদিন শান্তির রূপ দেখিবে ? আজ ছাড়া পাইয়া মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শান্তির নারীত্বের যে দিক ফুটিয়াছে তাহাই তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এ শান্তি এতদিন ছিল না। কাল হইতে আবার হয়তো থাকিবেও না। শান্তির মধ্যে যে নায়িকা এত কাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।

সে ভাবিল, আজ তাহার সহিত একা বাহির হইয়া শান্তি নিজের যে রূপ দেখাইতেছে— তাহা এতদিন ইচ্ছা করিয়াই ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এটুকু অভিজ্ঞতা বিপিনের বহুদিন হইয়াছে যে, মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না—যখন যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরা দেয়—সে-ই কেবল দেখিতে পায়।

বিপিন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শান্তিকে একা লইয়া আর কোনোদিন সে বাহির হইবে না। শান্তি তাহাকে জালে জড়াইতে চায়।

কিন্তু বিপিন আর নিজেকে কোন বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায় না। মনের দিক হইতে স্বাধীন না থাকিলে সে নিজের কাজে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই তো, কাল আর্চার সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে, হাসপাতালে একটি শক্ত অস্ত্রোপচার করা হইবে একটি রোগীর, বিপিন কাল দেখিতে যাইবে। তবুও যতটুকু শেখা যায়।

শান্তিকে লইয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল,—চল এবার বাসায় যাই—

—আর একটুখানি থাকুন না? বেশ লাগচে।

একখানা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বহু যাত্রী উঠিল, বহু যাত্রী নামিল।

শান্তি এসব অবাক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এসব ভাল করিয়া কখনো দেখে নাই, দু-তিন বার সে রেলে চড়িয়া এখান ওখান গিয়াছে—একবার গিয়াছিল শিয়ুরালি গঙ্গা-স্নানের যোগে মা-বাবার সঙ্গে, তখন তাহার বয়স মোটে এগার বছর, আর একবার স্বামীর সঙ্গে পিস্তুতো ননদের ছেলের বিবাহে এই লাইনে গিয়াছিল শ্যামনগর মূলাজোড়। সেও আজ দু-তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া কখনও সে এত বড় ইষ্টিশানের কাণ্ডকারখানা দেখে নাই।

বিপিনের নিজেরও বেশ লাগিতেছিল। কোথায় পড়িয়া থাকে বারো মাস, কোথা হইতে এ সব দেখিবে? রাণাঘাটের মত শহর বাজার জায়গায় থাকিতে পাইলে সামান্য টাকা রোজগার হইলেও সুখ। পাঁচ জনের সহিত মিশিয়া পাঁচটা জিনিস দেখিয়া সুখ।

সে কথা শান্তিকে সে বলিল।

শান্তি বলিল,—সত্যি। আচ্ছা, আমরা কোথায় পড়ে থাকি ডাক্তারবাবু, গরুর মত কিংবা ঘোষের মত দিন কাটাই। কি বা দেখলাম জীবনে, আর কি বা—

—সত্যি, কি দেখতে পাই?

—শুনতেই বা কি? এই যে ধরুন আজ টকি দেখলাম, এ কেউ দেখেছে আমাদের গাঁয়ে কি আমাদের শ্বশুরবাড়ীর গাঁয়ে? আহা, ও বোধ হয় দেখেনি, ও কাল দেখুক এসে।

—কে, গোপাল? গোপাল কখনো টকি দেখেনি?

—কোথেকে দেখবে! আপনিও যেমন! ওরা কেউ দেখেনি। কাল পাঠিয়ে দেবো বিকেলে।

—আমিও সত্যি বলচি শান্তি—এই প্রথম দেখলাম টকি। বায়োস্কোপ দেখেছি অনেক দিন আগে—সে তখনকার আমলে! বাবার পয়সা তখনও হাতে ছিল, একবার কলকাতায় গিয়ে বায়োস্কোপ দেখি। তখন টকি হয় নি। তারপর বহুকাল হাতে পয়সা ছিল না, নানা গোলমাল গেল—

বিপিন নিজের জীবনের কথা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও শান্তির কাছে বলে নাই। শান্তির

বোধ হয় খুব ভাল লাগিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল এ সব কথা।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। মিনিট পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল।

বিপিন হঠাৎ বলিল,—কি কথা মনে হচ্ছে জানো শান্তি?

শান্তি যেন সলজ্জ আগ্রহের সহিত বলিল,—কি?

—সেই মতি বাগ্দিনীর কথা।

শান্তির মুখে নিরাশা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটিল। অবাক হইয়া বলিল,—কেন, তার কথা কেন?

বিপিন ভাবিল, যদি মানী আজ থাকিত, এ প্রশ্ন করিত না। মনের খেলা বুঝিতে তার মত মেয়ে বিপিন আজও কোথাও দেখে নাই।

তবুও বলিল,—তুমি দেখনি শান্তি, কি করে সে মরেচে, সেই শীতের রাত, গায়ে লেপ কাঁথা নেই, খড় বিচুলি আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। অথচ কত অল্প বয়সে···আমি এখানে দাঁড়িয়ে চোখ বুজলে সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই চাঁদের আলো, বিলের ধারে চিতা, চিতার এদিকে আমি, ওদিকে বিশ্বেশর, এসব চোখের সামনে দেখতে পাই—

কিন্তু শান্তি বুঝিল। শান্তি যে উত্তর দিল, বিপিন তাহা আশা করে নাই। বলিল—ডাক্তারবাবু, সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে আনবেন তো? সেদিন আপনার মুখে ওর সব কথা শুনে পর্যন্ত আমিও ভুলতে পারিনি। হোক নীচু জাত, ওই একটা জিনিসে বড্ড উঁচু হয়ে গেছে। চলুন, ওই বেঞ্চিখানায় বসি একটু।

—আবার বসবে কেন? রাত হোল, বাসায় ফিরি।

—আমার পা ধরে গিয়েচে। ওখানে কি বিক্রী হচ্চে? চা? আর একটু চা খান—

—আমি আর নয়। তোমার জন্যে আনবো।

—তবে পান কিনে আসুন, আমার জন্যে আমি বলিনি। আপনি চা ভালবাসেন, তাই বলছিলাম।

পানের দোকান নিকটে নাই, কিছু দূরে প্ল্যাটফর্মের ওদিকে। শান্তিকে বেঞ্চে বসাইয়া বিপিন পান আনিতে গিয়া হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। আপ্ প্ল্যাটফর্ম হইতে কিছু সরিয়া ওভারব্রিজের কাছে একটি মেয়ে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া আছে তাহার আশেপাশে আরও দু-একটা ছোটখাট সুটকেস্, বিছানা, আরও কি কি। এইমাত্র যে ট্রেনখানা গেল, সেই ট্রেন হইতেই নামিয়া থাকিবে, বোধ হয় সঙ্গের লোক বাহিরে গাড়ী ঠিক করিতে গিয়াছে, মেয়েটি জিনিস আগুলিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি অবিকল মানীর মত দেখিতে পিছন হইতে। সেই ভঙ্গি, সেই সব।···কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার মত অল্প মেয়ে দেখিলেও তাহারই কথা মনে পড়ে।···

এই সময় মেয়েটি একবার পিছনের দিকে চাহিল।

বিপিন চমকিয়া উঠিল।

পরম বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে স্থান কাল পাত্র সব কিছু ভুলিয়া গেল ওভারব্রিজের তলায়। তাহার বুকের মধ্যে কে যে হাতুড়ি পিটিতেছে!

৪

বিপিন নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যে মেয়েটি পিছন ফিরিয়া চাহিয়াছিল, সে—মানী!

কয়েক মুহূর্তের জন্ত বিপিনের চলিবার শক্তি যেন রহিত হইল। মানী এদিকে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দিকে নয়—তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। বিপিন অগ্রসর হইয়া মানীর সামনে গিয়া বলিল—এই যে মানী! তুমি এখানে?

মানী চমকিয়া উঠিয়া অন্ত দিক হইতে মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহার মুখে বিস্ময়—গভীর, অবিমিশ্র বিস্ময়!

বিপিন হাসিয়া বলিল—চিনতে পারচ না? আমি

মানীর মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। পরক্ষণেই সে ট্রাঙ্কের উপর হইতে উঠিয়া হাসিমুখে বিপিনের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—বিপিনদা! তুমি কোথা থেকে?

বিপিন মানীকে 'তুই' বলিতে পারিল না, অনেক দিন পরে দেখা, কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। বলিল—আমি? আমি রাণাঘাটে এসেচি কাজে। বলচি। কিন্তু তুমি এমন সময় এখানে?

মানী চোখ নামাইয়া নীচু দিকে চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—তুমি কি করেই বা জানবে। বাবা মারা গিয়েচেন—কাল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ। তাই পলাশপুর যাচ্চি আজ। এই ট্রেনে নামলাম।

বিপিন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—অনাদিবাবু মারা গিয়েচেন? কবে? কি হয়েছিল?

—কি হয়েছিল জানিনে। পরশু টেলিগ্রাম করেচে এখানকার নায়েব হরিবাবু। তাই আজ আমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে আসচি, উনি আসতে পারলেন না—কেস আছে হাতে। বোধ হয় কাজের দিন আসবেন। দেওর গাড়ী ডাকতে গিয়েচে—তাই বসে আছি।

বিপিন দুই চক্ষু ভরিয়া যেন মানীকে দেখিতেছিল। এখনও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এই সেই মানী। সেই রকমই দেখিতে এখনও। একটুকু বদলায় নাই।

—বিপিনদা, ভাল আছ? কোথায় আছ, কি করচ এখন?

এখন যে আমি ডাক্তার, নাম-করা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। রুগী নিয়ে রাণাঘাটের হাসপাতালে এসেচি, রুগীর বাসাতেই আছি। আমাদের দেশের ওই দিকে সোনাতনপুর বলে একটা গাঁ, সেখানেই থাকি। মনে আছে মানী, ডাক্তারি করার পরামর্শ তুমিই দিয়েছিলে প্রথম। তাই আজ দুটো ভাত করে খাচ্চি।

—সত্যি, বিপিনদা! সত্যি বলচো এসব কথা?

—সাক্ষী হাজির করতে রাজি আছি, মানী। বিশ্বাস করো আমার কথা।

—ভারী আনন্দ হোল শুনে। কিন্তু বিপিনদা, তোমার সঙ্গে যে এক রাশ কথা রয়েছে আমার। একটি রাশ কথা।

বিপিন ঠিকমত কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতেছিল না। আজ কি সুন্দর দিনটা, কার মুখ দেখিয়া যে উঠিয়াছিল আজ! এই রাণাঘাট স্টেশনে জীবনের এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—মানীর সঙ্গে দেখা—

সে শুধু বলিল—আমারও এক রাশ কথা আছে, মানী।

মানী বলিল—আমার একটি কথা রাখবে বিপিনদা, পলাশপুরে এসো। বাবার কাজের দিন পড়েচে সামনের বুধবার, তুমি আর দুদিন আগে এসো। তোমার আসা তো উচিতও, এসময় তোমার দেখলে মাও যথেষ্ট ভরসা পাবেন।

—যাওয়া আমার খুব উচিতও। বাবার আমলের মনিব, আমার একটা কর্ত্তব্য তো আছে; কিন্তু একটা কথা হচ্চে—

মানী ছেলেমানুষের মত মিনতি ও আবদারের সুরে বলিল—ও সব কিন্তু-টিন্তু শুনবো না ...আসতেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি, এসো বিপিনদা—আসবে না?

এই সময় শান্তি আসিয়া সলজ্জ ভাবে অদূরে দাঁড়াইল।

মানী বলিল—ও কে বিপিনদা?

বিপিন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মানী জানে সে কি রকম চরিত্রের লোক ছিল পূর্বে, হয়তো ভাবিতে পারে পয়সা হাতে পাইয়া বিপিনদা আবার আগের মত—যাহাই হোক, শান্তি কেন এ সময় এখানে আসিল। আর কিছুক্ষণ বেকিতে বসিলে কি হইত তাহার!

বলিল—ও গিয়ে আমাদের গাঁয়েরই—মানে ঠিক আমাদের গাঁয়ের নয়, আমি যেখানে ডাক্তারি করি সে গাঁয়েরই—ওর বাবা আমার রুগী।

মানী বলিল—ডাকো না এখানে! বেশ মেয়েটি।

বিপিন শান্তিকে ডাকিয়া মানীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। মানী তাহার হাত ধরিয়া ট্রাঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল—বসো না ভাই এখানে, তোমার বাবার কি অসুখ?

—চোখের অসুখ, তাই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে আমরা রাণাঘাটের সায়েব ডাক্তারের কাছে দেখাতে এসেচি পরশু। আপনি বুঝি ডাক্তারবাবুর গাঁয়ের লোক?

—না ভাই, আমার বাপের বাড়ী পলাশপুর, এখান থেকে চার ক্রোশ—

এই সময় মানীর দেওর আসিয়া বলিল—বৌদি, গাড়ী এই রাত্তির বেলা যেতে চায় না—অনেক কষ্টে একখানা ঠিক করেচি। চলুন উঠুন।

মানী দেওরের সহিত বিপিনের পরিচয় করাইয়া দিল। মানীর দেওর বেশ ছেলেটি, কোন্ কলেজে বি. এ. পড়ে—এইটুকু মাত্র বিপিন শুনিল, তাহার মন তখন সে দিকে ছিল না।

মানী গাড়ীতে উঠিবার সময় বার বার বলিল—কবে আসচো পলাশপুরে বিপিনদা? কালই এসো।

—এরা এখানে ছদিন থাকবেন তো? তুমি সেই ফাঁকে ঘুরে এসো আমাদের ওখান। আসাই চাই; মনে থাকে যেন।

বাড়ী ফিরিবার পথে শান্তি যেন কেমন একটু বিমনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কে ডাক্তারবাবু? আপনার সঙ্গে কি করে আলাপ?

বিপিন বলিল—আমি আগে যে জমিদার বাড়ী কাজ করতাম, সেই জমিদারবাবুর মেয়ে। আমার বাবাও ওখানে কাজ করতেন কিনা, ছেলেবেলায় ওদের বাড়ী যেতাম—ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি—অনেক দিনের জানাশুনো।

শান্তি বলিল—বেশ লোক কিন্তু। অত বড় মানুষের মেয়ে, মনে কোনো ঠ্যাকার নেই। দেখতেও ভারি চমৎকার।

রাত্রে সেদিন বিপিনের ঘুম হইল না। মনের মধ্যে কি এক প্রকারের উত্তেজনা, কি যে আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না—যত ঘুমাইবার চেষ্টা করে—বিছানা যেন গরম আগুন, মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—আজ মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—মানী তাহাকে পলাশপুর যাইতে বার বার অনুরোধ করিয়াছে—অনেকবার করিয়া বলিয়াছে—সেই মানী। এসব জিনিসও জীবনে সম্ভব হয়?

শুধু মানীর অনুরোধেই বা কেন—অনাদিবাবু তাহার বাবার আমলের মনিব। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার সেখানে একবার যাওয়াটা লৌকিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াই একটা কর্তব্য বই কি।

৫

সকালে উঠিয়া সে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যথারীতি হাসপাতালে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া শান্তিকে বলিল—শান্তি, ভাত চড়িয়ে দাও তাড়াতাড়ি, আমি আজই পলাশপুর যাবো।

শান্তি নিজে ভাত রাঁধিয়া বিপিনকে দিত না, তবে হাঁড়ি চড়াইয়া দিত, বিপিন নামাইয়া লইত মাত্র। তরকারি রাঁধিবার সময়ে নিজে রান্না করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখাইয়া দিত কি ভাবে কি রাঁধিতে হইবে।

শান্তি মনমরাভাবে বলিল—আজই?

—হ্যাঁ, আজই যাই। বলে গেল কি না কাল—যাওয়া উচিত আজ। বাবার অন্নদাতা মনিব, বুঝলে না?

– আমাকে নিয়ে চলুন না সেখানে?

বিপিন অবাক হইয়া গেল। শান্তি বলে কি! সে কোথায় যাইবে?

শান্তি আবার বলিল—যাবেন নিয়ে? চলুন না ওদের বাড়ীঘর দেখে আসি—কখনো তো কিছু দেখিনি—থাকি পাড়াগাঁয়ে পড়ে।

তা হয় না শান্তি, কে কি মনে করবে, বুঝলে না? আর তুমি চলে গেলে তোমার শশুর কি করবেন?

—একদিনের জন্যে ও চালিয়ে নিতে পারবে এখন। ও সব কাজে মজবুত, আপনার মত অকেজো নয় তো কেউ!

—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কে কি ভাবতে পারে—গেলে গোপালকেও নিয়ে যেতে হয়। তা তো সম্ভব হচ্ছে না, বুঝলে না?

শান্তি নিরুত্তর রহিল—কিন্তু বোঝা গেল সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বেলা তিনটার সময় শান্তির স্বামী ও শশুরকে বলিয়া কহিয়া দুদিনের ছুটি লইয়া সে পলাশপুর রওনা হইল। যাইবার সময় শান্তি পান সাজিয়া একখানা ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া হাতে দিয়া বলিল—বড্ড রোদ্দুর, জলতেষ্টা পেলে মাঠের মধ্যে পান খাবেন। পরশু ঠিক চলে আসবেন কিন্তু। বাবা কখন কেমন থাকেন, আপনি না এলে মহা ভাবনায় পড়ে যাবো আমরা।

স্টেশনের পাশে সেগুন বাগান ছাড়াইয়া সোজা মেটে রাস্তা উত্তরমুখে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখনও রৌদ্রের খুব তেজ, যদিও বেলা চারটা বাজিতে চলিল। এই পথ বাহিয়া আজ পাঁচ বছর পূর্বে বিপিন ধোপাখালির কাছারি বা মানীদের বাড়ী হইতে কতবার কাগজ-পত্র লইয়া রাণাঘাটে উকীলের বাড়ী মোকর্দ্দমা করিতে আসিয়াছে, এই পথের প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহার সুপরিচিত—শুধু সুপরিচিত নয়, সেই সময়কার কত স্মৃতি, মানীর কত হাসির ভঙ্গি, কত আদরের কথা ইহাদের সঙ্গে জড়ানো। কত কত! সে সব কথা আজ ভাবিয়া লাভ কি?

বেলা পাঁচটার সময় কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ীর সামনে আসিতেই পথে হঠাৎ বিশ্বাসের বড় ছেলে মোহিতের সঙ্গে দেখা। মোহিত আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—একি, নায়েব মশায় যে! এতদিন কোথায় ছিলেন? চলেচেন কোথায়? পলাশপুরেই? ও, তা আবার কি ওদের স্টেটে—অনাদিবাবু তো মারা গিয়েচেন—

বিপিন সংক্ষেপে বলিল, স্টেটে চাকুরী করিবার জন্য নয়, অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়াই সে পলাশপুর যাইতেছে—বর্ত্তমানে সে ডাক্তারি করে। মোহিত ছাড়ে না, বেলা পড়িয়াছে, একটু কিছু খাইয়া তবে যাইতে হইবে, পূর্ব্বে রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে তাহাদের বাড়ীতে বিপিনের কত পায়ের ধুলা পড়িত -ইত্যাদি।

অগত্যা কিছুক্ষণ বসিতে হইল।

কতকাল পরে আবার পলাশপুরের বাড়ীতে মানীর সঙ্গে দেখা হইবে! সেই বাহিরের ঘর, সেই দালান, সেই দালানের জানালাটি, যেখানটিতে মানী তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত!

সন্ধ্যার পর সে অনাদিবাবুদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া গেল! প্রথমেই বীরু হাড়ির সঙ্গে দেখা—সেই বীরু হাড়ি পাইক, যে ইহাদের স্টেটে এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। তাহাকে দেখিয়া বীরু ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে! কনে থেকে আলেন এখন?

—ভাল আছিস্ রে বীরু?

—আপনার ছিচরণ আশীর্ব্বাদে—তা যান, মা-ঠাকরোণের সঙ্গে একবার দেখাডা করে আসুন। বিপিন বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে অনাদিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তিনি বিপিনকে দেখিয়া চোখের জল ফেলিয়া অনেক পুরানো কথা পাড়িলেন। তাহার বাবা বিনোদবাবুর সময় স্টেটের অবস্থা কি ছিল, আর এখন কি দাঁড়াইয়াছে, আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান নায়েবটিও বিশেষ কাজের লোক নয়, তাহার উপর কর্ত্তা মারা গেলেন। এখন যে জমিদারী কে দেখাশুনা করিবে তাহা ভাবিয়াই তিনি নাকি কাঠ হইয়া যাইতেছেন। পরিশেষে বলিলেন—তা তুমি এখন কি করছ বাবা?

বিপিন এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে চারিদিকে চাহিতেছিল, সেই অতি সুপরিচিত ঘরদোর, আগেকার দিনের কত কথা স্বপ্নের মত মনে হয়—আবার সেই বাড়ীতে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে—ওই সে জানালাটি—এসব যেন স্বপ্ন—সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এখনও যেন শক্ত।

অনাদিবাবুর স্ত্রী বলিলেন—তা বাবা, কর্ত্তা নেই, আমি মেয়েমানুষ, আমার হাত পা আসচে না। তুমি বাড়ীর ছেলে, দেখ শোনো, যাতে যা হয় ব্যবস্থা করো। তোমাকে আর কি বলবো?

—মা, ওপরের চাবিটা একবার দাও তো—সিন্দুক খুলে রূপোর বাটিগুলো—

বলিতে বলিতে মানী বারান্দা হইতে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই বিপিনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত মুখে বলিল—ওমা, বিপিনদা, কখন এলে? এখন? কিছু তো জানিনে—তা একবার আমাকে খোঁজ করে খবর পাঠাতে হয়—এসো, এসো, এসে বসো দালানে।

মানীর মা বলিলেন—হ্যাঁ, বসো বাবা। মানী সেদিন বলছিল রাণাঘাট ইষ্টিশানে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তোমাকে আসতে বলেচে—আমি বল্লুম, তা একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলি নে কেন? কতদিন দেখিনি—

মানী বলিল—বোসো বিপিনদা, আমি একটু চা করে আনি—হেঁটে এলে এতটা পথ। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার লইয়া মানী ফিরিল। বলিল—বিপিনদা, তোমায় এ বাড়ীতে আবার দেখে মনে হচ্চে, তুমি কোথাও যাওনি, আমাদের এখানেই যেন কাজ কর। পুরোনো দিন যেন ফিরে এসেচে—না?

—সত্যি। বোস্ না এখানে মানী? তোর দেওর কোথায়?

মানী হাসিয়া বলিল—তবুও ভালো, পুরোনো দিনের মত ডাকচো। রাণাঘাট ইষ্টিশানে

যে 'আপনি' 'আজ্ঞে' সুরু করেছিলে! আমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়েচি চতুর্থীর আজের জিনিসপত্র কিনতে। এখানে না এসে এষ্টিমেট ঠিক না করে তো আগে থেকে জিনিসপত্র কিনে আনতে পারিনে।

—সে কবে?

—কাল রাত পোয়ালেই। ভালোই হয়েচে তুমি এসেচ। আমার কাজের দিন তোমাকে পেয়ে আমার সাহস হচ্চে। দেখার কেউ নেই—তুমি দেখে শুনে যাতে ভালভাবে সব মেটে, নিন্দে না হয় তার ব্যবস্থা করো।

—তুই এখানে এসেছিলি আরও আমি চলে গেলে?

—হুঁ—কতবার এসেচি গিয়েচি—

—আমার কথা মনে হোত?

—বাপরে! প্রথম যখন আসি তখন টিঁকতে পারিনে বাড়ীতে। সেই যে আমি রাগ করে ওপরে গেলাম, তার পরেই সকালে উঠে দেখি তুমি রাণাঘাটে চলে গিয়েচ—আর কোনদিন দেখা হয়নি তারপর—সেই কথাই কেবল মনে পড়তো।

—আচ্ছা, কলকাতায় থাকলে আমার কথা মনে পড়ে?

—পড়ে না যে তা নয়। কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কলকাতায় ভুলে থাকি পাঁচ কাজ নিয়ে। সেখানে তুমি কোনোদিন যাওনি, সেখানকার বাড়ীঘরের সঙ্গে যাদের যোগ বেশী, তাদের কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে এলে—বাপরে! আচ্ছা, চা খেয়ে একটু বাইরে গিয়ে দেখাশুনো কর, আমি এরপর তোমার সঙ্গে কথা বলবো আবার। এখন বড় ব্যস্ত—

রাত্রে বিপিন পুরানো দিনের মত রান্নাঘরে বসিয়া খাইল, পরিবেশন করিল মানী নিজে। আহারান্তে বাহির হইয়া আসিবার সময় বিপিন দেখিল, মানী কখন আসিয়া সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়াছে। হাসিমুখে বলিল—ও বিপিনদা!

সাধে কি বিপিনের মনে হয়, মানীর সঙ্গে তাহার পরিচিতা আর কোনো মেয়ের তুলনা হয় না; আর কোন্ মেয়ে তাহার মন বুঝিয়া এ রকম করিত? মানীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোনো কথাই তো হয় নাই এ পর্য্যন্ত। অথচ সে কি করিয়া বুঝিল, বিপিনের মন কি চায়!

বিপিন হাসিয়া জবাব দিল— ও মানী!

—মনে পড়ে?

—সব পড়ে।

—ঠিক?

—নিশ্চয়! নইলে কি করে বুঝলুম। বাবা, তুমি অন্তর্য্যামী মেয়েমানুষ।

মানী জিব বাহির করিয়া দুই চোখ বুজিয়া মুখ ভ্যাঙাইল।

—সত্যি মানী, তোর তুলনা নেই!

—সত্যি?

—নির্ভুল সত্যি।

— কখনো ভেবেছিলে বিপিনদা, এমন হবে আমার ?

—স্বপ্নেও না ! কিন্তু মানী, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, কখন হবে ?

—বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। আমি পান নিয়ে যাচ্ছি।

একটু পরেই মানী বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চৌকির উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া কবাট ধরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—তুমি এখন কি করচো, কোথায় আছ ভাল করে বল। সেদিন কিছুই শুনিনি। সেদিন কি আমার ওসব শোনবার মন ছিল বিপিনদা ? কতকাল পরে দেখা বল তো ?

বিপিন তাহার ডাক্তারি জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। সোনাতনপুরের দত্ত-বাড়ীর কথা, শান্তির কথা, মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর কথা।

রাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দুবার মানী বাড়ীর মধ্যে গেল মায়ের ডাকে, আবার ফিরিল। সব কথা শুনিয়া বলিল—বিপিনদা, তুমি আমার চিঠি একখানা পেয়েছিলে একবার ?

—নিশ্চয়।

—ওই সময়টা আমার বড্ড খারাপ হয়েছিল পুরানো কথা ভেবে। তাই চিঠিখানা লিখে-ছিলুম। আমার কথা ভাবতে ? সত্যি বল তো—

—সর্ব্বদাই ! বেশী করে একদিন মনে পড়েছিল, সে দিনটির কথা বলি।

তারপর জোয়ালা-বল্লভপুরের বিলের ধারের সেই রাত্রির ব্যাপার বিপিন বলিল। মতি বাগ্‌দিনীর সর্ব্বত্যাগী প্রেমের কথা, তাহার অতীব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা।

সব শুনিয়া মানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অদ্ভুত !

—তোকে বলবো বলে সেইদিনই ভেবেছি। তোর কথাই মনে হয়েছিল সকলের আগে সেদিন।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বিপিনদা ? দুঃখের সময় কেন এমন করে মনে পড়ে ? সত্যি বলচি, তবে শোনো। আমার খোকা যখন মারা গেল, এক বছর বয়েস হয়েছিল, আজ বাঁচলে তিন বছরেরটি হোত, রাত তিনটের সময় মারা গেল ভবানীপুরের বাড়ীতে। একশো কান্নাকাটির মধ্যে তোমার কথা মনে পড়লো কেন আমার ?

—এ রোগের ওষুধ নেই মানী। কেন, কি বলবো !

—অথচ ভেবে ভাখো, সে সময় কি তোমার কথা মনে পড়বার সময় ? তবে কেন মনে পড়লো ?

তারপর দুজনেই চুপচাপ। নীরবতার ভাষা আরও গভীর হয়, নীরবতার বাণী অনেক কথা বলে। কিছুক্ষণ পরে বিপিন বলিল—কাল সকালে আমি চলে যাবো মানী। ডাক্তার লোক, রুগী ফেলে এসেচি।

—বেশ। আমি বাধা দেবো না।

—তুই আমায় মানুষ করে দিয়েছিস মানী।

—শুনে সুখী হলুম।

—জানিস মানী, ওই যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখান থেকে চলে যাবার পরে, সেই দুঃখটা মনের মধ্যে বড্ড ছিল। আজ আর তা রইল না। সুতরাং চলে যাই।

—না, যেও না বিপিনদা। বাবার চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা আমি করচি, থেকে যাও। একটু দেখাশুনা করতে হবে তোমাকে।

—তবে থাকি। তুই যা বলবি।

—তোমার সঙ্গে সেদিন যে বউটিকে দেখলুম, ও তোমার সঙ্গে বেড়ায় কেন?

—বেড়ায় না মানী। সিনেমা দেখতে এসেছিল সেদিন, শ্বশুর অন্ধ, তার কাছে কে থাকে, তাই ওর স্বামী ছিল।

- মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালবাসে।

—কে বললে?

—নইলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতে চাইত না পাড়াগাঁয়ের বউ। তোমার বয়েসও বেশী নয় কিছু! আসতে পারতো না।

—ও!

—আমার কথা শোনো। তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল না, ওর সঙ্গে আর মিশো না বেশী।

বিপিন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বেহ্মধম্মের লেকচার দিচ্চিস যে! পাদ্রি সাহেব!

মানীও হাসিয়া ফেলিল। পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না সত্যি বলচি, শোনো। ওকে কষ্ট দেবে কেন মিছিমিছি? ওর সঙ্গে মেলামেশা করো না। মেয়েমানুষ বড্ড কষ্ট পায়। মত্তি বাগ্দিনীর কথা ভাবো।

বিপিন বলিল—ধোপাখালিতে এক বুড়ী ছিল, সেও তোর সম্বন্ধে আমায় একথা বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে? কে বুড়ী? ওমা, সে কি! শুনিনি তো কক্ষনো?

বিপিন সংক্ষেপে কামিনীর কাহিনী বলিয়া গেল।

মানী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক বলেছিল বিপিনদা। এ কষ্ট সাধ করে কেউ যেন বরণ করে না! তবে কামিনী বুড়ী যখন বলেছিল, তখন আর উপায় ছিল কি?

—নাঃ।

—শান্তির সঙ্গে দেখাশুনো করবে না। সোনাতনপুর ওদের বাড়ী যদি ছাড়তে হয়, তাও করবে এজন্যে। বউদিদিকে নিয়ে যাও না? যেখানে থাকো সেখানে?

—বেশ। তুমি শান্তির বরের একটা চাকরী করে দাও না কলকাতায়? বড় ভাল ছেলেটি। শান্তির একটা উপায় করো অন্তত।

—চেষ্টা করবো। ওঁকে বলে দেখি—হয়ে যেতে পারে।

—জানিস মানী, শান্তির তোকে বড্ড ভাল লেগেছে। ও এখানে আসতে চাচ্ছিল।

—সে আমার জন্যে নয় বিপিনদা। সে তোমার জন্যে—তোমার সঙ্গ পাবে এই জন্যে। ওসব আর আমায় শেখাতে হবে না। আমি মনকে বোঝাচ্ছি, তোমার সঙ্গে কাল শ্রাদ্ধের

কথাবার্তা বলতে এসেছি। কিন্তু তাই কি এসেচি? এতক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে বক্ বক্ করচি কি সেই জন্যে?

পরদিন সকাল হইতে কাজকর্মের খুব ভিড়। জমিদারের বড় মেয়ে বড় মানুষের বউ, খুব জাঁক করিয়াই চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইবে। বিপিন খাটিতে লাগিয়া গেল সকাল হইতেই। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত। লোকজনের কোলাহলে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

মানী একবার বলিল—আহা, শান্তিকে আনলে হোত বিপিনদা! নিজে মুখ ফুটে বলেছিলো, আনলে না কেন? সব তোমার দোষ।

—না এনেই অত মুখনাড়া শুনলাম, আনলে কি আর রক্ষে ছিল?

—কীর্ত্তনের দল আনতে রাণাঘাটে গাড়ী যাচ্ছে, তুমি গিয়ে ওই গাড়ীতে তাকে নিয়ে আসবে?

—সে উচিত হয় না, মানী। অন্ধ শ্বশুর দু দিন পড়ে থাকবে কার কাছে? থাকগে ওসব।

ধোপাখালির অনেক প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই খুব খুশি। নরহরি দাসও আসিয়াছিল। সে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে! অনেক দিনের পর আপনার সঙ্গে ভাখা। ভাল আছেন? আপনি চলে যাবার পর ধোপাখালি অনুপায় হয়ে গিয়েচে বাবু! সবাই আপনার কথা বলে।

বিপিন তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। বলিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে ডাক্তারি চলে? আমি আজকাল ডাক্তারি করি কিনা?

নরহরি দাস বলিল—আহ্ন, এখ্খুনি আহ্ন বাবু। ডাক্তারের যে কি কষ্ট, তা তো নিজের চোখে তুমি দেখেই এসেচ। আপনারে পেলি লোকে আর কোথাও যাবে না। ওষুধ খেয়েই মরবে।

সারাদিন বিপিন বাহিরের কাজকর্মের ভিড়ে ব্যস্ত রহিল। মানীর সঙ্গে দেখাশুনা হইল না। অনেক রাত্রে যখন কীর্ত্তন বসিয়াছে, তখন মানী আসিয়া বলিল—বিপিনদা, খাবে এসো, রান্নাঘরে জায়গা করেচি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মানী নিজের হাতে তাহার পাতে লুচি তরকারি পরিবেশন করিতে করিতে বলিল—আমি জানি তুমি সারাদিন খাওনি, পেট ভরে খাও এখন।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই কি করে জানলি?

—আমি সব জানি।

—সাধে কি বলি, অন্তর্য্যামী মেয়ে?

—নাও, এখন ভাল করে খাও দিকি। বাজে কথা রাখো। দই আর ক্ষীর নিয়ে আসি—তুমি ক্ষীর ভালবাসতে খুব।

আরও ঘণ্টা দুই পরে নিমন্ত্রিতদের আহারের পর্ব্ব মিটিল। বাড়ী অনেক নিস্তব্ধ হইল।

বাহিরের উঠানে কীর্তনসভা শুরু হইল।

বিপিন মানীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—মানী, কীর্তনের দল গাড়ী করে রাণাঘাট যাচ্ছে, আমি ওই সঙ্গে চলে যাই।

—তাই যাবে! বেশ যাও। যা কিছু বলে দিয়েচি, মনে থাকবে?

—নিশ্চয়। তুই যা বলবি, তাই করবো।

—শান্তির সঙ্গে আর মিশবে না, ও ছেলেমানুষ—তার ওপর অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে।

—মানী, সে কথা আমিও ভেবেছিলুম বহুদিন আগেই। তবে চালাবার লোক না পাওয়া গেলে আমাদের মত লোকে সব সময় ঠিক পথে চলে না। এবার থেকে সে ভুল আর হবে না। আমি ভাবছি, ধোপাখালিতে যদি ডাক্তারি করি তবে কেমন হয়?

—সত্যি ভেবেছ বিপিনদা? খুব ভাল হয়। তুমি ওখানে নায়েব ছিলে, সবাই চেনে, বেশ চলবে। ওদিকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে এসো।

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মানী?

মানী হাসিয়া বলিল—আর জন্মে। এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্তব্য আছে, করে যাই বিপিনদা।

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল— বেশ, ভুল হবে না?

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল,—আবার ভুল? আমি নির্বোধ, এ অপবাদ অন্তত তুমি আমায় দিও না বিপিনদা। দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

তারপর মানী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমার আর একটা কথা রেখো। যেখানেই থাকো, বৌদিদিকে নিয়ে এসো সেখানে। অমন করে কষ্ট দিও না সতীলক্ষ্মী মেয়েকে। যদি সাপের কামড়ে মারাই যেতেন, সে কষ্ট জীবনে কখনো দূর হোত ভেবেছ?

বিপিন বিদায় লইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, মানী পিছন হইতে ডাকিল—শোন বিপিনদা!

—কি রে?

মানী কথা বলে না। বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—মানী! ছিঃ, লক্ষ্মীটি—আসি।

মানী তখন কথা বলিল না। বিপিনও আধ-মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মানীর সামনে। তারপরে মানী চোখ মুছিয়া বলিল—আচ্ছা, এসো বিপিনদা!

গরুর গাড়ী ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা—মেঠো নির্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদের জ্যোৎস্নায় মেটে পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, কচিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন-পটলের ক্ষেত, আখের ক্ষেত, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত দেখাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর-দূরান্তের উদ্দেশে তার যাত্রা যেন সীমাহীন লক্ষ্যহীন—সে চলার বিজন পথে না আছে

শান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীর সুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

৬

রাণাঘাটে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল—একি চেহারা হয়েচে আপনার ডাক্তারবাবু? রাত্তে ঘুম হয়নি বুঝি? আর হবেই বা কি করে গরুর গাড়ীতে। নেয়ে ফেলুন, আমি ঠাণ্ডা জল তুলে দিই।

দুপুরবেলা বিপিন চুপ করিয়া শুইয়া আছে, শান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ওবেলা চলুন আর একবার টকি ছবি দেখে আসি—আর তো চলে যাচ্ছি দু-তিন দিনের মধ্যে। হয়তো আর দেখা হবে না।

—গোপাল ছবি দেখেছিল?

—উঃ দুদিন! আপনি যেদিন যান, আর যেদিন আসেন।

—চল যাই।

শান্তি খুশি হইয়া সকালে সকালে সাজিয়া-গুজিয়া তৈয়ারী হইল। বিপিন বেলা তিনটার সময় তাহাকে লইয়া বাহির হইল, কারণ বিপিনের ইচ্ছা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সে শান্তিকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবে, নতুবা শান্তির শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা হয়।

ছবি দেখিতে বসিয়া শান্তি অত্যন্ত খুশি। আজকার ছবিতে ভাল গান ছিল, সে ও ধরণের গান কখনো শোনে নাই—মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ইন্টারভ্যালের সময়ে বলিল—চলুন বাইরে, চা খাবেন না?

তাহার ধারণা ছবিতে যাহারা আসে, তাহাদের চা খাইতেই হয় এবং চা খাওয়ার জন্য ছুটি দেওয়া হইয়াছে। শান্তি আবদারের সুরে বলিল—আমি কিন্তু পয়সা দেবো আজও।

বিপিন হাসিয়া বলিল—পয়সা ছড়াবার ইচ্ছে হয়েচে? বেশ ছড়াও—

শান্তি লজ্জিত হইল দেখিয়া বিপিন বলিল—না না, কিছু মনে কোরো না শান্তি। এমনি বল্লুম। আমি তোমাকে কিন্তু কোন একটা জিনিস খাওয়াবো—কি খাবে বল?

শান্তি বালিকার মত আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই যে কাঁচের বোয়েমে রয়েচে ওকে কি বলে—কেক?···বেশ ওই কেক নিন তবে—আপনার জন্তেও নিন—

সিনেমার পরে শান্তি বলিল—চলুন, একটু ইষ্টিশানে বেড়িয়ে যাই। আর তো দেখতে পাবো না ওসব—চলে যাচ্ছি পরশু।

ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা বেঞ্চির উপরে নিজে বসিয়া বলিল—বসুন এখানে।

বিপিন বসিল।

—একটা সিগারেটের বাক্স কিনে আহ্ন, আমি পয়সা দিচ্ছি।

—না, তুমি কেন দেবে ?

—আপনার পায়ে পড়ি—কটা আর পয়সা, দিই না কিনে !

সে এমন মিনতির সুরে বলিল যে, বিপিন তাহার অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না। সিগারেট টানিতে টানিতে বিপিন শান্তির নানা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল—এ লাইন কোথায় গিয়াছে, ও লাইন কোথায় গিয়াছে, সিগ্‌ন্যালে লাল আলো সবুজ আলো কেন, কি করিয়া আলো বদলায় ইত্যাদি। আধঘণ্টা বসিবার পরে বিপিন বলিল—চল আমরা যাই—দেরি হয়ে গেল।

—বসুন না আর একটু—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস্ করি—

—কি ?

—আমার জন্যে আপনার মন কেমন করে একটুও ?

বিপিন বড় মুশকিলে পড়িল। এ কথার জবাব কি ধরণের দেওয়া যায়। শান্তি আরও কয়েকবার এভাবের প্রশ্ন করিয়াছে ইতিপূর্ব্বে।

সে ইতস্তত করিয়া বলিল—তা করে বই কি—বিদেশে থাকি, তোমার মত যত্ন—

—ওসব বাজে কথা। ঠিক কথার জবাব দিন তো দিন—নইলে থাক।

—এ কথা কেন শান্তি ?

—আছে দরকার।

—করে বই কি।

—ঠিক বলছেন ?

—ঠিক।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চলুন, যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পরে অনেক রাত্রে বিপিন শুইল।

মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল—বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে। বিপিন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের পৈঠায় বাঁশের আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুস্‌নয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোণাকুণি।

বিপিন নিঃশব্দে জানালা হইতে সরিয়া গেল। শান্তি কেন কাঁদে এত রাত্রে ? তাহাকে কি দোর খুলিয়া ডাকিয়া শান্ত করিবে ? তাহাতে শান্তি লজ্জা পাইবে হয়তো। যে লুকাইয়া কাঁদিতে চায়, তাহাকে প্রকাশের লজ্জা দেওয়া কেন ?

বিপিনের আর ঘুম হইল না।

হয়তো ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, গোপালের ডাকে তাহার ঘুম

ভাঙিল। শান্তি চা লইয়া আসিল, সে সদ্য স্নান করিয়াছে, পিঠের উপর ভিজা চুলটি এলানো, মুখে চোখে রাত্রিজাগরণের কোনো চিহ্ন নাই। হাসিমুখে বলিল—উঃ, এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুম? কতক্ষণ থেকে থেকে শেষে ওকে বললুম ডেকে দিতে।

অদ্ভুত মেয়ে বটে শান্তি। বিপিনের মন দুঃখ, সহানুভূতি ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে অর্দ্ধেক কথা।

শান্তিকে আর সে দেখা দিবে না। এইবারই শেষ।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে ঠিকই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি চলুক না চলুক, সোনাতনপুরের নিকট হইতে তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। হয় ধোপাখালি, নয় যে কোন স্থানে—কিন্তু সোনাতনপুরে বা পিপ্‌লিপাড়ায় আর নয়। মানীর কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

পরদিন দুপুরের পর সকলে দুইখানি গরুর গাড়ীতে করিয়া রাণাঘাট হইতে রওনা হইয়া গ্রামের দিকে ফিরিল। কাপাসপুরের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে তাহাদের নিজেদের গ্রামের পথ বাহির হইয়া গিয়াছে—রাণাঘাট হইতে ক্রোশ চার পাঁচ দূরে। এই পর্য্যন্ত আসিয়া বিপিন বলিল—আপনারা যান তবে, আমি অনেকদিন বাড়ী যাই নি, একবার বাড়ী হয়ে যাব। সামান্ত পথ, হেঁটে যাবো।

শান্তি বলিল—কেন ডাক্তারবাবু? আমাদের ওখানে আসুন আজ। তারপর না হয় কাল বাড়ী আসবেন?

বিপিন রাজি হইল না। বাড়ীর সংবাদ না পাইয়া মন খারাপ আছে, বাড়ী যাইতে হইবেই। বিপিন বুঝিল, শান্তি দুঃখিত হইল।

কিন্তু উপায় নাই, শান্তিকে বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্ত এ দুঃখ তাহাকে দিতে হইবেই যে!

শান্তি গাড়ী হইতে নামিয়া বিপিনকে প্রণাম করিল, গোপালও করিল—উহাদের বংশের নিয়ম, ব্রাহ্মণের উপর যথেষ্ট ভক্তি চিরদিন।

একটা বড় পুষ্পিত শিমূলগাছতলায় গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে, শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, গোপাল বৃদ্ধ বাপের হাত ধরিয়া নামাইয়া বিপিনের পরিত্যক্ত গাড়ীখানায় উঠাইতেছে—ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষত শান্তির সম্বন্ধে এই ছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড় স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি। সেইজন্ত ছবিটা অনেকদিন তাহার মনে ছিল।

বেণীগীর ফুলবাড়ী

কুয়াশার রঙ্

ভয়ানক বর্ষা। ক'দিন সমানভাবে চলিয়াছে, বিরাম বিশ্রাম নাই। প্রতুল মেসের বাসায় নিজের সিটটিতে বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় বা বাহির হইবে? যাইবার উপায় নাই কোনদিকে, ছাদ চুঁইয়া ঘরে জল পড়িতেছে—সকাল হইতে বিছানাটা একবার এদিকে, একবার ওদিকে সরাইয়াই বা কতক্ষণ পারা যায়? সন্ধ্যার সময় আরও জোর বর্ষা নামিল। চারিদিক ধোঁয়াকার হইয়া উঠিল, বৃষ্টির জলের কুয়াশার ফাঁকে ফাঁকে গ্যাসের আলোগুলো রাস্তার ধারে ঝাপ্‌সা দেখাইতেছে।

প্রতুল একটা বিড়ি ধরাইল। সকাল হইতে এক বাণ্ডিল বিড়ি উঠিয়া গিয়াছে—বসিয়া বসিয়া বিড়ি খাওয়া ছাড়া সময় কাটাইবার উপায় কই? সিগারেট কিনিবার পয়সা নাই। এই সময়টা সিগারেট খাইয়া কাটাইতে হইলে দুই বাক্স ক্যাভেণ্ডার নেভিকাট সিগারেট লাগিত।

প্রতুলের হঠাৎ মনে পড়িল, এবেলা এখনও চা খাওয়া হয় নাই। মেসের চাকরকে ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় দুয়ারে কে ঘা দিল। হয়তো হরিশ চাকরের মনে পড়িয়াছে তাহার ঘরে চা দেওয়া হয় নাই। দুয়ার খুলিয়া প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—এই যে প্রতুলদা, ভাল আছেন? নমস্কার। এলাম আপনার এখানেই—

একটি ত্রিশ বত্রিশ বছরের লোক, গায়ে ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে রবারের জুতা, হাতে একটা ছোট টিনের সুটকেস, সঙ্গে একটি বছর নয় দশের ছোট ছেলে লইয়া ঘরে ঢুকিল। ছাতি হইতে জল গড়াইয়া পড়িতেছে—ভিজা জুতায় ঘরের দুয়ারের সামনের মেঝেটাতে জলে দাগ পড়িল, খোলা দরজা দিয়া ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

· আয় রে খোকা, যা, গিয়ে বোস গে যা—তোর জ্যাঠামশায়, প্রণাম কর। দাঁড়া, পা-টা মুছে দিই গামছা দিয়ে—যা—

প্রতুল তখনও ঠিক করিতে পারে নাই লোকটা কে, এমন দুর্যোগের দিনে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। দেশের লোক, গ্রামের লোক তো নয়—কোথায় ইহাকে সে দেখিয়াছে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, এ সেই শশধর, নাথপুরের শশধর গাঙ্গুলী। এত বড় হইয়া উঠিয়াছে সেই আঠারো উনিশ বছরের ছোকরা! আর বাল্যের সেই চমৎকার চেহারা এত খারাপ হইয়া উঠিল কিভাবে?

—চিনতে পেরেছেন প্রতুলদা?

—হ্যাঁ, এসো বসো, ও কতকাল পরে দেখা, তা তুমি জানলে কি করে এখানে আমি আছি? ভাল আছ বেশ? এটি কে—ছেলে? বেশ, বেশ।

শশধর রাঙ্গা দাঁত বাহির করিয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, তা হবে না? সে আজ কত বছরের কথা বলুন তো? আজ বারো তেরো কি চৌদ্দ বছরের কথা হয়ে গেল যে!

আপনার ঠিকানা নিলুম জীবন ভটচায্যির কাছ থেকে। জীবন ভটচাযকে মনে পড়ছে না? সেই যে জীবনদা, আমাদের লাইব্রেরীর সেক্রেটারী ছিল।

—কিন্তু জীবনবাবুই বা আমার ঠিকানা জানলেন কি করে—তাঁর সঙ্গেও তো বারো তেরো বছর দেখা নেই—যতদিন নাথপুর ছেড়েছি ততদিন তাঁর সঙ্গেও—

—জীবনদার শালার এক বন্ধু আপনারও বন্ধু—রাধিকাবাবু, চিনতে পেরেছেন এবার? সেখানে জীবনদা শুনেছে—আপনি তো আমাদের খবর রাখেন না—আমরা আপনার রাখি। এই, স্থির হয়ে বোস্ খোকা—এক কাপ চা খাওয়ান না দাদা, বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

সঙ্গের ছোট ছেলেটি অমনি বলিতে শুরু করিল, খিদে পেয়েচে, বাবা—আমার খিদে পেয়েছে।

তাহার বাবা ধমক দিয়া বলিল—থাম, ছোঁড়ার অমনি খিদে খিদে শুরু গেল, থাম না, খেইচিস্ তো দুপুরবেলা—

প্রতুল বলিল—আহা, ওকে ধমকাচ্চ কেন, ছেলেমানুষের খিদে তো পেতেই পারে। দাঁড়াও খোকা, আমি খাবার আনাচ্ছি।

চা ও জলযোগের পর্ব্ব মিটিয়া গেলে প্রতুল বলিল—তারপর শশধর, এখন হচ্ছে কি?

শশধর বলিল—করবো আর কি! রামজীবনপুরের ইউ পি স্কুলের হেড্‌পণ্ডিত। আজ দু দিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় এলাম, একটু কাজ আছে। ভাল কথা প্রতুলদা, এখানে একটু থাকবার জায়গা হবে?

প্রতুল বলিল—হাঁ হাঁ, তার আর কি। থাকো না। জায়গা তো যথেষ্টই রয়েচে। আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের খাওয়ার কথা রাত্রে।

আজ প্রায় বারো তেরো বছর আগে প্রতুল নাথপুর গ্রামের মিউনিসিপ্যাল অফিসে কেরাণীর চাকুরী লইয়া যায়। নাথপুর নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম নয়, আশপাশের চার-পাঁচখানি ছোট বড় গ্রাম লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি—ইলেক্‌শন লইয়া দলাদলি মারামারি পর্য্যন্ত হইত, লাইব্রেরী ছিল, ডাক্তারখানা ছিল, হাই স্কুল ছিল, একটা পুলিশের ফাঁড়ি পর্য্যন্ত ছিল।

একদিন নিজের ক্ষুদ্র বাসাটিতে বসিয়া আছি একা, একটি আঠার উনিশ বছরের ছোকরা আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আপনি বুঝি নতুন এসেছেন আমাদের গাঁয়ে?

—হ্যাঁ। এসো বসো। তোমার নাম কি?

—আমার নাম শশধর। আপনার সাথে আলাপ করতে এলুম—একলাটি বসে থাকেন।

—এসো এসো, ভালই। তুমি স্কুলে পড় বুঝি?

শশধর পরিচয় দিল।

না, সে স্কুলে পড়ে না। অবস্থা ভাল না, স্কুলে কে পড়াইবে? তাহা ছাড়া সংসারে বাবা নাই, তাহারই ঘাড়ে সংসার। মা, দুই বোন, তিনটি ছোট ছোট ভাই, স্ত্রী।

প্রতুল বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি বিয়ে করেচ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওবছর বিয়ে হয়ে গিয়েচে।

ছেলেটি দেখিতে খুব স্থশ্রী, স্থপুরুষ। অল্প বয়সে বিবাহ হওয়াটা আশ্চর্য্য নয় বটে।

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ছেলেটি সেদিন চলিয়া গেল। তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে সে প্রায়ই আসিত। এ গ্রামে প্রতুল নতুন আসিয়াছে, বিশেষ কাহারও সহিত পরিচয় নাই, এ অবস্থায় একজন তরুণ বন্ধু লাভ করিয়া প্রতুলও খুশি হইল। সময় কাটাইবার একটা উপায় হইল। সন্ধ্যাবেলাটা দুজনে গল্পগুজবে কাটিয়া যাইত।

একদিন শশধর প্রতুলকে বাড়ীতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিল। শশধরের মা তাকে ছেলের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন, শশধরের বোন কণা তাকে প্রথম দিনেই 'প্রতুলদা' বলিয়া ডাকিল—এই নির্ব্বান্ধব পল্লীগ্রামে ইহাদের স্নেহসেবা প্রতুলের বড় ভাল লাগিল সেদিন।

ইহার পর অফিস হইতে প্রতুল নিজের বাসায় ফিরিতে না ফিরিতে শশধর প্রতুলকে ডাকিয়া নিজের বাড়ীতে প্রায়ই লইয়া যায়—প্রায়ই বৈকালিক চা-পানের ও জলযোগের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়া থাকে।

দিনকতক যাইবার পরে প্রতুল ইহাতে সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। শশধরদের সাংসারিক ব্যবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, রোজ রোজ তাহার জলযোগের জন্ম উহাদের খরচ করাইতে প্রতুলের মন সায় দিল না। সে খাওয়া বন্ধ করিল। অবশ্য মুখে সোজাসুজি কোন কিছু বলিতে পারা সম্ভব ছিল না—তবে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে ওজর আপত্তির অভাব হয় না।

একদিন শশধর আসিয়া বলিল—আজ যেতেই হবে প্রতুলদা—কণা বলেছে তোমাকে নিয়ে না গেলে সে ভয়ানক রাগ করবে আমার ওপর। প্রতুল আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—কণা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কণা—আমার ছোট বোন। ভুলে গেলেন নাকি? চলুন আজ। প্রতুলের মনে বিস্ময় এবং আনন্দ দুই-ই হইল। কণার বয়েস পনেরো ষোল—রং ফর্সা, বেশ সুশ্রী মেয়ে। কথাবার্ত্তা বলে চমৎকার—পাড়াগাঁয়ের তুলনায় লেখাপড়াও জানে ভাল। তাহার সম্বন্ধে কণা আগ্রহ দেখাইয়াছে কথাটা শুনিতে খুব ভাল।

কণা সেদিন প্রতুলের কাছে কাছেই রহিল। কয়দিন না দেখাশোনার পরে দুজনেরই দুজনকে যেন বেশী করিয়া ভাল লাগিতেছে। ফিরিবার সময় প্রতুলের মনে হইল, কণাকে আজ যেন তাহার অত্যন্ত আপন জন বলিয়া মনে হইতেছে। কেন?

নির্জ্জন বাসায় ফিরিয়া কথাটা সে ভাবিল। কণা মেয়েটি ভাল, সত্যই বুদ্ধিমতী, সেবা-পরায়ণা। তাহাদেরই পালটি ঘর। আহা, এই জন্যই কি শশধরের এ তাগাদা—তাহাকে ঘন ঘন বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য?

কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ চিন্তাও তাহার মনে না আসিয়া পারিল না, তাই কণার অত গায়ে পড়িয়া আলাপ করার ঝোঁক তায় সঙ্গে!

প্রতুল আবার শশধরদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিল।

শশধর আসিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিতে আদৌ বিলম্ব করিল না। এবার কিন্তু প্রতুল

অত সহজে ভুলিল না। তাহার মনে খট্‌কা লাগিয়াছে। কণা তাহাকে সত্যই ভালবাসে, না তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য ইহা তাহার একটি ছলনা মাত্র? কণার মা কিজন্য তাহাকে অত আদর করিয়া থাকেন বা শশধর তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইতে অত আগ্রহ দেখায় -ইহার কারণ প্রতুলের কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গরীবের মেয়ে, বিবাহ দিবার সঙ্গতি নাই উপযুক্ত পাত্রে—সে হিসাবে প্রতুল পাত্র ভালই, ত্রিশ টাকা মাহিনা পায় অফিসে, বয়স কম, দেখিতে শুনিতেও এ পর্য্যন্ত তো প্রতুলকে কেহ খারাপ বলে নাই।

ইহাদের সকল স্নেহ ভালবাসা বা আগ্রহের মধ্যে একটি গূঢ় স্বার্থসিদ্ধির সন্ধান জানিয়া প্রতুলের মন ইহাদের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র মাস। সাত আট দিন বেশ ঝলমলে শরতের রৌদ্র—খালের ধারে কাশফুল ফুটিয়াছে, জল কাদা শুকাইয়া আসিতেছে। পূজার ছুটির আর বেশী দেরী নাই, প্রতুল বসিয়া বসিয়া সেই কথা ভাবিতেছিল—মিউনিসিপ্যাল অফিসে বার দিন ছুটি।

এই সময় একদিন কাহার মুখে প্রতুল শুনিল শশধরের বাড়ীতে বড় বিপদ। শশধরের মা মৃত্যুশয্যায়। শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। শশধর এদিকে অনেক দিন আসে নাই তা নয়, প্রতুল উহাদের বাড়ী না গেলেও সে এখানে প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকে, চা খায়, গল্পগুজব করে। কই, মায়ের এমন অসুখের কথা তো শশধর বলে নাই?

প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। এমন বিপদের সময় না আসিয়া চুপ করিয়া থাকা—সেটা ভদ্রতা এবং মনুষ্যত্ব উভয়েরই বিরুদ্ধে। প্রতুলের কড়া নাড়ার শব্দে কণা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। প্রতুলের মনে হইল কণা তাহাকে দরজায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। প্রতুলই আগে কথা কহিল। বলিল, মা কেমন আছেন?

—আসুন বাড়ীর মধ্যে। দাদা নেই বাড়ীতে. ডাক্তার ডাকতে গিয়েছে। অবস্থা ভাল না।

—চল, চল দেখি গিয়ে। আমি কিছুই জানিনে কণা অসুখের কথা, শশধর ক'দিন আমার ওখানে যায়নি। তবে মাঝে যা গিয়েছিল, তখন কিছু বলে নি।

—বলবে কি, মার অসুখ আজ সবে পাঁচ দিন হয়েচে তে'। পরশু রাত্তির থেকে বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। এর আগে এমন তো হয় নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যেটা প্রতুলের চোখে সর্ব্বপ্রথম পড়িল, সেটি ইহাদের দারিদ্র্যের কুশ্রী ও মলিন রূপ। সে নিজেও বড়লোকের ছেলে নয়, কিন্তু তবুও তাহাদের বাড়ীতে গৃহস্থালীর যে শ্রীছাঁদ আছে, এখানে তার সিকিও নাই।

কণা বলিল, এতকাল আসেন নি কেন এদিকে? আমাদের তো ভুলেই গিয়েছেন।

প্রতুলের মনে কষ্ট হইল। কণার ক্লান্ত, উদ্বেগপূর্ণ এবং ঈষৎ বিষণ্ণ চোখ দুটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে বড় নিষ্ঠুর কাজ করিয়াছে এতদিন এখানে না আসিয়া। কণা বড় ভাল মেয়ে, যতক্ষণ প্রতুল তাহাদের বাড়ী রহিল ততক্ষণের মধ্যেই প্রতুল জানিতে পারিল

কণার কি কর্তব্যজ্ঞান, রুগ্ন মায়ের কি সেবাটাই করিতেছে কণা। এত দুঃখে উদ্বেগেও কণার সুন্দর রূপ ম্লান হয় নাই। অনেক মেয়েকে সে দেখিয়াছে—সাজিলে গুজিলে সুশ্রী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু মলিন কাপড় পরিয়া থাকিলে বা চুল না বাঁধা থাকিলে কিংবা হয়তো সদ্য ঘুম হইতে ওঠা অবস্থায় দেখিলে বড় খারাপ দেখায়।

কণার রূপের মধ্যে একটা কিছু আছে যাহাতে কোন অবস্থাতেই খারাপ দেখায় না। এত অনিয়ম, রাত্রি জাগরণ, উদ্বেগ, পরিশ্রমের মধ্যেও কণা তেমনই ফুটন্ত ফুলটির মত তাজা. তেমনই লাবণ্য ওর সুকুমার মুখে।

কণার সম্বন্ধে এই একটি মূল্যবান সত্য আবিষ্কার করিয়া প্রতুল আনন্দিত ও বিস্মিত দুই-ই হইল।

ইহার পর প্রতুল কয়দিনই কণাদের বাড়ী নিয়মিত যাইতে লাগিল—রোগিণীর সেবায় সেও কণাকে সাহায্য করিত— স্টোভ জ্বালা, জল গরম করা, বিছানার চাদর বদলানোর সময় রোগিণীকে বিছানার একপাশে সরানো, ডালিম বেদানার দানা ছাড়ানো। পঞ্চম দিনের প্রাতঃকালে কণার মা যখন ইহলোকের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন তখন সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সে যথাযোগ্য সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, দাহকার্য্যের খরচপত্র নিজ হইতে দিল, কারণ শশধর একেবারে কপর্দ্দকশূন্য সেদিন। নিজে শ্মশানে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত রহিল। আবার সকলের সঙ্গে সেখান হইতে কণাদের বাড়ী ফিরিয়া আগুন তাপিল এবং নিমের পাতা দাঁতে কাটিল।

- কণা আজকাল প্রতুলের দিকেও বড় টানে, তাহার সুখ দুঃখ, সে রাত্রে ঘুমাইল কিনা, তাহাকে চা ঠিক সময়ে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে কিছু না হোক এক মুঠা মুড়ি ও তেল নুন মাখিয়া দেওয়া—এসব দিকে কণার সতর্ক দৃষ্টি—এত দুঃখ বিপদের মধ্যেও—ইহাও প্রতুলের মনে বড় আনন্দ দিয়াছে কয়দিন।

শ্রাদ্ধের আগের দিন প্রতুল শশধরকে নিজের মাহিনা হইতে কুড়িটি টাকা দিয়া তাহাকে কি করিতে হইবে না হইবে পরামর্শ দিল, জিনিসপত্র ও লোকজন খাওয়ানোর ফর্দ্দ ধরিল। সামান্য তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ হইবে—শ্রাদ্ধের দিন বারোটি ব্রাহ্মণ এবং নিয়মভঙ্গের দিন জন পনেরো জ্ঞাতি-কুটুম্ব খাইবে। এসব কথা কণাদের বাড়ী বসিয়াই হইতেছিল– পরামর্শান্তে প্রতুলকে বসাইয়া রাখিয়া শশধর কোথায় বাহির হইয়া গেল। প্রতুলের বসিয়া থাকিবার কারণ সে এখনও বৈকালিক চা পান করে নাই, না খাইয়া গেলে কণা চটিয়া যাইবে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, প্রতুল কণার হাত হইতে পেয়ালাটি লইয়া বলিল—বসে কণা। কালকার সব যোগাড় করে রাখো—ফর্দ্দ দিয়েছেন নবীন ভটচায্যি। সন্ধ্যের পর একবার দেখে নিও সেখানা—শশধর কেনাকাটা করতে গিয়েছে, যদি কিছু বাদ পড়ে, আনিয়ে নিও।

—আপনি টাকা দিলেন ?

—আমি ? হাঁ—তা ইয়ে—

—কত টাকা দিলেন ?

—সে কথায় দরকার ? সে এমন কিছু নয়—তা ছাড়া ধার —শশধর আবার আমায়—

—দাদা আবার আপনাকে ছাই দেবে। আপনাকে কথাটা বলবো ভেবেচি। কেন আপনি আমাদের পেছনে এমন করে খরচ করবেন ? রোগের সময় টাকা দিয়েছেন—আবার কাজের সময় দেবেন! আপনি কি এমন ন'শো পঞ্চাশ টাকা ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন শুনি ? মাইনে তো পান ত্রিশটি টাকা। আপনার নিজের বাবা মা ভাই-বোন রয়েছে, তাদের কি দেবেন ? নিজে কি খাবেন ? আপনাকে বলি শুনুন। দাদা বেকার বসে আছে, আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা কখনো আর উপুড় হাত করবে না। ওর ওই স্বভাব। আপনি আর এক পয়সা দেবেন না বলে দিচ্ছি। মায়ের কাজ হোক না হোক আপনার কি ? আপনি কেন দিতে যাবেন ?

প্রতুল বিস্মিত দৃষ্টিতে কণার মুখের দিকে চাহিল। কণার মুখে একটি সবল তেজস্বী লাবণ্য ...সত্যবাদী ও-স্পষ্টভাষী ওর ডাগর চোখ দুটি, যা খোশামোদ করিতে বা ছলনা করিতে শেখে নাই আজও প্রতুলের মনে হইল।

কিন্তু কণা আজ এ কি নতুন ধরণের কথা বলিল ? ভারি আশ্চর্য্য কথা। এতদিন কণাকে চিনিতে পারে নাই সে, আজ চিনিল বটে। শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। কণা সাধারণ মেয়ে নয়।

শ্রাদ্ধশান্তি মিটিয়া গেল। প্রতুল নিয়মিত উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। কণার সেবা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, সে যত্ন ও সেবায় এতটুকু খুঁত কোনদিন প্রতুলের চোখে পড়িল না আজও। মায়ের শোক খানিকটা প্রশমিত হইবার পরে কণা আরও সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে এখন, পরিস্ফুট যৌবন-শ্রী তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

প্রতুল ইতিমধ্যে মনে মনে ভাবিয়া স্থির করিয়াছে কি করিয়া কথাটা এইবার সে পাড়িবে। কথাবার্ত্তা পাকা না হয় রহিল, অশৌচ কাটিয়া গেলে বিবাহ হইতে বাধা কি ! পরের বাড়ীর তরুণী পূর্ণযৌবন মেয়ের সহিত এ ভাবে মেলামেশা উচিত হইতেছে না—একটা পাকাপাকি কথা হওয়া ভালো। বৈকালে প্রতুল কণাদের বাড়ী গেল।

কণা আসিয়া বলিল, ওইরে বাস্‌! আমি বলেচি কি না বলেচি, প্রতুলদা তো এলো বলে! দুধ নেই চা করবার, ওবেলা পিন্টু দুধের কড়া আলগা করে দিয়েচে, আর সব দুধখানি উপুড় করে রেখে দিয়েচে বেড়ালে।

—বসো কণা এখানে। চা হবে এখন, তার জন্যে কিছু নয়।

কণা এখন মাতৃহীন ছোট ভাইবোনের মায়ের স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, সংসারে সেই এখন কর্ত্রী, প্রতুল তা জানে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র কর্ত্রীটি মাঝে মাঝে কি রকমে ফাঁদে পড়িয়া যায় পয়সা কড়ির অভাবে তাহাও প্রতুল দেখিয়াছে। কণা তাহাকে কিছু বলে না—কোনদিন না—কিন্তু সে নানা রকমে টের পায়, যেমন আজই পাইল।

কণা কি কাজে একটু উঠিয়া গিয়াছে, প্রতুল কণার ছোট ভাই বিন্টুকে ডাকিয়া বলিল,

কি খেয়েচ খোকাবাবু ?

—ভাত খেয়েচি।

—এখন কি খেয়েচ ?

—আর কিছু নেই, ভাত নেই। দিদি খায় নি।

তখন সেখানে কণার ছোট বোন এগারো বছরের পিন্টু আসিল। প্রতুল বলিল, কণা খায় নি কেন ?

পিন্টু বলিল, ভাত ছিল না। ওবেলা চাল ধার করে নিয়ে এল দিদি ওই সরকারদের বাড়ী থেকে। দাদা কাল কোথায় গিয়েচে, আজও তো ফিরলো না। মহেশ চক্কত্তির দোকানে টাকা পাবে বলে চাল ডাল দেয় না আজকাল, দিদি এখন কোথায় পাবে, কোন্ দিকে যাবে ?

প্রতুল অনেক কথা ভাবিল। কণা সংসার চালাইতে পারে না টাকার অভাবে, সে নিজে যদি বাহির হইতে দু'দশ টাকা সাহায্য করে সেটা যেন ভিক্ষা দেওয়ার মত দেখায়। সে টাকা হাত পাতিয়া লওয়ায় কণার গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। কণাকে সে-অপমানের মধ্যে টানিয়া আনিতে তাহার মন সরে না অথচ এ রকম কষ্ট করিয়াই বা কণা কতদিন বাঁচিবে ?

সবদিকের মীমাংসা করিতে হইলে বিবাহের কথাটা পাড়িতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আজই সে কণার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা বোঝাপড়া করিবে আগে—তাহার পরে শশধরকে জানাইলেই চলিবে এখন। শশধরটা মানুষ নয়, সে ইতিমধ্যে বেশ বুঝিয়া ফেলিয়াছে।

কণা চা লইয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল—একটু দেরী হয়ে গেল প্রতুলদা, দুধ ছিল না একেবারে। আনলাম রায় কাকাদের বাড়ী থেকে। দেখুন তো চা-টা খেয়ে কেমন হয়েচে ?

প্রতুল বলিল—ব্যস্ত হয়ে ঘুরচ কোথায় কণা ? বসো এখানে, কথা আছে।

শীতকালের বিকাল, কণাদের বাড়ীর চারিপাশে বনজঙ্গলে বনমৌরী লতায় ফুল ফুটিয়াছে—বেশ একটা উগ্র সুগন্ধে অপরাহ্নের শীতল বাতাস ভরপুর। ভাঙ্গা ইটের পাঁচিলের গায়ে রাঙা রোদ পড়িয়া কণাদের পুরানো পৈতৃক ভদ্রাসনের প্রাচীনত্ব ও দারিদ্র্য যেন আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে।

কণা বলিল, প্রতুলের মুখের দিকে আগ্রহের সহিত চাহিয়া বলিল, কি প্রতুলদা ?

—তোমাকেই কথাটা বলি, কিছু মনে করো না কণা! অনেকদিন থেকে কথাটা আমার মনে রয়েচে—বলি বলি করে বলা ঘটে উঠচে না। তুমি আমায় বিয়ে করবে কণা ? আমি অত্যন্ত সৌভাগ্য বলে মনে করবো, যদি—

কণা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকক্ষণ দুজনের কেহই কথা বলিল না। তারপরে কণা ধীরে ধীরে অনেকটা চাপা সুরে বলিল, সে হয় না, প্রতুলদা।

প্রতুল বিস্মিত হইল। কণার এ উত্তর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাহার কাছে। বলিল, হয় না কণা?

কণা মাটির দিকে চোখ রাখিয়া পূর্ব্ববৎ নিম্নস্বরে বলিল, হয় না প্রতুলদা। কারণ আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে কথা বলবো না। বিয়ে হতে পারে না।

কেন? কণা কি অন্য কোন যুবককে ভালবাসে? কই, আর কোন যুবককে তো প্রতুল কোনদিন উহাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করিতে দেখে নাই? ব্যাপার কি?

—কারণটা জানতে পারলে বড় ভাল হতো, কণা। খুব বেশী বাধা কিছু আছে কি?

—হাঁ।

—কারণটা বলবে?

—আপনি কিছুই জানেন না? দাদা কিছু বলেনি আপনাকে?

প্রতুল আরও বিস্মিত হইল। কি জানিবে সে! শশধরই বা তাহাকে কি বলিবে! অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে সে বলিল—না কণা, তুমি কি বলচো আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে। শশধর কি বলবে আমায়?

—আমি বিধবা।

—তুমি!

—হ্যাঁ, আট বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়—তেরো বছর বয়সে—এই পাঁচ বছর হলো।

প্রতুলের মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল যেন। সর্ব্বশরীর যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। কণা বিধবা! কণার বিবাহ হইয়াছিল আট বছর বয়সে। অদৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! আর সে কত আকাশ-কুসুম না রচনা করিয়াছে মনে মনে এই কণাকে লইয়া…ইহাদের প্রতি মনে মনে কত অবিচার করিয়াছে তাহাকে জামাই করিবার উদ্দেশ্য প্রতি আরোপ করিয়া! গ্লানি ও অনুতাপে প্রতুলের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

—কিন্তু কণা, একথা তো আমি কিছুই জানিনে। আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি।

– আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে, আপনি জানেন, দাদা বলেছে আপনাকে। আমিও অবাক হয়ে গেছি এ কথা শুনে।

—একটা কথা বলবো! বিধবার পুনর্ব্বিবাহ তো হচ্ছে সমাজে।

—প্রতুলদা ওসব কথা থাক্। যা হয় না যেখানে, সেখানে সে কথা তোলা মিথ্যে মিথ্যে কেন?

—না, আমার কথার উত্তর দাও কণা, আমি অমন ধরনের কথা শুনবো না তোমার মুখে; তোমায় সুখী করার দিকে আমার লক্ষ্য। সেজন্যে সংস্কার এবং সমাজ আমি অনায়াসেই ঠেলবো।

কণার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। সে মুখ নীচু করিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—আপনার পায়ে পড়ি প্রতুলদা—

প্রতুল আর কিছু বলিল না। পরদিন অফিসে আসিয়াই সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া দিল

এক মাসের নোটিশে। এখানে আর থাকিবে না, থাকিয়া লাভ নাই।

এই এক মাসের মধ্যে সে কণাদের বাড়ী গেল প্রায় প্রত্যেকদিনই কিন্তু চাকুরীতে নোটিশ দেওয়ার কথা কাহাকেও বলিল না। বিবাহ সম্বন্ধে কণার সাথে আর কোন কথাও সে বলে নাই যদিও কণা আগের মতই তাহার কাছে নিঃসঙ্কোচে আসে, বসে, কথাবার্ত্তা কয়।

যাইবার পূর্ব্বে সে কণাদের বাড়ী গেল। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর সে বলিল, কণা, আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি কাল।

কণা আশ্চর্য্য হইয়া প্রতুলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—চলে যাবেন? কেন?

—চাকুরী ছেড়ে দিচ্চি।

—সে কি কথা!

—কথা ঠিকই তাই। কাল যাচ্চি।

—সত্যি?

—সত্যি। মিথ্যে বলে লাভ কি?

—সেকথা তো একদিনও বলেন নি—

—না বলিনি। বলেই বা লাভ কি? যেতেই যখন হবে।

—কেন, এখানে আপনার অসুবিধা কি হচ্ছিল? ভাল চাকুরী পেয়েছেন বুঝি কোথাও?

—কোথাও না।

কণা চুপ করিয়া রহিল। প্রতুলও তাই।

খানিক পরে কণা বলিল, যাবেন তা জানতুম। বিদেশী লোক আপনি—আপনাকে তো ধরে রাখা যাবে না। আমাদের কথা আপনি শুনবেনই বা কেন?

—অনেক জ্বালাতন করেচি, কিছু মনে করো না কণা।

কণা চুপ করিয়া রহিল।

এই পর্য্যন্ত সেদিন কণার সঙ্গে কথাবার্ত্তা। পরদিন আর একবার কণাদের বাড়ী যাইবার কথা ভাবিয়াও প্রতুলের যাওয়া ঘটিল না, দুপুরের ট্রেনে প্রতুল চলিয়া আসিল।

সারাপথ কেবল কণার কথা মনে হইল প্রতুলের। সেই অভাব অনটনের সংসারে চিরকাল কাটাইতে হইবে তাহাকে। গরীবের ঘরের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে, দাদার সংসার ছাড়া আর উপায় নাই। কণার জীবন অন্ধকার, কোন আলো নাই কোনদিক হইতে। প্রতুলের বুকের মধ্যে কোথায় যেন টন্‌টন্ করিতেছে। কণাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছে সে!

পরক্ষণেই ভাবিল, কি মুশকিল! কণা রয়েচে তার বাপের ভিটেতে ভাইবোনের কাছে, দাদার কাছে। আমার সঙ্গে তার কি?

মাস পাঁচ ছয় পরে, সেই ফাল্গুন মাসেই মায়ের পীড়াপীড়িতে তাহাকে বিবাহ করিতে হইল।

প্রতুলের শ্বশুরের দু-তিনটি ছোট বড় কলিয়ারি ছিল। কিন্তু কলিয়ারিগুলির অবস্থা ছিল খারাপ। চুরি হইত, নির্ভরযোগ্য ম্যানেজারের অভাবে কলিয়ারিগুলি লোকসানী

মহল হইয়া পড়িয়া থাকিত।

প্রতুলের শ্বশুর একদিন প্রস্তাব করিলেন—সে অফিসে পরের চাকুরী না করিয়া যদি কলিয়ারিগুলির তত্ত্বাবধান করে, তবে অফিসে যে বেতন পাইতেছে তাহা তো পাইবেই, উপরন্তু ভবিষ্যতে একটা উন্নতির আশা থাকে শ্বশুর-জামাই উভয়েরই। প্রতুল শ্বশুরের প্রস্তাবে রাজী হইল।. আরও বছর দুই পরে কলিয়ারির অবস্থা সত্যই ফিরিল প্রতুলের কর্মদক্ষতায়। প্রতুল আসানসোলের রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরে বুস্তচক্ কলিয়ারিতে সাজানো বাংলোতে স্ত্রীপুত্র (ইতিমধ্যে তাহার একটি ছেলে হইয়াছিল) লইয়া বাস করে—একটু স্টাইলের উপরই থাকে, না থাকিলে চলে না, কাজের খাতিরেই থাকিতে হয় নাকি।

কি জানি কেন এখানে আসিয়া কণার কথা তাহার বড়ই মনে পড়িতে লাগিল। আজ তাহার এই সাজানো বাংলো, সুখ ঐশ্বর্য্য—ইহাদের ভাগ কণা কিছুই পাইল না। সেই সুদূর পাড়াগাঁয়ে দারিদ্র্য ও নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে ভাঙ্গা পুরোনো ইটের পুরোনো কোঠাবাড়ী আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিল!

প্রতুলের মনটা যেন হা হা করিয়া ওঠে। সে বুঝিল, এখনও কণার কথা তাহার মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, তাই তাহাকে ভুলিয়া যাওয়া প্রতুলের পক্ষে সহজ নয়। প্রতুলের স্ত্রী বড়লোকের মেয়ে, বাল্যকাল হইতে সে সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নতুন জিনিস দেখাইয়া লাভ কি? তেলা মাথায় তেল দেওয়া। বরং যে চিরবঞ্চিতা —: জীবন যাহাকে কিছু দেয় নাই—তাহাকে যদি আজ সে—কেন এমন হয় জীবনে কে বলিবে?

যে পাইয়া আসিতেছে সে-ই বরাবর পায়, যে পায় না সে কখনই পায় না। যাহাকে খাওয়াইয়া সুখ পরাইয়া সুখ, দেখিয়া দেখাইয়া সুখ—তাহাকে খাওয়ানো যায় না, পরানো যায় না, দেখানোও যায় না।

কেন এমন হয়?

এ সব চার পাঁচ বছর আগের কথা।

আজ কয়েক দিন হইল প্রতুল কলিকাতায় আসিয়াছে চাকুরীর খোঁজে।

কলিয়ারি আছে কিন্তু প্রতুলের স্ত্রী নাই। পুনর্ম্মূষিকের পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইবার ইতিহাস আছে! সংক্ষেপে এই যে, গত বৎসর স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতেই শ্বশুরের কলিয়ারিতে থাকা প্রতুলের ভাল মনে হইল না এবং তার পরে দেখা গেল প্রতুলের শ্বশুরেরও তাহা ক্রমশঃ ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না। সুতরাং আজ কয়েকদিন হইল প্রতুল তাহার ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া এই পরিচিত মেসটিতে উঠিয়াছে এবং চাকুরীর সন্ধানে আছে।

এই সেই শশধর। কণার ভাই। এতকাল পরে হঠাৎ এভাবে কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বসিয়া শশধর চা খাইয়া সুস্থ হইবার পরে প্রতুল বলিল,

এতদিন পরে কি মনে করে? কেমন আছ?

শশধর বলিল, ভালই আছি। আপনি এখানে আছেন তা শুনলুম জীবনদার কাছে। আপনি নাকি চাকুরী খুঁজচেন? সেই জন্তেই আমার এখানে আসা। আপনার সব কথাই শুনেছি।

কি ব্যাপার? চাকুরী সন্ধানে আছে নাকি?

আমাদের দেশের মিউনিসিপ্যাল অফিসের সেই কেরাণীর পোস্ট খালি হয়েছে। আপনি গেলে ওরা লুফে নেবে এখুনি। কিশোরী চাটুয্যে এখন চেয়ারম্যান, আপনাকে বড় ভালবাসতো, আমাদের আপনার লোক। দিন একখানা দরখাস্ত করে। আমি লিখলে একবার গিয়ে ইণ্টারভিউ করে আসবেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে।

আবার সেই নাথপুর! সেই মিউনিসিপ্যাল অফিসের ত্রিশ টাকা বেতনের কেরাণীর পদ! তাহাই হউক। প্রতুল দরখাস্ত লিখিয়া পরদিন সকালে শশধরের হাতে দিল। চাকরী না করিলে চলিবে না। ছোট ছেলেটি লইয়া ত্রিশ টাকায় তাহার খুব চলিয়া যাইবে। তাহার বাবা মা জীবিত বটে, কিন্তু ছেলের রোজগারের উপর তাঁহাদের নির্ভর করিতে হয় না।

দিন পনেরো পরে শশধর লিখিল—চাকুরীর সব ঠিক, একবার আসিয়া চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করা দরকার। প্রতুল ছেলেকে লইয়া নাথপুরে গেল। দশ বৎসর আসে নাই এদিকে, অথচ যেন মনে হইতেছে কাল এ গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াছে। কণার কথা সে শশধরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই, কোথায় যেন বাধিয়াছিল—বহু চেষ্টা করিয়াও পারে নাই। আজ স্টেশনে নামিতেই কণার কথা প্রথমেই মনে পড়িল। কণা যেখানে থাকে, সেখানেই সে থাকিবে জীবনের বাকী কয়টা দিন।

বেলা প্রায় একটা, শশধর স্টেশনে ছিল। বলিল—প্রতুলদা, আপনার সেই পুরানো বাসা ভাড়া করে রেখেছি। কোন অসুবিধে হবে না। আর কণা বলে দিয়েছে আজ ওখানে খাবেন। চাকুরী হয়ে যাবে এখন, সব বলা আছে।

প্রতুল বলিল—এবেলা খাব না। খোকাকে বরং নিয়ে যাও কণার কাছে। আমি অফিসের পরে যাব। আমরা দুজনেই সকালে খেয়ে গাড়ীতে চড়েচি। বিকালের দিকে চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরে প্রতুল শশধরদের বাড়ী গেল। প্রথমেই কণা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়া বলিল—প্রতুলদা,—এতদিন পরে মনে পড়লো? তারপর সে পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল।

প্রতুল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সে কণা কোথায়? কোথায় সেই লাবণ্যময়ী কিশোরী? এ কণাকে সে চেনে না। কণা পূর্ব্বাপেক্ষা শীর্ণা হইয়াছে। যৌবনের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে অনেককাল বলিয়াই মনে হয়—যদিও বর্ত্তমানে সাতাশ-আটাশ বছরের বেশী বয়স নয় কণার। মুখের কোথাও পূর্ব্ব লাবণ্যের চিহ্ন আছে কিনা প্রতুল বিশেষভাবে খুঁজিয়া দেখিয়াও পাইল না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতুল দেখিল কণার উপর তাহার সে ভালবাসা যেন এক মুহূর্তে মন হইতে

কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। এ কণা অন্য একজন স্ত্রীলোকে—তাহার ভালবাসার পাত্রী, তাহার পরিচিত কণা এ নয়। কাহাকে সে ভালবাসিবে ?

কণা অবশ্য খুব আদর-যত্ন করিল। আহারাদির পরে প্রতুলকে পান আনিয়া দিয়া কণা বলিল, কতদিন আসেন নি, অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে প্রতুলদা। বসুন আমি আসচি।

প্রতুল ভাবিতেছিল, ভাগ্যে কণার সঙ্গে তাহার বিবাহের সুবিধা বা যোগাযোগ হয় নাই। কি বাঁচিয়াই গিয়াছে সে! ভগবান বাঁচাইয়া দিয়াছেন। উঃ!

দু-চারটি মামুলী কথা বলিয়া প্রতুল ছেলের হাত ধরিয়া উহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিল।

পরদিন সকালে শশধরকে ডাকিয়া বলিল, না ভাই, ছেলেটার শরীর খারাপ হয়েছে কাল রাত্রেই। তোমাদের যা ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলে নিয়ে এখানে চাকুরী পোষাবে না। অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে।

মাস্টার মশায়

প্রশান্তবাবুর কথা আমার এখনও পরিষ্কার মনে আছে।

সেদিন যেন কিসের ছুটি ছিল। বিকেলবেলা আমি ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। বিকেলবেলা আমি প্রায়ই ইস্টিশানে বেড়াতে যেতুম, বিশেষতঃ ছুটির দিনে। হিস্ হিস্ করে স্টীম ছাড়ে, খট্ খট্ করে গাড়ী চলতে থাকে, মাঝে মাঝে বিকট শব্দে সিটি দেয়। রেলের পুলের ওপর বসে আমার সেই সব দেখতে বেশ ভাল লাগত।

সন্ধ্যা হতে তখন অনেক দেরী আছে। পশ্চিম আকাশে লাল সূর্য্য যেন ফাগ ছড়িয়ে চারিদিক ভরিয়ে দিচ্ছে। কর্ম্মব্যস্ত পৃথিবীর মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ধীরে ধীরে নিঃশব্দতায় ধরিত্রী ভরে যাচ্ছে। আশেপাশের ঝোপঝাপ থেকে পাখীদের কিচির কিচির শব্দ ভেসে আসছে। আমি আঁকাবাঁকা মেঠো পথ বেয়ে পাকা কাঁঠালের তীব্র গন্ধে চিত্ত মদির করে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি।

এমন সময় কলকাতা থেকে ট্রেনখানা এসে প্ল্যাটফর্মের ধারে দাঁড়াল। সে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সশব্দে হাঁফ ছাড়তে লাগল। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে তার বিশ্রাম নেবার অধিকার। এই ক্ষণস্থায়ী মুহূর্ত কয়টির মধ্যে সকলের ওঠানামা শেষ করতে হবে। যথাসময়ে গাড়ী পুনরায় ছেড়ে দিল। সে ঝিক্ ঝিক্ করতে করতে সরু ফালি লাইনের ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ধূম নির্গত করে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যেতে লাগল। তার পেছনের লাল আলোটা বহুক্ষণ ধরে দেখতে পেলুম। আম কাঁঠালের বাগানের ধার দিয়ে, বাঁশ ঝোপের পাশ দিয়ে, সবুজ ধান ক্ষেতের কোণ ধরে, পানের ঝাড় পেছনে ফেলে সশব্দে ট্রেন এগিয়ে গেল।

কুলীর মাথায় মোট চাপিয়ে একটি ভদ্রলোক ইস্টিশান থেকে বেরিয়ে এলেন। বেশ সুপুরুষ চেহারা, বয়স বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, খুব ফর্সা, চোখে সোনার চশমা। গ্রামের মধ্যে কোথাও তাঁকে দেখেছি বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে তাঁর পানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলুম। আশ্চর্য্য! তিনি আমার কাছেই এগিয়ে এলেন, এমন কি তিনি আমাকেই প্রথমে সম্বোধন করলেন, শোন খোকা।

আমার চিত্ত পরম শ্রদ্ধায় ভরে গেল। বিনীত কণ্ঠে বললুম, আজ্ঞে!

তিনি বললেন, তুমি বুঝি এখানে থাক?

বললুম, হাঁ।

তিনি বললেন, বিষ্ণুপুর হাইস্কুল কোথায় বলতে পার?

বললুম, এই তো আমাদের স্কুল, চলুন না নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বললেন, ও:, তুমি বুঝি ওই স্কুলে পড়?

আমি গর্ব্ব অনুভব করলুম। তিনি বললেন, কোন্ ক্লাসে পড়?

বললুম, ক্লাস সেভেনে।

তিনি বললেন, বেশ বেশ, তোমার নাম?

বললুম, শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, গ্রামের মধ্যেই প্রায়। একটা মোড় বাঁকতেই স্কুল দেখা গেল। বললুম, ঐ দেখুন, আমাদের ইস্কুল……ঐ সাদা রঙের দোতলা বাড়ীটা। আপনি কোথায় যাবেন? ইস্কুল তো এখন বন্ধ।

তিনি বললেন, আমি যাব আশু চৌধুরীর বাড়ী।

আমি বললুম, ও:! আপনিই বুঝি আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার?

তিনি স্মিতমুখে বললেন, হাঁ, কেন বল তো?

আশ্চর্য্য! আমি এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলেছি? প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. আমাদের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। আমি নিবিড় শ্রদ্ধায় তাঁর পদধূলি মাথায় নিলুম। তিনি আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, থাক্ থাক্ থাক্।

আজও আমি সেদিনের কথা ভুলতে পারি নি। তাঁর সেই সৌম্য মূর্ত্তি, মধুর ভাষা আমার স্মৃতিপটে দুরপনেয় রেখাপাত করে গেছে।

স্কুলে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। আগেকার বুড়ো হেড্‌মাস্টারের পরিবর্ত্তে প্রশান্তবাবুকে পেয়ে অনেকে স্বস্তি বোধ করল। উঁচু ক্লাসের বড় বড় ছেলেরা তো হেসেই ফুঁ করে উড়িয়ে দিল। বলল, আরে, ছ্যা। ও আবার হেডমাস্টারী করবে! ডিসিপ্লিন কাকে বলে তাই হয়তো জানে না। অতটুকু হেডমাস্টারকে কেই বা মানবে? কি বলিস্ বক্কেশ্বর?

বক্কেশ্বর তুড়ি দিয়ে বলল, আরে অমন অবনীবাবুকে ঘাল করে দিলাম তার আবার প্রশান্ত মুখুজ্জে এম. এ.! মাত্তর দুদিন, তারপর দেখে নিস, বাছাধনকে বুঝিয়ে দেব আমরা হচ্ছি ইস্কুলের লিডার। নে নে ভোলানাথ, একটা গান ধর।

সঙ্গীতজ্ঞ ভোলানাথ বলল, ইস্কুলে বসে গান ?

বক্তেশ্বর বলল, আরে গর্দভ, টিফিনের সময় গাইবি তো তাতে কি হয়েছে ? নে সেই গানটা আরম্ভ কর, সেই 'ভুলি ভুলি করি ভুলিতে নারি'……

অগত্যা ভোলানাথ গলা ছেড়ে গান ধরল। গায়ক ভোলানাথের স্কুলে বেশ নাম° আছে। আমি জানালার ফাঁক দিয়ে দেখছিলুম। সেখানে ঢোকবার হুকুম নেই কারণ সে হচ্ছে বড়দের আসর। গান বেশ তালে তালে চলতে লাগল। এমন সময় কোথা থেকে হেডমাস্টার মশাই সেখানে নিঃশব্দে এসে হাজির হলেন। কে যেন ভোলানাথের গলাটা দুহাত দিয়ে চেপে ধরল। লিডারদের মুখ শুকিয়ে পাংশু হয়ে গেল। তাদের বীরত্ব আস্ফালন চিরতরে অন্তর্হিত হল। হেডমাস্টার মশায় ভোলানাথের কান ধরে দাঁড় করিয়ে তার দুগালে ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো চড় মেরে বললেন, এটা বাগানবাড়ী নয়।

তারপর অন্যান্য শ্রোতাদের এক এক চড় মেরে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন তেমন নিঃশব্দে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। লিডারদের তখন রক্ত গরম হয়ে গেছে। কেউ বলল, সেক্রেটারীর কাছে অ্যাপ্লিকেশন করবে। কেউ বলল, মজা দেখাবে।

কিন্তু কারুর মজা দেখাতে কিংবা অ্যাপ্লিকেশন করতে সাহস হল না। পরন্তু সকলে একবাক্যে স্বীকার করল যে হেডমাস্টার মশাই ভারী রাশভারী এবং কড়া মেজাজের লোক। বাস্তবিক ইস্কুলের সকলেই তাঁকে রীতিমত সমীহ করে চলত।

অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামময় তাঁর সুনাম রটে গেল আদর্শ শিক্ষক হিসেবে। তাঁকে সকলে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল। তিনি ছিলেন ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্বদা প্রস্তুত। যে যখন যা প্রশ্ন করত তিনি তখনই তার উত্তর দিতেন। ছেলেদের মঙ্গলের জন্যে তিনি সব সময়ে উন্মুখ ছিলেন।

তাঁর মধ্যে কোথাও একটুকু গর্ব ছিল না। তাঁর মুখ কোনসময়ে হাস্যমধুর, কোনসময়ে বা গাম্ভীর্য্যে অটল-প্রায়। সেই যে কথা আছে না 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি', হেডমাস্টার মশায় ছিলেন ঠিক সেই রকম। ছেলেরা কোন অন্যায় করলে তিনি তখন কঠোর শাস্তি দিতেন, আবার ছেলেরা কোন ভাল কাজ করলে তিনি তাদের প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন।

মাস কয়েক পরে শুনলুম তাঁর নাকি বিয়ে, এমন কি আমারই কাকার মেয়ে উষার সঙ্গে। উষাকে দেখতে ছিল ফুটফুটে ফুলের মত। দুজনকে চমৎকার মানায়। হারাণ চক্কোত্তি বললেন, অমন সোনার টুকরো মাস্টারকে সংসারী না হলে কি মানায় মুখুজ্জে মশাই ? আমরা থাকতে এমনি করে ভেসে ভেসে বেড়াবে ?

মুখুজ্জে মশাই বললেন, কিন্তু বিয়ে যে করতে চাইছে না।

চক্কোত্তি বললেন, ক্ষ্যাপা। বিয়ে কর বল্লেই বুঝি ছেলেরা রাজী হয় ? কলিকালে সব উল্টে গেছে। ওরা মুখে প্রথমে ওরকম বলে থাকে। তুমি দেখে নিও, ও বিয়ে করবে।

আরে দাদা, বিয়ে করতে কার না ইচ্ছে যায় ? দেখে নিও, চাটুজ্জের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবই দেব।

যথাসময়ে তাঁরা হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গিয়ে কথাটা পাড়লেন। কিন্তু হেডমাস্টার মশাই প্রথমে বিনীতভাবে তাঁদের প্রস্তাব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। অথচ গ্রামের লোকও কেউ সহজে ছাড়ল না। হেডমাস্টার মশাই বললেন, দেখুন আমার আত্মীয়স্বজন এখানে কেউ নেই। এখানে বাড়ী ঘর-দোরও নেই। আমি থাকি পরের বাড়ী। এখন আমার বিয়ে করা সাজে না।

রায়মশাই বললেন, বাড়ীর জন্যে ভাবতে হবে না মাস্টার মশাই। আমার একটা বাড়ী তো তো অমনি অমনি পড়ে রয়েছে। উঠবেন সেখানে গিয়ে।

হেডমাস্টার মশাই বল্লেন, আপনি আমায় নয় আজ থাকতে দিলেন, নয় ধরুন কাল থাকতে দিলেন ; কিন্তু চিরকাল কি আশ্রয় পাব ?

রায়মশাই বললেন, আশ্রয় দেওয়া কার সাধ্যি বলুন মাস্টার মশাই ? আপনি নয় এক কাজ করতে পারেন, মাসে মাসে কিছু ভাড়া দেবেন, তা হলেই হবে। যতদিন বাড়ী থাকবে, যতদিন আপনি এখানে থাকবেন ততদিন আপনি ওখানে বাস করবেন।

হেডমাস্টার মশাই বললেন, শুধু তাই নয়। আমার বিয়ে দেবেই বা কারা ?

রায়মশাই বললেন, তার জন্যে ভাববেন না। আমার বাড়ীর মেয়েরা গিয়ে আপনার বিয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনি কেবল সাত-পাক ঘুরে আসবেন, ব্যস্ ; মানে গরীবের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার দেওয়া।

অগত্যা মাস্টার মশাইকে বাধ্য হয়ে বিয়ের জন্য রাজী হতে হল। তিনি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে উষাকে দেখে এলেন। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁদের বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। তিনি উষাকে তাঁর নিজের হাতের নাম লেখা আংটি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে এলেন। বাড়ীর ভেতর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। মেয়েরা উলু দিল।

হেডমাস্টার মশাই আমাদের ইংরিজি পড়াতেন। প্রথম দিন ক্লাসে এলেন গম্ভীরভাবে। ইস্টিশানের সেই প্রশান্তবাবু আর নেই। কারুর মুখে কোন কথা নেই। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকু শোনা যায়। তিনি আমাদের একখানা বই নিয়ে বললেন, তোমাদের কি কি পদ্য পড়া হয়েছে ?

আমি বললুম, We are Seven, Lucy Gray, The blind boy ...।

তিনি বললেন, We are Seven হয়েছে ? কার লেখা বল দিকি ?

সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ-এর।

তিনি বললেন, একজন একজন করে উত্তর দাও। ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ সম্বন্ধে তোমরা কে কি জান ?

কারুর মুখে কোন কথা সরুল না। তিনি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আচ্ছা তুমি বল দিকি ?

আমি বললুম, তিনি প্রকৃতিকে ভালবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতির প্রাণ আছে।

তিনি বললেন, বেশ, বেশ। বল তো এই জায়গাটার মানে কি?

"How many you are, then" said I
"If they two are in Heaven?"
Quick was the little maid's reply
"O Master! We are seven."

অনেকেই তার কথার মানে করে গেল। তিনি তখন বললেন, কেউ আর কিছু জান?

কেউ আর উত্তর করতে পারল না। আমি বললুম, ঐ মানে আমরা শিখেছি।

তিনি মৃদু হাসলেন, বললেন, তোমাদের মানে ঠিকই হয়েছে। ওর আর একটা বিশেষ অর্থ আছে।

আমরা সকলে অবাক হয়ে তাঁর পানে তাকিয়ে রইলুম। তখন তিনি আমাদের বললেন, আত্মার অমরত্বের কথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে গেলুম। সে ব্যাখ্যা এখনও আমার বেশ মনে আছে। শেষে তিনি বললেন, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে?

আমি উঠে দাঁড়ালুম, তিনি বললেন, ওঃ, তোমার সঙ্গেই না সেদিন দেখা হয়েছিল? তোমার নাম নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় না?

বললুম, হ্যাঁ।

এর পর তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় খুব গভীর হয়ে উঠল। তিনি প্রায়ই আমায় ছুটির পর আপিস ঘরে নিয়ে কত সুন্দর সুন্দর বই পড়তে দিতেন। যে জায়গাটা বুঝতে পারতুম না, সেটা কত রকমে কতবার বুঝিয়ে দিতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'। এখন তোমরা শুধু পড়বে। পড়া মানে যে কেবল বইয়ের পড়া তা নয়। পড়া মানে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে পৃথিবীর চারদিক গভীরভাবে দেখা। জান, নিউটন কি করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন, কি করে গ্যাল্‌ভানি ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার করেছিলেন, স্নান করতে করতে আর্কিমেডিস্ হায়ড্রোস্ট্যাটিকসের কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন? আমাদের চারপাশে এমন অনেক জিনিস ঘটছে যা আমরা দেখছি শুধু সাদা চোখে, তার সেই পর্দা সরিয়ে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পাচ্ছি না। বড় হতে হলে চোখ চাই—সব জিনিস বুঝে দেখবার চোখ।

আমরা পরম বিস্ময়ে তাঁর কথা শুনতুম। তিনি বলতেন, দেশ তোমাদের কাছে কিছু চায়। তোমরা দেশের কাছে বলিপ্রদত্ত। দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। প্রতিজ্ঞা কর দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম।

যে মাস্টার মশায়ের বিয়ে করবার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, আশীর্বাদের পর তাঁর মধ্যে

নতুন উৎসাহ দেখা দিল। অজস্র পয়সা খরচ করে তিনি বিরাট আয়োজন করতে লাগলেন। সারা গ্রামে মহা ধুমধাম পড়ে গেল। আমাদের স্কুল চারদিনের জন্ত বন্ধ রইল। কলকাতা থেকে গায়ে হলুদের আগের দিন জিনিসপত্র কিনে আনা হল। কনের জন্তে পঁয়তাল্লিশ টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ী এল। বিখ্যাত জুয়েলারের দোকান থেকে গহনা এল। তারপর দূরান্তর কাঁপিয়ে সানাই বেজে উঠতে লাগল।

গায়ে হলুদ দেখে সকলে তো অবাক হয়ে গেল।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। পাশের গ্রামের হেমন্ত হাজরারা মোটর পাঠিয়ে দিয়েছে বর নিয়ে যাওয়া হবে বলে। সারাদিন ধরে ফুল দিয়ে সেই মোটর সাজান হচ্ছে। আমাদের মন আনন্দে ভরে গেছে। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে বসে আমরা তর্ক করছি বরযাত্রী বড় না কনেযাত্রী বড়—এমন সময়ে দেখি স্কুলের সেক্রেটারী মশাই একজন বেঁটেমত কালো ভদ্রলোককে নিয়ে উপস্থিত হলেন তিনি আমায় বললেন, তোর বাবাকে ডেকে দে দিকি।

তাঁর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর এবং চিন্তাযুক্ত। আমি বাবাকে ডেকে দিলুম। সেক্রেটারী বললেন, শুনে যান গোষ্ঠবাবু, এই ভদ্রলোক কি বলছেন।

বাবা বললেন, কি কি!

সেক্রেটারী বললেন, এদিকে আসুন। সতীশবাবুর মুখেই ব্যাপারটা শুনবেন।

সতীশবাবু ওরফে সেই কালোমত ভদ্রলোকটির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বাবা উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁদের কাছে গেলেন। তাঁরা ফিস্ ফিস্ করে কি সব বললেন। বাবার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। তখনই কাকাকে ডাকা হল। তিনি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বাড়ীর ভেতর মেয়েরা চীৎকার করে কেঁদে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে চারদিক নিরানন্দে ভরে গেল—সারা গৃহে বিষণ্ণতার ছায়া। সেক্রেটারী মশায় যাবার সময় বলে গেলেন, একেই বলে কলিকাল। নইলে বলুন, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারে না? আজকাল মানুষ চেনা দায়।

ইতিমধ্যে পাড়ার এ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাবের মেম্বররা এসে দারুণ হৈ চৈ বাধিয়ে দিল। বলল, শাস্তি চাই। আমরা কি সব মরে গেছি? গাঁয়ের মধ্যে একজন এসে যে এই কেলেঙ্কারি করবে তা আমরা কখনই সহ্য করব না। আজ ওর হাড় গুঁড়িয়েই ছেড়ে দেবে।

সেক্রেটারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, না না, তোমাদের অত কিছু করতে হবে না ভদ্রলোকের যা অপমান হবার খুবই হয়েছে। গায়ে যদি মানুষের চামড়া থাকে তো বুঝতে পারবে। কালই সমস্ত কাজ বুঝে দূর করে দেব গাঁ থেকে। তোমরা এই গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা কর।

তাঁরা সকলে চলে গেলে শুনলুম, হেডমাস্টারকে নিয়েই নাকি এই গণ্ডগোলের সৃষ্টি। তিনি নাকি বিধবার ছেলে। ঐ সতীশবাবু হচ্ছেন তাঁর কাকা। আমার কাকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এ সব ভাগ্য। তা নইলে অমন সোনার টুকরো ছেলের কিনা এই বিচ্ছিরি জন্ম?

উষার বহু কষ্টে বিয়ে হল সেই গোধূলি লগ্নেই এই গাঁয়ের মতি বাঁড়ুয্যের ছেলে কিরণের সঙ্গে। কিরণ তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। যাই হোক, বিয়েতে আমি আনন্দ পাই নি একটুও, এমন কি বিয়েও কখনও এমন বিষণ্ণতার মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর তো আমি শুনি নি। কোন প্রকারে সাত পাক ঘুরে মালা বদল করা আর নিঃশব্দে খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ করা।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা। চুপ করে বাড়ী বসে থাকতে আর ভাল লাগল না। আস্তে আস্তে ইস্টিশানের ধারে বেড়াতে গেলুম।

সন্ধ্যা হয়েছে। দূরের জিনিস ভাল রকম দেখা যায় না। একটা নারকেল গাছের মাথাটা কাঁপছে, তার পাশ দিয়ে উজ্জ্বল শুকতারাটি দেখা গেল। ইস্টিশানে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। গাড়ী আসছে। স্ন্যাগ ডাউন করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিন হলে হয়তো ছুটে গিয়ে লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতুম···সেটা হয়তো খটাখট খটাখট করে চলে যেত; কিন্তু আজ আমার পা যেন উঠতে চাইছে না। ধীরে ধীরে আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে চলেছি এমন সময়ে দেখি হেডমাস্টার মশাই ঠিক আমার সামনে। তাঁর হাতে একটা সুট্‌কেশ, পেছনে চাকরের মাথায় অন্যান্য জিনিসপত্র। তিনি আমার কাছে এলেন, বললেন, এখানে কি করছ নির্মল? বাড়ী যাও, ঠাণ্ডা লাগবে।

তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না। মনে হল এবার বুঝি তিনি কেঁদে ফেলবেন। আমি নিঃশব্দে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকালুম। তিনি আমার পিঠটা বার দুয়েক চাপড়ে সহাস্যে বললেন, বেশ...বেশ বেশ।

আমি অতিকষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম। তাঁর চোখ চকচক করছে যেন।

নিকটেই ট্রেনের শব্দ শোনা গেল। তিনি ক্ষিপ্র পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। যাবার সময় বললেন, বেশীক্ষণ আর এখানে থেকো না, বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছে।

মাত্র মিনিট কয়েক ট্রেনখানা থামল। তার মধ্যেই ওঠানামা শেষ হয়ে গেল। আবার সেই দুরন্ত ট্রেন হু হু করে ছুটে চলল। মাথার ওপর দিয়ে ডানার ঝটাপটি করতে করতে একটা পেঁচা উড়ে গেল। আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে কয়েকবিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল।

ভিয়োলের বালা

মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন।

গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে, এখনও ছাড়বার ঘণ্টা পড়ে নি, এ নিয়ে গাড়ীর লোকজনের মধ্যে নানা রকম মতামত চলেছে।

মশাই বড়গেছে নেমে যাব প্রায় পাঁচ মাইল। চারটে বাজে—এখনও গাড়ী ছাড়বার

নামটি নেই—কখন বাড়ী পৌঁছব ভাবুন তো ?

—এদের কাণ্ডই এই রকম—আসুন না সবাই মিলে একটু কাগজে লেখালেখি করি। সেদিন বড়গেছে ইস্টিশানে ছুটো ট্রেনের লোক এক ট্রেনে পুরলে—দাঁড়াবার পর্য্যন্ত জায়গা নেই—তাও কদমতলায় এল এক ঘণ্টা লেট্।

—ঐ আপিসের সময়টা একটু টাইমমত যায়—তার পর সব গাড়ীরই সমান দশা—

—আঃ, কি ভুল যে করেছি মশাই এই লাইনে বাড়ী করে। রিটায়ার করলাম, কোথায় বাড়ী করি, কোথায় বাড়ী করি, আমার শ্বশুর বললেন, তাঁর গ্রামে বাড়ী করতে—

—সে কোথায় মশাই ?

—এই প্রসাদপুর. যেখানে প্রসাদপুরের ঠাকুর আছেন, মেয়েদের ছেলেপুলে না হলে মাদুলি নিয়ে আসে, হাওড়া ময়দান থেকে পঁচিশ মাইল, বেশী না। ভাবলাম কলকাতার কাছে, সস্তাগণ্ডা হবে, পাড়াগাঁ জায়গা শ্বশুরবাড়ীর সবাই রয়েছেন—তখন কি মশাই জানি ? তিন-চার হাজার টাকা খরচ করে বাড়ী করলুম, দেখছি যেমনি ম্যালেরিয়া তেমনি যাতায়াতের কষ্ট, পঁচিশ মাইল আসতে পঁচিশ খেলা খেলছে। এই স্টুপিড গাড়ীগুলো—

—পঁচিশ কি স্যর, তিন পঁচিশং পঁচাত্তর খেলা বলুন! আমারও পৈতৃক বাড়ী ঐ প্রসাদ-পুরের কাছে নরোত্তমপুর। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, কান্না পায় এক-এক সময়—

আমি যাচ্ছিলাম চাঁপাডাঙ্গা। লাইনের শেষ স্টেশন। এদের কথাবার্ত্তা শুনে ভয় হলো। স্টেশন থেকে চার মাইল দূরে দামোদর নদীর এপারেই আমার এক মাসীমা থাকেন, মেসো-মশায় নাকি মৃত্যুশয্যায়, তাই চিঠি পেয়ে মাসীমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সেখানে চলেছি। যে রকম এরা বলছে, তাতে কখন সেখানে পৌঁছব কে জানে ?

কামরার এক কোণের বেঞ্চিতে একটি যুবক ও তার সঙ্গে একটি সতেরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। মেয়েটির পরনে সিল্কের ছাপা-শাড়ী, পায়ে মাদ্রাজী চটি, মাথায় চুলগুলো যেন একটু হেলাগোছা ভাবে বাঁধা—সে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। যুবকটি মাঝে মাঝে সকলের কথাবার্ত্তা শুনছে, মাঝে মাঝে বাইরের দিকে চেয়ে ধূমপান করছে।

গাড়ী ছেড়ে তিন-চারটে স্টেশন এল। পান, পটল, আলু, মাছের পুঁটুলি হাতে ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ক্রমে নেমে যাচ্ছে। বাকি দল এখনও সামনাসামনি বেঞ্চিতে মুখোমুখি বসে কোঁচার কাপড় মেলে তাস খেলছে। মাঝে মাঝে ওদের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে এঞ্জিনের ঝকঝক শব্দ ভেদ করে—টু হার্টস্। নো ট্রাম্প! থ্রি স্পেডস্!

যখন জাঙ্গিপাড়া গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে তখন বেলা যায়-যায়। জাঙ্গিপাড়া স্টেশনের সামনে বড় দীঘিটার ধারের তালগাছগুলোর গায়ে রাঙা রোদ।

শেষ ডেলি প্যাসেঞ্জারটি জাঙ্গিপাড়ায় নেমে যাওয়াতে গাড়ী খালি হয়ে গেল—একেবারে খালি নয়, কারণ রইলাম কেবল আমি। কোণের বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেখি সেই যুবক ও তার সঙ্গিনী মেয়েটিও রয়েছে।

এতক্ষণ ডেলি প্যাসেঞ্জারদের গল্পগুজব শুনতে শুনতে আসছিলাম বেশ, এখন তারা সবাই নেমে গিয়েছে, আমি প্রায় একাই—এখন স্বভাবতই যুবক ও মেয়েটির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হলো। মেয়েটি বিবাহিতা নয়। সে তো বেশ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবে ওদের সম্বন্ধ কি ভাইবোন? কিংবা মামা-ভাগ্নী? মেয়েটি বেশ সুন্দরী। ছোকরা মেয়েটিকে ভুলিয়ে নিয়ে পালাচ্ছে না তো? আশ্চর্য্য নয়। আজকালকার ছেলেছোকরাদের কাণ্ড তো!

যাকগে, আমার সে-সব ভাবনার দরকার কি? নিজের কি হবে তার নেই ঠিক। সন্ধ্যা তো হয়ে এলো। মাসীমাদের গ্রাম স্টেশন থেকে দুই-তিন মাইল, পথও সুগম নয়। ট্রেন খাঁটপুর এসে দাঁড়াল, জাঙ্গিপাড়ার পরের স্টেশন। তারপর ছাড়ল। বড় বড় ফাঁকা রাঢ়দেশের মাঠে সন্ধ্যা নেমে আসছে, লাইনের ধারে কচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষাগাঁ। লাউলতা চালে উঠেছে। একটা ছোট্ট গ্রাম্য হাট ভেঙে লোকজন ধামা-চেঙারি মাথায় ফিরছে—আবার মাঠ, জামগাছের মাথায় কালো কালো বাদুড় উড়ে এসে বসছে, খালের পারে মশাল জেলে জেলেরা মাছ ধরবার চেষ্টা করছে।

আবার সহযাত্রীদের দিকে চাইলাম।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছে। কিন্তু দুজনেই জানালার বাইরে চেয়ে রয়েছে। একটা কথাও শুনলাম না ওদের মধ্যে।

ছেলেটা মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পালাতে দু-জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে! বেশ সুন্দর চেহারা দুজনেরই। না, মামাভাগ্নী বা ভাইবোন নয়। নিয়ে পালানোই ঠিক। কিন্তু এদিকে কোথায় যাবে ওরা? মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন তো আর দুটো স্টেশন গিয়ে রাঢ়দেশের অজ পাড়াগাঁ আর দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে শেষ হয়েছে। এ দুটি শৌখীন পোশাক-পরা তরুণ-তরুণীর পক্ষে সে অঞ্চল নিতান্ত খাপছাড়া ও অনুপযোগী।

যাক গে, আমার কেন ও-সব ভাবনা?

পিয়ারাপাড়া স্টেশনের সিগন্যালের সবুজ আলো দেখা দিয়েছে। সামনে ভয়ানক অন্ধকার রাত্রি, নিতান্ত দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম। রাঢ় দেশের মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা, সঙ্গে ব্যাগে কিছু টাকাকড়ি আছে, শুনেছি হুগলী জেলার এদিকে চুরি-ডাকাতি নাকি অত্যন্ত বেশী। মেসোমশায়ের চিকিৎসার জন্যে মাসীমা কিছু টাকার দরকার বলে লিখেছিলেন। মা-ই টাকাটা দিয়েছে। ধনে প্রাণে না মারা পড়ি শেষকালে!

হঠাৎ আমার সহযাত্রী যুবকটি আমার দিকে চেয়ে বললে—চাঁপাডাঙা ইস্টিশান থেকে নদীটা কত দূরে বলতে পারেন স্যার?

—নদী প্রায় আধ মাইল।

—নৌকা পাওয়া যায় খেয়ার?

—এখন নদীতে জল কম। তবে নৌকাও বোধ হয় আছে।

যুবকটি আর কোন কথা না বলে আবার বাইরের দিকে চেয়ে রইল। আমার অত্যন্ত

কৌতূহল হলো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখি না ওরা কোথায় যাবে। কিন্তু ওদের দিক থেকে কথাবার্তার ভরসা না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

পিয়াসাড়া স্টেশনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। বিশেষ কেউ নামল উঠল না, ছোট স্টেশন। যুবকটি আমায় জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, স্যার, ওপারে গাড়ী পাওয়া যায়?

আমি ওর দিকে চেয়ে বললাম—কি গাড়ীর কথা বলছেন?

—এই যে-কোন গাড়ী—মোটর-বাস কি ঘোড়ার গাড়ী।

লোকটা বলে কি! এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের জন্যে মোটরের বন্দোবস্ত করে রাখবে কে বুঝতে পারলাম না। বললাম—না মশায়, যতদূর জানি ও-সব পাবেন না সেখানে। পাড়াগাঁ জায়গা, রাস্তা-ঘাট তো নেই।

এবারও ওদের গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অতি কষ্টে চেপে গেলাম।

কিন্তু যুবকটি পরমুহূর্তেই আমার সে কৌতূহল মেটাবার পথ পরিষ্কার করে দিলে। জিজ্ঞেস করলে—ওখান থেকে তিরোল কতদূর হবে জানেন স্যার?

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম।

—তিরোল যাবেন নাকি? সে তো অনেক দূর বলেই শুনেছি। আমিও এদেশে প্রায় নতুন, ঠিক বলতে পারব না—তবে পাঁচ-ছ ক্রোশের কম নয়।

যুবকের মুখে উদ্বেগ ও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমার দিকে একটু এগিয়ে বসে বললে—যদি কিছু মনে না করেন স্যার, একটা কথা বলব?

তবে ইলোপমেণ্টই হবে। যা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু তিরোলে কেন? সেখানে তো লোকে যায় অন্য উদ্দেশ্যে।

বললুম—হ্যাঁ, বলুন না—বলুন।

যুবকটি মেয়েটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বললে—ওকেই নিয়ে যাচ্ছি তিরোলে। পাগলা কালীর বালা আনতে ওরই জন্যে—আমার বোন, কাল অমাবস্যা আছে, কাল বালা পরা নিয়ম—

বাধা দিয়ে বললাম—মেয়েটি কি—

—চুপ করে আছে এখন প্রায় দু-মাস, কিন্তু যখন খেপে ওঠে তখন ভীষণ হয়ে ওঠে, সামলে রাখা কঠিন। এত রাত যে হবে বুঝতে পারি নি, সবাই বলেছিল স্টেশন থেকে বেশী দূর নয়—

—আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

—অনেক দূর থেকে স্যার, ধানবাদের কাছে সয়লাডি কলিয়ারি—এ-দিকের খবর কিছুই জানি নে—লোক যেমন বলেছে তেমনি শুনেছি—কি করি এখন? ঐ মেয়ে সঙ্গে, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, বড় বিপদে পড়ে গেলাম যে!

চুপ করে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

ছোকরা বিপদে পড়ে গিয়েছে বেশ। ওর কথা শোনার পর থেকে মেয়েটির দিকে চেয়ে

দেখছি, চমৎকার দেখতে মেয়েটি। ধপধপে ফর্সা রং, বড় বড় চোখ, ঠোঁটের দুটি প্রান্ত উপরদিকে কেমন একটু বাঁকান, তাতে মুখশ্রী আরও কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে! অমন সুন্দরী মেয়ে নিয়ে এই বিদেশে রাত্রিকালে মাঠের মধ্য দিয়ে পাঁচ-ছ ক্রোশ রাস্তা গাড়ীভাড়া করে গেলেও বিপদ কাটল বলে মনে করবার কারণ নেই।

এক চাঁপাডাঙ্গাতে কোথাও থাকা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অপরিচিত লোকদের, বিশেষ করে যখন শুনবে যে মেয়েটি পাগল—তখন ওদের রাত্রে আশ্রয় দেবার মত উদারতা খুব কম মানুষেরই হবে।

যুবকটিকে বললাম—চাঁপাডাঙাতে কোন লোকের বাড়ী আশ্রয় নেবেন রাত্রে—তার চেষ্টা দেখব?

—না স্যার, ওকে অপরিচিত লোকের মধ্যে রাখতে পারব না, তা হলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে উঠবে। আমি ছাড়া আর কারও কাছে ও খাবে না পর্য্যন্ত। যে-কোনও তুচ্ছ ব্যাপারে ও ভীষণ খেপে উঠতে পারে—সে-ভরসা করি নে স্যার—ওর সে মূর্ত্তি দেখলে আমি ওর দাদা, আমি পর্য্যন্ত দস্তুরমত ভয় পাই—সে না-দেখাই ভাল। ও অন্য মানুষ হয়ে যায় একেবারে—

চাঁপাডাঙা স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল।

রাত্রির অন্ধকার এখনও ঘন হয়ে নামে নি, তবে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি, অনুমান করা যায়, কি ধরণের হবে আর একটু পরে।

চাঁপাডাঙা স্টেশনের কাছে লোকের বাড়ীঘর বেশী নেই। খানকতক বিচুলি-ছাওয়া ঘর, অধিকাংশ পান-বিড়ি, মুড়িমুড়কি কিংবা মুদিখানার দোকান। একটা সাইকেল-সারানোর দোকান। একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা, ডাক্তারখানার এক পাশে স্থানীয় ডাকঘর। একটা পুকুর, পুকুরের ওপারে দু-একখানা চাষাভুষো লোকের ঘর।

আমরা টিকিট দিয়ে সবাই স্টেশনের বাইরে এলাম। সামনেই দু-তিন-খানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ী দেখে আমার দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল, কিন্তু যখন তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম নদীর ধার পর্য্যন্তই তারা যায়, নদীর পার হবার উপায় নেই গরুর গাড়ীর—তখন আমি আমার সঙ্গীটিকে বললুম—কি করবেন, নয়ত ইস্টিশানেই থাকবেন রাতে?

—না স্যার, কাল অমাবস্যা, আমায় তিরোল পৌছতেই হবে কাল। এখানে থাকলে কাজ হবে না। আপনি আর একটু কষ্ট করুন, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে যখন পেয়েছি, ছাড়তে পারব না। আপনি না দেখলে কোথায় যাই বলুন!

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদিকে মেসোমশায়ের অসুখ, সেখানে পয়সা-কড়ি নিয়ে যত শীগ্‌গির হয় পৌছনো দরকার। এদিকে এই বিপন্ন যুবক ও তার বিকৃতমস্তিষ্কা তরুণী ভগিনী। ছেড়েই বা এদের দিই কি করে এই অন্ধকার রাত্রে? তা হয় না। সঙ্গে যেতেই হবে, মেসোমশায়ের অদৃষ্টে যা ঘটুক।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা কিন্তু ভরসা দিল। ত্রিবোলের বাঁধা রাস্তা, নদী পেরিয়ে গাড়ী পাওয়া যায়, পালকি পাওয়া যায় একটু খোঁজ করলেই, হরদম লোক যাচ্ছে সেখানে, ভয়ভীত কিছু নেই—নদীর খেয়া থেকে বড় জোর দু-ঘণ্টার রাস্তা।

নদীর ধার পর্য্যন্ত একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ীতে আমরা তিন জন এলাম। সারা ট্রেনে মেয়েটি কথা বলে নি, অন্ততঃ আমি শুনি নি। ছইয়ের মধ্যে বসে সে প্রথম কথা কইল। যুবকটির দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমার শীত করছে—তোমার শীত করছে না?

সুন্দর গলার স্বর—যেন সেতারে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি সহানুভূতির চোখে তরুণীর দিকে চাইলাম, আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি কি অদৃষ্ট নিয়েই জন্মেছে!

বললাম—শীত করতে পারে, নদীর হাওয়া বইছে—সঙ্গে কিছু আছে গায়ে দেবার?

যুবকটি বললে—না, গায়ে দেবার কিছু ধরুন এ-বোশেখ মাসে তো আনি নি—বিছানার চাদরখানা পেতে গাড়ীতে বসে ছিলায—ওখানা গায়ে দে—

মেয়েটি আবার বললে—কি নদী দাদা?

বেশ স্বাভাবিক সুরে সহজ ধরনের কথাবার্তা।

আমিই বললাম—দামোদর।

মেয়েটি এবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বল্লভপুরে যে-দামোদর? আমি জানি, খুব বড় নদী—না দাদা? ছেলেবেলায় দেখেছি—

যুবকটি আমায় বললে—দামোদরের ধারে বল্লভপুর বলে গ্রাম, বর্দ্ধমান জেলায়, সেখানে আমার মামার বাড়ী কি না? পূর্ণিমা—মানে আমার এই বোন সেখানে দু-বার গিয়েছিল ছেলেবেলায়—তার পর—

খেয়ায় নদী পার হবার সময় পূর্ণিমা ওর দাদাকে বললে—ভয় করছে দাদা—ডুবে যাবে না তো? ও দাদা—নৌকো দুলছে যে—

—ডুবে যাবি কেন? চুপ করে বসে থাক—দুলছে তাই কি?

ওপারে গিয়ে আমরা দেখি গাড়ীঘোড়া তো দূরের কথা, একটা মানুষ পর্য্যন্ত নেই। খেয়ার মাঝি লোকটা ভাল, সে আমাদের অবস্থা দেখে বললে—দাঁড়ান বাবুমশাইরা, শাঁখকুন্ডের গোয়ালাপাড়ায় গরুর গাড়ী পাওয়া যায়—আমি ডেকে দিচ্ছি—আপনারা নৌকোতেই বসুন—

পূর্ণিমা বললে—দাদা, কিছু খাবে না? খাবার রয়েছে তো—

পরে আমার দিকে চেয়ে বললে—আপনিও খান, খাবার অনেক আছে—

ওর দাদা বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দে না, ওঁকে দে—তুইও খা—কিছু তো খাস নি—পৌঁছতে কত রাত হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা একটা ছোট্ট পুঁটুলি খুলে আমাদের সবাইকে লুচি, পটলভাজা, আলুচচ্চড়ি ও মিহিদানা পরিবেশন করে দিলে।

বললে—দেখ তো দাদা, মিহিদানা খারাপ হয়ে যায় নি?

আমি বললাম—এ কোথাকার মিহিদানা ?

পূর্ণিমা বললে—বর্দ্ধমান থেকে কেনা আসবার সময়। খারাপ হয় নি ? দেখুন তো মুখে দিয়ে—

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, তখন ভাবি নি এমন একটি সন্ধ্যার কথা, ভাবি নি যে দামোদর নদীর উপর নৌকাতে বসে একটি অপরিচিত যুবক ও একটি অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে খাবার খাব এভাবে। কেমন একটি শান্ত পরিবেশ, যেন বাড়ীতে মা-বোনের মধ্যেই আছি—বড় ভাল লাগছিল এদের।

কিন্তু পরবর্ত্তী মর্ম্মন্তুদ অভিজ্ঞতার পটভূমিতে ফেলে আজ যখন আবার সেই সন্ধ্যাটির কথা ও আমার সেই তরুণ সঙ্গীদের কথা এখন ভাবি—তখন মনে হয়, সেদিন তাদের সঙ্গে না-দেখা হওয়াই ভাল ছিল। একটা দুঃখজনক করুণ স্মৃতির হাত থেকে বাঁচা যেত তা'হলে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, এমন সময় গরুর গাড়ী নিয়ে খেয়ার মাঝি ঘাটের ধারে দামোদরের বিস্তৃত বালির চরে এসে হাজির হ'ল। তিরোল যাবার ভাড়া ধার্য্য করে আমরা গাড়ীতে উঠে পড়লাম, খেয়ার মাঝিকে তাঁর পরিশ্রমের জন্তে কিছু বকশিশ দেওয়াও বাদ গেল না।

গাড়োয়ান বললে—বাবু, ভুল হয়ে গিয়েছে—বাড়ী থেকে তামাকের টিনটা নেওয়া হয় নি—গাড়ী গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে যাই—বেশী দেরী হবে না বাবু—

শ্যামকুণ্ড গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকল। আমবাগান, বাঁশবন, লোকের বাড়ীঘরের পেছন দিয়ে রাস্তা; ঘরের দাওয়ায় মেয়েরা রান্না করছে, তার পর আবার মাঠ, আখের ক্ষেত, পাটক্ষেত, মাঠের মধ্যে দিয়ে চওড়া সাদা রাস্তা আমাদের সামনে বহুদূর চলে গিয়েছে। রাঢ়দেশের মাঠ, বনজঙ্গল খুব কম, এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে দু-চারটে কলাগাছ ছাড়া।

পূর্ণিমা আমায় বললে—আপনার মাসীমার বাড়ী এখান থেকে কত দূর হবে ?

—সে তো এদিকে নয়—দামোদরের ও-পারে। স্টেশনের পূবদিকে প্রায় দু ক্রোশ দূরে—

—আপনাকে আমরা কষ্ট দিলাম তো !

—কি আর কষ্ট ?... আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে কাল আপনাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে মাসীমার বাড়ী গেলেই হবে—

পূর্ণিমা মুখে আঁচল দিয়ে ছেলেমানুষি হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে হঠাৎ। বললে—কি আর কষ্ট ? না ? আমাদের কাজ শেষ হলে আমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে—হি-হি-হি—

ওর হাসির অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বাস ও সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করলে, এমন হাসি কোন দিন আমি হাসতে দেখি নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এ অপ্রকৃতিস্থের হাসি। স্থিরমস্তিষ্ক মেয়ে হলে এ ধরনের হাসত না, অন্ততঃ এ-জায়গায় ও এ-অবস্থায়।

হঠাৎ ওর দাদা অন্ধকারের মধ্যে আমার গা টিপলে।

ব্যাপার কি ? আমার ভয় হ'ল। মেয়েটি ভাল অবস্থায় আছে তো ? আমি কোন

কথা না বলে চুপ করে রইলাম। কি জানি মেয়েটির কেমন মেজাজ, কোন্ কথা তার মনে কি ভাবে সাড়া জাগাবে যখন জানি না তখন একদম কথা না বলাই নিরাপদ।

মনে মনে ভাবলাম, এমন সুন্দর মেয়ে কি খারাপ অদৃষ্ট নিয়েই এসেছিল পৃথিবীতে যে তার অমন সুন্দর প্রাণভরা হাসি, তাতে মনে আনন্দ না এনে আনে ভয় ?

গাড়ীতে কিছুক্ষণ কেউ কথা বললে না—সবাই চুপচাপ। মাঠ ভেঙে গরুর গাড়ী আপন মনে চলছে, বোধ হয় আমার একটু তন্দ্রাবেশ হয়ে থাকবে, হঠাৎ কেন যেন ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ীর ছইয়ের মধ্যে অন্ধকার, আমার মনে হ'ল সেই অন্ধকারের মধ্যে তরুণী এবং তার দাদার মধ্যে যেন একটা হাতাহাতি ব্যাপার চলছে।

তরুণীর মুখের কষ্টকর 'আঃ' শব্দ আমার কানে যেতেই আমি পেছন ফিরে চাইলাম ওদের দিকে, কারণ আমি বসেছি ছইয়ের সামনে, আর ওরা বসেছে গাড়ীর পেছন দিকটায়, সেদিকে বেশী অন্ধকার, কারণ ছইয়ের ও-দিকটা চাঁচের পর্দা আঁটা।

আমি কোন কথা বলবার পূর্বেই যুবকটি চাপা উদ্বেগের সুরে বললে—ধরুন, ওকে ধরুন, ও গাড়ী থেকে নেমে পড়তে চাইছে—

চাপা সুরে বলবার কারণ বোধ হয় গাড়ীর গাড়োয়ানের কানে কথাটা না যায়।

আমি হতভম্ব হয়ে মেয়েটির গায়ে কি করে হাত দেব ভাবছি, এমন সময় যুবকটি বেদনার্ত্ত কণ্ঠে 'উহু-হু-হু' বলে উঠল। পরক্ষণেই বললে—কামড়ে দিয়েছে হাত—ধরবেন না, ধরবেন না—

ততক্ষণ গাড়োয়ান গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি বাবু? কি হয়েছে ?

গাড়োয়ানের কথার উত্তর দেবার সময় বা সুযোগ তখন আমার নেই। কারণ মেয়েটি আমায় ঠেলে বাইরের দিকে আসতে চাইছে অন্ধকারের মধ্যে।

ওর দাদা বললে—ওর চুল ধরুন—গায়ে হাত দেবেন না, কামড়ে দেবে—

কিন্তু আমি কোন কিছু বাধা দেবার পূর্বেই মেয়েটি আমাকে ঠেলে গরুর গাড়ীর সামনের দিকে গিয়ে পৌঁছল এবং গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পড়ল।

হতভম্ব গাড়োয়ান গরুর কাঁধ থেকে জোয়াল নাবাবার পূর্বেই আমি ও মেয়েটির দাদা দু-জনেই গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

মাঠের মধ্যে অন্ধকার তত নিবিড় নয়, কিন্তু মেয়েটির কোন পাত্তা কোন দিকে দেখা গেল না।

আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে এবং বোধ হয় মেয়েটির দাদারও—

এই সময়ে কিন্তু আমাদের গাড়োয়ান যথেষ্ট সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিলে। সে ততক্ষণে ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছে। তিরোলে যারা যায়, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ যে অপ্রকৃতিস্থ থাকবেই, এ তথ্য তাদের অজানা নয়, তবে আমাদের তিনজনের মধ্যে কে সেই লোক, এটাই বোধ হয় সে এতক্ষণে ঠাওর করতে পারে নি।

গাড়োয়ান তাড়াতাড়ি বললে—বাবু শীগ্‌গির চলুন, কাছেই পাতিহালের খাল—সেদিকে উনি না যান, টিপকলের আলোটা জ্বালুন—

এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছি আমরা, যে, যুবকের পকেটে টর্চ রয়েছে, সে-কথা দুজনের কারও মনে নেই।

সবাই ছুটলাম গাড়োয়ানের পিছু পিছু। প্রায় দু-রসি আন্দাজ পথ ছুটে যাবার পরে একটা সরু খালের ধারে পৌঁছলাম, তার দু-পাড়ে নিবিড় কষার ঝাড়। তন্ন তন্ন করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে খুঁজে, চিৎকার করে ডাকাডাকি করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

সব ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল যে এতক্ষণে ভেবে দেখবারও অবকাশ পাওয়া যায় নি জিনিসটার গুরুত্ব কতটা বা এ থেকে কত কি ঘটতে পারে!

পূর্ণিমার দাদা প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে বললে—আর কোন দিকে কোন জলা আছে—হ্যাঁ গাড়োয়ান?

—না, বাবু, কাছেপিঠে আর জলা নেই তবে খালের ধারে আপনাদের মধ্যে এক জন দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা বাকি দু-জন অন্য দিকে যাই—

আমিই খালের ধারে রইলাম, কারণ যুবকটি একলা অন্ধকারে, যতদূর বুঝলাম, দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয়।

ওরা তো চলে গেল অন্য দিকে। আমার মুশকিল এই যে সঙ্গে একটা দেশলাই পর্যন্ত নেই। এই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রের অন্ধকারে একা মাঠের মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কি জানি?

সেখানে কতক্ষণ ছিলাম জানি না, ঘণ্টাখানেক বোধ হয় হবে, তার বেশীও হয়ত! তারপর খালের ধার ছেড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলাম। এদের ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছি নে।

এমন সময় দূরে আলো দেখা গেল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের গলাটা শুনলাম—বাবু, বাবু—

আমার সাড়া পেয়ে ওরা আমার কাছে এল। গাড়োয়ানের সঙ্গে কয়েকটি গ্রাম্য লোক—ওদের হাতে একটা হারিকেন লণ্ঠন।

ব্যস্তভাবে বললাম—কি হ'ল? পাওয়া গিয়েছে?

যার হাতে লণ্ঠন ছিল, সে-লোকটা বললে—চলেন বাবু। সব রয়েছেন তেনারা আমার বাড়ীতে বসে। আমি বাবু গোয়ালঘরে গরুদের জাব কেটে দিতে ঢুকেছি সন্ধের একটু পরেই—দেখি গোয়ালঘরের এক পাশে একটি পরমাসুন্দরী ইস্ত্রিলোক। তখন আমি তো চমকে উঠেছি বাবু! ইকি! তারপর বাড়ীর লোক এসে পড়ল। তারপর এনারা গিয়ে পড়লেন। তাঁদের আমরা বাড়ীতে বসিয়ে আপনার খোঁজে বেরুলাম। অন্ধকারের মধ্যে ভদ্দরলোকের ছেলের একি কষ্ট! চলুন গরীবের বাড়ী। দুটো ডাল-ভাত রান্না করে খান।

দিদিঠাকরুণের মাথাটা তাল যদি হ'ত একটু তো দিদিঠাকরুণ একেবারে লক্ষীর পিরতিমে। আমাদের বাড়ীতে তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে—আপনারা সবাই ব্রাহ্মণ শোনলাম—কতকালের ভাগ্যি আমাদের। দুটো ভাত সেবা করে আজ রাতে শুয়ে থাকুন—কাল ভোরে আমি আমার গাড়ীতে তিরোল পৌঁছে দেব আপনাদের। অমন হয়।

গ্রামের মধ্যে লোকটার বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম।

বাড়ীটার কথা এখানে একটু ভাল ক'রে বর্ণনা করা দরকার। কারণ এর পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে এই বাড়ীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এক-এক বার ভাবি সে-রাত্রে যদি সেখানে থাকবার প্রস্তাবে রাজি না হয়ে ওদের নিয়ে সোজাসুজি তিরোল চলে যেতুম!

আসলে নিয়তি। নিয়তি যাকে যেখানে টানে। তিরোল গেলেই কি নিয়তির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যেত? ভুল।

বাড়ীটা ও-দেশের চলন-মত মাটির দেওয়াল, বিচুলিতে ছাওয়া। বাইরে বেশ বড় একখানা বৈঠকখানা, তার দুই কামরা মাটির দেওয়ালের ব্যবধান। সামনে খুব বড় মাটির দাওয়া, তার সামনে উঠান—উঠানের পশ্চিম ধারে ছোট একটা ঘাট-বাঁধানো পুকুর। বৈঠকখানার দুটো কামরার মধ্যে যেটা ছোট, সেটার পেছনের দোর খুলে কিন্তু বাইরের উঠানে আসা যায় না—সেটি অন্তঃপুরে যাতায়াতের পথ।

গৃহস্বামীর নাম রসিকলাল ধাড়া জাতিতে কৈবর্ত্ত। সুতরাং তাদের রাঁধা ভাত আমাদের চলবে না। রসিকলালের একান্ত অনুরোধে আমরা রান্না করতে রাজি হলাম। জিনিসপত্র, দুধ, শাকসব্জী ছ'জনের উপযোগী এসে পড়ল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রান্না করলে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা আবার সেই আগেকার শান্ত, স্বাভাবিক মূর্ত্তি ধরেছে। তার কথাবার্ত্তা, রান্নার কৌশল, সহজ ব্যবহার দেখে কেউ বলতেও পারবে না কিছুক্ষণ আগে এ গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল।

খেতে বসবার কিছু আগে পূর্ণিমা যেখানে রাঁধছে, সেখানে উঁকি মেরে দেখি গ্রামের অনেক মেয়ে ওকে দেখতে এসেছে, নানারকম কথাবার্ত্তা জিগ্যেস করছে, বুঝলাম পূর্ণিমার কাহিনী গ্রামময় রটে গিয়েছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে, পূর্ণিমা এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল খেতে।

আমি বল্লাম- সকলের সঙ্গে আলাপ হ'ল পূর্ণিমা?

পূর্ণিমা সলজ্জ হেসে বললে—ওরা সব এসেছে কেন জানেন, না কি আমায় সবাই দেখতে এসেছে। আমি বললাম, আমি ভাই আপনাদের মতই মেয়ে, দুখানা হাত, দুখানা পা, আমায় দেখবার কি আছে?

ওর দাদা বললে—আর কি কথা হ'ল?

—আর কিছু না। আমাদের বাড়ী কোথায়, আমার বয়স কত—এই জিগ্যেস করছিল।

তার পর বেশ দিব্যি সহজভাবেই বললে—আর বলছিল তোমার বিয়ে হয় নি? আমি

বললাম, এ-বছর আমার বিয়ে দেবেন বলেছেন বাবা!

বলেই সে আমাদের পাতে ডাল না কি পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে।

আমি তো অবাক, ওর দাদার দিকে চাইতে সে বেচারী আমায় চোখ টিপলে। পাগল হোক, উন্মাদ হোক, মেয়েদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? বড় কষ্ট হ'ল ভেবে, অভাগীর ও-সাধ এ-জীবনে পূর্ণ হবার নয়।

কিন্তু এ ধরনের দু'একটা বেফাঁস কথা ছাড়া পুর্ণিমার অন্য সব কথাবার্তা এমন স্বাভাবিক যে, কেউ তার মধ্যে এতটুকু খুঁত ধরতে পারবে না। ওর গলার সুরটা ভারি মিষ্টি—খুব কম মেয়ের গলায় এমন মিষ্টি সুর শুনেছি। এমন একটি সুন্দর চালচলন, নিজের দেহটা বহন করে নিয়ে বেড়ানোর সুশ্রী ধরন আছে ওর যে ওকে নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে বলে কেউ ভাবতে পারবে না।

আমায় বললে আপনাকে আমরা তো বড় কষ্ট দিলুম। আমাদের সরলাডিতে যাবেন কিন্তু একবার দাদা—

— বেশ, যাব বইকি দিদি, নিশ্চয়ই যাব—

- এই পূজার সময়েই যাবেন। আমাদের ওখানে দুখানা পুজো হয়, একখানা কলিয়ারীর বাবুরা করে আর একখানা বাজারে হয়। শখের থিয়েটার হয়,—

ওর দাদা এই সময় বললে—আর একটা জিনিস দেখবেন—সাঁওতালের নাচ, সে একটা দেখবার জিনিস, আসুন পুজার সময়—ভারী খুশী হব আমরা আপনি এলে।

পুর্ণিমা উৎসাহের সঙ্গে বললে—তা হলে কথা রইল কিন্তু দাদা। বোনের নেমন্তন্ন রাখতেই হবে আপনার—

এই সময় গৃহস্বামীর মেয়ে দুধ নিয়ে এসে পুর্ণিমাকে বললে আমাদের সকলকে দুধ দিতে।

পুর্ণিমা বললে- ত হলে একখানা দুধের হাতা নিয়ে এস খুকী—ডালের হাতায় তো দুধ দেওয়া যাবে না।

পুর্ণিমার এই সমস্ত কথাবার্তার খুঁটিনাটি আমার খুব মনে আছে, কারণ পরে এই কথাগুলি মনে মনে আলোচনা করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল।

আহারাদির প্রায় আধ ঘণ্টা পর আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—পুর্ণিমা তার দাদার সঙ্গে বাইরের ঘরের ছোট কামরাটায় এবং আমি বড় কামরাটায়।

এবার আমি নিজের কথা বলি। শরীর ও মন বড় ক্লান্ত ছিল—অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু কতক্ষণ পরে জানি নে এবং কেন তাও জানি নে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার বুকে যেন পাথরের ভারি বোঝা চাপিয়েছে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে যেন কষ্ট হচ্ছে। ভাবলুম, নিশ্চয়ই নদীর হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে গিয়েছে কিংবা ওই রকম কিছু। অমন হয়। আবার ঘুমোবার চেষ্টা করি এমন সময় আমার মনে হ'ল পাশের কামরায় কি রকম একটা কৌতূহলজনক শব্দ হচ্ছে। হয়তো পুর্ণিমার দাদার নাক-ডাকার শব্দ অদ্ভুত রকমের নাক ডাকা বটে—যেন গোঙানি বা কাৎরানির শব্দের মত। একটু পরেই আর শব্দ

শুনতে পেলুম না—আমিও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

পাশের কামরায় দোর তখনও বন্ধ। আমি উঠে হাতমুখ ধুয়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গেলুম। আধ ঘণ্টা বেড়ানোর পরে ফিরে এসে দেখি তখনও ওরা কেউ ওঠে নি—এমন কি বাড়ীর লোকও না। আরও আধ ঘণ্টা পরে গৃহস্বামী রসিক ধাড়া উঠে বাইরের ঘরের দাওয়ায় এসে বসল। আমায় বললে—ঘুমুলেন কেমন বাবু? মশা কামড়ায় নি? এঁরা এখনও ঘুমুচ্ছেন বুঝি?

রসিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ চাষবাসের গল্প করলাম। তার পরে সে উঠে কোথাও বেরিয়ে গেল।

এদিকে প্রায় আটটা বাজল। তখনও পূর্ণিমা বা তার দাদার ঘুম ভাঙে নি। সাড়ে আটটার সময় রসিক ফিরে এল। গ্রীষ্মকাল, সাড়ে আটটা দস্তুরমত বেলা, খুব রোদ উঠে গিয়েছে চারিধারে। রসিক আবার জিগ্যেস করলে এরা এখনও ওঠেন নি? আমি বললাম—কই না, ওঠে নি তো। গরমে সারারাত ঘুম হয় নি বোধ হয়, ভোরের দিকে ঘুমিয়েছে আর কি।

আমার কাহিনী শেষ হয়ে এসেছে। বেলা ন-টার সময়ও যখন ওদের সাড়া-শব্দ শোনা গেল না তখন আমি দরজায় ঘা দিলাম। ঘরের মধ্যে মানুষ আছে বলেই মনে হলো না। তখন বাধ্য হয়ে আমি পশ্চিম দিকের ছোট জানালাটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলাম—ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে নিদ্রিতা, এ অবস্থায় জানালা দিয়ে চেয়ে দেখতে দ্বিধা বোধ করছিলাম কিন্তু একবার দেখাটা দরকার। ব্যাপার কি ওদের?

জানালা দিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম বোধ হয়, ঠিক বলতে পারি নে। কারণ আমারও কিছুক্ষণের জন্যে বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কি যে ঘটেছে, কি না ঘটেছে আমার খেয়াল ছিল না।

জানালা দিয়ে যা দেখলুম তা এই।

প্রথমেই আমার চোখে পড়ল ঘরে এত রক্ত কেন? চোখে ভুল দেখলাম না কি? কিন্তু পরমুহূর্তেই আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। ঘরে একখানা চৌকি পাত, পূর্ণিমার দাদা চৌকির উপরকার বিছানায় উপুড় হয়ে কেমন এক অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুয়ে, বিছানা রক্তে ভাসছে, মেজেতে রক্ত গড়িয়ে পড়ে মেজে ভাসছে - আর পূর্ণিমা দেওয়ালের ধারে মেজের ওপর পড়ে আছে, জীবিতা কি মৃতা বুঝতে পারলাম না। একটা পাশবালিশ চৌকির ওপর থেকে যেন ছিটকে পূর্ণিমার দেহের কাছে পড়ে, সেটাও রক্তমাখা।

আমার চীৎকার অনেক দূর থেকে শোনা গিয়েছিল নাকি। লোকজন চারিধার থেকে এসে পড়ল। আমার জ্ঞান ছিল না, মাথায় জলটল দিয়ে আমায় সকলে চাঙ্গা করে দশ-পনেরো মিনিট পরে।

এদিকে দরজা ভেঙে সকলে ঘরে ঢুকল। তারা দেখলে পূর্ণিমার দাদার গলায়, কাঁধে ও

হাতে সাংঘাতিক কোপের দাগ, আগের রাত্রে কুটনো কোটার জন্যে একখানা বড় বঁটি গৃহস্বেরা দিয়েছিল—সেখানা রক্তমাখা অবস্থায় বিছানার ওপাশে পড়ে, পূর্ণিমার শাড়ী ব্লাউজে কিন্তু খুব বেশী রক্ত নেই, কেবল শাড়ীর সামনের দিকটাতে যেন ছিটকে-লাগা রক্ত খানিকটা। হতভাগিনী রাত্রে কোন সময় এই বীভৎস কাণ্ড ঘটিয়েছে, নিজের হাতে ভাইকে খুন করে ঘরের মেঝেতে অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা। দিব্যি শান্ত, নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমুচ্ছে, আমার যখন জ্ঞান হয়ে ঘরে ঢুকেছি তখনও। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখাচ্ছে কি সুন্দর, আরও ছেলেমানুষ, নিষ্পাপ সরলা বালিকার মত।

নারীর প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসমূর্ত্তি সেই ভয়ানক প্রভাতে এক মুহূর্ত্তে আমার চোখের সামনে যেন ফুটে উঠলো—পলকে যে প্রলয় ঘটায়, এক হাতে দেয় প্রেম, অন্য হাতে আনে মৃত্যু, এক হাতে যার খড়্গ, অন্য হাতে বরাভয়।

অতঃপর যা ঘটবার তাই ঘটল। পাড়ার লোক, গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল। পুলিশ এল. আমি মেয়েটির অবস্থা সম্বন্ধে যা জানি খুলে বললাম। তাদের জেরার প্রশ্নোত্তর দিতে দিতে আমার মনে হ'ল হয়তো বা আমিই পূর্ণিমার দাদাকে খুন করে থাকব। ঘুমন্ত মেয়েটির পাশ থেকে ওর দাদার মৃতদেহ সরানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম—মৃতের সকল চিহ্ন, রক্তাক্ত বস্ত্র, বঁটি, বিছান। উন্মত্ততার ঘুম সহজে ভাঙে নি তাই রক্ষে—দুপুর পর্য্যন্ত পূর্ণিমা নিরুদ্বেগে ঘুমল। পুলিশকেও কষ্ট করে ওর ঘুম ভাঙাতে হলো।

আমি ওর পাশে দাঁড়ালুম এই ঘোর অন্ধকার রাত্রে। অসহায় উন্মাদিনীর আর কে ছিল সেখানে? যদিও ওর অবস্থা দেখে চোখের জল ফেলে নি এমন লোক সে-অঞ্চলে ছিল না, কি মেয়ে কি পুরুষ—এমন কি থানার মুসলমান দারোগাবাবু পর্য্যন্ত।...

সয়লাভি কলিয়ারীতে টেলিগ্রাম করা হলো। ওর বাবা এলেন, তাঁর সঙ্গে এলেন তাঁর তিনটি বন্ধু। ওঁদের মুখে প্রথমে শুনলুম, পূর্ণিমা বিবাহিতা। পাগল বলে স্বামী নেয় না—সে কখনও জানে সে বিবাহিতা, কখনও আবার ভুলে যায়। পূর্ণিমার মা নেই তাও এই প্রথম শুনলাম।

ভদ্রবংশের ব্যাপার, এ নিয়ে খুব গোলমাল যাতে না হয়, শুরু থেকেই তার ব্যবস্থা করা হলো। খবরের কাগজে ঘটনাটি উঠেছিল—কিন্তু একটু অন্যভাবে। কয়েকটি প্রভাবশালী লোকের সহানুভূতি লাভ করার দরুন ব্যাপারের জটিলতার হাত থেকে আমরা অপেক্ষাকৃত সহজে রেহাই পেলাম।

পূর্ণিমাকে রাঁচি উন্মাদ-আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। ওর বাবাও দেখলুম ওকে আর বাড়ী নিয়ে যেতে রাজী নয়। শ্রীরামপুর কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে ওকে মোটরে সোজা আনা হলো হাওড়া। হাওড়া থেকে রাঁচি এক্সপ্রেসে যখন ওঠানো হচ্ছে—তখন একগাল হেসে ও আমার দিকে চেয়ে বললে—আমাদের সয়লাভিতে আসবেন কিন্তু একদিন? মনে থাকবে তো?

ওর বাবাকে বললে—দাদা কোথায় বাবা? দাদাকে দেখছি নে। দাদার কাছে

কানের তুল ফুটো খোলা রয়েছে, কান বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছে—

এ-সব কয়েক বছর আগেকার কথা। অনেকেই বুঝতে পারবেন আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। মানুষ চলে যায়, স্মৃতি থাকে। জীবনের উপর কত চিতার ছাই ছড়ানো, সেই ছাইয়ের সূক্ষ্ম স্তরে বহু প্রিয়-পরিচিত জনের পদচিহ্ন আঁকা।

এই শ্যামলা পৃথিবী, রৌদ্রালোক, পরিবর্ত্তনশালী ঋতুচক্রের আনন্দ থেকে নির্ব্বাসিতা সে হতভাগিনীর কথা মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে তখন ভাবি সে নেই, এত দিনে সুদূর রাঁচির উন্মাদ-আশ্রমে তার অভিশপ্ত জীবনের অবসান হয়ে গেছে—ভগবান আর ওকে কতকাল কষ্ট দেবেন?

বলা বাহুল্য, এই কাহিনীর মধ্যে আমি সব কাল্পনিক নাম-ধাম ব্যবহার করেছি, কারণ সহজেই অনুমেয়।

জনসভা

আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারী স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পরিপক্ব। বিশু একদিন ক্লাসে একখানা বই আনিল, ওপরে সোনালীচুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন), রাঙা কাগজের মলাট, বেশী মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি বইও নয়।

আমি সেই বয়সেই দু-একখানা সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেল পড়িয়া ফেলিয়াছি; পূর্ব্বেই বলি নাই যে বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশী পাকিয়াছিলাম? সেজন্য বিশু আমাকে ক্লাসের মধ্যে সমঝদার ঠাওরাইয়া বইখানি আমার নাকের কাছে উঁচাইয়া সগর্ব্বে বলিল, "এই ভাখ, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস?"

বলিলাম, "দেখি কি বই?"

মলাটের ওপরে লেখা আছে 'প্রেমের তুফান'। হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত দাম আট আনা।

"তোর দাদার লেখা বই, কি রকম দাদা?"

বিশু সগর্ব্বে বলিল, "আমার বড়মামার ছেলে, আমার মামাতো ভাই।"

এই সময় নিতাই মাস্টার মহাশয় ক্লাসে ঢোকাতে আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই মাস্টার আপন মনে থাকিতেন, মাঝে মাঝে কি এক ধরনের অসংলগ্ন কথা বলিতেন আর আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতাম। জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তাঁর ক্লাসে।

অমনি তিনি বলিয়া বসিতেন, "এই তিনকড়ি, এদিকে এস, হাসছ কেন? হানা চায়

আনা সের, কেরোসিন তেল ছ-পয়সা বোতল—"

এই সব মারাত্মক ধরনের মজার কথা শুনিয়াও আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, হাসিয়া ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে।

বর্তমানে নিতাই মাস্টার ক্লাসে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ও-খানা কি বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিনটের গাড়ী কাল এসেছিল কি না পঁচিশ মিনিটের সময়, পঁচিশ মিনিট লেট— অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা—"

আমরা হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া মেজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

নিতাই মাস্টার বইখানা হাতে লইয়া বলিলেন, "কার বই?"

বিনু সগর্ব্বে বলিল, 'আমার বই, স্যার। আমার দাদা লিখেছেন, আমাদের একখানা দিয়েছেন—"

নিতাই মাস্টার বইখানা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "হুঁ, থাক্, একটু পড়ে দেখব।"

পরের দিন বইখানা ফেরৎ দিবার সময় মন্তব্য করিলেন, "লেখে ভাল, বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি করবে।"

বিনু বাধা দিয়া বলিল, "ছোকরা নন স্যার তিনি, আপনাদের বয়সী হবেন—"

নিতাই মাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, "বেশী কথা বইবে না, চুপ করে বসে থাকবে। আবার কথার ওপর কথা! পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারে, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজো হয়।"

পুরানো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারুক আর নাই সারুক, নিতাই মাস্টারের সার্টিফিকেট শুনিয়া বিনুর দাদার বইখানা পড়িবার অত্যন্ত কৌতুহল হইল, বিনুর নিকট যথেষ্ট সাধ্য-সাধনা করিয়া সেখানা আদায় করিলাম। বাড়ীতে বাবা ও বড়দার চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ করিয়া বিনুর এই অদেখা দাদাটির প্রতি মনে মনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কি করিয়া দুষ্ট লোক ধরিয়া লইয়া গেল, নানা কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি কিভাবে জলে ডুবিয়া মরিল, তাহারই অতি মর্মন্তুদ বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিনু বলিল, "জানিস পাঁচু, আমার সেই দাদা, যিনি লেখক, তিনি এসেছেন কাল আমাদের বাড়ী।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। "কখন এসেছেন? এখনও আছেন?"

"কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, দু-তিন দিন আছেন।"

"সত্যি? মাইরি বল—"

"মা-ইরি, চল্ বরং, আয় আমাদের বাড়ী"

আমার ন-দশ বৎসর বয়সে ছাপার বই কিছু কিছু পড়িয়াছি বটে, কিন্তু যাহারা বই লেখে তাহারা কিরূপ জীব কখনো দেখি নাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে স্বচক্ষে দেখিবার লোভ

সংবরণ করিতে পারিলাম না; বিমুর সহিত তাহার বাড়ী গেলাম।

বিমুদের ভেতর-বাড়ীতে একজন একহারা কে বসিয়া বিমুর মার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, বিমু দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, 'উনিই'। আমি কাছে যাইতে ভরসা পাইলাম না। সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, বয়স নিতাই মাস্টারের চেয়ে বড় হইবে তো ছোট নয়, খুব গম্ভীর বলিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রতি কাশী হইতে আসিতেছে, বিমুর মায়ের কাছে সবিস্তারে সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি গিলিতে লাগিলাম ও হাত-পা নাড়ার প্রতি ভঙ্গীটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

লেখকরা তাহা হইলে এই রকম দেখিতে।

সেই দিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিমুর বাবা মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, ইঁহার বড় শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, তার লেখার খুব আদর। ফলে গ্রামের লোক দলে দলে দেখা করিতে চলিল। বিমুর মা মেয়েমহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, 'প্রেমের তুফানে'র লেখক তাদের বাড়ী আসিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধ্যে পুরুষেরা যত পড়ুক আর না পড়ুক, গ্রামের মেয়ে-মহলে হাতে হাতে ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে, বিমুর মা ভ্রাতুষ্পুত্রগর্বে স্ফীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অনেককে পড়াইয়াছেন, সুতরাং মেয়ে-মহলও ভাঙ্গিয়া আসিল একজন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্য। বিমুদের বাড়ী দিনরাত লোকের ভিড়; একদল যায়, আর একদল আসে। অজ পাড়াগাঁ, এমন একজন মানুষের—যার বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই দুর্লভ।

কদিন কি খাতির এবং সম্মানটাই দেখিলাম বিমুর দাদার! এর বাড়ী নিমন্ত্রণ, ওর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বিমুর মা সগর্বে মেয়ে-মহলে গল্প করেন, 'বাছা এসে ক'দিন বাড়ীর ভাত মুখে দিলে? নেমন্তন্ন খেতে খেতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে—'

ভাবিলাম—সত্য, সার্থক জীবন বটে বিমুর দাদার! লেখক হওয়ার সম্মান আছে।

ভূষণদার সহিত এইভাবে আমার প্রথম দেখা।

অত অল্প বয়সে অবশ্য ভূষণদাদার নিকটে ঘেঁষিবার পাত্তা পাই নাই—কিন্তু বছর দুই পরে তিনি যখন আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত মিশিবার অধিকার পাইলাম—যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বাড়ী গিয়া উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না।

সে কথাও অতি সাধারণ ও সামান্য।

দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণদাদা বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম কি হে? তুমি বুঝি বিমুর সঙ্গে পড়?"

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তোমার ?"

"শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।'

"বেশ।"

কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। পরদিন আরও ভাল করিয়া আলাপ হইল। নদীর ধারে বিনু, আমি, আরও দু-একটি ছেলে তাঁর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণদাদা বলিলেন, "বল তো বিনু, 'এ দম্ভোলি বৃত্রাসুর শিরচ্ছিন্ন যাহে'—দম্ভোলি মানে কি ? পারলে না ? কে পারে ?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "আমি জানি, বলব···বজ্র।"

"বেশ বেশ, কি নাম তোমার ?"

কালই নাম বলিয়াছি ; এ দীনজনের নাম তিনি মনে রাখিয়াছেন, এ আশা করাও আমার মত অর্ব্বাচীন বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আবার নাম বলিলাম।

"বেশ বাংলা জান তো! বই-টই পড় না কি ?"

এ সুযোগ ছাড়িলাম না, বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বই সব পড়েছি।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণদার আরও দুইখানি উপন্যাস ও একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—বিনুদের বাড়ী সেগুলিও আসিয়াছিল ; বিনুর নিকট হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম।

ভূষণদাদা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বল কি ? সব বই পড়েছ ? নাম কর তো ?"

"প্রেমের তুফান, রেণুর বিয়ে, কমলকুমারী আর দেওয়ালী।"

"বাঃ বাঃ, এ যে বেশ দেখছি! কি নাম বললে ?"

বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম।

"বেশ ছেলে! ছাখ তো বিনু, তোর চেয়ে কত বেশী জানে!"

গর্ব্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক আমার প্রশংসা করিয়াছেন! তারপর ভূষণদাদা (বিনুর সুবাদে আমিও তাঁহাকে তখন 'দাদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, সাহিত্য, কবিতা এবং তাঁহার নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ; তার কতক বুঝিলাম কতক বুঝিলাম না—এগারো বছরের ছেলের পক্ষে সব বোঝা সম্ভব ছিল না।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাই-স্কুলে ভর্তি হইলাম। একদিন ভূষণদাদা সম্বন্ধে আমি এক বিষম ধাক্কা পাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাস্টারের নিকট হইতে। কি উপলক্ষে মনে নাই, মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা

দেশের আরও দু-একজন বড় লেখকের নাম করতে কে পারে ?"

একজন বলিল, "নবীনচন্দ্র", একজন বলিল, "সুরেন ভট্‌চাজ" (তখনকার কালে বড় নাম), একজন বলিল, "রজনী সেন" (তখন সবে উঠিতেছেন)—আমি একটু বেশী জানিবার বাহবা লইবার জন্ম বলিলাম—"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

মাস্টারমশায় বলিলেন, "কে ?"

"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমি পড়েছি তাঁর সব বই, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।"

"সে আবার কে ?"

আমি মাস্টারমশায়ের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইলাম।

"কেন, ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খুব বড় লেখক—প্রেমের তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালী, রেণুর বিয়ে—এই সব বইয়ের—"

মাস্টারমশায় হো হো করিয়া উঠিলেন, ক্লাসের ছেলেদের বেশীর ভাগই না বুঝিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। উহাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে ক্লাসরুম ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

আমার কান গরম হইয়া উঠিল, রীতিমত অপদস্থ বিবেচনা করিলাম নিজেকে। কেন ? ভূষণদাদা বড় লেখক নন ? বা রে !

মাস্টারমশায় বলিলেন, "তোমার গাঁয়ের আত্মীয় বলে আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিনি বড় লেখক হবেন তার কি মানে আছে ? কে তাঁর নাম জানে ? ও রকম বলো না।"

ভূষণদাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কেবল একতরফা বর্ণনাই শুনিয়া আসিয়াছি বিনুর মায়ের মুখে, বিনুর মুখে, বিনুর বাবার মুখে, ভূষণদাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপর সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেলই পড়িয়াছি—ক্রমে স্কুল লাইব্রেরী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও আরও অন্যান্য বড় লেখকের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মিল—ফলে বছর চার-পাঁচ স্কুলে পড়িবার পরে আমার উপরে ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রভাব যে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি, সেবার শ্রাবণ মাসে বিনুর ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে ভূষণদাদা আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন। তখন আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড় লেখক ভূষণচন্দ্র নন, বিনুর ভূষণদাদা, সুতরাং আমারও ভূষণদাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্ত্তা বলিলাম, দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও নয়। তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন।

একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটির কুটুম্বসাক্ষাৎদের হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই,

নাম,—'প্রতিমা-বিসর্জ্জন'! দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ভূষণদাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বিনুও তো আর বাল্যের সেই বিনু নাই। সে বলিল—"মজার কথা শোন্, আগের বৌদিদি ষোল বছর ঘর করে ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল বেচারী, তার বেলা শোকের কবিতা বেরুলো না। দ্বিতীয় পক্ষের বৌদি—দু-তিন বছর ঘর করে ডবকা বয়সেই মারা গেল কি না—দাদার তাই শোকটা বড্ড লেগেছে—একেবার—প্র তি—মা—বি স র্জ্জ—ন!"

ভূষণদাদা আমাকেও একখানা বই দিয়াছিলেন, দু-তিন দিন পরে আমায় বলিলেন—"প্রতিমা-বিসর্জ্জন কেমন পড়লে হে?"

অতি সাধারণ ধরণের কবিতা বলিয়া মনে হইলেও বলিলাম, "বেশ চমৎকার!"

ভূষণদাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বাংলাদেশে 'উদ্‌ভ্রান্ত- প্রেম'-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরণের বই আর বেরোয় নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে কিছু মনে করো না তবে তোমাদের ছোট দেখেছি, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই।"

ভূষণদাদার দাড়ি চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে, তাহাকে সমীহ করিয়া চলি, সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। যদিও 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর প্রতি আমার যে খুব শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভূষণদাদার কথা শুনিয়া সমালোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম।

ভূষণদাদার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, অনেকদিন হইতেই জানি। তিনি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রামে জমিদারদের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকুরি করিতেন, স্বাধীন ব্যবসা কোনদিন করেন নাই।

এবার শুনিলাম ভূষণদাদার সে চাকুরিটাও যায়-যায়। বিনুই এ সংবাদ দিল।

ভূষণদাদা আমায় পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা তো কলকাতায় ছাত্রমহলে ঘোর, পাঁচটা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার বই সম্বন্ধে কি মতামত কিছু শুনেছ?"

হঠাৎ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আমতা আমতা স্বরে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ—তা মত বেশ ভালই—

বলেন কি ভূষণদাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়া এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে ভূষণ চাটুয্যের নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া, আর সে সম্বন্ধে মতামত!

ভূষণদাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি, কি, কি-রকম বলে? আমার কোন্ বইটার কথা শুনেছ, পাষাণপুরী না দেওয়ালী?"

অকূলে কূল পাইলাম। ভূষণদাদার বইয়ের নাম কি আমার একটাও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, "হাঁ, ওই পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।"

ভূষণদাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কি শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি? পাষাণপুরী তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবুও তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয়ে বসিয়া বই বিক্রী ও বিজ্ঞাপনের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই।

বিনু আমায় আড়ালে বলিল, "এই অবস্থা, পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পান ডাক্তারী করে, সংসারই চলে না, তা থেকে খরচ করেন ওই সব বাজে বই ছাপতে। ভূষণদাদার চিরকালটা এক রকম গেল। বাতিক যে কত রকমের থাকে।"

ইহার পর আরও ছ-সাত বছর কাটিয়া গেল।

আমি পাশ করিয়া বাহির হইয়া নানারকম কাজকর্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও।

ভূষণদাদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই, মনের তলে কোথায় চাপা ছিল, লেখক হওয়া একটা মস্ত বড় কিছু বুঝি! সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে সেবার ভূষণদাদাকে সম্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, কে জানে?

আমার লেখক-জীবন যখন পাঁচ-ছ বছরের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, দু-চারখানা ভাল মাসিক পত্রিকায় লেখা প্রায়শঃ বাহির হয়, কিছু কিছু আরও হইতেছে, সে সময় কি একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিনুদের বাড়ীতে গিয়া দেখি, ভূষণদাদা অসুস্থ অবস্থায় সেখানে সপরিবারে কিছুদিন হইতে আছেন। আমায় বলিলেন, "পাঁচু, শুনলাম আজকাল লিখছ? কোন্ কোন্ কাগজে লেখা বেরিয়েছে?"

কাগজগুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভূষণদাদাকেও দেখাইলাম—দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করলাম।

ভূষণদাদা কাগজ কখানা উল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এইসব কাগজে লিখছ? বেশ বেশ। এসব তো বেশ নাম-করা পত্রিকা? একটু ধরাধরি করতে হয়, না? তুমি কাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না করলে আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কি আর আছে? এই দেখ না কেন, আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে নিজেকে পুশ্ করতে পারলাম না। আমার 'নারদ'-কাব্য পড় নি? দু-বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি। কিন্তু হলে হবে কি, ওই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে পারছে না।

বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণদাদার মুখে তাঁহার 'নারদ'-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলেও তাহার মধ্যে নিজস্ব জিনিস কি একটা ঢুকাইয়া দিয়াছেন ভূষণদাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিক কোন বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন।

বলিলাম, "বইখানা ছেপেছে কারা?"

"আমিই ছেপেছি। লোকের দোরে দোরে বেড়িয়ে ছাপানোর জন্তে খোশামোদ করা — ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

মনে হইল ভূষণদাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ করিতেছেন এই সব উক্তি দ্বারা। যাহা হউক, কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বছরখানেক পরে আমি আমার কর্মস্থলে একটা বুকপোস্ট পাইলাম। খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই 'নারদ'-কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন, সঙ্গে একখানা বড় চিঠি। 'নারদ'-কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া ঐ সঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি যেন কলিকাতায় কোন নামকরা কাগজে বইখানির ভাল ও বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণদাদার অনুরোধ।

ছাপানো প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি হইল না। একজন মফঃস্বলের কোন শহরের প্রধান ডাক্তার লিখিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার প্রধান উকিল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা ভাষার দুর্দ্দিন? বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দিন? যে দেশে আজও 'নারদ'-কাব্যের মত কাব্য রচিত হয়ে থাকে (মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কি বাংলা কবিতার কিছুই পড়েন নাই?) সে দেশে—, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন দিয়া 'নারদ'-কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক'-এর ব্যর্থ অনুকরণ। লম্বা লম্বা বক্তৃতা—মাঝে মাঝে 'ভূমা', 'প্রপঞ্চ', 'ক্ষর', 'অক্ষর', 'শাশ্বত', 'অব্যয়' প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভীড়—ইহাকে 'নারদ'-কাব্য না বলিয়া গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত।

আমি চিঠির উত্তরে লিখিলাম, 'নারদ' বেশ লাগিয়াছে, তবে কলিকাতায় কোন নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সে চিঠির উত্তরে ভূষণদাদা আমায় আরও দুই-তিনখানি পত্র লিখিলেন—যদি বইখানি আমার ভাল লাগিয়া থাকে, তবে সে কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। সে সব চিঠির উত্তর দিলাম না।

ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের কর্মস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। শ্রাবণ মাস, তেমনি বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দিনে রাত্রে বৃষ্টির বিরাম নাই। এ-বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির হইয়াছি। গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পড়িল। হ্যাণ্ডবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে অন্যমনস্কভাবে সেখানার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া দস্তুরমত বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উহাতে লেখা আছে—

'নারদ'-কাব্যের খ্যাতনামা কবি
বঙ্গভারতীর কৃতী সন্তান
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্তীকে (বড় বড় অক্ষরে)
সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত কলিকাতাবাসিগণের
জনসভা (আধইঞ্চি লম্বা অক্ষরে)
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল, সময়—সন্ধ্যা ৬।০টা।
সভাপতিত্ব করিবেন
একজন খ্যাতনামা নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক।

ব্যাপার কি? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—ভূষণদাদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত কলিকাতাবাসিগণ (কি ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে অতবড় নামজাদা সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই 'নারদ'-কাব্যের এতাদৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্ব্বে মোটেই শুনি নাই? যাহা হউক, হইলে খুব ভাল কথা, কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ কি ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ?

হ্যাণ্ডবিলের তারিখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সভা। সাড়ে ছ'টার বেশী দেরী নাই, যদি লোকের খুব ভিড় হয়, পৌনে ছ'টায় ইনস্টিট্যুটে গিয়া ঢুকিলাম। তখনও কেহ আসে নাই—অতবড় হল একেবারে খালি। এক পাশে গিয়া বসিলাম। ছ'টা বাজিল, জনপ্রাণীরও দেখা নাই—এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি নামিল, সওয়া ছ'টা—কেহই নাই, সাড়ে ছ'টার দু-এক মিনিট পূর্ব্বে দেখি ভূষণদাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে একতাড়া কাগজ বগলে হলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে চার-পাঁচটি ভদ্রলোক—তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না। তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণদাদার সহিত দেখা করিলে তিনি অপ্রতিভ হইতে পারেন—সুতরাং হলের বাহিরে গা ঢাকা দিয়া রহিলাম।

পৌনে সাতটা—জনপ্রাণী না, সভাপতিও অনুপস্থিত। সাতটা, তথৈবচ। এমন জনশূন্য জনসভা যদি কখনও দেখিয়াছি। ভূষণদাদার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গে ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহির করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত ভাবে কি পরামর্শ করিতেছেন—আবার একবার করিয়া ইনস্টিট্যুট-এর গেটের কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা—কাকস্য পরিবেদনা। সাড়ে সাতটা—পূর্ব্ববৎ অবস্থা। কলিকাতাবাসিগণের জনসভায় কলিকাতাবাসিগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

পৌনে আটটার সময় ভূষণদাদা সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—অল্পক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিন বিশুর মেসোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালই—বিশুর সঙ্গে কতবার সিমলা স্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে তিনি বলিলেন, "ভূষণ যে এখানে এসেছে হে, আমার বাসাতেই আজ আট দশ দিন আছে।

কি একখানা বই নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে, ওর মাথা আর মুণ্ডু! এদিকে এই অবস্থা, সতের আঠার বছরের মেয়ে একটা, পনের বছরের মেয়ে একটা—পার করবে কোথা থেকে তার সংস্থান নেই—আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় একগাদা কি মিটিং না ফিটিং-এর হ্যাণ্ডবিল ছেপে এনেছে, আর বল কেন, একেবারে মাথা খারাপ!"

বলিলাম, "হ্যা—হ্যাঁ, দেখেছিলুম বটে একখানা হ্যাণ্ডবিলে—জনসভা না কি—"

"জনসভা না ওর মুণ্ডু! ও নিজেই তো পরশু দুপুরে বসে বসে ওখানা লিখলে! আমার বাড়ীতে দুজন বেকার ভাই-পো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব ঘুরছে কদিন দেখতে পাই—সাড়ে সতের টাকা প্রেসের বিল কাল দিলে দেখলাম আমার সামনে—এদিকে শুনি, বাড়ীতে নিতান্ত দুরবস্থা···অতবড় সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক পয়সার সংস্থান নেই—তার বিয়ে!"

মাঘ মাসের শেষে আমি কার্য্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি যাইতেছি, পার্ব্বতীপুর স্টেশনে দেখি, ভূষণদাদা একটি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আরে পাঁচু যে! ভাল তো? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরি কর তো? কোথায় যাচ্ছ এদিকে?"

"আজ্ঞে একটু জলপাইগুড়িতে। আপনি কোথায়?"

"আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। হ্যাঁ, তোমাকে বলি—শোননি বোধ হয়, আমার 'নারদ'-কাব্যের খুব আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইন্‌স্টিট্যুট হলে প্রকাণ্ড সভা হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুক বাবু সভাপতি ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে খুব ভিড়—দেখবে? এই দেখ।" বলিয়াই ভূষণদাদা ব্যাগ খুলিয়া জনসভার ছাপানো হ্যাণ্ডবিল একখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ।"

প্রত্যাবর্ত্তন

কাকীমা তাহাকে গবাক্ষ বলিয়াই ডাকিতেন। গোবিন্দ নামটি উচ্চারণ করিতে তাঁহার নাকি কষ্ট হইত, তাই তিনি শব্দটিকে সরল করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, কি, বিদঘুটে নাম বাপু! বেছে বেছে নাম রেখেছেন গো-বি-ন্দ। উচ্চারণ করতে মুখ ব্যথা হয়ে যায়। ভেবেছেন ঐ নামে ডেকে বুঝি ভবনদী পার হয়ে যাবেন। মরে যাই আশা দেখে!

আর মাস্টারেরা তাহার নাম দিয়াছিলেন, 'গোবরা', কেন না বুদ্ধি বলিয়াই নাকি কোন পদার্থ হতভাগার মাথায় ছিল না। তাহার সারা মাথাটি নাকি গোবরে ভরিয়া ছিল। মাস্টারদের শিক্ষাগুণে আর সকলেই তাহাকে 'গোবরা' বলিতেই শিখিয়াছিল।

সেদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়াই তাহার কাকার ছোট ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা, গোবরা আজ ভয়ানক মার খেয়েছে!

বয়সে সে গোবিন্দের চেয়ে তিন বছরের ছোট হওয়া সত্বেও তাহাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে সে দ্বিধা বোধ করিত। কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? দুশো বার বলেছিলুম, হতভাগাটাকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে কাজ নেই, তবু যদি এ অভাগীর কথা শুনবে। মাগী মরুক চেঁচিয়ে, ওনার বয়ে গেছে! কথায় আছে না, কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি কুলো। ওনারও সেই দশা হয়েছে। কেন মার খেয়েছে রে সেণ্টু?

সেণ্টু সগৌরবে কহিল, পড়া পারে নি মা। কোন দিনও পড়া পারে না।

সেণ্টু ও গোবিন্দ এক ক্লাসে পড়ে।

কাকীমা গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিলেন, গবাক্ষ, এদিকে আয়!

বলির পশুর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে গবাক্ষ কাকীমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কাকীমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, পড়া পারিস নে কেন রে গবাক্ষ? টাকাগুলো কি খোলামকুচি পেয়েছিস? ইস্কুলের মাইনে, বাড়ীর মাস্টারের মাইনে, আমাদের কি তালুক-মুলুক আছে বাছা? হ্যাঁ, যদি বুঝতুম কিছু হচ্ছে তা হলে নয় এক কথা। তা নয়, এ শুধু ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ!

সেণ্টু কহিল, পিঠে বেতের দাগ বসে গেছে মা। জামা তুলে দেখ:

কাকীমা জামা তুলিয়া দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে রায় প্রকাশ করিলেন, আচ্ছা, উনি আসুন আগে বাড়ী।

মকদ্দমা যেন দায়রায় সোপর্দ্দ হইল।

গোবিন্দ পড়া পারে না সত্য, কিন্তু তাহার পশ্চাতে একটি অতি সত্য নিহিত ছিল। বাড়ীতে সে পড়িবার সময় পায় না। সারাদিন কাকীমার ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় থাকিত না। না বলিবার যো নাই। তাহা হইলে হয়তো বাড়ী হইতে দূর করিয়াই দিবেন তৎক্ষণাৎ। প্রায়ই তো তিনি বলেন, বিদ্দি হয়ে যা, বিদি হয়ে যা; আর জ্বালাতন করিস নে আমাদের। মাগী একটা ফ্যাচাং দিয়েছে দেখ না!

সেদিন সকালবেলা সবে পড়িতে বসিয়াছে এমন সময়ে কাকীমা আসিয়া তাহাকে একটি আনি দিয়া বলিলেন, ওরে গবাক্ষ, চট করে দুপয়সার চিনি নিয়ে আয় তো। দয়া করে দুটো পয়সা ফিরিয়ে আনতে ভুলিস না যেন। তোর আবার যে ভুলো মন!

গবাক্ষ তখন বাঙ্গালা দেশে কয়টি বিভাগ আছে মুখস্থ করিতে ব্যস্ত। পড়া না করিলে সতীশবাবু তাহাকে মারিয়া রসাতল করিবেন। আশ্চর্য্য এই সতীশবাবু! গাঁট্টা মারিতে তিনি অত্যন্ত পটু। প্রথম দিন হইতে তিনি গবাক্ষকে চিনিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমেই তিনি চোখ বুজিয়াই ডাকিয়া বসেন, গোবরা, এদিকে আয়।

ঐ ডাক শুনিয়াই গোবিন্দর রক্ত শুকাইয়া যায়। তারপর তিনি হয়তো প্রশ্ন করিলেন, বল বাঙলা দেশের রাজধানী কি? আর সেখানে কি কি দেখবার জিনিস আছে?

এই ভূগোল পড়াটা তাহার কোনদিনই হয় না। সতীশবাবু বলেন, তুই কি প্রতিজ্ঞা করেছিস পড়বি না? ছেড়ে দে বাপু, ছেড়ে দে!

ভূগোল পড়িবার কথা সকালে, আর প্রতিদিন সকালে তাহার কোন না কোন ব্যাঘাত ঘটিবেই ঘটিবে। সেদিন সে ভূগোল পড়িবার দুর্জ্জয় পণ করিয়া বসিয়াছিল। কাকীমার আনিটা মাটিতে রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম,···

এমন সময় নীচ হইতে কাকীমা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, ওরে ও বিদ্যাসাগর, আর জজ ম্যাজিস্টার হস্‌নে। এদিকে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে রে।

অগত্যা তাহাকে বইখাতা গুটাইয়া উঠিতে হইল। চিনি আনিয়াই কিন্তু সে নিষ্কৃতি পাইল না। চিনির পর তাহাকে বাজার যাইতে হইল। কাকীমা বলিলেন, এক পয়সার পলতা আনিস দিকিনি, আলু দেখে কিনবি, কালকের মত যেন পোকা না থাকে, আর ও ছড়র পাকা ট্যাড়স আনিস নে যেন, বুঝলি?

বাজার করিয়া ফিরিতেই তাহার বেলা নয়টা হইয়া গেল। কাকীমা হিসাব নিলেন। চারটি পয়সা কম পড়িল। কাকীমা চোখ পাকাইলেন, বলিলেন, বার কর বলছি পয়সা।

গোবিন্দ কহিল, আর তো কোন পয়সা ফেরে নি কাকীমা!

কাকীমা বলিলেন, আর মিছে কথা বলিস নে রে গবাক্ষ। হিসেব শেখাচ্ছিস তুই আমায়? বাজারের পয়সা চুরি! ওমা, আমি কোথায় যাব! বাড়তে বাড়তে তুই যে বেড়ে উঠেছিস! না, আজ আর তোর নিস্তার নাই। ডাক তোর কাকাকে।

গবাক্ষকে আর ডাকিতে হইল না, সেণ্টুই তাহার হইয়া কাজটি করিয়া দিল। কাকীমা বলিলেন, ওগো, দেখ তোমার গুণমণির কীর্ত্তি। ডানা উড়েছে! চুরি শিখেছে! চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। আজ বাজারের পয়সা চুরি করবে, কাল বাক্স ভাঙ্গবে, পরশু সিন্দুক ভাঙ্গবে। এখন হয়েছে কি! আদরের ভাইপো তোমার ভিটেয় ঘুঘু চরাবে। দোষ যে আমার!

কাকা নিজে হিসাব লইলেন। তথাপি সেই চারিটি পয়সা কম পড়িল। শত চেষ্টা করিয়াও গোবিন্দ ঐ চারিটি পয়সার হিসাব দিতে পারিল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কাকা সহ্য করিয়া করিয়া সেই চরম সীমায় সেদিন পৌছিলেন। তিনি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে অতিরিক্ত রাগিয়া উঠিলেন। তিনি উকিল। আজ দীর্ঘ বার বছর ধরিয়া স্থিরভাবে ছোট আদালতে প্র্যাকটিস করিয়াছেন। চুরি জিনিসটার উপর তাঁহার দৃষ্টি সচরাচর সহজেই নিবদ্ধ হয়। তিনি গোবিন্দকে গুটি কয়েক জেরা করিয়া সাব্যস্ত করিলেন, সে পয়সা চারিটি আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাগিলে তিনি ভীষণ হইয়া ওঠেন। তিনি বলিলেন, দেখি তোর ট্যাক।

অগত্যা তাহার ট্যাক দেখা হইল, কিন্তু পয়সা সেখানে পাওয়া গেল না। তখন কাকীমা হাসিয়া বলিলেন, এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ওকালতি কর? বলিহারি যাই! ও এত বোকা যে পয়সা তোমার জন্যে ট্যাকে রেখে দেবে, না?

কথা শেষে তিনি হাসিলেন, কাকা আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, দুম্ দাম করিয়া তাঁহাকে প্রহার শুরু করিয়া দিলেন। কাকার নিকট গোবিন্দ এই প্রথম মার খাইল। কাকাই যা এতদিন তাহাকে সুনজরে দেখিতেন, আজ তিনিও তাহার প্রতি বিরূপ হইলেন। তিনি চীৎকার করিলেন, হারামজাদার জন্যে দুশো দিন আমার কথা শুনতে হবে। দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা! দুধকলা দিয়ে আমি যেন কালসাপ পুষেছি। দূর করে দিয়ে তবে ছাড়ব!

চীৎকার করিতে করিতেই তিনি অবিশ্রান্ত প্রহার করিতে লাগিলেন। কাকীমা বকিয়া চলিলেন, দোষ দাও যে আমায়, দেখ এবার ভাইপোর গুণ! গোড়াতেই আমি বলেছিলুম, ওসব ঝঞ্ঝাট পুষো না—পুষো না। তখন যদি এ দাসীবাঁদীর কথা শোন। মনে রেখো, গরীবের কথা বাসী হলে খাটে।

শারশেষে কাকা প্রহার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দ কিন্তু কাঁদিল না। মারিয়া কাটিয়া ফেলিলেও গোবিন্দ নাকি কাঁদে না। ইহা তাহার ছেলেবেলাকার অভ্যাস। তথাপি সেদিন কিন্তু তাহার মনটা বড় বিষণ্ণ হইয়া গেল। কলিকাতা তাহার নিকট ভাল লাগে না। প্রথম যেদিন তাহার বিধবা মা তাহার কাকাকে কহিলেন, ঠাকুরপো, এখেনে বসে থেকে থেকে তো গোবিন্দ দিন দিন গোল্লায় যাচ্ছে, তুমি যদি নিয়ে যাও তোমার ওখেনে তাহলে ভারী ভাল হয় ভাই। তোমার সেন্টু মেন্টুর সঙ্গে ও একটু তাহলে পড়তে পাবে। নইলে ওকে এই এতটুকু বয়সেই লেখাপড়া ছাড়াতে হয়। কি করব বল? পেটে খেতে পাই না, তা আবার ছেলেকে বোর্ডিঙে রেখে লেখাপড়া শেখাব! তবে তুমি যদি দয়া কর তা আলাদা কথা।

কাকা রাজী হইয়া গেলেন। গোবিন্দ যেন সেদিন হাতে স্বর্গ পাইল কলিকাতা তাহার শিশুকালের স্বপ্ন। এই তীর্থস্থান দেখিবার জন্য শিশুকাল হইতে তাহার মনে অদম্য পিপাসা জাগিয়াছে। সেই স্বপ্ন তাহার সফল হইবে। বেশ মনে আছে, সেদিন সে যেন হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়াইয়াছিল। সারাদিন গ্রামময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার পরম সৌভাগ্যের কথা ঘোষণা করিয়া মরিয়াছিল। নিঃশব্দে মধ্যাহ্নে ছিপ হাতে সোনাদীঘির পাড়ে বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে তাহার সেই কলিকাতার কথা মনে পড়িল। সেই বুড়ো ফণি-মনসার গাছটি তাহার নিকট তখন অতিসুন্দর বলিয়া বোধ হইল। তাহাকে যেন নূতন করিয়া রঙীন কাচের মধ্য দিয়া দেখিতে লাগিল। দীঘির ধারে অসংখ্য তালগাছ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাতাস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জলের উপর একটি স্পন্দন পর্যন্ত ছিল না। ওপাশে সারি বাঁধিয়া পদ্ম ফুটিয়া ছিল। পদ্মের পাতায় দীঘির কালো জল ঢাকিয়া গিয়াছিল। দীঘির ধার দিয়া দিয়া দুটি পাতিহাঁস পাশাপাশি সাঁতার কাটিয়া চলিয়াছিল। দূরে একটি কাঠঠোকরা অবিরত ঠক্ ঠক্ করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল। সেদিন সেই বনশোভা দেখিয়া গোবিন্দের চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তাহার ফাৎনা ডুবিয়াছে কি ভাসিতেছে, তাহার ছিপে টান পড়িল কিনা সেদিকে তাহার হুঁশ ছিল না। সে পরক্ষণেই কাপড় দিয়া তাহার অবোধ অশ্রুকণাগুলি চুপি চুপি মুছিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার শহরে

যাওয়ার আনন্দ তাহার গ্রাম ত্যাগের দুঃখের চেয়ে গভীর হইয়াছিল।

কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া তাহার দীর্ঘদিনের মধুর স্বপ্ন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহার মনোরাজ্যের কলিকাতাকে সে ফিরিয়া পাইল না। এখানে আকাশ নাই, বাতাস নাই, সবুজ ঘাস নাই, সন্ধ্যার সূর্য্যের অগণিত রঙের খেলা নাই। এখানে মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। মানুষ মানুষকে হিংসা করে, ঘৃণা করে। এখানে আছে কেবল 'পড়' 'পড়'। উঠিতে বসিতে সর্ব্বক্ষণ সে শুনিতেছে 'পড়' 'পড়'। পড়ার যূপকাষ্ঠে এখানকার সকলেই বলিপ্রদত্ত। এখানকার পাঁচিলঘেরা ক্ষুদ্রপরিসর গৃহকোণে পড়িয়া থাকিয়া বদ্ধজীবন কাটাইতে সে সহসা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইবার স্থান এখানে নাই। কলিকাতা তাহার নিকট কারাগার বোধ হইল।

সেদিন স্কুলে গিয়া সে তলাইয়া তলাইয়া অতীতকে দেখিতে লাগিল। সকলেই তাহাকে দূর করিবার জন্য উন্মুখ। এখানে তাহার ঠাঁই নাই। কিন্তু সে পয়সা চুরি করে নাই। আলুওয়ালাই তাহাকে ঠকাইয়া চারিটি পয়সা লইয়াছে। তাহার স্পষ্টবাদী কাকীমার কাছে এই মারাত্মক সত্য স্বীকার করিতে তাহার সাহস হয় নাই। তাই তাহাকে মিথ্যা মার খাইতে হইল। তারপর স্কুলে সতীশবাবু প্রশ্ন করিলেন, বাঙ্গলা দেশে কটা জেলা ?

গোবিন্দের মুখে কোন কথা সরিল না। ইতিমধ্যে সে তাহার পাঠ রীতিমত ভুলিয়া গিয়াছে। ভূগোল তাহার চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। তাহার ফল স্বরূপ সতীশবাবু তাহার পিঠে দাগ বসাইয়া দিতে ভোলেন নাই। গোবিন্দকে তিনি গাঁট্টা মারিয়া মারিয়া কাহিল হইয়া গিয়াছিলেন। সে কাঁদে নাই। অগত্যা তিনি সেদিন তাঁহার বিখ্যাত গাঁট্টার পরিবর্ত্তে ম্যাপে দেখাইবার লাঠিটা ব্যবহার করিলেন। আরও বলিলেন, ছেড়ে দে বাবা, আমাদের ছেড়ে দে, দেশে গিয়ে চাষবাস করগে!

বাড়ীতে ফিরিতেই কাকীমা তাহাকে আপ্যায়িত করিলেন, মানিক আমার, সোনা আমার, এস। লিখে পড়ে এসেছ, একবাটি দুধ খাও।

সেই প্রথম গোবিন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, না, আমি খাব না।

কাকীমাও বলিলেন, ও বাবা! কুলোপানা চক্কর! না খাবি তো আমার ভারী বয়ে গেছে। আমার সাধবার গরজ!

কাকীমা সাধিলেন না, গোবিন্দও খাইতে চাহিল না। সে চুপি চুপি চিলকুঠিতে উঠিয়া গেল। চারিদিক নিঃশব্দ। সন্ধ্যা তখন ঘনীভূত হইয়াছিল। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। আকাশের এককোণে এককালি চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার নক্ষত্র ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। দক্ষিণের উদাস বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছিল। গোবিন্দর অনেক কথাই মনে পড়িল। ছেলেবেলা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক কাহিনীই তাঁহার স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করিয়া উঠিতে লাগিল। সুখ দুঃখ মিশ্রিত কত ক্ষণস্থায়ী দিনের মনোরম ইতিহাস। দূরান্তর হইতে সেই গ্রামের আহ্বান

আসিয়া পৌছিতে লাগিল। সেই পাকা সোনার ধানক্ষেত···নিস্তব্ধ সোনাদীঘি, আশেপাশে তালের বন, সবুজ বাঁশের ঝাড়, হলদে পাতায় ভরা বনপথ, মর্মর শব্দ, হাস্যোজ্জ্বল শিমুল গাছ, চিক্কণ পত্র-শোভিত তেঁতুল গাছ, সব কিছু মিলিয়া তাহার নিকট অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সেই যে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে ফিরিবার সময়ে পথের ধারের কল্কে ফুল হইতে মধু চুষিয়া খাইত সেটিই যেন আজ তাহার নিকট বড় প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল। তাহার সোনার দেশ, সোনার মাটি। ইছামতীর ধীর কলধ্বনি, দু-একখানি জেলে ডিঙ্গি, সন্ধ্যায় কম্পমান জলের উপর সহস্র সূর্য্যমূর্ত্তি, নিঃশব্দ প্রকৃতি, তাহার নিকট বড়ই মধুর বোধ হইল। তাহার মার কথা মনে পড়িল, সেই স্নেহময়ী জননী। দুঃখিনী কত আশা করিয়াই না তাহাকে শহরে পাঠাইয়াছিলেন। যদি তিনি ঘুণাক্ষরেও জানিতেন শহর কি বিষাক্ত, কি বিশ্রী, কি বিস্বাদ! মার কথা মনে পড়িতেই গোবিন্দ কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু আর সে রোধ করিতে পারিল না। আজ তাহার জন্মদিন। ভাদ্র মাসে এক শুক্রবারে তাহার জন্ম। এই দিন মা তাহাকে পরমান্ন রাঁধিয়া দেন, খাইবার সময়ে তাহার সামনে প্রদীপ জালিয়া দেন, শাঁখ বাজান। আজ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন। ভাদ্র মাসের এই শেষ শুক্রবার। এ বৎসর তাহার জন্মদিন বৃথাই কাটিল। কতদিন সে তার মার সংবাদ পায় নাই। তিনি কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য তাহার মন সহসা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সন্ধ্যায় পড়িবার সময় তাহার অতিবাহিত হইতেছে। না, সে আজ আর পড়িতে যাইবে না। সেই তো ছোট ঘরখানিতে বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে হইবে। এতটুকু থামিবার অবকাশ নাই, তাহা হইলেই মাস্টারের শাসনদণ্ড। সেই বিশ্রী ট্র্যান্সলেশন, সেই উৎকট গ্রামের কসরৎ। এসব কিছু তাহার ভাল লাগে না। না, সে লেখাপড়া শিখিতে চায় না। এইরূপ কত কি আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কখন সে নিজের অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িল। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিল তাহা হুঁশ নাই, সে স্বপ্ন দেখিল, সে যেন দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। তাহার মা যেন বকিতেছেন, কেন এলি? বেশ তো ছিলি!

তিনি জানেন না তো তাহার ছেলে কি সুখে আছে। জানিলে তিনি নিশ্চয় গোবিন্দকে এই মরুভূমিতে পাঠাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন কত রাত্রি তাহা বুঝিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বুঝিল, রাত্রি গভীর হইয়াছে। সকলেই যে যার গৃহে নিঃশব্দে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তাহাকে কেহই পড়িতে বা খাইতে ডাকে নাই। না কাকা না কাকী। এমন সময়ে নিকটের গীর্জ্জার ঘড়িতে সুর করিয়া পাঁচটা বাজিয়া গেল। গোবিন্দ তাহার চক্ষু মুছিল। ওঃ, রাত্রি তো ভোর হইল প্রায়। এই পাঁচটার পর ছয়টায় তাহাদের দেশের একটি ট্রেন আছে। বাড়ীর কথা মনে পড়িতেই সে সহসা উঠিয়া বসিল। না, সে আর এখানে থাকিবে না। সে এই ছয়টার গাড়ীতেই দেশে ফিরিয়া যাইবে। চুপিচুপি তাহার ছোট্ট ক্যাশ-বাক্সটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আসিবার সময়ে এই বাক্সটি তাহাকে তাহার মা দিয়াছিলেন।

সে যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে খররৌদ্র পড়িয়াছিল। ভোরবেলা হয়তো একপশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। একটি রাখাল বালক বটের ঝুরি ধরিয়া নিবিড় আরামে দোল খাইতেছিল। পাশ দিয়া একটি গরুর গাড়ী চাকার শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। দুটি শালিকপাখী ডাকাডাকি করিয়া মাঠের উপর লুকোচুরি খেলিতে লাগিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া দেখিল তাহার মা উনানে আগুন দিতেছেন। ফুঁ দিয়া দিয়া তাঁহার চক্ষু জ্বালা করিতে লাগিল। অজস্রধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি অকস্মাৎ গোবিন্দকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, চলে এলি যে বড় ?

গোবিন্দ মার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিল। তারপর বলিল, তোমায় ছেড়ে আমি আর কখ্‌খনো সেখানে যাব না।

মা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, তাই হবে বাবা। আমি আর তোমায় হাতছাড়া করছি না। এ কি হয়েছে চেহারার ছিরি।

গোবিন্দ একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। তার মুখ দিয়া আর কোন কথা সরিল না।

প্রাবল্য

কথাটি শুনিয়া মন খারাপ হইয়া গেল। পাশের ঘরের বধূটির মেয়ের নাকি ভারী অসুখ। দিন দশ ধরিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহার অনিন্দ্যসুন্দর হাস্যমুখর মুখখানি দুর্ভাবনার ছায়াপাতে ম্লান হইয়াছে। তাহার অনর্গল কলকণ্ঠ ক্লান্ত হইয়াছে। সে প্রভাত হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত কত অসংখ্য গল্প করিত--হাসিয়া হাসিয়া খুন হইত। আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া আমাদের নিঃসন্তান সংসার-জীবন বহিয়া যাইতেছিল।

রমার বয়স বেশী নয়, বড় জোর বছর একুশ হবে। কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে রীতিমত পাকা গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কথায় এবং কর্মে সর্বত্র সেই আভাস পাওয়া যায়। রবিবারে দাড়ি কামাইলে নাকি শরীরের বৃদ্ধি কমিয়া যায়, বৃহস্পতিবারে আমিষ ভক্ষণ করিলে কোন্ এক দুষ্ট দেবতার কোপে পড়িতে হয় ইত্যাদি অগণিত বিধিনিষেধের বেড়াজালে নিজেকে বদ্ধ করিয়া অতি সন্তর্পণে সে দিন গুণিয়া যাইতেছিল। তিন প্রাণীর সমবায়ে তাহার ক্ষুদ্র সংসার গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে···তাহার কর্মব্যস্ত স্বামী···ও স্বর্গের পরীর মত ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়ে। এখনও তাহার ঠিকমত কথা ফুটে নাই। বয়স অতি অল্প বলিয়া টলিয়া টলিয়া চলিতে থাকে। কারণে অকারণে রাঙা ঠোঁটদুখানি কাঁপাইয়া হাসিয়া

ওঠে। তাহার নামকরণ করিয়াছে 'কমলা', কিন্তু সচরাচর ডাকে 'কমলি' বলিয়া।

আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সে কমলাকে বড় ভালবাসে। অষ্টপ্রহর তাহাকে কাছে কাছে রাখিয়া দেয়। তাহাকে খাওয়ানো, স্নান করানো সমস্ত খুঁটিনাটির ভার আমার স্ত্রী স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। সারাদিন সে আমাদের ঘরেই থাকে। রাত্রে তাহার মা আসিয়া ডাকে, কমলি কোথায় দিদি?

স্ত্রী কহিল, ঘুমুচ্ছে ভাই।

রমা বলিল, রাতেও রেখে দেবে নাকি?

স্ত্রী কহিল, থাকত যদি তো রাখতুম; কিন্তু ভাই, রাতদুপুরে মার জন্যে যদি কাঁদে!

রমা কহিল, অত আস্কারা দিও না দিদি।

স্ত্রী কহিল, আস্কারা নয় ভাই, আস্কারা নয়। তুমি ছেলেমানুষ, ছেলে মানুষ করার কি জান?

রমা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, কি মিথ্যুক গো তুমি। ছেলে মানুষ করার সব কিছু তোমার জানা আছে বুঝি? না জানি পেটের পাঁচটা হলে কি দেমাকই না হত!

স্ত্রীর মুখ মুহূর্তের জন্য পাংশু হইল। তাহার বক্ষ দলিয়া পিষিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইল। রহস্যের ছলে কথাটি মুখ দিয়া বাহির হইয়া আর একজনকে যে এরূপভাবে আঘাত করিতে পারে, রমা হয়ত তাহা জানিত না। ঐ শব্দগুলি জোড়া দিয়া একটি যে বিশ্রী শ্রুতিকটু বাক্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা রমার অবিদিত ছিল। সে অপ্রস্তুতে পড়িল। আমার স্ত্রীর হাতদুখানি চাপিয়া ধরিয়া করুণ সুরে মিনতি করিল, রাগ করলে দিদি? আমি না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি।

রমার কাতর মুখ দেখিয়া স্ত্রীর পাষাণ-হৃদয় দ্রব হইল। সে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি আনিয়া কহিল, ওমা! কি এমন মন্দ কথা বলেচ ভাই? ও আমার বরাত। তবে কি জান, মেয়েটা আমায় একেবারে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলেছে।

রমা কহিল, ওর মা যে কে তাই ও ভাল করে বুঝতে পারে না। আর জন্মে তুমি ওর মা ছিলে নিশ্চয়।

স্ত্রী কহিল, মাইরি বলছি, বিচ্ছেদ যদি আমাদের মধ্যে কখনও হয় তো তোমার আমার সঙ্গেই হবে। কমলি যেন তার মধ্যে জড়িয়ে না পড়ে। ও যেখানে খুশী থাকবে।

রমা হাসিতে লাগিল, বলিল, এখন থেকে অত ভাবনা নেই তোমার দিদি। দেখে নিও ও ঠিক তোমার কাছেই থাকবে।

স্ত্রী কহিল, ওকে দু'দণ্ড না দেখতে পেলে আমার বুকের ভেতরটা কেমন কেমন করে।

আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী কিসের জোরে কমলিকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিল। কেমন করিয়া দিনে দিনে পলে পলে তাহার ঊষর বাৎসল্যবর্জিত জীবন-মরুতে স্নেহপ্রেমের বিরাট মহীরুহ সৃষ্ট হইল? কেমন করিয়া তাহার নিষ্ফল হৃদয় নিঃস্বার্থ-ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া একজন অচেনাকে দুহাত দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিল। সত্য কথা

বলিতে কি, আমার স্ত্রী কমলিকে তাহার জননীর চেয়ে বেশী ভালবাসিত বলিয়া বোধ হইত।

একদিন স্ত্রী কমলিকে কোলে শোয়াইয়া দুধ খাওয়াইতেছিল। তাহার মুখের মধ্যে ঝিনুক পুরিয়া কহিল, তুই দিন দিন ভারী দুষ্টু হচ্ছিস বাপু। বসে দুধ খেতে শিখবি কবে?

আমি কহিলাম, শ্বশুর বাড়ী গিয়ে।

স্ত্রী আমার প্রতি একটি বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কহিল, তুমি থাম দিকিন। দেখছিস তো কমলি, তোর জন্যে লোকের পাঁচশো কথা শুনতে হয়। দাও দিকি গামছাটা, মুখ হাত পা মুছিয়ে দেব।

গামছা দিয়া কহিলাম, অতটা ভাল নয় সরো।

সরো অর্থাৎ সরোজিনী, আমার স্ত্রী। কহিল, মানে?

মরীয়া হইয়া বলিলাম, যাই হোক, পর ভিন্ন তো আর কিছু নয়।

আমার মুখ দিয়া আর কথা সরিল না, তাহার অবকাশও পাইলাম না। স্ত্রী তীব্রস্বরে প্রতিবাদ করিল, তোমার ঐ এক সৃষ্টিছাড়া কথা। দেখ, ও অলক্ষুণে কথা আমায় কখনও বলো না। আমার কমলি-মাকে তুমি পর ভাবতে পার, কিন্তু আমি পারি না। মরে গেলেও পারব না। কমলি, তুই আমায় পর ভাবিস?

কমলি নেহাৎ ছেলেমানুষ। সংসারে এই সব তীক্ষ্ণ বাক্যের অর্থ জানিত না। সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, ধ্যেৎ!

সুতরাং আমার একটিও কথা বলিবার রহিল না।

কমলাকে মধ্যস্থ করিয়া আমাদের দাম্পত্যজীবনে মাঝে মাঝে কলহ হইত। আজ তাহার খেলনা চাই—কাল তাহার পোষাক চাই—তার পরদিন জরির জুতো চাই। এই অসংখ্য অভাব অভিযোগ পূরণ করিতে করিতে আমি অস্থির হইয়া উঠিতাম। আমি মানুষ—অমন নিঃস্বার্থভাবে জানিয়া শুনিয়া পরের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে রাজী নই। স্ত্রী কহিত, তোমার হাত দিয়ে যদি জল গলে!

আমি কহিলাম, যেন জন্মে জন্মে না গলে।

স্ত্রী কহিল, ছিঃ! ছিঃ! লোকে বলবে কি?

কহিলাম, জান, বেচারা কাক কোকিলের ডিমে তা দেয়!

আসলে আমি কমলিকে আদৌ সুনজরে দেখিতাম না।

এহেন কমলির নাকি অসুখ—অসুখ নাকি সহজ নয়, কারণ ডাক্তার পর্য্যন্ত মুখ ঘুরাইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে নাকি আরও আগে দেখানো উচিত ছিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া কহিলাম, বল কি? আগে তো শুনি নি!

বিশুষ্ক মুখে স্ত্রী কহিল, মা আবাগী কি বলেছে সে কথা?

আমি কহিলাম, বড়ই দুঃসংবাদ।

স্ত্রী যুক্তহস্ত ললাটে ঠেকাইয়া কহিল, মা মঙ্গলচণ্ডী! তুমি আমার বাছাকে ভাল করে দাও মা।

ব্যস্তভাবে বাজারের থলি খুঁজিতে খুঁজিতে কহিলাম, বাজার থেকে আজ কি আনবে বল তো?

স্ত্রী কহিল, আজ আর বাজারে গিয়ে কাজ নেই। তুমি বরং দুটো চিঁড়ে-মুড়কি খেয়ে আজ আপিস যাও।

কহিলাম, আর তুমি?

স্ত্রী কহিল, আমার কথা আমি ভাবব।

অগত্যা ফলার খাইয়া সেদিন যথাসময়ে আপিসে হাজির হইলাম। যাহা হউক, সেখানে তো আর স্নেহমমতার বালাই নাই—সেখানে স্ত্রীর ন্যায় আখার খাটিবে না। আত্মীয়-স্বজনহীন, শূন্য প্রাণহীন, কর্মমুখর আপিস।

কমলির অসুখ আঁকাবাঁকা পথে মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে আগাইয়া চলিল। আমার স্ত্রীর মন সংসারে আর বসিল না কিছুতেই—ভাত গলে না কিংবা গলিয়া যায় অত্যন্ত; তরকারিতে ঝাল বেশী হয় কিংবা ঝালই হয় না; হয়ত নুন বেশী হয় কিংবা আদৌ হয় না। স্ত্রীর তো ঠিকমত খাওয়াই হয় না। প্রাণধারণের জন্য ঐ যা দুবেলা দুটো দাঁতে কাটা। রাত্রি-দিন সে অক্লান্তভাবে কমলির সেবা করিতে লাগিল। আমি একদিন কহিলাম, শেষকালে তুমিও কি পড়বে!

স্ত্রী উদাস কণ্ঠে কহিল, জানি না।

বলিলাম, জানি না নয়। অমনি করে মিছিমিছি নিজের বিপদ ডেকে এনো না।

স্ত্রী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, কি পাষাণ গো তুমি!

সুতরাং সেইখানেই সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়া গেল

সেদিন রবিবার।

বিকালবেলা স্ত্রী কহিল, আমি উনুনে আগুন দিচ্ছি। কোথাও যেও না যেন। সকাল সকাল আজ খেয়ে নাও।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া মুক্তার ন্যায় অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল, ভাঙা ভাঙা সুরে সে কহিল, কি জান, আজ যেন মেয়েটাকে ভাল বুঝছি না। সত্যি আমার হাত পা অবশ হয়ে গেছে। কোন কাজ আর ভাল লাগছে না।

সন্ধ্যার পরই খাইতে বসিলাম। অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে, এমন সময়ে পাশের ঘরে রমা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে কমলারে, তুই কোথায় গেলিরে?

সেই বিচ্ছেদবেদনাবিধুর ক্রন্দন-শব্দে আকাশ বাতাস ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিল, তাহার হাত হইতে ভাতের থালা পড়িয়া গেল। সে জড়িতকণ্ঠে কহিল, পাতের গোড়ায় একটু জল দাও।

আমি স্ত্রীর কথা পালন করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। স্ত্রী কহিল, ওকি, খেলে না যে বড়?

বলিলাম, পাষাণ গলে গেছে।

স্ত্রী নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করিল। পরক্ষণেই মিলিত কণ্ঠে দুইজনে ঘোর রবে দিকে দিকে মৃত্যুর বার্তা পৌঁছাইয়া দিল। রমার স্বামী সমস্ত পুরুষত্ব খোয়াইয়া ঘরের কোণে বসিয়া বার বার ডুকরাইয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। আমি হেন নিষ্ঠুর ব্যক্তিরও চক্ষু যেন ছল ছল করিয়া উঠিল। কমলি এ মরজগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সহস্র ব্যাকুল আহ্বানেও সে ফিরিয়া আসিবে না। এ কথা স্মরণ করিতে কোথা হইতে এক অনির্দেশ্য উদ্বেল বায়ু কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের পথ বহিয়া আসিয়া মধ্যপথ হইতে কেন জানি ফিরিয়া গেল। আমার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিলাম—কখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিলাম, সমস্ত কর্তব্যভার আমার উপরই ন্যস্ত হইয়াছে। আমি না করিলে কমলির সৎকারের কোন সম্ভাবনা নাই। কমলির বাপের নিকট গিয়া বলিলাম, রবীনবাবু, আপনি একটু স্থির হোন।

স্থির হওয়া তো দূরের কথা, রবীনবাবু বালকের ন্যায় আমায় জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হইয়া উঠিল, কি হবে দাদা!

প্রবোধ দিলাম, আঃ! আপনার এত বিচলিত হলে চলবে কেন? আপনি পুরুষ-মানুষ। জানেন তো ভগবান বলেছেন, 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।'

কথাটা নিজের কানেই যেন বিঁধিতে লাগিল। আমার কথায় কোন কাজ হইল না। রবীনবাবু বিন্দুমাত্র তাহাতে কর্ণপাত করিল না।

সুতরাং আমি লোক-সংগ্রহের জন্য বাহির হইলাম। নটার সময় ফিরিয়া সেই একটানা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। সেই সুর করিয়া করিয়া পরপারবর্তী বধির যাত্রীর নিকট অসংখ্য অভিযোগ। দেখিলাম, ইহার মধ্যেই আমার স্ত্রীর গলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সে মেঝের উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, ওরে কমলিরে, পর বলে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয় রে;

আর রমা? তাহাকে দেখিয়া অবাক হইলাম। সে কমলির বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে·· তাহার কণ্ঠস্বর বিকৃতপ্রায় হইয়াছে—তাহার চক্ষু দুটি ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া গিয়াছে···পিঠের উপর জমকাল চুলগুলি লুটাইয়া পড়িয়াছে।

স্ত্রী কহিল, বাছার একখানা ফটো তুলে রাখ গো। তা না হলে আমি কখনো বাঁচব না।

সুতরাং একখানি ফটো তোলা হইল। সেই নিমীলিত চক্ষু, বিবর্ণ মুখের বীভৎস ছবি। সঙ্গীদের মধ্যে একজন বলিল, ঐটুকু মেয়ের আবার ফটো তোলা কেন?

স্ত্রী মেঝের উপর মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে সুর সপ্তমে চড়াইয়া কাঁদিল, ওরে কমলি রে, তুই কেন অভিমান করে চলে গেলি রে?

কঠিন মেঝের আঘাতে কোমল কপাল ফুলিয়া উঠিল। তাহার সেই অশ্রান্ত ক্রন্দন, সেই আর্তনাদ যেন মর্তভূমি ত্যাগ করিয়া অন্তহীন ইথার-সমুদ্র বহিয়া স্বর্গের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া ইহজগতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আমরা নিষ্ঠুরের ন্যায় নিজেদের কর্তব্য পালন

করিতে লাগিলাম। রমার বুক হইতে তাহার প্রাণের পুত্তলীকে মূর্ত্তির বিক্রমে ছিনাইয়া লইলাম। নিস্তেজন রমার শরীর স্পন্দিত হইল। সে কাতর ভাগর রাঙা চোখদুটি তুলিয়া মিনতি করিল, না—না—না। আমি যেতে দেব না।

মুহূর্তের জন্য আমার হাত অবশ হইল, সমস্ত কর্মশক্তি শিথিল হইল। ভবতারণ কহিল, সব মাটি করে ফেলছ খুড়ো। পুরুষমানুষের অত কোমল হলে চলে না। সরো ছিকিনি।

রমা 'মাগো' বলিয়া মেঝের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আমার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া আমাদের পা আঁকড়াইয়া ধরিল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সোনামাণিকে আমার? আমি প্রাণ থাকতে যেতে দেব না। তার আগে আমার মরণ হোক গে।

তাহার কথায় কর্ণপাত করিলাম না। অবকাশও আর ছিল না।

সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল। হাঁ, মার চেয়ে মেয়েটাকে বেশী ভালবাসত সরোজিনী —আমার সহধর্মিণী। আঘাতটা নাকি তাহাকেই বেশী করিয়া হানা দিয়াছে।

সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া সরোজিনী একটানা স্বরে শোক করিয়া চলিল। মুখে তাহার খাদ্য রুচিল না···রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হইল···মধ্যাহ্নে সাংসারিক কর্মে অবহেলা করিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ফটোখানি বুকে চাপিয়া কমলিকে কতরূপে কত ছলে এই ধরাতলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহার ক্লান্তিহীন শোকের গভীরতা দেখিয়া আমারই ভাবনা হইল। একদিন বলিলাম, সরো, তুমি একটা কথা শোন।

সে অশ্রু-সজল চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, কি?

বলিলাম, নিজেকে তোমার বাঁচতে হবে। বল, এমনি করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করলে কি কমলি ফিরে আসবে? না আসতে পারে?

সরোজিনী অসহায়ের মত হতাশ স্বরে বিষণ্ণভাবে বলিল, সত্যি আর সে আসবে না?

বলিলাম, পাগল! কখন কি কেউ এসেছে? তুমি জেনেশুনে এমন ছেলেমানুষের মত কাজ কর। লক্ষীটি আমার কথা শোন, দুটি খেয়ে নাও, কথার অবাধ্য হয়ো না।

কত সাধ্য-সাধনা করিলাম। আশপাশের কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া অজস্র সান্ত্বনা দিতে লাগিল। তখন স্ত্রী বহুকষ্টে জীবনধারণের জন্যই যা দুটি অন্ন মুখে দিল। সরোজিনীর শোকাতিশয্যে সকলেই রমার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কমলির বিচ্ছেদ-বেদনায় তাহার যে বত্রিশ নাড়ী মোচড়াইয়া অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করিতে পারে, যাহা কোনরূপ প্রলাপেই আরোগ্য হইতে পারে না - তাহা ভাবিবার আমাদের ফুরসৎ ছিল না।

এই ঘটনার মাস দেড়েক পর একদিন আপিস হইতে ফিরিয়া আমি স্ত্রীর পানে চাহিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তাহার মুখ দুর্ভাবনায় শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া বসিতেই বলিল, একটা কথা বলি শোন। হেসে উড়িয়ে দিও না।

বলিলাম, কি কথা শুনি ?

সরোজিনী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল, আর একটা বাড়ী দেখ, এ বাড়ীতে আর একদণ্ডও থাকতে পারব না, মাইরি বলছি।

কথাটি আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। বাড়ী-বদল সহজ ব্যাপার নয় কোন মতেই। পাঁচ বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অনড় অবস্থায় এইখানে রমাদের সন্নিকটে দুটি পরিবারের স্নেহবন্ধনে দিনযাপন করিতেছিলাম। আজ অকস্মাৎ সেই সুগঠিত পরিপাটী নীড় ভাঙ্গিবার আদেশ হইল। দুর্ব্বাসার অভিশাপ বোধ হয় এ আদেশের সহিত তুলনীয় হয় না। বিচলিত চিত্তে কহিলাম, অপরাধ ?

স্ত্রী তখন বিশদভাবে অপরাধ ব্যাখ্যা করিল। সে এক অভিনব অপরাধ। কেন জানি না, রমা কমলির ব্যবহৃত বিছানাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। সেই বিছানার উপর শুইয়া কমলি নাকি নিশ্চিন্ত আরামে দেহত্যাগ করিয়াছিল। সরোজিনী তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। এমন কি ফটোতে পর্য্যন্ত তাহার ছবি উঠিয়াছে। রমা সেই বিছানাগুলি প্রতিদিন নাড়িয়া-চাড়িয়া কারণে অকারণে কাঁদিতে থাকে। সেগুলিকে সযত্নে পবিত্রভাবে বাক্সের মধ্যে তুলিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী কহিল, সত্যি বাপু, ও আমি কখনও সহ্য করতে পারব না। ছিছি রি-রি কচ্ছে। একটু বাছ-বিচার নেই। আমার ঠাকুর রয়েছে, দেবতা রয়েছে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজই তুমি বাড়ী ঠিক করে এস।

কথাটি শুনিতে যা বলিতে খুব সহজ। কহিলাম, রমারা কি মনে করবে সরো ?

সরোজিনী বলিল, তাই বলে তো আমি ইহপরকাল খোয়াতে পারি না। জেনেশুনে পাপ করি কি করে বল।

বলিলাম, কমলিকে তুমি না রমার চেয়ে বেশী ভালবাস ? আড়াই টাকা দিয়ে তো ফটো তুললে !

সরোজিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ওগো, দোহাই তোমার, আর দগ্ধে মেরো না। এই নাও কমলির ফটো। বেঁচে থাকতে তো একদিনও বাছাকে আমার একটুও ভালবাস নি। মরে গিয়েও তার রেহাই নেই।

কথার শেষে সে কমলির ফটোখানি নিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বাতাসে ভর করিয়া সেই ফটো দূরে উড়িয়া গেল।

অগত্যা আমায় সে বাড়ী অচিরেই ত্যাগ করিতে হইল। রমাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল। জানিয়া শুনিয়া তো আর পাপ করিতে পারি না। আচার-বিচার আগে, না আগে ভালবাসা।

আশ্চর্য্য মানুষ !

বাঁশি

আজও আবার সেই ভাঙা বাঁশিটা লইয়া গোল বাধিল। বহুদিনের একটা পুরাতন বিবর্ণ পিতলের বাঁশি। মুখের দিকটা খানিক ভাঙিয়া গিয়াছে, ছিদ্রগুলি আর নিখুঁত হইয়াও নাই, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনায় ফেলিয়া দিলেই হয়। এমন একটা পুরানো বাঁশি ছোট বউ কেন এমন আঁকড়াইয়া থাকে, একথা বহুবার ভাবিয়াও সুলেখার শাশুড়ী কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই। প্রায়ই এই বাঁশিটা লইয়া গোল বাধে। আর লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা ছেলেটাও যদি কথা শোনে—না, ঐ বাঁশিই তার চাই।

আজও গোল বাধিল। সুলেখা অনেক যত্নে, টুলের উপর দাঁড়াইয়া অনেক কষ্টে বাঁশিটাকে খুব উঁচুতে তুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। খোকা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে এবং ঘরের মেঝেতে বসিয়া অবাধ্য কাঠের ঘোড়াকে তাহা দ্বারা সজোরে আঘাত করিতেছে।

সুলেখা ঘরে ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ভাবিল কিছু বলিবে না। কিন্তু কেমন একটা তীব্র বেদনা তাহার সমস্ত মনের গহনে ম্লান হইয়া উঠিল। নিকটে এবং দূরে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে কিসের এক কল্যাণময় সুর যেন শ্রান্ত গতিতে বাজিতে লাগিল। করুণ সুর কিন্তু সজীব।

সুলেখা খোকার নিকট আগাইয়া গেল। গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে আস্তে আস্তে বলিল: তোকে একটা নূতন বাঁশি এনে দেব···

খোকা জবাব দিল না। ঘোড়া কিছুতেই চলিতেছে না, তাহা লইয়া সে ব্যস্ত। সে ঘোড়ার উপর কয়েক ঘা লাগাইয়া বলিল—চল ঘোড়া। চল, হ্যাট—

সুলেখা বলিল—লক্ষ্মীটি! দে।

মুখ ঘুরাইয়া খোকা বলিল—না। এবং এই 'না' বহু চেষ্টায়ও 'হাঁ'তে পরিণত হইল না। বাঁশির এই অযত্ন সুলেখা সহিতে পারে না···

হাত হইতে বাঁশিটা টানিয়া লইল—তোকে পয়সা দেব। দে।

খোকা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। কিন্তু সুলেখারও যেন আজ কি রকম এক রোক চাপিয়া গিয়াছে: বাঁশি তার চাই, চাই-ই। সে খোকার গালে অকস্মাৎ রাগের বশে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া গোটাকতক চড় মারিয়া বলিল, হতভাগা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, কথা শোনে না! কী হবে তোর এ ভাঙা বাঁশি নিয়ে? সেদিন কিনে দিলাম—সেটায় হবে না, এটা চাই। লক্ষ্মীছাড়া!

বলিয়া সুলেখা খোকার পিঠে আরও কয়েকটা চড় বসাইয়া দিল। চড় খাইয়া খোকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শব্দ শুনিয়া মা আসিলেন এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই নিত্যনৈমিত্তিক উপভোগ্য ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিতে ভুলিলেন না।

পিসী এ বাড়ীতে বহুকাল ধরিয়া আছেন এবং বড় বৌয়ের দিকে টানিয়া মনরক্ষা করিয়াই চলিতে অভ্যস্ত।

পিসী বলিলেন, তোমার যে কবে জ্ঞানগম্যি কিছু হবে, তা এতটা বয়স হলেও আমি বুঝলাম না ছোট বউ।

সুলেখা কথা কহিল না। চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বড় বৌ আজ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। ছোট বৌ সুলেখাকে অত্যন্ত স্নেহ করিলেও এবং তাহাকে ছোট বোনের মত দেখিলেও, খোকার পিঠের দাগগুলি দেখিয়া যার হৃদয় সহসা কাঁদিয়া উঠিল। তিনি টান মারিয়া প্রাচীরের উপর দিয়া বাঁশিটা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন।

সুলেখা আপত্তি করিল না। একটা প্রতিবাদও তুলিল না। যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল ঠিক তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সমস্ত চোখে মুখে এক নিদারুণ বেদনা জাগিয়া উঠিল। বর্ষার দিনে সমস্ত আকাশ যেমন করিয়া মেঘ-ভারাক্রান্ত হইয়া সজল নয়নে চুপ করিয়া থাকে, তেমনি গাঢ় বেদনায় সে একান্ত নিরুপায়ের মত চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া কালো আবছা অন্ধকার নামিয়া আসিল। দূরের গাছটার পাশ দিয়া সূর্য্যদেব নামিয়া যাইতেছেন: সব কিছুর মধ্যে আজিকার মতো বিদায়ের ধ্বনি।

সুলেখা ছাদে আসিয়া ছাদের আলিসা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যেন কিছু ভাল লাগে না। এই পরিপূর্ণ সন্ধ্যা, এই মিষ্টি সুন্দর হাওয়া, এই আলো, এই বাতাস—সব কিছু যেন তিক্ত বেদনায় ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসে রোজকার মতো আছে সেই সুর, সেই ছন্দ; তবু যেন ভালো লাগে না। হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী যেন কিসের আবাহনে আবার নিবিড় হইয়া উঠিল; বিগত জীবনকে সে কত ভাবে কত দিক দিয়া ভুলিতে চাহিয়াছে, কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে সযতনে নিয়োজিত রাখিবার কত প্রচেষ্টাই না সে দিনরাত করে—তবু পারে না। ঐ বাঁশিটাই যেন তাহাকে সজোরে তাহার গত জীবনের মধ্যে লইয়া আসে।

সুলেখা ছাদ হইতে সেই বাঁশিটার দিকে তাকাইয়া রহিল। একটা ইটের উপর বাঁশিটা চুপ করিয়া শুইয়া আছে। সুলেখার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। মনে ভাবিল: ভালই হইল। ঐ অলুক্ষণে সর্ব্বনাশা বাঁশিটাই যত নষ্টের গোড়া; ওটাই কিছুতেই তাহার বিগত জীবনকে ভুলিতে দেয় না। ভালই হইল।

কিন্তু তবু যেন কিসের এক নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ণ সুর তাহার কানে আসিয়া বাজিতে থাকে। সে সব কিছু ভুলিয়া যায়।

মনে পড়িতে লাগিল সেই দিনের কথা, যখন এ গৃহে প্রথম সে আসে। বয়স আর তখন কতই বা হইবে ওই বছর পনের বা ষোল—বা তারও কম।

স্বামীকে মনে পড়ে। মনোজ যেন আজও তার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর, গৌর

চেহারা। বনোজ : তার স্বামী। তার স্বামীকে মনে পড়িয়া যায়।

আরও ধীরে ধীরে অনেক কথাই তার মনে পড়িতে লাগিল। এই বনোজ কি দুষ্টুই না ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা তাহার খোঁপা খুলিয়া দুষ্টুমি করিয়া এমনি হাজারো রকমের কী বিরক্তিই না করিত। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া সে বলিত, সুলেখার মনে পড়িতে লাগিল—তোমাকে একটি মুহূর্ত পাওয়া যায় না, কেমন মেয়ে তুমি ?

সুলেখা বলিত, দিনরাতই ত কাছে আছি, তবু পাও না ?

না পাইনে ত। এই বুঝি দিনরাত ?

সুলেখা অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিত।

এই বুঝি দিনরাত কাছে থাকা, বনোজ বলিত, হিসেব করে দেখ ত আজকে কতক্ষণ তুমি কাছে ছিলে। সেই ভোরে মিনিট খানেক—দুপুরে তিন সেকেণ্ড, আর এই এসেই, যাই আর যাই।

সুলেখা প্রতিবাদ করিত না। কারণ, করিয়া লাভ নাই। বলিত, মা বসে আছেন সেই কখন থেকে, আর-আর-ওরা সবাই বা কি ভাববেন, যাই।

এমনি কতো টুকরো টুকরো কাহিনী মনে পড়িতে লাগিল।

কিন্তু বনোজের একটি প্রিয় জিনিস ছিল—বাঁশি বাজানো। তন্ময় হইয়া সে বাঁশি বাজাইত এবং এই একটিমাত্র সময়েই সে সব কিছু ভুলিয়া যাইত—সংসার মুছিয়া যাইত দৃষ্টির সম্মুখ হইতে, সমস্ত কিছু সুরের ছন্দে নাচিয়া বেড়াইত। কী সুন্দর বাজাইতেই না সে জানিত। সুরের উপর সুর সৃষ্টি করিত এক অপরূপ রূপ-জগতের, যেখানে আর কাহারও স্থান ছিল না, সুলেখারও নয়। এ সময় সুলেখা আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেও সেই দিকে তাহার বিন্দুমাত্র খেয়াল হইত না—হয়তো চোখ পড়িয়াও পড়িত না।

এই সুরের রাজ্যে বনোজ ছিল একান্তই একক। ইহার গণ্ডী পার হইয়া সুলেখাও কখনও সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এইখানেই ছিল তার দুঃখ। সে স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইত, বনোজ একবার ফিরিয়াও তাকাইত না।

সুলেখার রাগ বাড়িয়া যাইত। সে হয়তো টান মারিয়া বাঁশিটি তাহার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইত। দু-একবার একটু আপত্তি তুলিয়া বনোজ চুপ করিয়া থাকিত। সুলেখাকে সে এতই ভালবাসিত যে অত্যন্ত রাগ হইলেও কখনও তাহাকে বাধা দিতে পারিত না, বলিত, সু—তুমি অমন করে কখনও বাঁশি কেড়ে নিও না আমার কাছ হতে।

সুলেখা জয়ের আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিত, বাঁশি তুমি আর কখনও বাজাতে পারবে না।

ম্লান ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া সে বলিত : কেন ?

সুলেখা রাগিয়া বলিত, কেন দিনরাত শুধু বাঁশি বাজাবে তুমি ? আমি কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

বনোজ কোলের কাছে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইত। আদর করিয়া বলিত, এই কথা! বেশ ত। এসো।

বলিয়া এমন দুষ্টুমিই করিতে আরম্ভ করিত যে বাধ্য হইয়া সুলেখা বলিত, তোমার কেবল দুষ্টুমি, ছাড়ো।

বাঃ! তোমার সাথেও দুষ্টুমি করতে পারবো না?

না।

বেশ, বনোজও হাত পা ছড়াইয়া চুপ করিয়া নির্ব্বিকার হইয়া বসিত। বেশ, না করলাম, বলিয়া বাঁশিটি হাতে তুলিয়া লইত।

থাঁ করিয়া সুলেখা আবার তাহা কাড়িয়া হইয়া বলিত, না, এখন থাক বাজানো। বেশ না হয় দুষ্টুমিই কর, কিন্তু দেখ ত এই সন্ধ্যাবেলা—শেষে কে কি বলে বসবে!

বনোজ আদর করিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, কেউ কিছু বলবে না।

এমনি কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল, সে-সব কথা এতো ছোট, এতো ক্ষুদ্র যে কোনটিই মনে রাখিবার মতো নয়—তবুও প্রত্যেক কাহিনী, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি ছন্দ যেন কতো চেনা, কতো পরিচিত।

ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও যেন ভোলা যায় না। স্মৃতির কোন্ অতল দেশ হইতে আপনিই উঠিয়া আসে। বসন্ত ঋতুতে যেমন করিয়া দক্ষিণের বাতাস সমস্ত কিছু ভরাইয়া দিয় যায়, তেমনি করিয়া সেই সব গত কাহিনী মনের কোন্ গহ্বর হইতে উঠিয়া আসিয়া সুরে ছন্দে, গানে এবং প্রাবল্যে, উত্তেজনায় আর আনন্দে তাহাকে মাতাইয়া দিয়া যায়, তাহাকে বিভোর করিয়া তোলে। সে আচ্ছন্ন হইয়া যায় সেই রূপের মোহে, সেই সুরের ধ্বনিতে, সেই ছন্দের বিচিত্র বর্ণে এবং গন্ধে।

ভুলিতে চাহিলেও ভোলা যায় না।

এমন করিয়া কত কি সুলেখা ভাবিতেছিল।

নীচ হইতে মা ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বৌ ডাকিলেন, ও ছোট, কোথায় তুই? নীচে আয়।

সুলেখা ডাক শুনিয়া নীচে আসিল। বড় বৌ বলিলেন, তোমার জন্যেই খোকাটা অত বাড় বেড়েছে, এখন বোঝ মজাটা। একদিন তুমি না খাইয়ে দিলে চলবে না, ভাত নিয়ে কতক্ষণ সাধাসাধি হলো। খাবে না।

সুলেখা কোন কথা বলিল না, খোকাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। ইহাকে খাওয়ানো একটা মহাযুদ্ধ জয় করা হইতে কম নয়। এবং একমাত্র সুলেখাই তাহা পারে। খাইতে বসিয়া অন্ততঃ সহস্র আবদার রক্ষা না করিলে সে কিছুতেই খাইবে না। সুলেখা ইহা জানে, কিন্তু আজ তার কোন দিকে ভাল লাগিল না। বলিল, বুড়ো ছেলে এখনও নিজে খেতে শেখেনি, পারব না আমি তোকে রোজ খাওয়াতে, খা!

সুলেখা বুঝিতে পারিল আজ খোকার ভাল করিয়া পেট ভরে নাই। কিন্তু কোন কথা

বলিল না, রাগ করিয়া এমন করিয়াছে একথা মিথ্যা কেন ভাল লাগিল না। যাকে এক মুঠা বেশী খাওয়াইবার জন্ত উদ্বেগের আর তাহার অন্ত থাকে না, আজ তাহাকে পেট ভরিয়া খাওয়াইয়া দিতেও যেন কেমন এক বিশ্রী আলস্ত। মনের সমস্ত কিছু ভরিয়া শুধু বনোজ। শুধু মাত্র বনোজ, আর কেউ নাই। এই পৃথিবী, এই বিরাট জগতের যা কিছু সব আজ নিঃশেষে এই বিধবা তরুণীটির নিকট হইতে মুছিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র 'বনোজ' আজ সেখানকার অধীশ্বর, কেউ আর কোথাও নাই। সব ফাঁকা, সব খালি।

খোকার খাওয়া-পর্ব্ব শেষ হইলে সুলেখা সংসারের ছোটখাটো কাজ করিল। আজ কাজ করিতেও কেমন এক বিতৃষ্ণা। দেখিল, মায়ের সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত এখনও হয় নাই। খোকার এবং অন্তান্তের বিছানা খালি পড়িয়া আছে, চাদর পাতা হয় নাই। বড় ঠাকুরের আসিয়াই গামছা চাই, অথচ র‍্যাকে গামছাটা পর্য্যন্ত ঝোলান নাই।

এসব কাজ সুলেখাই করে, এবং করিতে না পারিলে দুঃখিতও হয়। কিন্তু আজ কিছু ভাল লাগিল-না, কেমন যেন একটা অবসাদ, সমস্ত মাথার ছিদ্র দিয়া যেন অন্ত কাহারও কথাই মনে ঢুকিতে লাগিল।

ছোট ননদ 'মিনু' আসিয়া বলিল—বৌদি, আমার পড়াটা একটু দেখিয়ে দেবে চল না।

চল, বলিয়া তাহাকে পড়াইতে বসিল।

কিন্তু আজকে যেন কিছু ভাল লাগে না, পড়াইতে পড়াইতে অকস্মাৎ কখন মনে পড়িয়া গেল—সন্ধ্যা হইলেই বনোজ ঐ বাঁশিটি লইয়া বাজাইতে বসিত, আস্তে আস্তে সুর তুলিত গানের।

মিনু বলিল, তার পর কি হল বৌদি, কি হবে বলে দাও না।

বৌদি বলিল, বাঁশির ইংরাজী তাও জানো না—

মিনু বলিল, বা, তা বুঝি জিজ্ঞেস করছি?

বৌদির মন অবচেতনা হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, আজ থাক বোন। আজ ভাল লাগছে না। ধীরা কই রে?

কে, বড়দি?

হাঁ।

সে ত আর স্কুল হতে আজ বাড়ী আসেনি।

কেন রে?

ওদের আজ প্রাইজ না কি, বললাম আমাকে নিয়ে যেতে—নিলে না।

বৌদি চুপ করিয়া রহিল।

মিনু বলিল, আজ ওরা হোস্টেলে থাকবে, কাল সকালে আসবে।

আচ্ছা।

ধীরা থাকিলে তাহার সহিত গল্প করিয়া কিছুটা সময় তবু কাটানো যাইত। আজ তাহারও উপায় রহিল না, অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় তখন অমনি করিয়াই হয়।

রাত্রি এদিকে অনেক হইয়া গিয়াছে। আকাশে এক খণ্ড চাঁদ, তাহারই শুভ্র আলোকে সকল কিছু রঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ী-ঘর, দূরের ঐ প্রান্তর সমস্ত কিছুর উপর চাঁদের মিষ্টি আলো। কোমল স্পর্শ।

সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। রাতও কম হইল না। সুলেখার চোখে ঘুম নাই। ঘুম যেন এ রাজ্য হইতে কতদূরে পলাইয়া গিয়াছে—ঘুম নাই। সুলেখা জানালার নিকটে দাঁড়াইল। কিসের যেন একটা মিষ্টি শব্দ কতদূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে। দূরের ঐ পল্লবিত বনানীর শ্রেণী পার হইয়া, ছোট ঝরণাধারাগুলিকে পাশে রাখিয়া কোথা হইতে যেন একটা বাঁশির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

জানালা ধরিয়া সুলেখা চুপ করিয়া রহিল।

আকাশে শ্বেত-শুভ্র অপরূপ জ্যোছনা, রূপার মত ঝক ঝক করিয়া বিছাইয়া গিয়াছে। জানালা দিয়া গলাইয়া আসিয়াছে খানিকটা তাহার ঘরের মধ্যে, এমনি কত রজনীতে কতদিন তাহারা দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়াছে, বাঁশি লইয়া ঝগড়া হইয়াছে। এমনি করিয়া কত বসন্ত, কত বর্ষা, কত গ্রীষ্ম তাহাদের নিকট দিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইয়া গিয়াছে—খুশী করিয়া, হাসি দিয়া, কত ভাবে। কিন্তু তারপরের কথা ভাবিতেও সুলেখার ভয় হয়।

তখন বৈশাখ মাস। এমনি একটা সময়ে বনোজের সর্দ্দি হঠাৎ বসিয়া যায়। তা লইয়া যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু টানাটানিতে এক পক্ষই জিতিতে পারে—জয় হইল বিধাতার। অসুখের সময় বনোজ বাঁশি বাজাইতে চাহিত। ডাক্তারদের বারণে হইয়া উঠিত না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে বনোজ সুলেখাকে কাছে টানিয়া নেয়। বলে, আমার ত সময় হইয়া আসিল। বিদায় দাও, সু!

চোখের অশ্রু মুছিয়া সুলেখা কি বলিতে চাহিতেছিল, পারে নাই।

মৃত্যুর মত হাসি হাসিয়া বনোজ বলিয়াছিল, যদি কিছু হয়—এ বাঁশিটি তুমি রেখে দিও। ওর চেয়ে প্রিয় আমার কিছু নেই।

কাঁদিতে কাঁদিতে সুলেখা বলিয়াছিল—অমন কথা বলবে ত, আমি এক্ষুনি চলে যাব। আমি পারব না রাখতে তোমার বাঁশি।

বনোজ আর কিছু বলে নাই। শুধু বলিয়াছিল—ওকে রেখে দিও।

তারপর কোথা দিয়া কি হইয়া গিয়াছে আজ তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। সুলেখা সে কথা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠে। মাত্র তিন বছর স্বামীর সহিত বাস করিবার পরই তাহার সব ঘুচিয়া গেল : নারী যাহা লইয়া গর্ব্ব করে, সে তাহাকে হারাইল।

তারপর কত বছর কাটিয়া গিয়াছে। কত বর্ষা, কত বসন্ত ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিয়া গিয়াছে। গন্ধভরা উতলা বাতাসে কত দক্ষিণের গানই না রূপের মাধুর্য্যে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সব কিছুর মধ্যেই যেন মস্তবড় একটা দীর্ঘ ফাঁক। কি যেন হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন অভাবে সমস্ত আলো সমস্ত হাসি একটা বিরাট মিথ্যা হইয়া তাহার নিকট দেখা দেয়।

কিন্তু প্রত্যহ রাতে যেন কে আসিয়া ঐ বাঁশিটি বাজায়। সুলেখা ঘুমাইয়া পড়িলে যেন কাহার সজীব হস্তে বাঁশিতে সুর আরম্ভ হয়। জাগিয়া থাকিলে বাঁশি বাজে না। কিন্তু ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া প্রত্যেক রাত্রে সে ঐ বাঁশির শব্দ শুনিতে থাকে। তাহার বৈধব্য-জীবনের মধ্যে এই একটি মাত্র সান্ত্বনা। যাহা লইয়া সে আজও বাঁচিয়া আছে।

আজ তাহার মনে হইতে লাগিল কতদূর হইতে একটা বাঁশির করুণ সুর যেন ভাসিয়া আসিতেছে। কি করুণ সে সুর! প্রতিটি রেশের মধ্য হইতে কে যেন শান্ত কণ্ঠে বিনয় করিয়া বলিতেছে, আমায় তুমি তুলে নিলে না? তুলে নাও, নাও।

সুলেখার সমস্ত ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে, উপায় নাই। ওদিকে বাঁশি যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় তুলে নাও তুমি, তুলে নাও।

সুলেখা কি করিবে, অনেকক্ষণ বসিয়া ভাবিল। তাহার পর ধীরে ধীরে চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে আসিল। খিড়কীর দরজা খুলিয়া প্রাচীরের নিকটে আসিয়া সেই বাঁশিটির নিকট ধীরে ধীরে আগাইয়া গেল। কে এক ছায়ামূর্ত্তি যেন বাঁশিটি হাতে করিয়া বসিয়া আছে। সুলেখা কেমন বিহ্বল হইয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

তারপর কিসের এক উন্মাদনায় আগাইয়া গেল এবং সেই ছায়ামূর্ত্তির হাত হইতে বাঁশিটি তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। ছায়ামূর্ত্তি খুশী হইয়া উঠিল যেন, কিন্তু কিছু বলিল না।

পাঁচুমামার বিয়ে

বাবা যখন মারা গেলেন, তখন দাদার বয়স উনিশ, আমার সতেরো। অবস্থা আমাদের ছিল দিব্বি সচ্ছল, বড় বড় পাঁচ গোলা ধান তখন বাড়ীতে, এক একটা গোলায় দু পৌটি আড়াই পৌটি ধান মজুত। জমিজমার আয়ও বার্ষিক হাজার দুই টাকার কম নয়, এ বাদে ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা ও মায়ের গায়ে সোনার গহনাও বেশ ছিল। আর ছিল গ্রামের মধ্যে প্রচুর মান, খাতির, রবরবা নাম-ডাক।

রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় লোয়ার প্রাইমারী পড়বার সময় ইতিহাসে পড়েছিলাম, কে একজন বাংলার সুলতানের পুত্র "পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার রাজকোষে দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, তিন লক্ষ হস্তী, পাঁচ লক্ষ অশ্ব, দশ লক্ষ পদাতিক ও বিশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য আছে"......অতএব তাঁর মাথা ঘুরে গেল এবং তিনি দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করে বসলেন। আমাদেরও হলো তেমনি অবস্থা।

মা ছিলেন নিরীহ ভাল মানুষ, ঠাকুরমা পিতৃহীন নাতিদের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণ, সুতরাং আমাদের মাথার ওপর কড়া শাসন করবার বা রাশ টেনে ধরবার তো কেউ ছিল না —এ অবস্থায় আমাদের মুণ্ড ঘুরে যাবে, এ আর বিচিত্র কি?

দাদাই অগ্রজের অধিকারে পথ দেখালেন প্রথম। আগে মুণ্ড ঘুরে গেল তাঁরই।

সে ইতিহাস রীতিমত বিচিত্র।

কাঁচড়াপাড়ার কাছে বন্দিপুর গ্রামে আমার এক দূর সম্পর্কের মামা থাকতেন, তাঁকে পাঁচুমামা বলে আমরা ডাকতুম। বাবা বেঁচে থাকতে তিনি দু-একবার আমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে তাঁর যাতায়াত, বিশেষ করে দাদার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা যেন হঠাৎ খুব বেড়ে গেল।

পাঁচুমামা দাদার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়। কাজেই আমি পাঁচুমামাকে খুব সমীহ করে চলতুম। পাঁচুমামাও আমার চেয়ে দাদার সঙ্গে বেশী করে মিশতো। একবার পাঁচুমামা এসে দাদাকে সঙ্গে করে বন্দিপুর নিয়ে গেল।

বন্দিপুর থেকে দিন পনেরো পরে ফিরে এসে দাদা ঠাকুরমাকে বল্লেন, ঠাক্‌মা, আমার দুশো টাকা বড় দরকার এখুনি। কলাই মুগের ব্যবসা করছি, পাঁচুমামা সস্তায় মাল বাঁধাই করছে, চাষাদের দিতে হবে—টাকাটা এখুনি চাই। মোটা লাভ হবে দু'মাস পরে। ঠাকুরমার হাতে নগদ টাকা কত ছিল তা আমার জানা ছিল না, তবে নগদ টাকা যে মন্দ ছিল না—এটা দাদাও জানতেন, আমিও জানতাম। ঠাকুরমা টাকাটা দিয়ে দিলেন, দাদা টাকা নিয়ে মাল খরিদ করতে চলে গেলেন।

দিন কুড়ি পরে পাঁচুমামাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা আবার এসে শ' দুই টাকা চাইলেন। মাল যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে সস্তায়। পাঁচুমামার বাড়ী মাল গোলাজাত করা হচ্ছে, টাকার দরকার সেজন্যেই।

পাঁচুমামাও দাদার কথা সমর্থন করলেন। মাল সস্তার মুখে বেশী পরিমাণে খরিদ করে রাখতে পারলেই লাভ। টাকাটার দরকার বটে।

ঠাকুরমা জিগ্যেস করলেন—কত মাল কেনা হলো?

পাঁচুমামা বল্লে—তা দুশো মণের ওপর। এই টাকাটা পেলে আরও দুশো মণ খরিদ করা হবে। মণ পিছু আট আনা করে ধরলেও দুশো টাকা লাভ।

দিলেন টাকা ঠাকুরমা।

দাদা ও পাঁচুমামা টাকা নিয়ে চলে গেল—এরপরে মাস খানেক তাদের আর কোন পাত্তা রইল না। ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে একখানা চিঠিও লেখালেন—তারও উত্তর এল না।

চিঠির উত্তরের বদলে আরও দিন দশেক পরে এলেন পাঁচুমামার এক ভগ্নিপতি নারাণবাবু। নারাণবাবু বৃদ্ধ ব্যক্তি, বন্দিপুরে তারও বাড়ী। আমি তাঁকে কখনও আমাদের বাড়ী আসতে দেখিনি।

নারাণবাবুকে হঠাৎ আসতে দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত হয়ে উঠল। দাদা ভালো আছেন তো? ব্যাপার কি?

নারাণবাবু হাত-পা ধুয়ে সুস্থ ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুরমাকে বল্লেন—মা, আপনি পটলকে কত টাকা দিয়েছেন এ পর্য্যন্ত?

—চারশো টাকা।

নারাণবাবু অবাক হয়ে বল্লেন—এত টাকা কেন দিলেন? কি বলে টাকা নিয়েছিল আপনার কাছ থেকে?

ঠাকুরমা বল্লেন,—কেন বলো তো বাবা এসব কথা জিগ্যেস করছো? সে তো মুগ কলাইএর ব্যবসা করবে বলে টাকা নিয়েছে। কেন, পাঁচুও তো সেবার এসে ওই কথাই বলে গেল।

নারাণবাবু রাগে জলে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বল্লেন—পাজী বদমাইস্, ছুঁচো।...সেই রাস্কেলটাই তো যত নষ্টের গোড়া। অত বড় বদমাইশ কি আর আছে নাকি? সেই তো পটলটাকে ভালমানুষ পেয়ে নষ্ট করবার চেষ্টা করছে। ওই জন্যেই আমার সামনে বেরোয় না। ব্যবসা না মুণ্ডু। টাকা নিয়ে দুলে-পাড়ায় রাজি দুলেনী বলে এক মাগী আছে, তারই ওখানে দুজনে যাতায়াত করে—এর মধ্যে বোধ হয় সব টাকাই তার পাদপদ্মে ঢেলেছে। ব্যবসা!

মা আর ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। দাদা যে এমন ব্যাপার করতে পারে এ সবারই ধারণার অতীত।

নারাণবাবু বল্লেন—আমিই কি আগে ছাই জানতাম। জানলে এমনতরো হয়? আমার সামনে তো দুজনের কেউ-ই বড় একটা আসে না, পরস্পরে শুনলাম এই ব্যাপার চলছে। শুনলাম খুব টাকা ওড়াচ্ছে। জোড়া জোড়া শাড়ী আসছে রাণাঘাটের বাজার থেকে মাগীর জন্যে। আজ খাবার, কাল থাগড়াই বাসন। বোধ হয় মদও ধরেছে। তাই ভাবলাম আপনাকে একবার কথাটা জিগ্যেস করা দরকার যে, আপনি টাকা দিয়েছেন কিনা। তাই আজ এলুম।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার বহুকষ্টে উপার্জ্জিন করা পয়সা—ছেলেরা সব মূর্খ ও নাবালক—যা কিছু আছে, সংসারের অসময়ে কাজে লাগবে বলেই আছে। এখনও আমার দুই বোনের বিয়ে দিতে বাকী! এ অবস্থায় বিধবার পুঁজি সামান্য টাকার মধ্যে চারশো টাকা এক দুলে মাগীর পেছনে এভাবে ওড়ানো?

সমস্ত রাত পরামর্শ করার পরে ধার্য্য হলো যে, পরদিন সকালে নারাণবাবু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবেন বস্থিপুরে এবং কালই দাদাকে আমি ঠাকুরমার অসুখ হয়েছে এই কথা বলে বাড়ী ফিরিয়ে আনব।

বস্থিপুর যেতে হয় মদনপুর স্টেশনে নেমে। মাঠের মধ্যে দিয়ে ক্রোশ দুই হেঁটে তো বিকেলে বস্থিপুর পৌছানো গেল। বাড়ী থেকে খেয়েই বেরিয়েছিলুম। পাঁচুমামা বাড়ীতে নেই, দাদাও নেই—শুনলাম তারা কানসোনার বাজারে গিয়েছে।

আমি পাঁচুমামার বাড়ীর সামনে একটা বেলগাছ তলায় বসে আছি, কে একজন মোটাসোটা কুচকুচে কালো স্ত্রীলোক সামনের পথ দিয়ে হেঁটে কলসী কাঁখে নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল—নারাণবাবু তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই ভাখো, ওই বেটি

সেই বাজি দুলেনী—ওরই পাদপদ্মে তোমার দাদা সব টাকা ঘুচিয়েচে।

একটু পরে দাদা ও পাঁচুমামা বাড়ী ফিরল। আমাদের দেখে দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে যেন থতমত খেয়ে গেল, তারপর দাদা জিগ্যেস করলে—কিরে নগা, কি মনে করে?

নারাণবাবু বল্লেন—ও এসেছে তোমায় বাড়ী নিয়ে যেতে। তোমার ঠাকুরমার বড় অসুখ যে!

—অসুখ? কি অসুখ?

দাদা আমার মুখের দিকে চাইলে। দাদার হঠাৎ-ভয়-পাওয়া হঠাৎ-ম্লান মুখের দিকে চাইতে পারলুম না। বড় কষ্ট হলো, একবার মনে হলো, সত্য কথাটা বলে ফেলি। কিন্তু তা হলে দাদা যদি বাড়ী না যায়?

সেই রাত্রেই দাদাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম।

বাড়ী এসে দাদা খুব বকুনি খেলে ঠাকুরমা ও মায়ের কাছে। তার উত্তরে সে নারাণবাবুকে গালমন্দ দিয়ে যা-তা বলে গেল। কে বলেছে সে সর্ষে কেনে নি? এখনও বিশ মণ সর্ষে ঘরে মজুত রয়েছে—আর সব মাল চাষাদের ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে, দরকার হলেই,—বাজি দুলেনী কে? বাজি দুলেনীকে দাদা চেনেও না। নারাণবাবুর মত কুটিল, ধড়িবাজ লোক দুনিয়ায় আর নেই। তিনি টাকা ধার চেয়েছিলেন, দাদা দেয়নি, তাই তিনি দাদার বিরুদ্ধে এই সব মিথ্যে রটনা করে বেড়াচ্ছেন।

বলা বাহুল্য, মা বা ঠাকুরমা দাদার এসব কথা কিছু বিশ্বাস করলেন না। মাস খানেক পরে পাঁচুমামা আবার একদিন এসে হাজির আমাদের বাড়ীতে। ঠাকুরমা বল্লেন—পেঁচো শোন। হতভাগা, আমার যে এক রাশ টাকা চেয়ে পাঠালি পটলাকে দিয়ে ব্যবসা করবি বলে, কই ব্যবসার হিসেব দেখা তো আমায়? দেখি কোথায় গেল এতগুলো টাকা!

পাঁচুমামার মুখে চিরদিন তুবড়ি ছোটে। হাত পা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিলে, টাকা ডোবানো তো দূরের কথা—আর মাস দুই পরে ঐ চারশো টাকায় অন্ততঃ দেড়শোটি টাকা লাভ দাঁড়াবে। তখন লাভে মূলে একসঙ্গে টাকাটা এনে দেবে এখন। পাঁচুর অদৃষ্ট খারাপ, সে যার জন্য চুরি করে—সেই নাকি পাঁচুকে চোর বলে। যাক্, তার জন্যে সে দুঃখিত নয়—আসল টাকাটা কোন রকমে ঠাকুরমায়ের হাতে তুলে দিতে পারলেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। ততদিন পর্য্যন্ত রাত্রে ঘুম নেই তার।

পাঁচুমামার বক্তৃতায় ঠাকুরমার বিশ্বাস ফিরে এল। ফলে পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে রয়েই গেল। দাদাকে এর আগেই সে নষ্ট করেছিল, এবার আমার পিছনে লাগল এবং অদ্ভুতভাবে সাফল্য অর্জ্জন করল। এমন কি, কিছুদিন পরে আমারই মনে হলো, আমি দাদাকে বুঝি ছাড়িয়েই যাই।

তখন আমার বিবাহ হয়নি—দাদার সবে হয়েছে। আমি নানা ছুতোয় ঠাকুমার কাছ থেকে টাকা আদায় করি আর পাঁচুমামার পরামর্শ মত খরচ করি। মহকুমা শহর ছিল নিকটেই। নানা ছুতোনাতায় মহকুমা গিয়ে আমি আর পাঁচুমামা প্রায়ই রাত্রে বাড়ী ফিরতুম না।

ধাপে ধাপে শেষে এতদূর পর্য্যন্ত নেমেছিলুম।

পাঁচুমামাকে সত্যি আমি অদ্ভুতকর্মা মানুষ বলে ভাবতাম। যেমন জানে ব্যবসা, তেমনি রাখে দুনিয়ার সব খবর ; যেমনি বোঝে মোকদ্দমা, তেমনি পারে ফুর্ত্তি করতে। পাঁচুমামার হাতে টাকাগুলি তুলে দিয়ে বলতাম, এর মধ্যে থেকে যা যা দরকার খরচ করো।

যত টাকাই দিই, তিন-চার দিনের মধ্যে সব খরচ করে ফেলে আবার আমার কাছে চাইতেন। বলতেন—কিন্তু, বুড়ীর হাতে মোটা টাকা আছে। তা তোমার দ্বারা কিছু যে হবার নয়, আমি বুড়ীর নাতি হলে দেখতিস।

মামার কাছে কখনো টাকার হিসেব নিইনি—অসীম শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা ছিল আমার পাঁচুমামার ওপরে। কিভাবে ও কোথায় সে সব টাকা ব্যয় হতো, সে কথা আর বলব না—তবে এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে মাঘ মাস থেকে আশ্বিন মাসের মধ্যে প্রায় চার-পাঁচ শো টাকা পাখীর মত উড়ে গেল বেমালুম। ঠাকুরমা হাত গোটালেন, মায়ের গহনা বন্ধক পড়তে লাগল। এই অবস্থায় পাঁচুমামা একদিন তেওটা বন্দিপুরে বিশেষ কাজ আছে বলে চলে গেলেন, আর এলেন না।

মাস দশেক পরে একদিন শীতের রাত্রে মুড়িসুড়ি দিয়ে দালানে বসে আছি, এমন সময় পাঁচুমামা আমাদের বাড়ী এসে আবার হাজির।

আমায় বল্লেন—এই যে, ভাল আছিস নগা? পটলা কোথায়?

বল্লুম—দাদা ওপাড়ায় গাঙ্গুলি-বাড়ী গিয়েছে বোধ হয়। তার পরে, এতদিন কোথায় ছিলে মামা? এসো বসো—বড্ড শীত।

পাঁচুমামা দরজা ভেজিয়ে আমার কাছে এসে বসল। বলল—শোন্, একটা কথা বলতে এলুম তোদের। কাল এখানে এক ভদ্রলোক আসবে সকালের গাড়ীতে। যদি তোদের কিছু জিগ্যেস করে তবে বলবি, তোদের এখানকার বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পাঁচ আনা অংশ আছে। বলতে পারবি তো? পটলা কোথায় গেল—তাকেও কথাটা শিখিয়ে রাখি।

কৌতুহল ও আগ্রহের সঙ্গে বল্লুম—কি, কি ব্যাপার মামা? কে আসবে?

ব্যাপার যা শুনলুম তা সংক্ষেপে এই। পাঁচুমামার বিবাহ, কাল তাকে দেখতে আসবেন মেয়ের বাপ নিজে। আসলে তো পাঁচুমামার কিছু নেই তেওটা-বন্দিপুরে, যা ছিল তা উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে অনেককাল। কিছু না দেখলে মেয়ে দেবেই বা কেন? মেয়ের বাপের নাম হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে, মদনপুরের কাছেই কি গাঁয়ে বাড়ী, গরীব অবস্থার লোক। তিনটি মেয়ে তাঁর, মেয়ে তিনটি অপরূপ সুন্দরী—এইটি বড়। পাঁচুমামা এই মেয়েটিকে দেখে নাকি পাগল হয়েছেন, বিয়ে যে কোন উপায়ে হোক হওয়াই চাই।

রাত্রে দাদা ফিরলে দাদাকে বলা হলো সব কথা। দাদা বল্লে—পাঁচ আনা অংশ কেনা আছে যদি জিগ্যেস করে?

—তবে বলবে তোমার বাপ আমার বাবার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল—সেই দেনার দায়ে

সম্পত্তির অংশ বিক্রী করে যায়।

আমরা রাজী। কিন্তু ভদ্রলোক যদি গাঁয়ের আর কাউকে জিগ্যেস করেন? তবেই তো মিথ্যে কথা ফাঁস হয়ে যাবে; পাঁচুমামা সেকথাও ভেবে এসেছেন। গ্রামের যে ক'জন লোক আমাদের পয়সায় ফুর্ত্তি করেন, যেমন হারু সান্যাল, ওপাড়ার আশু চক্কত্তি, এঁদের বয়েস আমাদের চেয়ে বেশী—এঁদেরও কথাটা বলে রাখতে হবে। আমরা বল্লে কেউ 'না' বলতে পারবে না। কাল মেয়ের বাপের সামনে তাঁদের হাজির করতে হবে। তাঁরাও আমাদের কথায় সায় দেবেন।

পরদিন সকালে আমাদের দলের লোক যাঁরা, তাঁদের একথা বলা হলো। তাঁরা সকলেই রাজী হলেন, না হয়ে উপায় ছিল না।

দুটোর কিছু আগে মেয়ের বাপ হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এলেন। ছেলে দেখে পছন্দ করলেন; তারপর ছেলের কি আছে না আছে সে কথা উঠল।

পাঁচুমামা বল্লে, আমাদের জমিজমার সে পাঁচ আনার মালিক। আমরা তাতে সায় দিলাম। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে নিতান্ত সরল, গ্রাম্য লোক এবং ভাবে মনে হলো নিতান্ত গরীব। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারের কিছু বোঝেন না। কেবল একবার জিগ্যেস করলেন—আপনারা তো ভাগ্নে, ভাগ্নের সম্পত্তিতে আপনাদের মামার অংশ কি করে এল?

এর উত্তরে বাকপটু পাঁচুমামা একটি যে মিথ্যা কথা বানিয়ে বল্লে, আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম—আমাদেরই মনে হলো, পাঁচুমামা যা বলছে তাই বুঝি সত্যি। কবে আমার বাবা পাঁচুর বাবার কাছে টাকা ধার করেছিলেন, সুদে আসলে তা কত টাকা দাঁড়ায়, তারই বদলে আমার বাবা পাঁচুর বাবাকে পাঁচ আনা সম্পত্তির উপস্বত্ব দিয়ে যান।

যে কোনো বিষয়ী বুদ্ধিমান লোক হলে এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হতো, কিন্তু হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের মনে কোন সন্দেহ জাগল না। আমাদের এখানে আহারাদি করে বৈকালের দিকে বাঁড়ুয্যে মশায় চলে গেলেন। যাবার আগে পাত্র আশীর্ব্বাদের দিন স্থির করেই গেলেন।

উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদের পরে বিবাহের দিন স্থির হলো। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা সবাই বরযাত্রী গেলাম। বলা বাহুল্য, পাঁচুমামার চালচুলো পর্য্যন্ত ছিল না—জমিজমা থাকা তো দূরের কথা—সুতরাং আমাদের বাড়ী থেকেই বর বিয়ে করতে রওনা হলো এবং কথা হলো যে বউ নিয়ে আবার পাঁচুমামা আমাদের বাড়ীতে ফিরে আসবে।

কনের বাপের বাড়ী একখানা মাত্র খড়ের ঘর, তারই দাওয়ায় সম্প্রদানের আসর, কারণ বর্ষাকাল, বৃষ্টি যখন তখন আসতে পারে। বরযাত্রী থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিল কিছু দূরে এক প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে।

কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা খুবই কম, সবশুদ্ধ জন পনেরো। বাড়ীর ভিতরের উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে, তারই তলায় আমরা বসে গেলাম। রাত ছিল বেশী বাজে।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের অবস্থা কত খারাপ তা বোঝা গেল একটু পরেই। তিনি নগদ বরপণ স্বরূপ একুশটি মাত্র টাকা দিতে চেয়েছিলেন, এখন বিবাহ সভায় দেখা গেল তিনি মাত্র এগারোটি টাকা থালার উপর সাজিয়ে রেখেছেন। বরকর্ত্তা ছিলেন আমাদের গ্রামের দাশু চক্রবর্ত্তী, প্রবীণ লোক বলে তাঁকেই আমরা সঙ্গে নিয়েছি কর্ত্তা সাজিয়ে, নইলে পাঁচুমামার তরফ থেকে বরকর্ত্তা হবার কোন মানুষ নেই তো!

দাশু চক্রবর্ত্তী আমাদের উপদেশ মত বল্লেন—একুশ টাকার কথা ছিল, এগারো টাকা কেন? বাকী টাকা না দিলে বর সভাস্থ করবার অনুমতি দেব না।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে হাত জোড় করে বল্লেন—আর যোগাড় করতে পারিনি—ওই নিয়ে আমায় মাপ করতে হচ্ছে বেহাই মশায়। আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর কি বলব, ঘরের চালে দেবার জন্যে খড় কিনে রেখেছিলাম—সেই খড় বেচে ফেলে দিয়ে তবে ওই এগারো টাকা যোগাড় করেছি। সামনে বর্ষা আসছে, ঘরের মধ্যে এসে দেখুন চাল ফুটো—আলো আসছে। ঘর সারাবার আর কোন সঙ্গয় নেই। আর টাকা হলেও এই জষ্টি মাসে খড় পাব কোথায়?

এর পরে আমরা তর্ক চালাতাম, ছাড়তাম না। তোমার চালে খড় নেই তা আমাদের কিরে বাপু? মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছ, আগে থেকে তোড়জোড় করনি কেন? রইল তোমার বিয়ে-থাওয়া—আমরা বর সভা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এসব কথা বলা চলতো, কিন্তু পাঁচুমামা দেখি ছট্‌ফট্ করছে—তার ইচ্ছে নয় টাকার জন্যে আমরা বিয়ে ভেঙে দিই বা কোন বাধা সৃষ্টি করি। সে আমায় ডেকে কানে কানে বল্লে, কি ছেলেমানুষি হচ্ছে! তার চোখমুখের করুণ ভাব দেখে আমি তো আর হেসে বাঁচিনে। সে কেবল ভাবছে, তার বিয়েটা বুঝি আমরা পাঁচজনে মিলে ভেঙে দিলাম। যাই হোক, পাঁচুমামার অবস্থা দেখে আমরা আর বেশীদূর ব্যাপার গড়াতে দিলাম না; বর সভাস্থ করা হলো। মেয়েকে যখন আনা হলো, মেয়ের রূপ দেখে আমরা তো অবাক। এমন রূপসী মেয়ের সঙ্গে পাঁচুমামার বিয়ে হচ্ছে তা তো জানতাম না! কি গায়ের রং—কি সুন্দর গড়ন-পিটন, আর তেমনি মুখশ্রী। অমন রূপের ডালি মেয়ে কালেভদ্রে চোখে পড়ে। তাই পাঁচুমামা ক্ষেপে উঠেছে এই বিয়ের জন্যে—তাই এত জুয়োচুরি, এত আটঘাট বাঁধা, এত দুর্ভাবনা—পাছে এমন মেয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়।

মনে মনে ভাবলাম—পাঁচুমামার অদৃষ্টটা দেখছি বেজায় ভালো। নইলে এমন মেয়ে ওর জোটে! ওর চাল নেই, চুলো নেই, তিন কুলে কেউ নেই—অজমূর্খ, গাঁজা খায়, নেশাভাঙ করে, কোন বদমাইশিটা ওর বাকী আছে জিগ্যেস করি। আমার দাদাকে আর আমাকে তো ও-ই নষ্ট করেছে! তার ওপর পাঁচুমামা ঘোর জুয়াচোর আর ঘোর মিথ্যাবাদী। লোককে ঠকাতে এমন ওস্তাদ আর দুটি নেই। এই বিয়েই তো করছে জুয়োচুরি করে। আমাদের বিষয়ে ওর পাঁচ আনা অংশ আছে না ছাই আছে। সত্যি কথা জানলে বিয়ে দিত মেয়ের বাপ? বিশেষ করে যখন এমন সুন্দরী মেয়ে!

যাক্, সে সব কথায় দরকার কি আমাদের। বিয়ে-থাওয়া মিটে গেল, বর-কনে আমাদের বাড়ী এসে উঠল। বৌভাত কিন্তু আমাদের বাড়ীতে হবে না একথা ছিল আগে থেকেই। কারণ আমাদের এখানে বৌভাত করতে গেলে আমাদের নামডাকের উপযুক্ত জাঁকজমকের সঙ্গে বৌভাত করতে হয়—নইলে আমাদের নিন্দে হবে। সে খরচ দেয় কে, কাজেই ঠাকুরমা বলেছিলেন - বৌ এখানে তুলে তারপর তুমি পৈতৃক ভিটেতে নিয়ে যেও। সেখানে কাজকর্ম ক'রো গিয়ে। এখানে ওসব হবে না।

পাঁচুমামা বৌ নিয়ে নিজের বাড়ী চলে গেল।

আমার মা ছিলেন বড় খাঁটি লোক। তিনি জানতেন না যে পাঁচুমামা বিয়ের আগে কি জুয়াচুরির আশ্রয় নিয়েছিল, আমাদের বিষয়ে তার পাঁচ আনা অংশ থাকা নিয়ে।

মা বল্লেন—পাঁচুর বৌটি যেন হয়েছে দুর্গাপ্রতিমা,—কিন্তু মেয়েটার অদৃষ্ট ভাল নয়। আমার জ্ঞাতি ভাই হলেও আমি বলছি—ওরকম পাত্রে অমন রূপের ডালি মেয়ে কি দেখে যে বুড়ো দিল, তা সেই জানে। ওই বাঁদরের গলায় ওই মুক্তোর মালা!

মা জানতেন না এর মধ্যে আসল কথাটা কি! পাত্রীর বাবার কোন দোষ ছিল না, যত সব জুয়োচোরের পাল্লায় পড়ে সরল বৃদ্ধ তাঁর সুন্দরী মেয়েটিকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছেন। সে জল যে কত গভীর জল, প্রথম থেকেই তা বুঝতে নববধূ বা তার বাপ, কারও বাকী রইল না। পাঁচুমামা বৌ নিয়ে পৈতৃক বাড়ী বন্দিপুরে চলে গেল বটে—কিন্তু বৌভাত হলো না সেখানে। পয়সা কোথায় পাঁচুমামার যে বৌভাত হবে?

বন্দিপুর বড় কখনো যেতাম না—এখান থেকে পাঁচুমামা চলে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে আর অনেক দিন ওদের দেখা হল না—বিয়ে করার পরে এখানে আসাটা যেন পাঁচুমামার কমে গেল। দাদা মাঝে মাঝে যেত বন্দিপুরে—এসে গল্প করত, পাঁচুমামার সংসার অতি কষ্টে চলছে। নতুন বৌয়ের গায়ে এক আধখানা গহনা যা তার বাবা দিয়েছিলেন, এরই মধ্যে পাঁচুমামা বেচে ফেলেছে। বৌটি কিন্তু খুব ভালো, সে ইচ্ছে করে গহনা খুলে দিয়েছে—ইত্যাদি।

বছর তিন-চার কাটল। তারপর একদিন খবর এল পাঁচুমামা মারা গিয়েছে। আগে থেকে নেশা-ভাঙ্ খায়, লিভার ছিল খারাপ, নেফ্রাইটিস্ হয়ে মারা পড়েছে, চিকিৎসাপত্র বিশেষ কিছু হয়নি।

দিন পনেরো পরে একদিন সকালে আমি বাইরের উঠানে একগাছা ছিপ চাঁচতে বসেছি—দাদা বাড়ী নেই, কোথায় বেরিয়েছে—ঠাকুরমা নদীর ঘাটে নাইতে গিয়েছেন—এমন সময় আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে এবং তাঁর বিধবা মেয়ে।

আমি ছুটে কাছে এলুম—পাঁচুমামার বিধবা স্ত্রীকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম, বাঁড়ুয্যে মশায়কেও করলুম। রূপসী বটে এই বিধবা মেয়েটি। যেন্ে না অগ্নিশিখা! বিয়ের সময়েও তো এতটা রূপ দেখিনি মামীমার! আমি মামীমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে মায়

কাছে রেখে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের কাছে এসে বললাম।

তিনি বল্লেন—যা হবার তো হয়ে গিয়েছে, তার আর চারা নেই। মেয়েটার এই সবে উনিশ বছর বয়েস—ওর মুখের দিকে তো চাইতে পারা যায় না। এখন এমন অবস্থা যে দিন চলে না, পাঁচু একটি পয়সা রেখে যায়নি যে মেয়েটা একদিন সেখানে হাঁড়ি চড়িয়ে খায়। ধার দেনা করে কোন রকমে তিলকাঞ্চন শ্রাদ্ধ সেরে শুদ্ধ করিয়েছি দাদা। ভাবলাম, আগে তো মেয়েটাকে শুদ্ধ করি, তারপর পাঁচুর বিষয়ের যে অংশ আছে এখানে, তা থেকে দেনা শোধের কথা ভাবা যাবে পরে। তাই আজ এলাম মেয়েটাকে নিয়ে। ওরও তো ঘোর দুরবস্থা। বন্দিপুরে একবেলা খায় এমন অবস্থা নেই। পরনে কাপড় ছিল না, দেনা করে একখানা সরুপাড় কাপড় কিনে দিয়েছিলাম শ্রাদ্ধের পরে, তাই পরে এসেছে। আমার তো অবস্থা সবই জানো—এখনও দুই মেয়ের বিয়ে দিতে বাকী, এক পাল কুপুষ্যি—তাদেরই খেতে দিতে পারিনে, তা আবার বিধবা মেয়ে নিয়ে গিয়ে রাখি বা কোথায়, খেতে বা দিই কি? এখন বিষয়ের পাঁচুর যা অংশ এখানে আছে—তা থেকে মেয়েটার একটা হিল্লে তো হোক। দেনাটা শেষ করে দিয়ে না হয় তার উপস্বত্ব থেকে এখানেই একখানা খড়ের ঘর তুলে দিই ওকে। ও তো মেয়েমানুষ, কিছু বোঝে না—আমি সঙ্গে করে আনলাম। মেয়েও বল্লে—বাবা, চলো সেখানে—তুমি দাঁড়িয়ে থেকে আমার একটা ব্যবস্থা করে রেখে এসো। আর তাঁরাও ভাল লোক—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়ের অংশের যা আয় দাঁড়ায়—তা থেকে আমার একটা বিলিব্যবস্থা—আর বন্দিপুরে থেকেই বা কি হবে, সেখানে তো এক ভাঙা খড়ের ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই—যখন বিষয় এখানে, সম্পত্তি এখানে, তখন এখানেই যা হয় একটা ঘরদোর বেঁধে—

আমি এই লম্বা বক্তৃতায় বাধা দিয়ে একটু আশ্চর্য্য হবার সুরে বল্লুম, কিসের বিষয়? কিসের অংশের কথা বলছেন?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—ওই যে পাঁচুর যে অংশ আছে এখানকার বিষয়ে, তা তো ধরো এখন আমার মেয়েরই অর্শেছে। তোমাদের এত বড় বিষয়ের পাঁচ আনা অংশ কি কম? ওর এক বেলা একমুঠো আলোচালের ভাত আর বছরে চারখানা কাপড় তা থেকে হেসে খেলে চলে যাবে—

আমি বিনীত শান্ত হাসিমুখে ভদ্রতার সুরে বল্লাম—আপনি ভুল করেছেন বাঁড়ুয্যে মশায়, এখানকার বিষয়ে পাঁচুমামার কোন অংশ নেই।

—আঁা! সে কি কথা?

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে প্রথমটা তো হতভম্ব হয়ে গেলেন, পরক্ষণেই—কি ভেবে সামলে নিয়ে চিৎকারের সুরে বল্লেন—অংশ নেই কেমন কথা? বিয়ের আগে তো তোমরাই বলেছিলে পাঁচ আনা অংশ আছে—বলো নি? আর এখন বলছ নেই। আমার মেয়েকে ছেলেমানুষ পেয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার মতলব? বরাবর শুনে আসছি অংশ আছে, আর এখন অংশ নেই বল্লেই হলো?

আমারও রাগ চড়ে গেল মাথায়। আমি বল্লুম—আপনি মিছে চেঁচামেচি করেন কেন? আপনি বিষয় সম্পত্তির কিছুই বোঝেন না তাই ওকথা বলছেন। এ তো শোনাশুনির কথা নয়। দলিল দস্তাবেজের কথা, পত্তনী কোবালার কথা। বিষয় সম্পত্তি গাছের ফল নয় যে—যে কুড়িয়ে পায় সেই খায়। আমার বাবা যদু চক্কত্তির নামে সাতখানা গাঁয়ের প্রজা কাঁপত—তিনি কি দুঃখে তেওটা বল্লিপুরের পাঁচু রায়ের বাবার কাছে বিষয়ের পাঁচ আনা বেচতে যাবেন? ও সব ভুলে যান। যা শুনেছেন, ভুল শুনেছেন। বিশ্বাস না হয় আমার কথা, রেজিস্ট্রী আপিসে দুটাকা ফি জমা দিয়ে খুঁজে দেখুন গিয়ে সেখানে এমন কোন দলিল আছে কিনা। আমরা দলিল গোপন করতে পারি, সেখানে তো গোপন থাকবে না?

চেঁচামেচি শুনে পাড়ার দু-পাঁচজন জড় হলো। তারাও হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যের সরলতা দেখে কোনক্রমে হাসি চেপে রইল। যারা সেবার সাক্ষী দিতে এসেছিল যে পাঁচুমামার বিষয়ের অংশ আছে, তারাই বলে গেল পাঁচুর এখানকার বিষয়ের অংশ আছে এমন কথা কস্মিন্‌কালে তারা শোনেও নি।

সব শুনে হৃষীকেশের বিশ্বাস হলো শেষ পর্য্যন্ত যে এদের কথাই সত্যি।

তিনি তো মাথায় হাত দিয়া বসে পড়লেন—তারপরেই হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ডুক্‌রে মেয়েমানুষের মত কেঁদে উঠলেন—আমি মেয়েটার সর্ব্বনাশ করেছি নিজের হাতে—তখন কি জানি এমন জুয়োচুরি আমার সঙ্গে সবাই করবে—আমার অমন সোনার পিরতিমে মেয়েটা—আমায় ভালমানুষ পেয়ে—

— ভাল হাঙ্গামাতেই পড়া গেল দেখছি সকালবেলা।

বুড়োর কান্না শুনে পাড়ার লোক জড় তো হলোই, বাড়ীর মধ্যে থেকে মা, ঠাকুরমা ছুটে এলেন, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রী পর্য্যন্ত সেই সঙ্গে ছুটে এলেন দেখতে যে তাঁর বাবাকে বুঝি আমি মারধর করেছি।

সে এক কাণ্ড আর কি!...

ঠাকুরমা তো বুড়োকে অনেক অনুরোধ করে তাঁর কান্না থামিয়ে তাঁকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেলেন। অনেক কি সব বোঝালেন-সোঝালেন। আমায় ডেকে খুব বকুনি দিলেন; আমি নাকি লোকের সঙ্গে কথা কইতে জানি নে।

আমি বল্লাম—এর আর কথা কইতে জানাজানি কি, আমি যা সত্যি কথা তাই বলেছি। তুমিই বলো না কেন, আমাদের বিষয়ে পাঁচুমামার কি পাঁচ আনা অংশ ছিল?

মা শুনে অবাক, তিনি এসব ব্যাপার কিছুই জানতেন না। বল্লেন—সে কি কথা! পাঁচুর এদের বিষয়ে অংশ কন থাকবে? এ কি রকম কথা, এ তো বুঝতে পারছি নে?

ক্রমে তিনি সব শুনলেন। আমার ও দাদার ওপর খুব রাগ করলেন শুনে। বল্লেন—বেশ, আমার ছেলেরা যখন এ জুয়োচুরির মধ্যে আছে, তখন আমি পাঁচুর বৌয়ের ভরণ-পোষণের ভার নিলুম। মেয়েকে এ বাড়ীতে রেখে চলে যান। আজ থেকে ও আমাদের ঘরের লোক।

হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে বল্লেন—জিগ্যেস করে দেখুন আপনার ছেলেকে ? ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। বিয়ের আগে পাত্র আশীর্ব্বাদের দিন একথা বলেছিল কিনা! আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম আপনাদের দেখে। আমি তো পাঁচুকে দেখে দিই নি। ভাবলাম আপনাদের আত্মীয়, আপনাদের বিষয়ের অংশীদার—তাই আমি সম্বন্ধ করি। তখন কি করে জানব এর মধ্যে এত জুয়োচুরি।

আমি বল্লাম—এ কথা আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলছেন। যদি কেউ বলে মণীন্দ্র নন্দীর জমিদারীতে আমার অংশ আছে—অমনি তার অংশ হয়ে যাবে ?

ঠাকুরমা আমায় আবার ধমক দিয়ে চুপ করালেন। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেকে স্নান করতে পাঠালেন, তারপর খাইয়ে-দাইয়ে তাঁকে সুস্থ করলেন। খাবার সময়ে হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যে ঠাকুরমায়ের হাতে ধরে বল্লেন—আমার মেয়েকে আপনি রেখে দিন। আমার সংসারে একপাল পুষ্যি, খেতে দিতে পারি নে। আপনাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত, আমার মেয়েকে একবেলা একমুঠো আলোচালের ভাত—

মা ও ঠাকুরমা বল্লেন—তার আর কি, বৌমা থাকুন এইখানেই। পাঁচুর বৌ আমাদের তো আর পর নয়, কপালই না হয় পুড়েছে সকাল সকাল।

সেই থেকে পাঁচুমামার স্ত্রী আমাদের সংসারে রয়ে গেলেন। প্রথমে ছিলেন বেশ সুখেই, যতদিন মা ঠাকুরমা বেঁচেছিলেন। তারপর তাঁরা একে একে গেলেন স্বর্গে। দাদার বিয়ে আগেই হয়েছিল, আমারও বিয়ে হলো। হৃষীকেশ বাঁড়ুয্যেও ওদিকে মারা গেলেন। পাঁচু-মামার স্ত্রীরও আর বাপের বাড়ী যাবার জায়গা রইল না।

নতুন বৌয়ের দল নিজের সুবিধামত সংসার সাজিয়ে নিয়েছিল। পাঁচুমামার স্ত্রীর এ-সংসারে থাকাটা তারা গোড়া থেকেই অনধিকার-প্রবেশ বলে ধরেছিল, এইবার সামান্য পান থেকে চুন খসলেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে অপমান করা শুরু করলে। এর আর একটা কারণ ছিল। পাঁচুমামার স্ত্রী ছিলেন অসামান্যা রূপবতী বিধবা মানুষ, একবেলা খেতেন, একখানা নরুন পাড় কাপড় পরতেন—তাতেই তাঁর রূপ ধরতো না। বয়সের সঙ্গে সে রূপ ম্লান হওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বাড়তেই লাগল।

নতুন বৌয়েরা দেখতে অমন সুন্দরী নয় কেউ-ই। তাদের মনে পাঁচুমামার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে নানা হিংসে, ঘোর সন্দেহ এসে জুটতে লাগল।

পাঁচুমামার স্ত্রী তো এ বাড়ীতে থাকতেন বিনি মাইনের রাঁধুনী ঝি চাকরাণীর মত। কিন্তু তাঁর ওপর অত্যাচার অবিচার তাতেও কম ছিল না।

আমার সত্যিই কষ্ট হতো পাঁচুমামার স্ত্রীর জন্যে। যে সহানুভূতি পাঁচুমামার ওপর কখনও হয় নি, পাঁচুমামার শ্বশুরের ওপর হয় নি—তা হয়েছিল এই অসহায় বিধবা নারীর ওপর।

কিন্তু আমার কথা কওয়ার কোন উপায় ছিল না। তা হলেই আমার স্ত্রী সন্দেহ করবেন, কেন আমি পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষে এত কথা বলছি। আমার পূর্ব্বেকার রেকর্ড খুব ভাল ছিল না, সুতরাং স্ত্রী পদে পদে আমায় সন্দেহ করতেন, আমিও যে না বুঝতাম এমন নয়। সুতরাং

পারিবারিক শান্তিভঙ্গের ভয়ে মুখ বুজেই থাকতাম।

এত সাবধান থেকেও একবার বড় বিপদে পড়ে গেলাম। সে দিনটা একাদশী। দেখি বেলা এগারটার সময়ে পাঁচুমামার স্ত্রী এক রাশ বাসন মেজে ডোবা থেকে উঠে আসছেন। আমি বড় বৌ অর্থাৎ আমার বৌদিদিকে বল্লাম,—বৌদিদি, মামীমাকে আজ বাসন মাজতে দিয়েছে কে? আজ একাদশীর দিনটা, তোমরা একটু দেখো শোন না সংসারের কাজের কি হয় না হয়?

বৌদিদি ঝঙ্কার দিয়ে উঠে বল্লেন—ও সব লোক দেখানো ঢং! কে বললে বাসন মাজতে? অন্যদিন বল্লেও তো কাজ করতে দেখিনে—আর আজ বাসন না মেজে আনলে দরদ কুড়োনো যাবে কি করে? ওসব কি আর বুঝি নে? তা বুঝি।

বৌদিদি কি বোঝেন জানি নে, কিন্তু সেদিন রাত্রে আমার স্ত্রী আমায় বল্লে—ওগো, শোন একটা কথা বলি। কথা রাখবে বলো?

—কি কথা বলো?

—তুমি ওকে বাড়ীতে রাখতে পারবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বল্লেম—কাকে গো? ভেঙেই বলো না?

—ওই যে তোমাদের মামীমাকে। ওকে এখুনি তাড়াও।

—কেন, মামীমা কি করেছেন?

—সোজা কথা বলি, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি নে। ও তো তোমাদের আপন মামীমা নয়—বিশেষ কোন সম্পর্কও কিছু না। সামান্য পাতানো সম্পর্ক। আর ওই রূপ, আর ওই বয়েস। তোমাকে আমি চিনি—মিছে অশান্তি কেন সৃষ্টি করবে? সরাও ওকে এখান থেকে। আমি গতিক ভাল দেখছি নে।

বুঝলাম, সেই যে দুপুরবেলা পাঁচুমামার স্ত্রীর পক্ষ হয়ে একটা কথা বলেছিলাম বড় বৌয়ের কাছে, তিনিই লাগিয়েছেন সমস্ত কথা ছোট বৌকে। কি বিশ্রী মন এই সব পাড়াগাঁয়ের মেয়েমানুষদের! অস্বীকার করি নে যে আমার রেকর্ড ভাল না, আমিই জানি আমি কি বা আমি কি নই। কিন্তু একজন আশ্রিতা অসহায়া তরুণী বিধবা, যাঁর প্রতি সত্যিই আমার সহানুভূতি ও অনুকম্পা, যাঁকে মামীমা বলে ডাকি—তাঁর সম্বন্ধে এই সব—

আমার মন একমুহূর্তে বিরূপ হয়ে উঠলো সংসারের ওপর, স্ত্রীর ওপর, বৌদিদির ওপর, সমস্ত ব্যাপারটার ওপর, এমন কি পাঁচুমামার স্ত্রীর ওপর।

বল্লাম—বেশ ভালো, আজই যেতে বলছি।

মনে ভাবলাম, এমন করে বলবো যে স্ত্রী পর্যন্ত দুঃখিত ও অপ্রতিভ হয়ে উঠবে।

পরদিন সকালেই পাঁচুমামার স্ত্রীকে ডেকে বললাম—আপনার আর এখানে থাকা হবে না। আপনাকে নিয়ে সংসারে অশান্তি বাধছে, আপনি এখুনি আমাদের বাড়ী থেকে অন্যত্র যান।

বড় বৌ বল্লেন—সে কি কথা! কাল গিয়েছে একাদশী, আজ দ্বাদশীর দিন। না খেয়ে

কোথায় যাবেন উনি। কাল সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস গিয়েছে। সংসারের অকল্যাণ হবে যে!

মনে মনে ভাবলাম—সেইটেই বোঝ। আর একটা গরীব অসহায়া মেয়ের যে কি হবে তা মনেও ওঠে না। তোমাদের ভালো করেই কল্যাণ করাচ্ছি।

পাঁচুমামার বৌ কথাটি বল্লেন না। নিজের পুঁটলি গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। আমি জানি তাঁর কোথাও যাবার জায়গা নেই—বাপের বাড়ী এক গাঁজাখোর বেকার ছোট ভাই আছে, সেখানে একমুঠো খাওয়াও জুটবে না এক বেলা। কিন্তু সব জেনেও বড় রূঢ় ও কঠিন হয়ে উঠলাম আজ। একাদশীর পরদিন না খেতে দিয়েই তাড়াবো। করাচ্ছি সংসারের কল্যাণ তোমাদের!

সেই সকালেই চা খেয়ে বসে আছি, পাঁচুমামার বৌ দুটি পান সেজে ডিসের বাটিতে আমার সামনে রেখে দিয়ে পুঁটলি বগলে করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি মুখে কিছু বলিনি, কেবল স্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাবার জন্যে আমাদের মুহুরী বৃদ্ধ গোপাল মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম এবং আপদ চুকে গেল ভেবে আরামের নিঃশ্বাস ফেললাম। পাঁচুমামার বৌয়ের তারপর থেকে আর কোন খবর রাখি নি।

শাস্তিরাম

সন্ধ্যার কিছু আগে একখানা ট্রেন ছাড়ে। রাত সাড়ে নটা আন্দাজ সেখানা দেশের স্টেশনে পৌঁছায়। শাস্তিরাম ওই ট্রেনেই বাড়ী যাওয়া ঠিক করিল।

কলে জল আসিয়াছে। ঝর্ ঝর্ শব্দে চৌবাচ্চায় পড়িতেছে। চৌবাচ্চাটা মাঝারি, ক্রমশঃ পুরিয়া আসিল বলিয়া। ভাদ্র মাসের পচা গুমোট, স্নান করিয়া লওয়া ভাল। কাপড় ভিজাইয়া দরকার নাই—গামছা পরিয়া শাস্তিরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিল। এখনও ঝাড়ুদার আসে নাই। এবেলা-ওবেলার উচ্ছিষ্ট ভাত, শাকের চিবানো ডাঁটা, মাছের কাঁটা ঝাঁঝরি ড্রেনের মুখে পড়িয়া জলের স্রোত আটকাইয়াছে, দেখিলে গা কেমন করে—কি নোংরা!…কিন্তু এই নোংরা, আঁস্তাকুড়ের মধ্যে আজ সাতটি মাস বাস করিয়াও পয়সা হইল কৈ? সে সব সহ্য করিতে পারিত যদি হোটেলটা হইতে কিছু পয়সা আসিত।

ভূপেনবাবু আপিস হইতে ফিরিয়া রান্নাঘরের পাশের ছোট্ট ঘরের চাবি খুলিল। ঘরটার সামনে চালের বস্তা, ডালের বস্তা, বেগুন পটলের ধামা, শুকনা বিলাতি কুমড়া। আধ নাগরী আখের গুড়—একটা ছোট্ট আড়াইসেরা টিনের অর্দ্ধেক ভর্ত্তি সরিষার তৈল। বাজে হোটেলের মত যা তা তেল এখানে ব্যবহার করা হয় না, রামগোপাল মিলের মোহন-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈল। কিন্তু এতেও হোটেল চলিল না।

ভূপেনবাবু কলতলায় হাত পা ধুইতে আসিল। কাঁধে গামছা, পায়ে খড়ম। চটির দাম

বেশী। বেচারী পঁচিশটি টাকা মাহিনা পায়। ট্রাম কোম্পানীর আপিসে কাজ করে। ঘরের ভাড়া দেয় সাড়ে চার টাকা—পাইস্ হোটেল এটা, তবুও ভূপেনবাবুর সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে—ঘরভাড়া বাদে এগারো টাকা।

ভূপেনবাবু বলিল—শান্তিরামবাবু, আপনি নাকি আজ চল্লেন ?

—না গিয়ে কি করি বলুন। এতদিন তো বেয়ে ছেয়ে দেখলাম। কিছুই যখন হলো না, তখন থেকে লাভ কি, থাবই বা কি ?

—কেন, আপনাকে এরা রাখবে না ?

—আমার পোষাবে না। আমি ছিলাম হোটেলের মালিক, আর এখন ওদের তাঁবে আমাকে সাত টাকা মাইনে আর খোরাকীতে খাটতে হবে। আর ওই যে নিধিরামবাবু, ওঃ, এমন মানুষ যদি দুটি--বল্লাম আর পঁচিশটি টাকা বেশী দাও গিয়ে। দেনার দায়ে না হয় হোটেল বিক্রিই হচ্ছে, তা বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে তোমাদের ভালো হবে। হোক, ভগবান মাথার উপর আছেন। তিনি দেখবেন। কারেই না হয় পড়েছি মশায়, চিরকাল এমন দিন থাকবে না, তাও বলে দিচ্ছি।

—বাড়ীতেই এখন থাকবেন ?

—দেখি কি হয়! পয়সা যা পেলাম হোটেল বিক্রি করে, তা গেল পাওনাদারের দেনার পেছনে। মিথ্যে বলব কেন ভূপেনবাবু, আপনি আমার ছোটভাইয়ের মত, সাতটি টাকা আর রেলভাড়া—এই নিয়ে দেশে যাচ্ছি। তাতে আর কদিন চলবে সেখানে ?

হঠাৎ শান্তিরামের মনে পড়িয়া গেল—ধারে হোটেলের জন্য কড়া ও বালতি কিনিয়াছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটের গিরীন্দ্র কুণ্ডুর দোকান হইতে। হোটেল বিক্রি হইয়া যাইতেছে শুনিয়া তাহারা আজ কয়দিন জোর তাগাদা চালাইতেছে। খাইতে দেয় না, ঘুমাইতে দেয় না। তাহাদের বিল-সরকারকে আজ সন্ধ্যার সময় আসিতে বলা হইয়াছে। আসিলেই চার টাকা কয়েক আনা তাহাদের দেনা শোধ করিতে যাইবে। তবে বাড়ী যাইবে কি শুধু হাতে ? পুঁজি তো সাতটি টাকা।

কাজের কথা নয়। তাহার আগেই বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। শেয়ালদ স্টেশনে গিয়া গাড়ীর জন্য বসিয়া থাকা ভাল। দেড় ঘণ্টা হোটেলে অপেক্ষা করিবার দণ্ড স্বরূপ চার টাকা কয়েক আনা দিতে সে রাজী নয়। নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া সে একখানা ময়লা কাপড় পাতিয়া দু-তিনখানা আধময়লা কাপড় ও জামা, কাঁসার গেলাসটা, পুরানো একজোড়া জুতা, একজোড়া খড়ম, পাটি একখানা—পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। না, এখানে কোন জিনিস ফেলিয়া গিয়া লাভ নাই। বাড়ীতে লইয়া গেলে গৃহস্থ সংসারে কত কাজে লাগিতে পারে।

ছোট্ট টিনের স্যুটকেসটার মধ্যে ধোপার বাড়ী হইতে সদ্য-আসা দুখানি ধুতি এবং একটা ছিটের কাপড়ের পাঞ্জাবি পুরিয়া নিজের গায়ের ময়লা শার্টটা পরিতেছে—রেলে যাইবার সময় ফর্সা জামা গায়ে দিয়া লাভ কি ? বিশেষতঃ নিজের বাড়ীতেই যখন যাইতেছে সে, কুটুম্ব-বাড়ীতে নয়—এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল—শান্তিরামবাবু আছেন ?

—কে ?

—সেদিনকার সেই আধ টিন সর্ষে তেলের দামটা পাওনা—কাল আসতে বলেছিলেন, কাল দু-দুবার এসে দেখা পেলাম না।

—কত বাকি ?

—এক টাকা সাড়ে ন আনা।

শান্তিরামের একবার ইচ্ছা হইল বলে, কাল এসো সকালবেলা। কিন্তু ভুপেনবাবু পাশের ঘরেই রহিয়াছে, ভুপেনবাবু জানে, আজই হোটেল বিক্রী হইয়া গিয়াছে, সে—শান্তিরাম, আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে দেশে চলিয়া যাইতেছে, আর এখন ফিরিবে না। এ অবস্থায় পাওনাদারকে কি বলিয়া মিথ্যা কথা বলা যায় ?

অগত্যা দিতে হইল। সাত টাকার ভিতর হইতে বাহির হইয়া গেল এক টাকা সাড়ে ন আনা। এ বেড়া-আগুনের জাল হইতে বাহির হইতে পারিলে এখন সে বাঁচে। আবার কোন-দিক হইতে কে আসিয়া পড়িবে কে জানে ?

—চল্লেন তা হলে ?

—হেঁ হেঁ আসি। নমস্কার। কিছু মনে করবেন না।

—বাড়ী গিয়ে চিঠি দেবেন—কি রকম আছেন, কেমন তো ?

—হ্যাঁ, দেব বইকি—দেব না ?

বেশ লোক ভুপেনবাবু।

ডান হাতে টিনের বিবর্ণ স্যুটকেসটা, বাম বগলে পুঁটুলি ও ছাতা লইয়া শান্তিরাম হোটেল হইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে শেয়ালদ-এর মোড়ে আসিয়া পৌঁছিল।

নাশপাতি—নাশপাতি—ছেলেদের জন্ত কিছু কিনিয়া লওয়া যাক। দু'পয়সা জোড়া! ডাকাত নাকি রে বাবা! দু'পয়সা জোড়া নাশপাতি কে কবে শুনিয়াছে ?

দিব্যি আপেলগুলি। কত দর ? চার পয়সা জোড়া কেন, পয়সা পয়সা না ?

ফলওয়ালা চটিয়া বলিল—বাবু, কৌন জমানা মে আপেল পয়সা পয়সা বিকা ?

অনেক দরদস্তর করিয়া শান্তিরাম ছোট ছোট নাশপাতি দুই পয়সায় জোড়া দরে ছয়টি কিনিল, চার পয়সায় একজোড়া আপেলও কিনিল। পরিমল নস্ত লইবে কিছু, দেশে ভাল নস্ত পাওয়া যায় না।

ফলওয়ালাকে পয়সা বাহির করিয়া দিতেছে, এমন সময় পিছন হইতে কে ডাকিল—এই যে শান্তিরামদা, এ কি, যাচ্ছ কোথায় ? বাড়ী নাকি ?

শান্তিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল তাহাদের দেশের (ঠিক গ্রামের নয়) সরোজ মুখুজ্জে। সরোজ এখানে কোন মেসে থাকে, সপ্তাহে সপ্তাহে দেশে যায়। চাকুরি করে মার্চেন্ট আপিসে। আশি-নব্বই টাকা মাহিনা পায়।

—আর ভাই, বাড়ী চল্লাম—সব উঠিয়ে দিয়ে চল্লাম।

—কেন, তোমার সেই হোটেল ?

—চালাতে পারলাম কই ? চলতো ভাল, পাঁচ ভূতে খেয়ে আর বাকি ফেলে ফেল মারিয়ে দিলে। এক এক ব্যাটার কাছে আট টাকা দশ টাকা বাকি, খেয়ে যাচ্ছে তো খেয়েই যাচ্ছে! উপুড় হাত করবার নামটি নেই। তাগাদা করতে গেলেই আজ দেব কাল দেব। এদিকে আমার পাওনাদারেরা—বাড়ীওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদি আমায় ছিঁড়ে খাচ্ছে। জোচ্চোরের জায়গা কলকাতা। এখানে কি ভদ্দরলোক আছে ?

—কিন্তু শান্তিরামদা, দেশে কতদিন যাওনি বল তো ? দেশের অবস্থা জানো ? বাড়ী তো যাচ্ছ, বন্যেয় সব ডুবে গিয়েছে—রসময়পুর থেকে নৌকায় চড়বে আর একেবারে তোমাদের গাঁয়ের বটতলায় গিয়ে উঠবে, কলুবাড়ীর কাছে। চাল নেই, ধান নেই—সব ডুবেছে। জিনিসপত্রের দাম চড়া—লোকজনের ভয়ানক কষ্ট। কত বাড়ী ঘর পড়ে গিয়েছে—আর এই দুর্দ্দিনে তুমি যাচ্ছ দেশে ? এখন যেও না আমি বলি!

—না গিয়ে কি করি ?

—এখানে থেকে পয়সা উপায়ের চেষ্টা কর। এখানে নানা পথ আছে—দেশে কিছু নেই —এক ভিক্ষে ছাড়া। তাই বা দেবে কে ? এখানে থেকে বাড়ীতে পয়সা পাঠাও, তাদের উপকার হবে। শুধু হাতে বাড়ী গিয়ে কি করবে ? আচ্ছা আসি শান্তিরামদা, আসি।

বন্যার খবর শান্তিরাম কিছু জানে না। বাড়ীর চিঠি পায় নাই আজ পনেরো-কুড়ি দিন। চিঠি না পাওয়ার কারণ সে জানে। তিন পয়সা দাম একখানা পোস্টকার্ডের, পাড়াগাঁয়ের লোক নিতান্ত দরকারী খবর দিবার না থাকিলে চিঠি বড় একটা দেয় না। বিশেষতঃ তাহার সংসারের যা অবস্থা। তিনটি পয়সা তিনটি মোহর।

ট্রেন ছাড়িল। বেলা একদম পড়িয়া আসিয়াছে। স্টেশনের সিগন্যালের লাল সবুজ আলো জ্বলতেছে। গাড়ীতে লোক বেশী নাই। শান্তিরাম এককোণে বসিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া মাঝে মাঝে বিড়ি টানিতে টানিতে ভাবিতে ভাবিতে চলিল।

সরোজ যাহা বলিল, তাহাতে বাড়ী যাইবার উৎসাহ তাহার কমিয়া গিয়াছে। সত্য বটে সে ন-দশ মাস বাড়ী যায় নাই। সে অগ্রহায়ণ মাসে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, স্ত্রীর শেষ সম্বল বালা দুগাছা বিক্রয় করিয়া দুইশত টাকা লইয়া ব্যবসা করিতে আসিয়াছিল কলিকাতায়।

দুইশত টাকার মধ্যে বাড়ী লইয়া ফিরিতেছে পাঁচ টাকা সাড়ে ছ-আনা। অবশ্য এ কয় মাস কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়াছিল বাড়ীতে—কিন্তু গত আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আর কিছুই দিতে পারে নাই।

দেশে থাকিতে পয়সা উপার্জ্জনের কোন পথ সে বাকি রাখে নাই। লেখাপড়া তেমন জানে না বলিয়া চাকুরি জোটে নাই, না-ই বা জুটিল চাকুরি ? ব্যবসা করিয়া বড়লোক হওয়া যায়, চাকুরিতে নয়। গুড়ের ব্যবসা, কাঠ চালানির ব্যবসা, তরকারি চালানির ব্যবসা, এমন কি মাছ চালানি পর্য্যন্ত। কিছুতেই কিছু হইল না। তাই স্ত্রীর বালাজোড়া লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল কোন একটা ব্যবসা করিতে।

অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল হোটেল খুলিতে। খারাপ কিছু চলে নাই, দুবেলা লোকজন খাইতেছিলও মন্দ নয়।—কিসে কি হইল ভগবান জানেন, খরচে আয়ে আর কিছুতেই কুলায় না এমন হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাড়ীভাড়া বাকি পড়িয়া গেল তিন মাসের। বাড়ীওয়ালা শাসাইল জিনিসপত্র আটকাইয়া ভাড়া আদায় করিবে। মুদির দেনা, কয়লাওয়ালার দেনা, তরকারীওয়ালার দেনা, মাছওয়ালার দেনা, দুধওয়ালার দেনা, ঠাকুরের মাহিনা বাকি, ঝি চাকরের মাহিনা বাকি—হোটেল চলে কি করিয়া ?

সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল—সত্যসত্যই সর্ব্বস্বান্ত। এতটুকু সোনার গুঁড়া নাই ঘরে, এই কটি টাকা মাত্র সম্বল। বাড়ীতে পা দিলেই চৌকীদারি ট্যাক্সের তাগাদা—সেখানেও মুদির দেনা, গোয়ালার দেনা কোন-বা দশ পনেরো টাকা না জমিয়া গিয়াছে !

তাহার উপর দেশের অবস্থা যে-রকম শোনা গেল, সব কিছু ডুবিয়া গিয়াছে, জিনিসপত্রের দাম চড়া, ধার মেলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে এ বাজারে। স্ত্রীপুত্র হয়তো বা উপবাসে দিন কাটাইতেছে। নীরদা কত আশা করিয়া আছে, পূজার সময় (আর দিন সতেরো বাকী পূজার) স্বামী কলিকাতা হইতে সকলের জন্ম নতুন কাপড় এবং টাকাকড়ি লইয়া বাড়ী ফিরিবে !

নীরদাকে একদিনের জন্যও খুশী করিতে পারে নাই সে। বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত অভাব অভাব—অভাব আর ঘুচিল না কোনদিন। অদৃষ্ট ! তাহার অদৃষ্ট না নীরদার অদৃষ্ট ? দুজনেরই !

দেশের স্টেশনে নামিয়া সহযাত্রীদের মুখে শুনিল, পায়ে হাঁটিয়া গ্রামে পৌছানো যাইবে না। মাতুগঞ্জের বড় বিল ভাসিয়া রাস্তার উপর এক কোমর জল—এত রাত্রে নৌকাই বা পাওয়া যায় কোথায় ? চিলমারির নবীন কলু তাহার মুদীর দোকানের জন্ম কলিকাতায় মাল কিনিতে গিয়াছিল। সে তিন গ্রোস দেশলাই ও দুই তিনটি মিছরীর কুঁদো লইয়া বড় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

—এই যে দাদাঠাকুর ! কলকেতা থেকে এলেন বুঝি ? এই গাড়ীতেই এলেন—কই দেখিনি তো ! এখন কি করে যাই বলুন তো। একটা লোক নেই ইষ্টিশনে। নৌকো থাকবার কথা বলা ছিল, কই কাউকে তো দেখছি নে। আপনিও তো যাবেন, ওদিকে সব জলে জলময়।

একজন কুলি তাহাদের জিনিসপত্র ঝাঁকায় করিয়া লইয়া যাইতে রাজী হইল। কুলিটার মুখে শোনা গেল, স্টেশন ছাড়াইয়া যে বড় মাঠ, কিছুদূর গেলে সেই মাঠের ধারে জেলেদের নৌকা ভাড়ার জন্ম মজুত আছে। মাঠ জলে ভাসিয়া সমুদ্রের মত দেখাইতেছে—শুধু বাবলা গাছ ও অন্যান্য গাছপালার খানিকটা করিয়া জায়গা আছে মাত্র।

শান্তিরাম অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। বলিল—হাঁ নবীন, এ রকম বন্যে তো আমাদের জ্ঞানে কখনো দেখিনি। এ কি হয়েছে, এ যে চেনা যায় না কিছু। গাঁয়ের মধ্যে জল ঢুকেছে নাকি ?

বাড়ী পৌঁছিতে রাত এগারোটা বাজিয়া গেল। সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, শান্তিরাম ছোট ছেলের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে নীরদা উঠিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের দোর খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিল। রং ফর্সা, রোগা চেহারা, শান্তিরামের অপেক্ষা সাত বছরের ছোট সুতরাং বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ হইয়াছে। মাথার চুল সামনের দিকে অনেক উঠিয়া গিয়াছে। মুখের লালিত্য অনেক দিন নষ্ট হইয়াছে। পরনে লাল পাড় ময়লা শাড়ী; চুলবাঁধা বা পরনপরিচ্ছদের মধ্যে এতটুকু পারিপাট্য নাই। অতিরিক্ত পান দোক্তা খাইয়া দাঁতগুলি কালো।

—এত রাত্তিরে কোন গাড়ীতে এলে! ভাও ওগুলো আমার হাতে। বাবা, একখানা চিঠি না পত্তর না—ভেবে মরছি। সতুর আজ আবার তিন দিন জ্বর আর পেটের অসুখ—বুলুর একটা ফোড়া হয়ে কষ্ট পাচ্ছে, ভাবছি আজকালের মধ্যে একখানা পত্তর দেব। তার ওপরে চারিদিকে জল! হাটবাজার করে এনে দেবার লোক পাচ্ছিনে, এই জল পেরিয়ে কে আমার জন্যে চিলেমারি থেকে জিনিস কিনে এনে দেবে! এলে বাঁচলাম—কি আতান্তরে যে পড়েছি—তার ওপর এদিকে হাতে—ও বুলু, কি বলছে শোন, এই যে যাই—চেঁচিও না, কে এসেচে ভাখ্—

—তোমার শরীর ভাল আছে? এই এতে আপেল আর নাশপাতি আছে, সতুকে বুলুকে দাও। খুকীকে দাও এই লেবেঞ্চুস—কলার আর কমলালেবুর। খুকী ভাল আছে তো? চল ঘরে—

—দাঁড়াও একটু, আলোটা জ্বালি, ঘরে অন্ধকার। সামনেই সব শুয়ে আছে, মাড়িয়ে চটকে দেবে।

খানিক পরে শান্তিরাম সুস্থ হইয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া কেহ আপেলের টুকরা কেহ লেবেঞ্চুস খাইতেছে। নীরদা স্বামীর জন্য ভাত চড়াইতে গিয়াছে রান্নাঘরে।

নীরদা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছে, সে না জানি কত টাকা লইয়াই ঘরে আসিয়াছে! নীরদাকে কিছু বলা হইবে না এখন। না, বলাই ভালো। মিথ্যা আশায় রাখিয়া লাভ কি! নীরদার মুখে আনন্দ ও উৎসাহ যেন ধরিতেছে না। কষ্ট হয় বলিতে—নীরদা, যা ভাবছো তা নয়, আমার হোটেল বিক্রী করে দিয়ে চলে এলুম। সর্ব্বস্বান্ত হতে হয়েছে, তোমার সে বালা গিয়েছে, তার টাকা গিয়েছে। পাঁচ টাকা সাড়ে ছ আনা মাত্র হাতে অবশিষ্ট আছে।

এ কথা বলিতে কষ্ট হয়। নীরদাকে কোন সুখটা দিয়াছে জীবনে সে?

নীরদা ভাত চড়াইয়া দিয়া আবার ঘরের মধ্যে আসিল। বলিল—পুজোর আগে আবার যাবে বুঝি! তা এই যাবে আবার আসবে, মিছিমিছি পয়সা খরচ। একেবারে আর দুদিন দেরি করে পুজো পর্য্যন্ত থেকে যাও। ওদের কাপড়-চোপড় এনেছ নাকি?

শান্তিরাম একবার ভাবিল বলে—নীরদা, কিছু নেই, সব গিয়েছে। তোমার বালা জোড়াটাও। সব উড়িয়ে দিয়ে এলাম। হাত একেবারে খালি! পুজোর কাপড়-চোপড় তো

দূরের কথা, তোমাদের খেতে দেবো যে কোত্থেকে তাই ভেবে—

তবুও আজ আট মাস পরে বাড়ী আসিয়া তাহার কি ভালই লাগিতেছিল। কলিকাতায় হোটেল খুলিয়া থাকা—সে এক অন্ত ধরনের জীবন। এই কয় মাসে সে তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে। কখনো যে ঘরছাড়া হয় নাই তাহার পক্ষে একা ওভাবে নির্বান্ধব স্থানে থাকা কি ভাল লাগে? এ তাহার নিজের বাড়ী—সকলে এখানে আপন। এখানে নীরদা আছে, সতু, বুলু, খুকী, পিসিমা। পাশের বাড়ীতে দুর্গাদাস কামার, নিতাই কামার,—এরা সব তাহার আপন। নিতাই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু, লেখাপড়া শেখে নাই—পৈতৃক বৃত্তি দা-বাঁধানো, লাঙলের ফাল-পোড়ানো অবলম্বন করিয়াছে। তাহাকে সে যে কত দিন দেখে নাই! নিতাই কামারের দোকানঘরের জামরুলতলার ছায়ায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে নিতাই এবং কামারদোকানের সমাগত লোকজনের সঙ্গে বেগুন কুমড়ার গল্প করিতে কি সুখ! তার তুলনায় হোটেল? কাল নিতাইয়ের সঙ্গে সকালেই দেখা করিতে হইবে।

শান্তিরাম খাইতে বসিল।

—হ্যাঁ গা, পুজো পর্য্যন্ত থাকবে তো?

—হ্যাঁ।

—তা কাপড়জামা ওদের কলকাতা থেকে আনলে না কেন? এখানে দর বেশী।

—দর? হ্যাঁ, তা বেশী।

—হোটেল দেখাশোনা করবে কে এখন?

শান্তিরাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল নেই।

নীরদা বিস্ময়ের সুরে বলিল—নেই! তবে অস্ত কি—কেন, এই সেদিনও তো চিঠি লিখলে হোটেলের কাজ চলছে ভাল।

শান্তিরাম বলিল—চলছিল তো ভালই। তারপর কিসে থেকে কি হলো, কেবল দেনা বাধতে লাগলো। বিক্রি হয়ে গেল দেনার দায়ে।

—সে বালা-জোড়াটা আছে তো! এনেছ সঙ্গে তো?

নীরদা এই ধরনের প্রশ্ন করিয়া বড় বিপদে ফেলে। এই ধরনের প্রশ্ন না করিয়া যদি বলিত—"সে বালা দুগাছাও ঘুচিয়ে দিয়েছ তো?" তাহা হইলে উত্তর দেওয়াটা সহজ হইত যে বালা ঘুচিয়া গিয়াছে। মিটিয়া গেল। এতখানি আশা-ভরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে এমন—

না, সংসার করা এত বিপদ জানিলে সে বিবাহ করিত না। বিবাহ সে ইচ্ছা করিয়া করেও নাই। স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রবধূর মুখ দেখিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় উনিশ বছরের ছেলে শান্তিরামের বিবাহ দিয়া যান বারো বছর বয়সের নীরদার সঙ্গে।

—ইয়ে, বালা কোথায় নীরদা? বালা বিক্রী করেই তো হোটেল খুলেছিলাম।

নীরদা হঠাৎ নিজের গালে চড় মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল—ওমা আমার কি হবে, ওমা আমার কি হবে—

শান্তিরাম বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, কি ছেলেমানুষি কর—থামো—

ছেলেমেয়েরা কাঁদিয়া উঠিল।

শান্তিরামের ভাত খাওয়া হইল না—সে ভাত ফেলিয়া উঠিয়া নীরদার হাত ধরিল। স্বামীস্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। নীরদাকে শান্ত করিতে শান্তিরামের সময় লাগিল। মেয়েমানুষকে বোঝান দায়। অনেকক্ষণ পরে নীরদা কিছু প্রকৃতিস্থ হইল। চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া বলিল—তোমার খাওয়া হলো না—আর দুটি ভাত আছে, বেড়ে নিয়ে আসি—

—না না, থাক। শোয়া যাক এখন। রাত হয়েছে বারোটা কি একটা—

শান্তিরাম স্ত্রীর প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে—একজোড়া বালা না হয় গিয়াছে, তা বলিয়া, সে খাইতে বসিয়াছে আর এমন কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! ছিঃ, এর নাম সংসার? একটু সান্ত্বনার কথা নাই, সহানুভূতি নাই! আচ্ছা, সন্ন্যাসী হইয়া গেলে কেমন হয়? অনেকে তো যায়। সংসার আর ভাল লাগে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঠিকই বলিয়াছেন—কামিনী কাঞ্চন অসার। তাহাদেরই গ্রামের পাশে বন্দিপুরের মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলে রাধাকান্ত বহুদিন আগে সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছিল—এখন কি একটা বেশ বড় গোছের নাম লইয়া কাশীতে মঠ করিয়া আছে। বহু শিষ্য সেবক। দুধ ঘি খায়, কোন কষ্ট নাই—পায়ের উপর মোহর প্রণামী। দিব্যি আছে। আর সংসার করিলে তাহারও দশা এই রকমই হইত—ছেলেপিলে লইয়া জড়াইয়া মরিতে হইত এতদিন।

কামিনী কাঞ্চন সত্যই অসার!

নীরদাও স্বামীর উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল না। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, বালা-জোড়াটা একমাত্র সম্বল ছিল। এই তো সংসারের ছিরি! তাহার বাবার দেওয়া বালা। শ্বশুরবাড়ী?…তাহা হইলে ভাবনা থাকিত না! এক কুচো এখানকার সোনা কোনদিন অঙ্গে ওঠে নাই। কি বিবাহই দিয়াছিলেন বাবা! অকর্মণ্য—আসল কথা এই যে অকর্মণ্য স্বামী। কত পুরুষ মানুষ কত কাজ করিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে, গরীব অবস্থা হইতে বড় লোক হইতেছে। আর তাহার স্বামী যাহা ঘরে আছে বা ছিল, তাহাও ঘুচাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী আসিয়া বসিল। বড়লোক হইতে সে চায় না। কিন্তু এই দুর্ব্বৎসরের বাজারে ছেলেপিলের মুখে অন্ন দিতে হইবে তো? এমন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই। বিবাহের শখ আছে, স্ত্রীপুত্র পুষিবার ক্ষমতা নাই।

শেষরাত্রে ভয়ানক বৃষ্টি আসিল, ফুটা ছাদ দিয়া নানাস্থানে জল পড়িতে লাগিল। নীরদা ছেলেমেয়েদের লইয়া সরিয়া বিছানা পাতিল স্বামীর মশারি ভিজিতেছিল দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। শান্তিরাম কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে উঠিয়া বিছানার উপর বসিয়া বলিল—আঃ, কি?

—মশারি ভিজছে—ওঠো একটু। বৃষ্টি এসেছে বড্ড।

নীরদা মশারি খুলিয়া কোণের দিকে লইয়া গিয়া আবার খাটাইতে লাগিল। শান্তিরাম বিরক্তমুখে বিছানায় বসিয়া ছিল, কেরোসিনের টেমির মৃদু আলোয় নীরদার দিকে চাহিয়া দেখিল—নীরদা দেখিতে যেন বুড়ী হইয়া গিয়াছে এরই মধ্যে। বিবাহের পর প্রথম কয়েক বছর কি সুন্দর ছিল দেখিতে। সে রং, সে চেহারা কয়েক বছরের মধ্যেই যেন ভোজবাজির মত উড়িয়া গেল।

ঠিক তেমন ভালবাসাই কি এখন আছে? সে আকুলি-বিকুলি ভাব, না দেখিলে বাঁচি না ইত্যাদি - বহুদিন চলিয়া গিয়াছে।

নীরদা মশারি খাটাইতেছে। সামনের কপালখানা মাঠের মত চওড়া হইয়া গিয়াছে চুল ওঠার দরুন, ময়লা শাড়ীখানাতে চেহারা আরও খারাপ দেখাইতেছে। যেন ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েই নয়। ফর্সা একখানা কাপড় পরিলে কি হইত?

শান্তিরামের মনে স্ত্রীর প্রতি হঠাৎ কেমন অনুকম্পা জাগিল। বেচারী নীরদা!

তাহারই দোষে নীরদা অমন হইয়া গিয়াছে। মেয়েমানুষ অসহায়, যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে। পরাও না শান্তিপুর ফরাসডাঙার জরিপাড় শাড়ী, চড়াও না মোটরগাড়ীতে? এমন চড়িবে যখন, সাজসজ্জাও করিবে তখন। উহার দোষ কি?

না—কাল উঠিয়া কোন একটা চেষ্টা-চরিত্র দেখিতে হইবে। হাত-পা হারাইলে চলিবে না!

নীরদা বলিল—পান দেব, পান খাবে?

—না। এক গেলাস জল বরং দাও! তামাকের পাত্রটা কোথায় রেখেছ? টিকে-গুলোতে জল না পড়ে।

—তামাক খাবে নাকি? সাজবো?

—থাক, তুমি জল দাও। তামাক আমি সাজছি।

তামাক টানিতে টানিতে শান্তিরাম বলিল—এখানে আর দেনা কত হয়েছে?

—তা পনেরো-ষোল টাকা কেষ্টর দোকানে বাকি পড়েছে। রোজ তাগাদা করে, বলেছিলাম পুজোর সময় বাড়ী এলে একেবারে নিও—

—পনেরো-ষোল টাকা! এত ধার জমলো কি করে?

নীরদা একটু ঝাঁজের সহিত বলিল—জমবে আর কি করে। চার মাস যে বাড়ীতে উপুড়-হাত করোনি সে কথা মনে আছে? চালাচ্ছি কি করে তবে? তবুও আমার কথায় চাল ধার দেয়—নইলে পাড়ায় ধার দেওয়া দোকান থেকে বন্ধ করে দিয়েছে।

এই কথাটিতে শান্তিরামের দুর্ভাবনা আবার বাড়িয়া গেল। একটা টাকা যাহার কাছে একটা মোহর—বর্তমানে, তাহার মুদীর দোকানে পনেরো-ষোল টাকা বাকি! না শোধ করিলে অবশ্যই চলে এবং চলিতও। কিন্তু বর্তমানের অসহায় অবস্থায় দোকান হইতে ধারে জিনিসপত্র না লইলে চলিবে না এবং লইতে গেলেই পূর্বের দেনার কিছু অংশ শোধ করিতেই হইবে।

নীরদা বলিল—শুয়ে পড় এখন। ভেবে আর কি হবে। যা হবার হবে।

নীরদার এ কথাটা আবার শান্তিরামের বেশ লাগিল। নীরদার মনে ভালবাসা আছে। দুঃখ হোক, কষ্ট হোক, নীরদার মুখখানা দেখিলে তবুও যেন অনেকটা শান্তি।

নীরদা বলিল—ওগো শোন, তোমাদের গাঁয়ে পশুপতি মুখুজ্জে কে ছিল? পুকুরধারের ওই যে বড় দোতলা বাড়ীটা? ও তো আমার বিয়ে হয়ে পর্যান্ত পড়েই আছে ওই ভাবে। ওই বাড়ীর লোক এসেছে, আজ পুকুরের ঘাটে গিয়ে দেখি গাড়ী করে নামলো। একজন ছোকরা, এক ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, এক বুড়ী বোধ হয় ওদের মা—মেয়েটা আইবুড়ো, বেশ দেখতে। ওরা পশ্চিমে থাকতো না?

শান্তিরাম বলিল—পশুপতিদাদার বাড়ীতে? তা হবে। পশুপতিদাদা তো মারা গিয়েছেন আজ সাত-আট বছর। তাঁর ছেলে শুনেছি ইঞ্জিনিয়ার। এতকাল পরে দেশের কথা মনে পড়েছে বোধ হয়। লখনৌ না কানপুর কোথায় থাকে।

—কোন জন্মে তো আসতে দেখিনি। বাড়ীটা তো ভাঙাচোরা, থাকবে কি করে ও বাড়ীতে?

পরদিন সকালে শান্তিরাম বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—কাকা চিনতে পারেন?

শান্তিরাম বুঝিল এটি পশুপতি মুখুজ্জের ছেলে, যাহার কথা রাত্রে হইয়াছিল। বলিল—এসো বাবা, এসো। তোমার খুড়ীমা বলছিলেন তোমরা কাল এসেছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যথেষ্ট—আহা পুণ্যাত্মা লোক—তোমাদের রেখে স্বর্গে চলে গিয়েছেন- বসো বাবা, বসো। বৌদিও এসেছেন নাকি?

না, মায়ের শরীর ভাল না। সঙ্গে এসেছেন আমার এক সম্পর্কে মাসীমা। আমি কখনো গাঁয়ে আসিনি—কাউকে চিনি নে। সকলের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াচ্ছি। দেখুন, এই বাপঠাকুরদার দেশ। অথচ কাউকে চিনি নে। বাড়ীটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে একেবারে। কাল সারা রাত্তির বিছানায় জল পড়েছে। সঙ্গে আমার বোন আছে—ওকেও নিয়ে এলাম, এবার ম্যাট্রিক দেবে। কলকাতায় মামার বাড়ী থেকে পড়ে।

—বেশ বেশ, খুব ভালো বাবা। যাবে আসবে বৈ কি! তোমরা গাঁয়ের রত্ন, না এলে-গেলে কি হয়? দেখছ তো গাঁয়ের অবস্থা। এমন সোনার চাঁদ ছেলে সব থাকতে, আমরা কি কষ্টটা পাচ্ছি দেখ গাঁয়ে থেকে। তোমার নামটি কি বাবা?

যুবক বলিল—আজ্ঞে আমার নাম সুশান্ত। আমার বোনের নাম চিন্ময়ী, চিনু বলে ডাকে। আপনার কাছে যে জন্যে এলাম তা বলি। বাবা আমাদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাদার নামে গাঁয়ে একটা পুকুর কেটে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে। আজ সাত বছর বাবা মারা গিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে আমার গাঁয়ে আসা ঘটেনি। তাই এবার ভাবলুম—যাবই। কাজটা সেরে আসি। আমাদের বাড়ীর সামনে যে পুকুরটা রয়েছে, ও তো একেবারে মজা। ভাবছি ওটাকে কাটাবো। পাড়ার লোকের জল খাওয়ার সুবিধে হয়

তা হ'লে। তা ও-পুকুরে আপনার অংশ আছে শুনলাম। আমি অন্য সব অংশীদারের কাছে গিয়েছিলাম, তাঁরা সব রাজী হয়েছেন। এখন আপনি যদি—আমি অবিশ্যি ন্যায্য দাম যা হয় দেব। সকলকেই দেব।

শান্তিরাম বলিল—এঃ আর কি বাবা, খুব ভাল কথা। তোমার খুড়ীমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করে ওবেলা কি কাল যা হয় বলব।

যুবক চলিয়া গেল। শান্তিরাম স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল- শোন, শোন। একেবারে অকূল ভাবছিলাম, একটা কূল দেখা দিয়েছে—

তারপর পুকুরের ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া বলিল—মজা এঁদো পুকুর পড়ে আছে শেওলা হয়ে। কখনো কিছু তো হয় না। যা পাও, পঁচিশটে টাকাও দেবে। ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে পাঁচ পয়সার হরিলুট দিও।

দুপুরের পর পশুপতি মুখুজ্জের মেয়েটি শান্তিরামের বাড়ী বেড়াইতে আসিল। নীরদাকে প্রণাম করিয়া বলিল, কাকীমা, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

নীরদা কাঁথা সেলাই করিতেছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া মেয়েটির চিবুক ছুঁইয়া আদর করিয়া বলিল, এসো মা আমার, এসো, বসো। গরীব কাকার বাড়ী, তোমায় মা কোথায় বসাই; এ আসনখানাতে বসো মা।

দুজনে ভাবসাব খুব শীঘ্রই হইয়া গেল। মেয়েটি বেশ সুন্দরী। সারা দেহে একটা গতির হিল্লোল, ছিপছিপে গড়ন, মাথায় একরাশ চুল, একটু নামাইয়া এলানো খোঁপা-বাঁধা—সাদা-সিধা ধরণের শাড়ী ব্লাউজ পরনে। হাসি ছাড়া যেন কথা কহিতে পারে না মেয়েটি।

নীরদা বলিল—তোমার দাদা এসেছিল ওবেলা তোমার কাকার সঙ্গে দেখা করতে। শুনলাম বড় ভাল ছেলেটি। তুমি ইস্কুলে পড় শুনলাম। কি পড়?

—ক্লাস টেন্-এ পড়ি। এবার ম্যাট্রিক দেব।

—তোমার মা এলেন না কেন? কখন দেখিনি তাঁকে।

—তাঁর শরীর ভাল না। বিছানা থেকে উঠলে মাথা ঘোরে—কোথাও বেরুতে পারেন না।

—আহা! তাঁর দেখাশুনো কে করে? তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—না, দাদা বিয়ে করবে না এখন। দেশসেবা করবে, যারা লেখাপড়া জানে না তাদের লেখাপড়া শেখাবে—এসব দিকে মন। দেশের কাজ করবে বলে পাগল। অন্য ধরনের মানুষ দাদা।

দাদার কথা বলিবার সময় মেয়েটির চোখের দৃষ্টি স্নেহ ও শ্রদ্ধায় নম্র হইয়া উঠিল। ক্ষণে ক্ষণে ইহার মুখের চেহারা যেন বদলাইয়া যাইতেছে। ভারী জীবন্ত চোখমুখ—এসব পাড়াগাঁয়ে নীরদা কখনও এমন মেয়ে দেখে নাই।

অনেকক্ষণ বসিয়া এগল্প ওগল্প করিবার পর মেয়েটি উঠিতে চাহিলে নীরদা বলিল—ছিঃ মা, গরীব কাকীমার বাড়ী এসেছ যদি, কিছু না খেয়ে তো যেতে পারবে না। তুমি বসো,

আমি একটু হালুয়া করে আনি—

চিনু বলিল—মুড়ি নেই কাকীমা? মুড়ি খেতে বড় ভালবাসি।

নীরদা তাড়াতাড়ি মুড়ি মাখিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—তুমি কি মুড়ি খেতে পারবে মা, সেই জন্যে দিতে ভরসা করিনি। আমি নিজে মুড়ি ভাজ—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল মুড়ির ধান ফুরাইয়াছে, অথচ কিনিবার পয়সা নাই। আর দুদিন পরে চিনু আসিলে তাহাকে মুড়ি দিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত থাকিত না। মানসম্ভ্রম কি করিয়া বজায় থাকে যে সংসারে পুরুষ মানুষ অমন অকর্ম্মণ্য!

চিনু সেদিন গেল, কিন্তু পরদিন সকালে আবার আসিয়া প্রায় ঘণ্টা-দুই নীরদার সঙ্গে কাটাইয়া গেল। ভারি অমায়িক মেয়ে, এদিন সংসারের যত তরকারি, সব বঁটি পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কুটিয়া দিতে লাগিল, নীরদাও কোন বারণ শুনিল না। পাড়ার অন্য সকলের বাড়ীতে চিনু তত যায় না, যত এখানে সে আসে। নীরদাকে তাহার কি যে ভাল লাগিল সে-ই জানে। দিনে অন্ততঃ দুইবার তার এখানে আসাই চাই। নীরদারও তাহাকে বেশ ভাল লাগে।

দিন দশ বারো পরে একদিন শান্তিরাম স্ত্রীকে বলিল—শুনেছ, আমার অংশের দাম ধার্য্য হয়েছে বত্রিশ টাকা। আশা করি নি এত হবে! তা সবাই যে দর নিয়েছে আমিও তাই নিলাম।

নীরদা অবাক হইয়া বলিল—সে কি গো! এই এক মজা ডোবা, বত্রিশ টাকা করে অংশ হলে ছ-অংশের জন্য সুশান্তকে দুশো টাকা দিতে হবে?

—তা হবে বৈ কি। ঠাকুরদাদার নামে পুকুর পিরতিষ্ঠে করবার গরজ আছে—টাকা খরচ করবে না?

নীরদা গম্ভীর মুখে বলিল—একটা কথা বলি শোন। তুমি ও টাকা নিতে পারবে না; ছেড়ে দাও অমনি।

শান্তিরাম অবাক হইয়া বলিল—এমনি ছেড়ে দেব! কেন? বেশ তো তুমি—

নীরদা বলিল—চিনু আমাকে বড় ভালবাসে। এখানে ছাড়া সে কোথাও যায় না আসে না। দুটি চালভাজা দিই তাই হাসিমুখে বসে বসে খায়। মেয়ের মতো মায়া হয়েছে ওর ওপর, ওদের কাছ থেকে তুমি ওই ডোবা বেচে টাকা নিতে পারবে না—আর যে টাকা নেয্য নয়, তা কখনও নিতে পারবে না তুমি।

—তবে চলবে কি করে শুনি? এ টাকা ছাড়লে কিসে থেকে কি হবে?

—তা যাই হোক! ওরা বড়মানুষ বটে, কিন্তু গাঁয়ে সবাই ওদের ঠকিয়ে নিচ্ছে ছেলেমানুষ পেয়ে—তা বলে তুমি তা নিতে পারবে না। এতে আমাদের ভাগ্যে যা আছে! তুমি নিলে আমি অনর্থ বাধাব বলে দিচ্ছি।

স্ত্রীকে শান্তিরাম ভয় করিত। কাজেই যখন অন্য সরিকেরা ডোবার অংশের দাম বড্ডায়-গণ্ডায় বুঝিয়া পাইল, শান্তিরাম কিছুতেই টাকা লইল না। সুশান্তকে বলিল—পশুপতি দাদার

ইচ্ছেতে তাঁর বাবার নামে পুকুর হবে, আমি তাতে টাকা নিতে পারব না। এমনি লিখে দিচ্ছি আমার অংশ। ও অনুরোধ ক'রো না বাবা!

রাত্রে সে স্ত্রীকে বলিল—কথায় বলে স্ত্রীবুদ্ধি! তুমি টাকা নিতে দিলে না, এখন কর উপোস! বত্রিশ টাকায় ছুটি মাস ভাবতে হতো না। এখন আমি কোথা থেকে কি করি, এই পুজো আসছে সামনে, অন্তত ওদের কাপড় কিনে দিতে পারতাম তো—

নীরদা বলিল—ফাঁকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে টাকায় আমার ছেলেমেয়ের কাপড় কিনতে হবে না। ওরা কাপড় এবার না হয় পরবে না। যেমন চিনু তেমনি ওর দাদা—ওরা ছেলেমানুষ। ওদের কাছ থেকে দম দিয়ে অনেষ্য টাকা আদায় করে কদিন খাবে? বেশ করেছ ছেড়ে দিয়েছ।

টাকাটা হাতছাড়া হওয়াতে শান্তিরাম দুঃখিত হইল বটে কিন্তু স্ত্রীর এ নূতন মূর্ত্তি তাহার কাছে লাগিল ভাল। সোনার বালার শোকে স্ত্রীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, ইহা তাহার বিপরীত; নীরদা—না, বেশ লোক। এ জিনিস যে আবার নীরদার মধ্যে আছে—

বলিল—শোন, ওপাড়ার মহেশদাদা তো এক শরিক! আমায় ডেকে পরশু বলছে—হ্যাঁ হে, তোমরা নাকি বত্রিশ টাকা করে অংশ ধার্য্য করেছ? আমি আমার অংশ পঞ্চাশ টাকার কমে দেব না। ওদের গরজ পড়েছে, বড়লোক, যা চাইবো তাই দিতে হবে। ও খাশ ব্রহ্মোত্তর, ছাড়বো কেন অত সহজে? সত্যি যা বলেছ, সুশান্তকে ভালমানুষ পেয়ে ওরা দম দিয়ে বেশী টাকা আদায় করেছে।

—করে থাকে করেছে। যার ধর্ম্ম তার কাছে। ও টাকা কদিন খেতে? ও কথা বাদ দাও। পুকুর কাটিয়ে দেবে ওরা একগাদা টাকা খরচ করে কিন্তু জল খাবে পাড়ার পাঁচজনেই তো? ওরা সেই পশ্চিম থেকে কিছু পুকুরের জল খেতে আসছে না। আমাদের সুবিধের জন্যেই ওরা করে দিচ্ছে। চিনু বলেছিল, ওর দাদা পরের কাজে, দেশের কাজে বড় মন দিয়েছে। বেশ ছেলেটি।

পূজার দিন কয়েক বাকি।

সুশান্ত সন্ধ্যার সময় শান্তিরামের বাড়ী আসিল। বলিল—কাকা, আমরা কাল চলে যাচ্ছি পশ্চিমে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। আপনার উপর একটা ভার দিয়ে যেতে চাই। পুকুর কাটানোর ভারটা আপনি নিন। গাঁয়ের মধ্যে আপনি অনেস্ট লোক দেখলুম। চিনুর মুখে আপনাদের সব কথা আমি শুনেছি। একটা প্রস্তাব আছে আমার, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি। আমি এই পুকুর কাটানোর আর আমাদের জমিজমা বাড়ীঘর এখানে যা আছে তা দেখাশুনা করবার জন্যে মাসে আপনাকে পনেরো টাকা দেবো। পুকুর কাটানো হয়ে গেলে আমাদের বাড়ীটা মেরামত করবার ভারও আপনার ওপর থাকবে। আমি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে খালাস হবো। মাঘ মাসের দিকে মাকে নিয়ে এসে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে যাবো। বলুন কাকা, এতে আপনি রাজী আছেন—রাজী না হলে

ছাড়ছি নে, গাঁয়ে আর লোক নেই। আর আমাদের যাওয়ার আগে আপনার ছুমাসের টাকা দিয়ে যাবো—কেন না, পুজো আসছে, খরচপত্র আছে তো? পুকুর-কাটার দরুনও আপাততঃ একশো টাকা আপনার হাতে দিয়ে যেতে চাই—আপনাকে সকলে গাঁয়ে বলে হোটেলওয়ালা বামুন, কিন্তু দেখছি আপনিই খাঁটি লোক।

শান্তিরামের মাথা ঘুরিয়া গেল। ছোকরা আরও সব যে কি বলিয়া গেল শান্তিরামের মাথার মধ্যে কিছু ঢুকিল না। সুশান্ত চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কোথায় গেলে, শুনছো—শোন শোন—

নীরদা সব শুনিয়া হাসিমুখে বলিল—স্ত্রীবুদ্ধি বলছিলে যে? আমার বুদ্ধি নিয়ে চলো একটু।

ফিরিওয়ালা

অনেক দিন আগে বাল্যজীবনে যখন কলকাতায় এসে কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ করি, তখন হ্যারিসন রোডের একটা ছাত্রদের মেসে থাকতাম।

একজন ফিরিওয়ালা সে-সময় প্রত্যহ আমাদের মেসে আসত, তার মাথায় একটা চেপ্‌টা গড়নের হাঁড়ি—তাতে থাকত ক্ষীরমোহন ও রসগোল্লা। লোকটা সত্যিই ভারি চমৎকার ক্ষীরমোহন তৈরি করতে পারত—এবং তার চেয়েও বড় গুণ ছিল লোকটার,—সে ধারে খাবার দিয়ে যেত মেসের ছেলেদের।

মেসে জিনিসপত্র যারা বিক্রি করে, ধার না দিলে তাদের ব্যবসাই চলে না—একথা তাদের চেয়ে ভালভাবে কেউ বুঝত না। ধারও যেমন তেমন ধার নয়, মেসের ছেলেরা নির্ব্বিবাদে দিনের পর দিন খেয়ে চলেছে, মাস শেষ হলে দেখা গেল, ফিরিওয়ালার ক্ষীরমোহনের দেনা দাঁড়িয়েছে এক-একজনের কাছে দশ টাকা, পনেরো টাকা। মজা হচ্ছে এই যে, টাকা শোধ না হলেও এসব ক্ষেত্রে ধার দিয়েই যেতে হবে—কারণ খাবার খাইয়ে না যেতে পারলে টাকা কখনই আদায় হবে না।

ক্ষীরমোহনওয়ালার মুখে বিনয়ের হাসি সর্ব্বদাই লেগে থাকত, আমি কখনো তার হাসিমুখ ছাড়া দেখিনি অন্ততঃ। ও এলেই বড় ভাল লাগত—ওর মুখের মজার মজার হাসির গল্প শুনতে। মেসের ছেলেরা গল্প শুনতে শুনতে চার পাঁচ টাকার খাবার খেয়ে ফেলত সবাই মিলে।

লোকটার চেহারা ছিল ভাল। বেশ দোহারা গঠনের, রং একটু ফর্সা, বড় বড় গোঁপ জোড়া দেখলেই আমাদের খুব হাসি পেত, তার ওপরে ওর মুখে ওর দেশের নানান রকম মজার গল্প শুনতে গিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার উপক্রম হত।

ঘড়ির কাঁটার মত লোকটা আসত আমাদের মেসে।

ঠিক সাতটা যে-ই বাজল, মুখ ধুয়ে উঠে সবাই বসেছে, এইবার চা আর খাবার আনবার দরকার, অমনি দেখা গেল ক্ষীরমোহনওয়ালা তার চেপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে হাজির হয়েছে। ছুঘণ্টা ধরে নানারকম হাসির গল্পের মধ্যে বেচা-কেনা নিষ্পন্ন করে সে তার চেপ্‌টা হাঁড়িটা মাথায় তুলে আবার ফিরে যেত। এই রকম দুই তিন বছর কেটে গেল।

তারপর আমাদের মেস গেল ভেঙে, আমিও অন্যত্র গিয়ে উঠলাম। দিনকতক পরে আমার নতুন মেসে আবার সেই ফিরিওয়ালা গিয়ে হাজির।

মেসের ছেলেদের মন কি করে পেতে হয়, এ আর্ট ভালভাবে জানা ছিল লোকটার। মাসখানেক যেতে না যেতে ও এখানেও সবার অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। এক হাঁড়ি করে প্রতিদিন বিক্রি হতে লাগল এ মেসেও। একদিন ক্ষীরমোহনওয়ালা (ওর নামটা বোধ হয় ছিল পঞ্চানন, কিন্তু ওর নাম ধরে কেউ কোনদিন ডাকেনি, কাজেই ঠিক মনে নেই) এসে আমাদের হাতজোড় করে বল্লে—বাবুমশাইরা, আমার ছেলের বিয়ের আজ বৌভাত, আপনাদের দোরে খেয়েই তো আমি মানুষ। আপনারা সবাই আমার মনিব। বলতে সাহস পাইনে, তবে যদি আপনারা দয়া করে আমার ওখানে আজ পায়ের ধুলো দিয়ে মিষ্টিমুখ করে আসেন, তবে বড় খুশী হই।

মেসের অনেকে গেল, কি কারণে আমার যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটে নি। যারা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে ফিরিওয়ালার খাতির ও যত্ন আতিথ্যের যথেষ্ট প্রশংসা করলে।

বেলেঘাটা অঞ্চলে কোথায় একটা ছোট্ট খোলার বাড়ীতে ফিরিওয়ালার বাসা। তারই সামনে অন্য একখানা খোলার বাড়ীর বাইরের ঘরে ওদের বসবার জন্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা পাতা হয়েছিল। পান তো ছিলই, এমন কি কাঁচি সিগারেটের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা ছিল। মেসের ছেলেরা নববধূর জন্যে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল। বৌটিও বেশই হয়েছে সবাই বল্লে, তবে বয়েস কম, এগারো বছরের বেশী নয়—ছেলের বয়েসই সবে ষোল বছর।

তারপর ফিরিওয়ালা সকলকে পরিতোষ করে খাইয়ে ছেড়েছে—লুচি, তরকারি, মাছ, দই, সন্দেশ ইত্যাদি। খাওয়ার পর আবার পান সিগারেট। একজন সামান্য ফিরিওয়ালা যে এমন চমৎকার খাতির যত্ন করবে ভদ্রলোকের ছেলেদের, সেটা এমন বেশী কথা কিছু নয়, কিন্তু তার আয়োজন যে এমন ত্রুটিশূন্য হবে, তার ঘর দোর, বসবার বিছানা যে এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এটাই অনেকে আশা করেনি। এমন কি, যাবার সময়ে সকলে ঠিক করেই গিয়েছিল, যাচ্ছি বটে—নিতান্ত গরীব লোকটা নিমন্ত্রণ করে ফেলেছে, না গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হবে তাই যাওয়া। ওর ছেলের বউয়ের মুখদেখানি স্বরূপ কিছু কিছু ওর হাতে দিয়েই চলে আসবে, কিছু খাবে না কেউ সেখানে। তার পরিবর্ত্তে তারা যা দেখলে, তা আশাতীত বটে তাদের পক্ষে। দুতিন-দিন ধরে মেসে ফিরিওয়ালা ছেলের বিয়েরই কথাই চলল।

তারপর আবার ফিরিওয়ালা মেসে আসতে লাগল। আগের চেয়ে তার দশগুণ

খাতির বেড়ে গেল আমাদের মেসে। ক্ষীরমোহন এক হাঁড়ি করে উঠত আগে—এখন দুবেলা ওঠে দু-হাঁড়ি।

ধড়িবাজ ব্যবসাদারও বটে লোকটা।

আরও বছর দুই পরে আমার ছাত্রজীবন শেষ হল, আমি কলকাতার বাইরে গেলাম চাকুরি নিয়ে এবং সেখানে সাত আট বছর কাটিয়ে দিলাম। কলকাতার জীবন ক্রমশঃ দূরের হয়ে গেল—মেসের কথা, পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের কথা আর তেমন করে ভাবিনে। সেবার পূজার পূর্ব্বে বিশেষ কি কাজে কলকাতায় এসে দেখলাম, আমার পূর্ব্ব-পরিচিত সেই ক্ষীরমোহনওয়ালা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে মেসে খাবার বিক্রী করতে এসেছে।

আমি বল্লাম—কিগো, চিনতে পার?

ফিরিওয়ালা আমায় দেখে চিনতে পারলে, খুব খুশী হল। প্রণাম করে বললে—বাবুমশাই, চিনতে পারব না আপনাদের? আপনাদের দোরে খেয়ে মানুষ আর আপনাদেরই চিনব না? তা এখন কোথায় আছেন? অনেক কাল আপনাকে দেখিনি। বিয়ে-থা করেছেন বাবু? ছেলেপিলে হয়েছেন?

আমি আমার সব খবর মোটামুটি তাকে দিয়ে জিগ্যেস করলাম—তোমার সব খবর ভাল? আছ কেমন? তোমার ছেলেটি এখন কি করে?

লোকটা চুপ করে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—বাবু, সে নেই।

আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—তোমার ছেলেটি নেই! মারা গিয়েছে? কতদিন হল?

ফিরিওয়ালার চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়তে লাগল। ময়লা কোঁচার খুঁটে চোখের জল মুছে বললে—বাবু, তার কি হয়েছে তা যদি জানতাম, তা হলে তো মনটা শান্ত হত। আর বছর মাঘ মাসে একদিন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল বৌবাজার যাব বলে। বৌবাজারে আমাদের দেশের একজন লোকের মুদিখানার দোকান আছে। সেই যে বাবু গেল, আর এল না।

—খুঁজেছিলে?

—খোঁজার কি কিছু বাকি রেখেছিলাম বাবু? সব হাসপাতাল সব জায়গা খোঁজ করেছিলাম—কোন সন্ধান নেই। এখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি বাবু। আপনার সঙ্গে একটা কথা বলব—কাল থাকবেন?

পরদিন সকালে ফিরিওয়ালা আবার এসে আমার ঘরের দোরের সামনে দাঁড়াল। বললাম —এস, ঘরের মধ্যে এস, কেউ নেই—কি কথা বলবে বলছিলে;—

—বাবু, আপনি একটু খবরের কাগজে লিখে দেবেন ছেলের কথাটা? আমায় লোকে বলে তুমি কাগজে লিখে দাও, তা হলে ছেলে পাওয়া যায়। দেবেন লিখে বাবু?

কোথায় কি লিখে দেব বুঝতে পারলুম না। এতদিন পরে লিখে দিলেও যে বিশেষ কোন ফল হবে, সে সম্বন্ধে আমার নিজের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবুও পুত্রশোকার্ত্ত পিতাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলুম, আচ্ছা, তুমি বলে যাও, আমি লিখে নিই। কি রকম দেখতে ছিল

তোমার ছেলে? বয়েস কত?

কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমি নিজের খরচে দু'তিনখানা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেলাম। বাবা ননী, ফিরে এস, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, যদি শেষ দেখা করতে চাও—ইত্যাদি।

এর ফলাফলের কথা আমি কিছু জানিনে—কারণ তিনচার দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতা থেকে চলে গেলাম।

পুনরায় কলকাতায় ফিরলুম দু-বছর পরে।

কলকাতায় এবার এসেছিলাম খুব অল্পদিনের জন্যে, আগের সেই মেসটাতেই উঠেছিলাম—কিন্তু ফিরিওয়ালাকে এবার আর দেখলাম না সেখানে, তার কথা যে খুব মনে ছিল, তাও নয়।

নিজের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরতাম, অন্য কারও কথা ভাববার অবকাশ ছিল কোথায়?

হয়তো বা ওকে দেখলে সব কথা মনে পড়ত, কিন্তু তা হয় নি।

তারপর আবার চলে গেলুম কলকাতা থেকে।

বিদেশে থাকবার সময়ে অবসর-সময়ে আমার মাঝে মাঝে দু-একবার ফিরিওয়ালা ও তার ছেলের কথা মনে হত—তারপরে একেবারে ভুলে গেলাম।

ন-বছর পরে বিদেশে চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এসে কলকাতাতেই চাকুরির খোঁজে এলাম, মাস কয়েক পরে একটা চাকুরি পেয়েও গেলাম।

মেসেই থাকি। পূর্ব্বে যে অঞ্চলে থাকতাম, সেই অঞ্চলে বটে, তবে অন্য বাড়ীতে। হঠাৎ একদিন দেখি সেই ফিরিওয়ালা। সেই চেপ্‌টা ধরনের হাঁড়িতে ক্ষীরমোহন ভরা, আগেকার মতই। ওকে দেখে কি জানি কেন, আমি হঠাৎ বড় খুশী হয়ে উঠলুম। এই যে মেসে এসে উঠেছি এখানে সবাই অপরিচিত, এদের সঙ্গে আমার মনের কোন যোগই নেই কোন দিক দিয়ে। এই অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ভিড়ের মধ্যে এই লোকটিই একমাত্র আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার বহুকাল পূর্ব্বের ছাত্রজীবনের সঙ্গে কেবল এই লোকটিরই যোগ আছে—আর কারও নেই এখানকার মধ্যে।

আমাকে কিন্তু ও প্রথমটাতে আদৌ চিনতে পারেনি। আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছিল এর মধ্যে, বয়েসেও হয়েছিল, হবারই কথা—আমার বর্ত্তমান জীবন ও ছাত্রজীবনের মধ্যে কুড়ি-একুশ বৎসরের ব্যবধান।

এখনও লোকটা ঠিক সেই আগের দিনের মতই সেই একই ধরনের চেপ্‌টা হাঁড়ি মাথায় করে মেসে মেসে ক্ষীরমোহন ফিরি করে বেড়ায়।

ওকে ডাকলুম। ক্ষীরমোহন কিনে পয়সা দেবার সময় ও আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দু-একবার, কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না।

আমি বল্লুম—কি, চিনতে পারো?

ফিরিওয়ালা হাতজোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তাই চেয়ে চেয়ে দেখছি, বাবুমশাই না?…তা এখন আর চোখে তেমন তেজ নেই আগেকার মত। এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু?

ফিরিওয়ালার চেহারার কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম—মাথার চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি, মুখের চেহারা ঠিক তেমনি আছে।

বল্লাম—আমি দেখছি—তোমার চেহারা রাখলে কি করে? কিছুই বদলায়নি, মনে হচ্ছে যখন হ্যারিসন রোডের মেসে খেতে, সে যেন কালকের কথা।

ফিরিওয়ালা বল্লে—আর বাবুমশাই, চেহারা!

হঠাৎ মনে পড়ল ওর নিরুদ্দিষ্ট ছেলের কথা। আগে মনে হওয়াই উচিত ছিল সেটা, কিন্তু তা হয় নি। একটু ইতস্ততঃ করে জিগ্যেস করলুম—হ্যাঁ, ভাল কথা, তোমার সেই ছেলেটি—

ফিরিওয়ালা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লে—না বাবু, সে সেই যে চলে গেছে, সেই শেষ।

খুব দুঃখিত হলাম শুনে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও তাহলে কোন কাজ হয়নি!

—ছেলের বৌটি কোথায়?

—আমার কাছেই আছে বাবুমশায়, আর কোথায় যাবে?

—এখন আছ কোথায়?

—বেলেঘাটায় সেই বাসাতেই।

—তোমার স্ত্রী আছে তো?

—না বাবু—সেও আজ চার বছর হলো মারা গিয়েছে। ছেলের নিরুদ্দেশের পর তার শরীর সেই যে ভেঙে গেল, আর তো ভাল হয়নি। বাবু এসে পড়েছেন, ভাল হয়েছে—

—কেন বল তো?

—আমাকে কিছু সাহায্য করুন বাবুমশাই। বারো বছর হয়ে গেল, এবার খোকার কুশপুতুল দাহ করে শ্রাদ্ধ করব। বিধেন নিয়েছি ভটচাযি্য মশায়ের কাছ থেকে। আমার তেমন রোজগার-পাতি নেই আজকাল—ভিক্ষেশিক্ষে করে ছেলের কাজটা করব—

ওকে একটি টাকার বেশী দিতে পারলাম না—নিজেরই চাকুরির অবস্থা সুবিধে নয়, মেসের খরচ চালানোই দুর্ঘট হয়ে পড়েছে।

দিন পনেরো পরে ফিরিওয়ালা এসে আমায় বল্লে—বাবু, আজ আমার ছেলের কাজ, আপনি একটু পায়ের ধুলো যদি দেন গরীবের বাড়ীতে, ছোট মুখে বলতে সাহস হয় না আপনাকে—আপনার দয়া—

ওর অনুরোধ এড়াতে পারলুম না—মন সরলো না। বহুদিনের যোগাযোগ ওর সঙ্গে। আমার ছাত্রজীবনের আমলের আর কোন পরিচিত লোক কলকাতায় নেই—এই ফিরিওয়ালা ছাড়া। যেতেই হলো।

ও একটা ঠিকানা আমায় দিয়ে গেল বেলেঘাটার—যে অঞ্চলে জীবনে কখনো যাইনি,

যাবার প্রয়োজনও হয়নি এতদিন। একটা বস্তির খানকুড়ি বাইশ ঘরের মধ্যে অতি কষ্টে ওর ঘর খুঁজে বার করলুম। সামনে একটা ডোবা। সামনে একটা নীচু খোলার ঘরে ফিরিওয়ালা আমায় নিয়ে গিয়ে যত্ন করে বসালে। কেওড়া কাঠের তক্তপোশের ওপর পুরু করে বিছানা পাতা। আমি আসাতে ফিরিওয়ালা যে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে ওর প্রত্যেক কথার মধ্যে, হাত-পা নাড়ার ভঙ্গির মধ্যে তার প্রকাশ।

আমি জিগ্যেস করলাম—এ বাড়ীতে কতদিন আছ?

—আজ ত্রিশ বছর বাবু, এ বাড়ীতে আমার খোকা জন্মায়—

তারপর সে ব্যস্ত হয়ে, কোথায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই একবাক্স সিগারেট এনে আমার সামনে রেখে দিয়ে বল্লে—নিন, বেশ আরাম করুন বাবু, গরীবের কুঁড়েয় যখন এসেছেন—

ওর হাব-ভাব দেখে মনে হবার কথা নয় যে আজ ওর পুত্রের শ্রাদ্ধ। যেন কোন উৎসব আনন্দের কাজ চলছে বাড়ীতে। আমার মনে কেমন সঙ্কোচের ভাব এল, আমি এসেছি বলে আমার খাতির করতে গিয়ে ওকে উৎসবের মতই আয়োজন করতে হয়েছে।

আমায় বল্লে—আমার খোকার যখন বিয়ে হয়, আজ অনেকদিন আগেকার কথা—তখন আপনাদের সেই পুরোনো মেসের রমেশবাবু, হরিধনবাবু, গোপালবাবু, সতীশবাবু ওঁরা সব এসে এই ঘরে এই তক্তপোশেই বসেছিলেন। বড় ভাল লোক ছিলেন ওঁরা। রমেশবাবু ওইখানটাতে বসে চা আর খাবার খেলেন, আমার আজও মনে আছে। সতীশবাবু বল্লেন—ওহে, গরম গরম লুচি নিয়ে এস তো? আমি তখন খোলা চড়িয়ে আমার স্ত্রীকে দিয়ে আলাদা করে গরম লুচি ভাজাই—খেয়ে তাঁদের কি স্ফূর্তি বাবুমশাই! বল্লেন—বেশ করেছ, বেশ করেছ—আহা কি সব লোকই ছিল তখন। পান এনে দি বাবু, বসুন—

আমি সত্যিই অস্বস্তিবোধ করছিলুম। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল ওর ছেলের বিয়েতে সেদিন—বহুবছর আগের কথা—বিশ-বাইশ বছর হবে, সে কথা আমার মনে ছিল না, আজ ওর কথায় মনে হল।

তখন কেন আসা হয়নি জানিনে—এতকাল পরে সেই ছেলের শ্রাদ্ধতে এসেছি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

লোকটা কিন্তু আমায় নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমি ওর বাড়ীতে এসেছি, এ যেন ওর কাছে মহাশুভ ঘটনা। বারবার সে আমার কাছে এসে আমার সুবিধা অসুবিধা দেখতে লাগল। বিশ বৎসর আগে যখন আমার মেসের বন্ধুরা ওর বাড়ীতে এসেছিল ওর ছেলের বিবাহে, সেও ওর জীবনে দেখলুম এক অতি স্মরণীয় দিন হয়ে আছে—ঘুরে-ফিরে বারবার ও সেই কথাই পাড়তে লাগল।

—রমেশবাবুরা এলেন, তা আমি ওঁদের জন্যে সব আলাদা বন্দোবস্ত করেছিলাম। ফিরি-ওয়ালার কাজ করি বটে বাবু, কিন্তু আমি মানুষ চিনি বাবুমশাই। হরিধনবাবু বল্লেন—তুমি ক্ষীরমোহন বিক্রী কর, তোমার ছেলের বিয়েতে আমরা পেট ভরে ক্ষীরমোহন খাব। নিয়ে

এস ক্ষীরমোহন। আমি বড় হাঁড়ির একহাঁড়ি ক্ষীরমোহন ওঁদের জন্যে আলাদা করে রেখেছিলাম। সতীশবাবু, রমেশবাবু খেয়ে খুব খুশী—তার পরের হপ্তায় সতীশবাবু আমায় পাঁচ সের ক্ষীরমোহনের অর্ডার দেন, বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে—

আমি বল্লাম—বিশ বছর আগেকার কথা তোমার এত খুঁটিনাটি মনে আছে?

ফিরিওয়ালা বল্লে—তা থাকবে না বাবু? আপনারা তো আমার বাড়ীতে রোজ রোজ পায়ের ধুলো দিচ্ছেন না। জন্মের মধ্যে কর্ম একটা দিন। তা মনে থাকবে না!

আর কিছুক্ষণ পরে আমি আরও গোটাদুই পান খেয়ে উঠবার চেষ্টা করছি, ফিরিওয়ালা জিভ কেটে বল্লে—তা কি হয় বাবু? এসেছেন যখন তখন—

আমি বল্লাম—না, শোন! আমি কিছু খেতে পারব না আজ—এ যদি আনন্দের কাজ হত আমি—

—ও কথাই মুখে আনবেন না বাবু। আপনারা আমার মা বাপ—আমার খোকার সদ্‌গতি হবে না আপনি আজ এখানে সেবা না করলে—ব্রাহ্মণ দেবতা আপনি—

অগত্যা কিছু খেতেই হল।

পাশের ঘরে আমার জন্যে পরিপাটি করে খাবার আসন পাতা। একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের বিধবা যুবতী আধ-ঘোমটা দিয়ে আমায় খাবারের থালা দিতে এল।

ফিরিওয়ালা বল্লে, এই আমার বৌমা। গড় কর বৌমা, ওঁদের খেয়েই আমরা মানুষ—ব্রাহ্মণ দেবতা—

বৌটি গলায় আঁচল দিয়ে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

ফিরিওয়ালা কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বল্লে—বৌমা বড় ভাল মেয়ে মশাই। খোকা যখন আমায় ছেড়ে পালাল, তখন বৌমার কাঁচা বয়েস, এই আঠারো কি উনিশ। সেই থেকে এই সংসারেই আছে, গরীবের সংসার, কখনো ভাল মন্দ খাওয়াতে পরাতে পারিনি। মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে। আমার পরিবার ওর ওপর একটু অত্যাচার করত, মিথ্যে কথা বলব না, দেবতা আপনারা। বলত তুই অলুক্ষুণে বৌ ঘরে এলি, আর ছেলে আমার দেশছাড়া হল। একদিনের জন্যেও বৌমা ব্যাজার হয়নি সে সব শুনে। এখন তো আর কেউ নেই—ও আছে আর আমি আছি। ওই আমার মা, ওই আমার মেয়ে—

ফিরিওয়ালার পুত্রবধূ ইতিমধ্যে দই আনতে গিয়েছিল বাড়ীর মধ্যে।

আমি বল্লাম—তোমার বৌমা বরাবর তোমার কাছেই আছে?…বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত আছে তো?…

—কোথায় বাবুমশাই? ওর তিন কুলে কেউ নেই। তাই তো মাঝে মাঝে ভাবি, বয়েস হয়েছে, আজ যদি চোখ বুজি, আমি তো বেশ যাব, পুত্রশোক জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু বৌমার কথা যখন ভাবি, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। কার কাছে রেখে যাব ওকে, সোমত্ত বয়েস, এক পয়সা দিয়ে যেতে পারব না। কখনো ঘরের চৌকাঠের বাইরে পা দেয় নি কি খাবে, কোথায় যাবে।

—ও কি বাবুমশাই, তা হবে না, ও কখনো ফেলে উঠতে পারবেন না, খেতেই হবে।

আহারাদি শেষ করে চলে আসবার সময় বিধবা মেয়েটি পান এনে রাখলে সামনে। তারপর আবার তার শ্বশুর ও সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

এরও বছরখানেক পরে পর্য্যন্ত ফিরিওয়ালা নিয়মিত ভাবে আমাদের মেসে খাবার ফিরি করতে আসত। তারপর গত বৎসর পূজোর ছুটির আগে থেকে ও আর এল না। এখনও পর্য্যন্ত একদিনও আর তাকে দেখা যায় নি। মাঝে মাঝে লোকটার কথা মনে হয়—বেঁচে আছে না মরে গেল! খোঁজ-খবর নেওয়া উচিত ছিল অবিশ্যি—কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি।

নিষ্ফলা

—আ মর্! এগিয়ে আসছে দেখ না। দূর হ, দূর হ। ওমা আমি কোথায় যাব? এ যে ঘরে আসতে চায়। ছি: ছি:! ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব গেল। বলি ও ভালমানুষের মেয়ে, এমনি করে কি লোককে পাগল করতে হয়?

বেলা বেশী নয়, আটটা হইবে প্রায়। বৈশাখ মাস—বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। পাশের বাড়ীর গৃহিণী আহ্নিক করিতে বসিয়াছেন তাঁহার পূজার ঘরে। পূজার ঘরটি ত্রিতলে। সেইখানে বাড়ীর দুষ্ট কুকুরটি দরজায় আসিয়া উঁকি মারিল। নামাবলীতে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ছোট একটি আরশি দেখিয়া নাকের উপর তিলক কাটিতে কাটিতে কুকুরের মুখদর্শন করিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত হইতে সশব্দে তিলক-মাটি পড়িয়া গেল। তিনি তখন পূজায় বাধা পড়িতে দেখিয়া চকিতে ঠাকুরঘরের দরজাটি বন্ধ করিয়া ভীত-কণ্ঠে ঐ কথাগুলি বলিতে শুরু করিলেন। নীচের তলায় বধূটি স্নান করিতেছিল। সে মুহূর্ত্তে ভিজা কাপড়েই দৌড়াইতে দৌড়াইতে উপরে আসিয়া কুকুরটিকে কোলে লইয়া বলিল—বেবী, তুই বড় দুষ্টু হয়েছিস্। একদিন না এখানে আসতে বারণ করেছি!

কথা-শেষে সে বেবীর পিঠে মৃদু করাঘাত করিল। বেবী ভারী খুশী হইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে ফিরিয়া ডাকিল, ঘেউ-ঘেউ!

বিপদ কাটিয়া যাইতে দেখিয়া শাশুড়ী নির্ভয়ে পুনরায় পূজার ঘরের দরজা খুলিয়া দিলেন; বধূকে বলিলেন, দেখো গা বাছা, কুকুরকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। কথায় আছে না, কুকুরকে নাই দিলে মাথায় ওঠে! সব জিনিসের একটা সীমা আছে।

বধূটি প্রতিবাদ করিল, কি অত আদর দিতে দেখলেন?

—ওই ত, তোমাদের সব তাতেই তর্ক। একটা কুকুরকে কোলে করে ধেই ধেই করে নাচাটা খুব ভাল, না?

বধূ আর কোন কথা না বলিয়া কুকুরটিকে লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গল্পটি আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটু গোড়ার কথা বলা দরকার। মাস ছয়েক আগে পঞ্চাননতলায় একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে সকালবেলা হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সেই গলির মধ্যে ডাস্টবিনের কাছে কাহাদের একটি কুকুরের ছানা পড়িয়া রহিয়াছে। বয়স তাহার বেশী নয়, এখনও চোখ ফোটে নাই। বেচারা ঈষৎ নড়িয়া চড়িয়া মৃত্যুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। কাহার এই দুঃসাহস যে নিঃশব্দে রাত্রিকালে চুপি চুপি নিষ্ঠুরের মত এই দুর্ভাগা ছানাটিকে এইরূপে ফেলিয়া যাইতে পারিল? ছানাটির মৃত্যু সুনিশ্চিত। প্রথমত না খাইয়া মরিতে পারে—দ্বিতীয়ত কোন শত্রুর আক্রমণেও মরিতে পারে। অগত্যা বেচারাকে রক্ষা করিবার জন্ত সকলে আকুল হইয়া পড়িল, অথচ কেহই সাহস করিয়া তাহার ভার লইতে চাহিল না। পরিশেষে ঐ বধূটির স্বামী স্ত্রীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে ভিজা গামছা পরিয়া কুকুরটিকে নিজ গৃহে লইয়া গেল। নিঃসন্তান বধূটি তাহাকে মাতার স্নেহে পালন করিতে লাগিল। 'কুকুরের জীবটি'র উপর তাহার অনুর্ব্বর জীবনের স্নেহবাৎসল্যের প্রবল বন্যা বহাইয়া দিল। দিনে দিনে তাহার সুপ্ত স্নেহ ঐ কুকুরটিকে জড়াইয়া বিরাট মহীরুহ সৃষ্টি করিতে লাগিল। কুকুরটির নাম-করণ হইল 'বেবী'। কিন্তু এই বেবীকে উপলক্ষ করিয়া বধূটির সহিত তাহার শাশুড়ীর মনোমালিন্য হইল। শাশুড়ী প্রাচীন-পন্থী বিধবা মানুষ। তিনি তাঁহার পূজা-আহ্নিক লইয়া দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা কাটাইয়া দেন। সংসারে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভোর রাত্রে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়া যান, রোদ উঠিলেই ফিরিয়া তাঁহার ত্রিতলের ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া গৃহদেবতার সেবা করেন। সন্ধ্যায় নিত্য বৈষ্ণব বাবাজীরা হরিনাম করিয়া গৃহ পবিত্র করিয়া যায়। বার মাসে তের পার্ব্বণ। গঙ্গাজল আর গোময় লেপন করিতে করিতে সারা বাড়ী শুদ্ধ করিয়াই কাটাইয়া দেন। এ হেন শাশুড়ী ঐ অপবিত্র প্রাণীটিকে তাঁহার সুপবিত্র গৃহ কলুষিত করিতে দেখিলে যে খড়্গহস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বধূটি শাশুড়ীকে যে প্রমান্য করে তাহাও বলা যায় না, কিন্তু এক্ষেত্রে কেন জানি না সে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। তাহার স্বামী অকস্মাৎ আশ্চর্য্যরূপে মূক হইয়া পড়িল। যেমন বেবী দিন দিন শশিকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল তেমনই তাহাদের কলহও প্রবল হইতে প্রবলতর হইল। শাশুড়ী বলিলেন, ছিঃ ছিঃ, এত ম্লেচ্ছপনা কি সহ্ হয়? হারামজাদা ছিষ্টি রৈ রৈ করছে। এ বাড়ীর ছায়া মাড়াতে পর্য্যন্ত গা ঘিন ঘিন করে। এমন সোনার সংসার ছারখার করে দিলে। আমার যে দুদিন কোথাও গিয়ে থাকবার চুলো নেই। কত লোকের কুকুর দেখেছি বাপু, এমন বাড়াবাড়ি কোথাও দেখিনি। তাদের কুকুর থাকে বার-বাড়ীতে বাঁধা। আর এনার কুকুরের শোবার ঘর নইলে রাতে ঘুম হয় না। আন ছিছি, কুকুর দিন-রাত্তির খাটের ওপর শুয়ে থাকে।

বারমাস গঙ্গাস্নান করিয়া তিনি অনেক পথের ঝিদি জুটাইয়াছেন। সেই পথের ঝিদিই সবিস্ময়ে কহিলেন, ওমা, আমি কোথায় যাব!

শাশুড়ী বলিলেন, শুধু কি তাই? কুকুরকে কোলে নিয়ে আটপহর কি আদর করেন—তাকে চুমু খাবার কি ঘটা!

—একেবারে সাহেবীয়ানা।

স্বামী ভুলিয়াও কোন দিন প্রতিবাদ করে নাই বা প্রশ্রয়ও দেয় নাই। মাঝে মাঝে দৈবাৎ কখনও হয়ত বলিল, বেবী এসে অবধি আমার অবস্থা বড় কাহিল হয়ে গেছে।

বেবীর কান দুইটি দুই হাত দিয়া ঈষৎ চাপিতে চাপিতে ডাগর চোখে স্বামীর পানে তাকাইয়া স্ত্রী প্রশ্ন করিল, তার মানে?

স্বামী বলিল, মানে, আমাকে তুমি কম ভালবাসছ। কারণ চব্বিশ ঘণ্টা বেবী হারাম-জাদাকে নিয়ে থাকলে আমি-বেচারার কথাটা স্মরণ হওয়া তোমার দায় হয়ে উঠেছে।

অমনি স্ত্রী অভিমানের সুরে কহিল, ওঃ! বেবীর ওপর তোমাদের বাড়ীসুদ্ধ সকলের হিংসে! ওকে গলা টিপে মেরে ফেললে তোমাদের মোলকলা পূর্ণ হয়, না?

বধূটির গণ্ড বাহিয়া অশ্রুকণা ঝরিতে লাগিল। স্ত্রীকে কাঁদিতে দেখিয়া স্বামীর চিত্তও বিচলিত হইল, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, অমনি রাগ হল রমা? ঠাট্টাও বোঝ না? যা-হোক মানুষ!

রমা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কহিল, আমি বেশ জানি, এ তোমাদের ঠাট্টা নয়। তোমাদের মনের কথা। বেশ, দূর করে বিদেয় করে দেব একে। দূর হ! দূর হ হারামজাদা।

কথা শেষে সে বেবীকে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল। বেবী কেঁউ কেঁউ করিয়া তাহার ব্যথা প্রকাশ করিল। উঠিয়া বধূটির পায়ের কাছে আসিয়া তাহার পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। বধূটি পিছু ফিরিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, আর মায়া বাড়াসনে রাক্ষস!

একটির পর একটি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। বেবীর সেবাযত্নে ত্রুটি হইল না। দুইবেলা মাংস রাঁধিয়া তাহাকে দেওয়া হইত। প্রতিদিন সকালে চা ও বিস্কুট সংযোগে সে জলযোগ করিত। তাহার নানা রকমের জামা তৈয়ারী হইল। কিন্তু রমার এই অক্লান্ত সেবা-যত্ন সত্ত্বেও বেবীর শরীর পুষ্ট হইল না, পরন্তু সে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল, তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হইল। রমার আপ্রাণ চেষ্টা আদৌ ফলপ্রসূ হইল না। সে একদিন স্বামীকে কহিল, কুকুরটা দিন দিন কেন জানি না শুকিয়ে যাচ্ছে। একটু ডাক্তার-বদ্যি দেখাও না। শুনেছি কুকুরের নাকি ডাক্তার আছে।

স্বামী কহিল, কুকুর পোষার যদি অত শখ তা হলে এক কাজ কর না।

—কি?

—ওটাকে দূর করে দাও। আমি একটা ভাল বিলিতি কুকুর এনে দিচ্ছি। সেটা মানুষ কর।

রমা অভিমান করিয়া কহিল, তার মানে তোমরা সবাই ওর শত্রু। স্বাস্থ্য কি সকলের সমান হয়?

—কিন্তু ওর স্বাস্থ্য বদলাবে না কোন দিন রমা। ওর জাতটা মনে রেখো।

—ছেলে যদি কুৎসিত কুরূপ হয় কোন মা-বাপ তাকে প্রাণ ধরে দূর করে দিতে পারে গো?

তাহার এই চরম আঘাত পাইয়াও স্বামী হো হো করিয়া হাসিল, বলিল, তার চেয়ে একটা ছেলে মানুষ কর না কেন ? কত গরীব ছেলে পাওয়া যাবে।

—তারা বড় নেমকহারাম হয়।

—কিন্তু রমা, ও কুকুর তোমায় ত্যাগ করতেই হবে!

—কারণ ?

—কারণ, ওর রোগটি সোজা নয়, ওর গায়ের ঘা বড় বিচ্ছিরি আর ছোঁয়াচে। কখনও সারে না।

স্বামী ভাবিয়াছিল স্ত্রী নিশ্চয়ই ভয় পাইয়া যাইবে, কিন্তু স্ত্রী ভয় পায় নাই। বরং সে নির্ভীকভাবে বেবীকে তাহার বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে বলিয়াছে, বেবী, বেবী, সব্বাই তোর শত্তুর।

কি জানি কেন বেবীর চোখ দুটি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিয়াছিল। রমা আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছিয়া দিতে দিতে কহিল, বেবী, দুষ্টু, কাঁদছিস্ ? দূর পাগল, আমি তোকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

কিন্তু এই ঘটনার দিন সাতেক পর বেবীই রমাকে ছাড়িয়া গেল। স্বামী যাহা বলিয়াছিল তাহাই সত্য হইল। বেবী পুরুষানুক্রমে যে দুরারোগ্য ও মারাত্মক রোগ পাইয়াছিল তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে নিষ্কৃতি পাইল না। রমা ডাক্তার-বৈদ্য দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। সকলে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে, এই একটা হীনজাত কুকুরকে এই আপ্রাণ সেবা করিতে দেখিয়া।

শাশুড়ী কহিলেন, পয়সা খোলামকুচির মত উড়ে গেল দিদি। কুকুরটাকে নিয়ে হারামজাদী পাগল হয়েছে একেবারে। এই বিচ্ছিরি রোগ, অত মাখামাখি কি ভাল ? এতে কি এমন বাহাদুরী আছে ?

দিদি কহিলেন, ছেলেপিলে নেই কি-না, তাই একটা টান পড়ে গেছে।

শাশুড়ী বলিলেন, ছেলেপিলে হবার বয়স যেন কেটে গেছে! এই তো সবে ছাব্বিশ বছর বয়স। আমার ভোঁদা হয়েছিল একুশ বছরে।

—একটা কিছু নিয়ে ত থাকতে হবে ?

—তাই বলে এতটা বাড়াবাড়ি ভাল কি দিদি ?

দিদি শাশুড়ীকে সাবধান করিয়া দিলেন, ছেলেকে তোমার তাই অত মিশতে দিও না।

শাশুড়ী কহিলেন, ছেলে ত আর পাগল নয়।

বেবীর জীবনের শেষ কয়দিন শাশুড়ী তাহাকে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, বধূটির স্বামীও এ আদেশের প্রতিধ্বনি করিল। অগত্যা বেবী বাহিরের উঠানে স্থান পাইল। রাত্রে একটা প্যাকিং বাক্সে তাহার শয্যা রচনা করা হইত। রমা নিজের হাতে রাত্রে তাহাকে খাওয়াইত। খাওয়া শেষ হইলে তাহাকে বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইতে যাইত। ইদানীং তাহার মুখে বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তাহার

যেন অতি আপনার জনটির জীবনান্তের সম্ভাবনা। সন্তানের রোগশয্যাপার্শ্বে সেবারতা মাতার মুখখানিও বুঝি এইরূপেই উদাস হইয়া থাকে। তাহার বত্রিশ নাড়ী এমন করিয়াই বার বার মোচড়াইয়া উঠে। রমার স্বামী কহিল, কুকুর-কুকুর করে তুমি খেপলে নাকি!

রমা কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, সত্যি বেবী বাঁচবে না?

তাহার বিষাদ-কাতর চোখ দুটির পানে তাকাইয়া স্বামী বেদনা বোধ করিল, স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ওর চেয়ে ভাল কুকুর এনে দেব রমা। যত দাম লাগে দেওয়া যাবে।

রমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বেবীর গা মুছিতে মুছিতে বলিল, আহা, বাছার আমার সব হাড় কখানা বেরিয়ে গেছে।

ইহার দুই দিন পরই বেবীর ইহলীলা সাঙ্গ হইল। সকালে রমা তাহার কাঠের ঘরের দরজা খুলিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বসিল। তাহার অত সাধের বেবীর মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। অসংখ্য লাল পিপীলিকায় সেই কদাকার, হাড়-বার করা রোমা-ওঠা দেহটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। রমা সেই বাক্সের উপর উবু হইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল, ওগো, আমি কাকে নিয়ে থাকব গো?

বেণীগীর ফুলবাড়ী

মুঙ্গেরের কষ্টহারিণী ঘাটে রোজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে ললিতবাবুর দেখা হইত।

আমি পিসিমার বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। পশ্চিমের শহরে তাহার পূর্ব্বে কখনও বেড়াইবার অভিজ্ঞতা ছিল না, আমার এক বন্ধু আসিবার সময় বলিয়াছিল—ওখানে জুতায় কালি দেওয়ার কোন দরকার হবে না দেখো।

দেখিলাম, ব্যাপার তাই বটে। লাল ধুলা মাখিয়া জুতার যে দশা হয় পনেরো মিনিট রাস্তা চলিবার পরেই, তাহাতে জুতায় কালি দিবার উৎসাহ ক্রমে কমিয়া গেল। শহরের মধ্যে বা বাহিরে যে কোন জায়গাতেই যান, সর্ব্বত্র ধুলা। ক্রমে বেড়াইবার উৎসাহও কমিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধারেই দেখিলাম বেড়াইবার প্রকৃষ্ট স্থান। এদিক ওদিক বেড়াইয়া কষ্টহারিণীর ঘাটের সিঁড়ির উপর অনেক রাত পর্য্যন্ত একা বসিয়া থাকিতাম।

একদিন পাশে এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া বসিলেন। কথায় কথায় আলাপ হইলে জানিলাম, তাঁহার নাম ললিতমোহন ঘোষাল, বাড়ী হুগলী জেলায়—ভবঘুরে লোক, আগে ছিলেন বর্দ্ধমান টাউনে, ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় পশ্চিমে আজ প্রায় দশ-বার বৎসর আসিয়া বাস করিতেছেন। ক্রমে ললিতবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা হইত, ঘাটে বসিয়া গল্প করিতাম অনেক রাত পর্য্যন্ত।

একদিন তিনি আসিয়া আমায় বলিলেন—আপনি একজন সাহিত্যিক, এ কথা তো এতদিন আমায় বলেন নি?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কার মুখে শুনলেন আবার এ কথা ?

—সবাই বলছে। আপনি সোমবার বেথুনবাজার লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন শুনলাম। আমার বাড়ীওয়ালার ছেলে ছিল সভায়—

—হ্যাঁ, ও।...তা বটে।

—বড় আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আমিও নিজে একটু আধটু লিখতুম কিনা এক সময়ে, তাই সাহিত্যিকদের বড় শ্রদ্ধা করি মশায়—আপনি বয়সে অনেক ছোট হলেও আমার নমস্ক—

আমি বিনয়সূচক হাস্য সহকারে বলিলাম—কি যে বলেন !

—একদিন আসুন না গরীবের বাসায়। লেখাটেখাগুলো আপনাকে দেখাব। এককালে যথেষ্ট—হেঁ হেঁ—লোকে জানতো। আমার উপন্যাসের দু-তিনটে এডিশন হয়েছে—মশাই—

শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। বাংলা আমি তখনকার সময়ের হেন উপন্যাস ছিল না যাহা পড়ি নাই। কিন্তু ললিত ঘোষালের নাম ঔপন্যাসিক হিসাবে কোথাও পাই নাই, কাহারও মুখে শুনিয়াছি বলিয়াও তো মনে হইল না।

কৌতূহলবশতঃ একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে তাঁর বাসায় গেলাম। স্টেশনের কাছে লাইনের ধারে একটা ছোট পুরানো বাড়ীর বাহিরের ঘরে তাঁর বাসা। অতি অপরিষ্কার ঘর, কত কাল যেন ঝাঁট পড়ে নাই, বিছানাপত্র ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া তুলো-বেরুনো ওয়াড়বিহীন বালিশ, ময়লা গামছা ও ঘরে পরিবার ধুতি দেখিয়া মনে হইল ললিতবাবুর বর্ত্তমান অবস্থা আদৌ স্বচ্ছল নয়। ললিতবাবু আমায় যত্ন করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, একটু চা খান দয়া করে এসেছেন যখন।

আতিথ্যের কোন ত্রুটি হইল না। নিজেই চা করিয়া দুখানা আটার রুটিতে গুড় মাখাইয়া আমায় খাইতে দিলেন। হুঁকায় তামাক সাজিয়া আমায় দিতে গেলেন, আমার ও-সব চলে না শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

নিজে তামাক খাওয়া শেষ করিয়া তিনি একখানা পুরানো বাঁধানো খাতা আমার কাছে আনিয়া খুলিলেন। আমার দিকে সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন—এই দেখুন, মানে—যত কাগজে আমার সমালোচনা বার হয়েছিল আপনাকে দেখাচ্ছি। সাগ্রহে খাতাখানি দেখিতে লাগিলাম। এখন হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯১০ কি ১২ সালের দিকে যে সব খবরের কাগজে ও মাসিক পত্রিকায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন, যেমন 'বঙ্গবাসী', 'ইংলিশম্যান', 'হিতবাদী' 'ভারত-মহিলা' প্রভৃতি—সেই সব পত্রিকা হইতে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকের সমালোচনা-গুলি কাটিয়া আঠা দিয়া খাতাখানিতে আঁটিয়া রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক টুকরাতে কাগজের নাম ও মাস তারিখ কালো কালি দিয়া হাতে লেখা। টুকরাগুলি বিবর্ণ, হলদে ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু খুব বেশী ধুলাবালি পড়িয়া নাই তাহাদের উপর—দেখিয়া মনে হয় খাতাখানির প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয় ও মাঝে মাঝে ঝাড়ামোছা করা হয়। ললিতবাবু প্রত্যেকটি আমায় পড়িয়া শোনাইতে লাগিলেন। দেখিলাম—তাঁহার বইয়ের এককালে বেশ ভাল

সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। পড়িতে পড়িতে গর্ব্বে ও আনন্দে তাঁহার মুখ চোখের ভাবই যেন বদলাইয়া গেল। একখানা ইংরাজী কাগজে তাঁহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ বলা হইয়াছে, তবে ইংরাজ-সম্পাদিত ইংরাজী কাগজ—বলা বাহুল্য, তাহাদের যেমন জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে, তেমনি জ্ঞান ললিত ঘোষাল সম্বন্ধে। উঠিব উঠিব করিতেছি এমন সময় ললিতবাবু বলিলেন, দুখানা বই লিখে রেখেছি, অনেকদিন হল। মশায় তো কলকাতায় থাকেন, পাবলিশারদের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ, বই দুখানার কিনারা করতে পারেন ?

প্রধানতঃ তাঁহারই আগ্রহে পড়িয়া সেদিন দুখানা ভারি মোটা খাতা আমাকে বাসায় বহন করিয়া আনিতে হইল।

আসিবার সময় ললিতবাবু বার বার বলিলেন, আমি যেন পাণ্ডুলিপি দুখানা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখি। কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া খাতা দুখানা পড়িয়া ললিতবাবুর জন্য আমার কষ্ট হইল। অত্যন্ত সেকেলে ধরণের লেখা, জবড়জঙ্ ভাষা, সেন্টেন্সগুলি কাঠের পুতুলের ন্যায় নড়নচড়ন-বিরহিত, প্রাণহীন। পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে পুণ্যের জয় ও পাপের শাস্তি পাঠকের চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এ যুগে এ বই অচল। ললিত ঘোষালকে কথাটা খোলাখুলিভাবে বলিতে পারি নাই। কষ্টহারিণীর ঘাটে ললিতবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—পড়েছেন ? কেমন লাগল ?

বলিলাম—চমৎকার। একালে অমন লেখা আর দেখা যায় না।

কথাটার মধ্যে মিথ্যা ছিল না।

ললিতবাবু অত্যধিক খুশী হইয়া বলিলেন—হেঁ হেঁ, আপনি হলেন গিয়ে নিজে একজন লেখক—সমঝদার লোক। আপনাকে কি বুঝিয়ে বলতে হবে এসব ? আজকাল লেখা বদলে গিয়েছে মশাই—লিখতে জানেই না। বঙ্কিম, হেমবাবু, নবীন সেন—কি সব মহামহারথী বলুন দিকি একবার ? তা নয় রবিঠাকুর, রবিঠাকুর—হেঃ—

ললিতবাবু তাচ্ছিল্য ও বিরক্তির ভঙ্গিতে অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইলেন।

আমি সমর্থনসূচক মাথা নাড়িলাম। ললিতবাবুর উপন্যাস দুখানির প্রশংসা করিয়া যে ভাল কাজ করি নাই, পরে তাহা বুঝিয়াছিলাম। দিন নাই রাত নাই ললিতবাবু তাগিদ দিয়া আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন যে, উপন্যাস দুখানির কি কিনারা করিলাম। এমন কি, সন্ধ্যাবেলায় কষ্টহারিণীর ঘাটে বেড়ানো প্রায় ছাড়িয়া দিতে হইল।

পাঁচ ছয় দিন ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই। একদিন আমার বাসার চাকর বলিল—আপনাকে এক আওরৎ খুঁজছে বাইরে—

আওরৎ কে খুঁজিবে ? বাহির হইয়া দেখি একটি সুন্দরী যুবতী সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত বাসার উঠানের পেঁপে-তলায় দাঁড়াইয়া আছে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—কে ?

মেয়েটি চোখ নীচু করিয়া দেহাতি হিন্দীতে বলিল—লোলিতবাবু আপনাকে একবার ডেকেচেন বাবুজী—

—ললিতবাবু? বেশ যাব ও-বেলা।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, মেয়েটি কে। ললিতবাবুর ঝি নাকি? কখনও সেখানে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না। বেশ দেখিতে মেয়েটি। এ দেশের হিন্দুস্থানী মেয়েরা সচরাচর যেমন আঁটসাঁট গড়নের হয়, তেমন তো বটেই, ফর্সা, ধপ্‌ধপে রং, মুখশ্রীও বেশ লালিত্যপূর্ণ।

সন্ধ্যাবেলায় ললিতবাবুর বাসায় গেলাম। ললিতবাবু উনুনে কড়া চাপাইয়া চায়ের জল গরম করিতেছিলেন। জল নামাইয়া দুধ ও ভেলিগুড় মিশাইয়া চা তৈরী করিয়া আমায় খাইতে দিলেন। আমি বলিলাম—একটি মেয়ে গিয়ে আমায় আপনার এখানে আসতে বল্লে। ক'দিন ব্যস্ত ছিলাম বলে আসতে পারি নি—

ললিতবাবু বলিলেন—ও মণিয়া গিয়েছিল বুঝি? তা এসেছেন ভালই করেছেন। আমি ভাবছিলাম, কেন আর আসেন না।

স্বল্পমাত্র ভূমিকার পর ললিতবাবু আবার বইয়ের কথা পাড়িলেন।

—জানেন ব্যাপারটা, হাতে একটু টাকার ইয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম বই দুখানার একখানাও যদি লাগিয়ে দিতে পারেন তবে এ সময়ে কিছু পেলে বড় উপকার হত। তাই মণিয়াকে ওবেলা আপনার ঠিকানা দিয়ে—তা করেছেন কিছু?

বড় বিপদে পড়িলাম দেখিতেছি। ও বইয়ের আমি কি করিয়া কি করিব বুঝিলাম না। সেকথা ললিতবাবুকে বলিতে কিন্তু আমার মন সরিল না, কেন কি জানি!

বলিলাম—আজ্ঞে হ্যাঁ। দু-তিনজন পাবলিশারকে লিখেছি, এখনও উত্তর পাইনি—পেলেই জানাব আপনাকে।

ললিতবাবু বলিলেন—আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। মণিয়া যখন বাড়ী চিনে গেছে, ওই পরশু নাগাৎ আর একবার যাবে এখন—

—মণিয়া বুঝি আপনার এখানে কাজ করে?

ললিতবাবু যেন ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—হ্যাঁ—ইয়ে—মণিয়া?…হ্যাঁ—

আমি সেদিন বিদায় লইয়া আসিলাম। তৃতীয় দিন মণিয়া আমার বাসায় আবার গিয়া হাজির। এদিন আমার কৌতূহল হওয়াতে মণিয়াকে বলিলাম - ললিতবাবুর ওখানে কতদিন আছিস?

মণিয়া বেশী কথা বলে না, মুখ না তুলিয়া কি একটা বলিল ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়া বলিলাম—ললিতবাবুকে গিয়ে বলো কলকাতা থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে—

মণিয়া টাকা কয়টি লইয়া চলিয়া গেল। ইহার পর দিনকতক ললিতবাবু আমাকে বড় উদ্বাস্ত করিয়া তুলিলেন। কোন্ পাবলিশার তাঁর বই লইতেছে—কি কথা হইতেছে তাঁহাদের সঙ্গে ইত্যাদি। বই পড়িয়া রহিয়াছে আমার বাসায়। কলিকাতায় বইওয়ালারা এত বোকা নয় যে, ওই বইয়ের জন্ম অগ্রিম টাকা দিতে যাইবে। মুখে বলিলাম—বই নেবে কি না তার

ঠিক নেই তবে যদি নেয় তার বায়নাস্বরূপ টাকাটা দিয়েছে।

ললিতবাবু বুঝিলেন না যে, আমার কথা সম্পূর্ণ অর্থহীন। বায়না কথা ইহাকে বলে না, বা এ অবস্থায় কেহ বায়নার টাকাও দেয় না। অভাবের দিনে টাকা আসিয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কোথা হইতে আসিল, কেন আসিল অত বুঝিয়া দেখিবার অবসর ও ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। সেই হইতে মাঝে মাঝে তাঁহাকে দু এক টাকা পাঠাইয়া দিতাম মণিয়ার হাতে, কারণ মণিয়াকে বাঁধা নিয়মে প্রতি সপ্তাহে আমার বাসায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন।

কষ্টই হইত তাঁহার কথা ভাবিয়া! প্রৌঢ় হইলেও ললিতবাবু দেখিতে সুপুরুষ, ভাল হোক মন্দ হোক তিনিও একজন লেখক ছিলেন, আজ অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তিন কুলেও এদিকে কেহ নাই। এই দূর বিদেশে এই বয়সে কে তাঁহাকে দেখে, কে মুখের দিকে চায়? টাকা কোন্ প্রকাশক পাঠাইতেছে, একথা তিনি আমায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি কাল্পনিক পুস্তক-প্রকাশকের নাম করিতাম, তাহাদের কাল্পনিক চিঠির কথা বলিতাম, কোন রকমে সেকথা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িতাম।

শীতের শেষে সেবার মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম।

আসিবার পূর্বে ললিতবাবুর খাতা দুখানি তাঁহাকে ফেরত দিতে গেলাম। তিনি বলিলেন —কি হল মশায়?

—বড্ড গোলমাল হয়ে গেল সব। ওদের সে দোকানখানা উঠে গেল। তাইতে ভাইতে গোলযোগ, কেস্ রুজু হয়েছে. এ অবস্থায় আর ওরা—তাই পরশু আমায় খাতা ফেরত পাঠিয়েছে।

পুনরায় ঘটনাচক্রে মুঙ্গেরে গেলাম তিন বৎসর পরে।

গিয়াই সর্বপ্রথমে ললিতবাবুর কথা মনে হইল; কষ্টহারিণীর ঘাটে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিলাম, ললিতবাবু মুঙ্গেরে আছেন না অন্যত্র চলিয়া গেছেন; কিন্তু বিশেষ কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

একদিন শহরের বাহিরে টমটম ভাড়া করিয়া বেড়াইতে গিয়াছি, পথে শহর হইতে অন্ততঃ ছ-সাত মাইল দূরে একটা বড় বাগানবাড়ী দেখিয়া টমটমওয়ালাকে বলিলাম—এ কার বাগান-বাড়ী রে? টমটমওয়ালা ভাল বাংলা বলে। আমার কথার উত্তরে সে বলিল—ই বেণীগীর ফুলবাড়ী আছে। শুনিয়াই বাগানটা দেখিবার শখ হইল।

—দেখতে দেয়?

—হাঁ বাবুজি, হঁিয়া এক বাঙ্গালী বাবু আছে—দেখনে কাহে নেই দেবে?

আমার আগ্রহ আরও বাড়িল বাঙ্গালী বাবুর নাম শুনিয়া। টমটম গেটের সামনে দাঁড় করাইয়া বাগানের ভিতর গেলাম। অদ্ভুত বাগান। দেখিয়াই বুঝিলাম—এককালে খুব বড় ও সৌখিন বাগানবাড়ী ছিল, বর্তমানে সে অবস্থা নাই, কিন্তু বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ এই পরিত্যক্ত

বাগানবাড়ীর বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

গেট হইতে কাঁকর বিছানো পথটি বাঁকিয়া চলিয়াছে—গাছপালার আড়ালে যে ভাঙ্গা পুরাতন বাড়ীর চুন-বালি-খসা শ্রীহীন, জীর্ণ রূপ দেখা যাইতেছে সেদিকে। বাগানের সর্ব্বত্র খুব বড় বড় বৃদ্ধ গাছ—প্রধানতঃ বট, অশ্বত্থ, নিম, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়া, ছাতিম ইত্যাদি। গাছগুলির তলায় ঘন ফার্ণ ও কাঁটাজঙ্গল, এখানে ওখানে জংলী গোলাপের ঝোপ, কালো পাথরের হাতীর মুখ, মকর-মুখের পয়ঃনালী, হাতল-ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চি, চটা ওঠা ঠেস্ গাঁথা চাতাল, জঙ্গলের নীচে লতায় পাতায় কাঠবেড়ালীর লঘুপদে ত্রস্ত যাওয়া-আসা, বনটিয়ার ডাক বড় বড় গাছের পাতার ফাঁক দিয়া সূর্য্যালোক আসিয়া পড়িয়াছে, একটা পাথরে গাঁথা শুকনো ফোয়ারার ধারে ঘন চামেলির ঝোপ, চামেলি ফুলের মিষ্টি সুবাস, প্রাচীন বটগাছে ডাহুক পাখীর ডাক, আর পায়ের নীচের আধশুকনো লম্বা লম্বা উলুঘাসের মধ্যে বহুরূপীর গতিবিধির খড়মড় শব্দ···সবটা মিলাইয়া একটা নিবিড় শান্তি ও নীরবতা।

কোন বড় লোকের বাগান ছিল এক সময়, বোধ হয় অবস্থা খারাপ হইবার জন্য আর বাগান দেখাশোনা করিবার শখ নাই। ফোয়ারার কাছে দাঁড়াইয়া এইসব দেখিতে দেখিতে ঐশ্বর্য্যের নশ্বরতা লইয়া বেশ একটা গম্ভীর ধরণের প্রবন্ধ (যাহাতে মানুষের ও সমাজের সত্যকার উপকার হয়, হালকা গল্প বা উপন্যাস লিখিয়া লাভ কি ?) রচনা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

আমার সামনের কাঁকরের পথ দিয়া আসিতেছেন কষ্টহারিণী ঘাটের সেই লেখক ললিত ঘোষাল্।

আমি বলিলাম—ললিতবাবু যে! এখানে কি রকম? চিনতে পারেন?

ললিতবাবু চিনিতে পারিলেন। আমায় দেখিয়া খুব খুশী হইলেন। আমায় জোর করিয়া বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। আজ এখানে থাকিতে হইবে, কোন অসুবিধা নাই। কতকালের পর দেখা, অনেক কথা আছে, ইত্যাদি।

বাড়ীটা খুবই পুরানো, সামনে খুব বড় রোয়াক বা চাতাল, সেখানে আমরা পাথরের বেঞ্চিতে গিয়া বসিলাম। ললিতবাবুকে বলিলাম—তার পর? আপনাকে কত খুঁজেছি—মুঙ্গের শহরে আজ দিন পনেরো এসেছি। এখানে গড্‌ফরসেকন জায়গায় কি করে এসে পড়লেন? কিনেছেন নাকি? এখানে আর থাকে কে?

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—আস্তে, ব্যস্ত হবেন না। সবই দেখতে পাবেন। আপাততঃ একটু চা খান—দাঁড়ান বলে আসি—

ললিতবাবু কাহাকে চায়ের জন্য বলিয়া আসিলেন তখন বুঝি নাই, কিন্তু প্রায় আধ ঘন্টা পরে যে ব্রীড়াবনতা সুন্দরী হিন্দুস্থানী মেয়েটি চা ও পাঁপর ভাজা আনিয়া আমাদের সামনে রাখিল, তাহাকে দেখিয়া চিনিলাম। ললিতবাবু বলিলেন—চিনেছেন একে?

—হ্যাঁ, ও তো সেই মণিয়া! ও তা হলে এখনও আপনার কাছেই কাজ করে? কথাটা শুনিয়া ললিতবাবু হাসিলেন, মণিয়ার মুখেও সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিল। সে অন্যদিকে মুখ

ফিরাইল। ব্যাপার কি? আমার কথার মধ্যে হাসিবার কি আছে ভাবিয়া পাইলাম না।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, যাও, আর একটু চা দাও আমাদের—

মণিয়া চলিয়া গেলে ললিতবাবু আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—কে কার কাজ করে মশাই? মণিয়াকে আপনি ভাল করে কোনদিন জানেন না। এই ফুলবাড়ী ওর নিজের। আমি ওর আশ্রয়ে আছি। এটা ওর বাপের বাড়ী।

মণিয়াকে ললিতবাবুর ঝি বলিয়াই জানিতাম, কখনও আমার মনে আসে নাই যে, সে ছদ্মবেশিনী রাজকুমারী, সুতরাং কথাটা শুনিয়া তো দস্তুরমত আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম—মুঙ্গেরে যখন থাকতেন আপনি, তখন মণিয়া তো আপনার বাসায় কাজ করত—

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন—কখনও আমার বাসায় কাজ করতে ওকে দেখেছিলেন? আন্দাজ করেছিলেন আপনাকে ডেকে আনত বলে। আসল কথা জানতেন না।

—আসল কথাটা কি তাড়াতাড়ি বলুন, রহস্যটা কোথায়?

—মণিয়ার বাবার সঙ্গে ওর মায়ের বিয়ে হয় নি। ওর বাবা মস্ত ধনী জমিদার ছিলেন, ওর মা মজঃফরপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের মেয়ে—এই বাগানবাড়ীতে এনে ওর বাবা তাকে তাঁর কাছে রাখেন। মণিয়া ওদের একমাত্র সন্তান—এখন দুজনেই পরলোকগত, মণিয়া এই বাগানবাড়ীর মালিক। বুঝলেন কিছু? খুব সোজা কথা।

—খুব সোজা কথা নয়। মণিয়ার সঙ্গে আপনার কি ভাবে আলাপ, আপনিই বা এখানে থাকেন কেন, মণিয়ার অভিভাবকই বা কে ছিল—এসব কথা খুব সোজা আর কই?

ললিতবাবু বলিলেন—সে আরও সোজা কথা। আমি মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পরে আমিই এখন মণিয়ার অভিভাবক। আর একজন অছি আছেন মুঙ্গেরের উকিল বাবু কমলেশ্বরী সহায়। মধ্যে আমাকে ওরা সবাই ষড়যন্ত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই মুঙ্গেরে গিয়ে বছরখানেক ছিলুম। মণিয়া প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে যেত। আপনার কাছে ওকে পাঠাতুম বইয়ের দরুন টাকা আনতে। ও নিজেও অনেক সাহায্য করেছে—

বলিলাম—ওর বিয়ে হয়নি?

ললিতবাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ওর এই ইতিহাস শুনে কে ওকে বিয়ে করবে বলুন! বিশেষত, এ দেশ তো জানেন?

ইতিমধ্যে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বেলা আর বেশী নাই, চামেলি বনের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে বসিয়া আমাদের গল্প জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় মণিয়া আবার চা আনিল।

ললিতবাবু বলিলেন—মণিয়া, এ বাবুকে চিনতে পেরেছ?

মণিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

—কোথায় দেখেছিলে বল তো?

—মুঙ্গেরে। ওঁর বাসায়।

পরে আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ওর অত্যন্ত দেহাতি হিন্দীতে বলিল—ভাল আছেন বাবুজী ?

—হাঁ। তুমি ভাল আছ মণিয়া ?

এই সময় ললিতবাবু বলিলেন—রাত্রে কিন্তু থাকতে হবে আপনাকে। আমি দুটো কথা বলবার লোক পাইনে, এসেছেন যদি থাকুন। মণিয়া তুমিও থাকতে বল।

—আমিও তো বলছি, থাকুন বাবুজী। ভারী খুশী হব থাকলে।

অগত্যা রাজী হইতে হইল।

দেখিলাম মণিয়া সত্যই খুশী হইল। বলিল—রাত্রে আপনি কি খান বাবুজী ? উনি পুরি খান—আপনিও তাই খাবেন তো ?

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মণিয়া সত্যই সুন্দরী মেয়ে। হিন্দুস্থানী মেয়ের দেহের গড়ন ও বাঙ্গালী মেয়ের মুখের লাবণ্য, এ দুটির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে মণিয়াতে। দেহবর্ণ চম্পক গৌর, কাশ্মিরী মেয়ের মত ঈষৎ গোলাপী। মাথায় ঘন কালো এক ঢাল চুল। বড় বড় চোখ। আমার আশ্বাস পাইয়া মণিয়া উৎসাহের সহিত বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল—সম্ভবতঃ রান্নাবান্না করিতে গেল।

ললিতবাবু বলিলেন—বড্ড সেবাযত্ন করে আমাকে—মানে খুব। তা মানবে না ? আমাদের সঙ্গে ওদের কথা ? কত কান্নাকাটি করে আমায় আনল।

রাত্রে চমৎকার চাঁদ উঠিল। জ্যোৎস্নার আলো বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট, মেহগ্নি ও পাইন গাছের ডালে পড়িয়া সমস্ত উদ্যানটিকে যেন এক রহস্যময় পুরানো দিনের জগতে পরিণত করিল। আমার মনে পড়িল দুটি প্রেমিক-প্রেমিকার কথা—মণিয়ার বাবা ও মা—তাঁরা সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করিয়া এই নিভৃত নিরালা বাগানে পরস্পরের প্রণয়কে মাত্র সম্বল করিয়া জীবনের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

মণিয়া আমাদের ডাকিয়া লইয়া গেল খাইবার জন্য। তখন রাত দশটার কম নয়। এই এত বড় বাড়ীর নিভৃত রান্নাঘরটিতে বসিয়া মেয়েটি এতগুলি রান্না রাঁধিয়াছে, এক চুপড়ি আটার পুরী ভাজিয়াছে—আগুনের তাতে সুন্দর মুখখানি রাঙা, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম—দীর্ঘ কালো কেশপাশ অবিন্যস্ত—দেখিয়া তাহার উপর কেমন মমতা হইল।

মণিয়া কাছে বসিয়া আমাদের যত্ন করিয়া খাওয়াইল, নিজের হাতে ললিতবাবুকে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, মশলা সুপারী দিয়া গেল—হিন্দুস্থানীর দেশে পান খাওয়ার তেমন রেওয়াজ নাই।

ললিতবাবুর উপর হিংসা হইল—লোকটা তোফা তোয়াজে আছে। মণিয়ার মত মেয়ের সেবা যে দিনরাত পায়, তাহার উপর হিংসা হয় বৈকি। লোকটার বরাত ভাল।

এইভাবে ললিতবাবুর সঙ্গে যে আলাপ-পরিচয়ের সূত্র পুনরায় স্থাপিত হইল, আমার এক বৎসরব্যাপী যুদ্ধের প্রবাসের মধ্যে সেই সূত্র ধরিয়া অনেকদিন বেণীগীর ফুলবাড়ীতে গিয়াছি।

বার দুই যাইবার পরে আমার কৌতূহল বড় বাড়িল। হয়তো আমার সে কৌতূহল

অযথা ধরনের, তবুও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কৌতূহল শুধু এই বিষয়ে যে, মণিয়া ও ললিতবাবুর মধ্যে সম্পর্কটি কি। ললিতবাবুর বয়স বাহাত্তর হইতে পারে, সাতাত্তর হইতে পারে, বাট বলিলেও দোষ ধরিতে পারা যায় না। মণিয়ার বয়স খুব বেশী হইলেও চব্বিশের বেশী কখনও নয়।

পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক। ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্ক। অভাবপক্ষে ভাই বোনের সম্পর্ক। বয়স হিসাবে তাই হওয়া উচিত এবং হইলে দেখাইত খুব ভাল, মানিয়া লইতাম। কিন্তু জগতে যাহা ভাল দেখায়, যাহা হওয়া উচিত, তাহা সব সময় ঘটে না ইহাই দুঃখ।

একদিনের কথা বলি, কি করিয়া প্রথম আমার সন্দেহ হইল।

সেদিন ভয়ানক গরম, দারুন রোদের তাত, বেলা তিনটার সময় আমি গিয়াছি ওখানে, গিয়া দেখি মণিয়া ছাড়া আর কেহ নাই বাড়ীতে।

সে আমায় দেখিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন দুপুরের পরে, এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবার কথা—এখনও ফিরলেন না, কি হবে?

জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, ললিতবাবু বালিশের জন্ত শিমূল তুলা কিনিতে গিয়াছেন নিকটবর্ত্তী কি একটা বস্তিতে। আমি যত মণিয়াকে বোঝাই, তাহার সে কি ব্যাকুলতা, কি উদ্বেগ, বার বার ঘরবাহির করার সে কি চঞ্চল ভঙ্গী! আমি সেদিন মণিয়াকে নতুন দৃষ্টি দিয়া দেখিলাম যেন। সেই একদিন দেখিয়াই আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলাম, মণিয়া ললিতবাবুকে ভালবাসে। পিতাপুত্রী নয়, ভাইবোন নয়। নায়িকার মত ভাল না বাসিলে ঠিক সে জিনিসটি হয় না—চোখে না দেখিলে কি করিয়া তাহা বুঝাইব!

তাহার পর ললিতবাবু একদিন আমাকে সামান্ত একটু বলিলেন। কথায় কথায় মণিয়ার কথা উঠিলে আমায় বলিলেন—ও আমার মুখের দিকে চেয়ে ওর যৌবনের দিনগুলো কাটাল—কতবার ভাবি, আমার অবর্ত্তমানে ওর কি যে হবে! সমাজে ওর স্থান কোনদিনই নেই। আমায় ছাড়া ও কাউকে জানেও না। ভেবে কষ্ট হয় এক এক সময়!

একটি কুড়ি-একুশ বছরের তরুণী যে একজন পঞ্চান্ন বছরের (কম পক্ষে) বৃদ্ধকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিতে পারে, নিজের চক্ষে দেখার পূর্ব্বে সে কথা কেহ যদি বলিত, তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম।

জীবনের কি রহস্তই বা আমরা জানি! মণিয়ার ভালবাসা দেখিয়া জীবনের একটি অজ্ঞাত তথ্য জানিয়া বিস্মিত হইলাম।

আরও একটি ব্যাপার দেখিলাম।

ললিতবাবু সম্পূর্ণ বেকার, একটি কানাকড়ি দিয়াও তিনি মণিয়াকে সাহায্য করিতে অক্ষম, অথচ তাঁহার যাহা কিছু খরচ সব যোগাইতে হয় মণিয়াকেই এবং সে অম্লান বদনে তাহা এযাবৎ সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। ললিতবাবু তাঁহার স্বগ্রামস্থ এক বেকার ভ্রাতুষ্পুত্রকে মাসিক অর্থসাহায্য করেন (চার পাঁচ বার ললিতবাবু আমাকেই টাকাটা দিয়াছিলেন মনিঅর্ডার করিবার জন্ত, কারণ তাঁহাদের এখানে নিকটে ডাকঘর নাই), তাহাও মণিয়ার পয়সায়। ললিতবাবু যখন একা মুঙ্গেরের বাসায় থাকিতেন, তখনকার অপেক্ষা এখন তাঁহার চাল অনেক

বাড়িয়াছে। পরের পয়সায় আমাদেরও বাড়িত। কথাবার্তার মধ্যে একদিন ললিতবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মণিয়ার বাবার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন কতদিন? কি ভাবে আলাপ হয়?

—শুনবেন? কলকাতায় যখন বইটই আর কেউ নিতে চায় না, পাবলিশার খুঁজে পাইনে, তখন তো এলাম মুঙ্গেরে, আজ থেকে বছর বারো আগে। বাবু কমলেশ্বরী সহায় এখানকার বড় উকিল, তিনি বল্লেন, একজন বড়লোক মক্কেল বাঙ্গালী সেক্রেটারী খুঁজছে, ইংরিজি চিঠিপত্র লেখার জন্যে—তাই এখানে এসে মণিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করি; চাকুরিও হয়ে গেল—সাত বছর ছিলাম। মণিয়ার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে গিয়ে মুঙ্গেরে বাসা করে থাকতাম, সে অবস্থায় আপনি আমায় দেখেছিলেন সেবার। মণিয়া জোর করে আবার নিয়ে এল এখানে। কি করি বলুন?

সত্যই তো। বেচারী ললিতবাবু! কি করিবার ছিল তাঁর? মণিয়াকেও দেখিয়াছি, ললিতবাবুকে সে ছায়ার মত অনুসরণ করে। তাঁহার এতটুকু কষ্ট বা অসুবিধা—বাস্তব বা কাল্পনিক, দূর করিতে কি ব্যাকুলতা! নিজের চোখে যাহা দেখিতে পাই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারি কই? মাস কয়েক যাতায়াতের ফলে ক্রমে আমার মনে হইল যে, মণিয়া যতটা করে, ললিতবাবুর দিক হইতে তাহার অর্দ্ধেকও নাই, বরং আরও কম। ললিতবাবু এখানে আছেন যে, তাহার কারণ মণিয়ার উপর তাঁহার দরদ নয়, তিনি বর্ত্তমানে বেকার, মণিয়া তাঁহার সব খরচ চালাইয়া থাকে—এইজন্য।

ললিতবাবু মণিয়াকে তাঁহার ঝি বা পাচিকার মত ভাবেন যেন, হুকুমের উপর তাকে সর্ব্বদা রাখিয়াছেন। অনেক সময় ভাবটা এই রকম দেখান যে, তিনি অতি বড় লোক বাঙ্গালী, এখানে যে অবস্থান করিতেছেন সে নিতান্তই মণিয়ার উপর কৃপা করিয়া।

বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বনস্পতিদের ছায়ায় চামেলি ঝোপের ধারের হাতল-ভাঙ্গা লোহার বেঞ্চিতে বা পুকুরের ভাঙা ঘাটে বসিয়া কতদিন তরুণী মণিয়ার জীবনের এ অদ্ভুত ট্রাজেডির কথা চিন্তা করিয়াছি।

জগতে কেন এমন ঘটে, অমন সুন্দরী মেয়ে—কত তরুণ প্রেমিক যাহার এক কণা অনুগ্রহ পাইবার জন্য অসাধ্য সাধন করিতে রাজী হইতে পারিত—তাহার অদৃষ্টে একি দুর্ভোগ!

একদিন এ অবস্থায় একা বসিয়া আছি, মণিয়াকে দূরে দেখিতে পাইয়া ডাকিলাম। এ সময়টা সে খানিকক্ষণ আপন মনে বাগানে বেড়ায় জানি।

মণিয়া কাছে আসিয়া বলিল—এখানে বসে কেন বাবুজী?

—বেশ বসে আছি। ললিতবাবু উঠেছেন?

—এখনও ওঠেন নি। উনি ঠিক চার বাজলে ওঠেন—তারপর চা করব্।

ললিতবাবুর বৈকালিক নিদ্রা ঘড়ির কাঁটার মত বাঁধা পথ ধরিয়া চলে, নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম বড় একটা ঘটিতে দেখিলাম না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে।…

মণিয়ার পরনে একখানা হাল্‌কা চাঁপা রঙের শাড়ী, গায়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মত কোর্ত্তা, সুগঠিত গৌরবর্ণ বাহু দুটিতে বাজু, কানে বড় বড় কানবালা, কপালে কালো টিপ। রূপকথার রাজকুমারীর মত সম্পূর্ণ সেকেলে ধরনের বেশভূষা ওর, হালফ্যাশানের বড় একটা ধার ধারে না, দেহাতি মেয়ে, সম্ভবতঃ জানেও না।

বলিলাম, বসো মণিয়া—

—না বাবুজী, দাঁড়িয়ে আছি বেশ, সারাদিন তো বসে থাকি—

—তুমি আপন মনে বেড়াও এ সময়টা, না ?

—হ্যাঁ বাবুজী, উনি ঘুমোন, আমার কাজকর্ম্ম থাকে না—একটু বেড়িয়ে বেড়াই—

—ঘুমোও না বুঝি ?

—না, দুপুরে আমার ঘুম ভাল লাগে না। অভ্যেস নেই বাবুজী।

—আচ্ছা, এ বাগানে কতদিন আছ ?

—ছেলেবেলা থেকেই। এই তো আমাদের বাড়ীঘর। বাবা মা ছিলেন যখন, তখন খুব ভাল ছিল—বাবার বাগানের শখ ছিল খুব। নিজের হাতে গাছ পুঁতেছিলেন কত। একটা বটগাছ আছে বাবার হাতে পোঁতা, তার পাতাগুলো জুড়ে ঠোঙার মত হয়ে যায়—নাকি কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে বৃন্দাবনে যমুনার ধারে অমনি হত, বংশীবট বলে এদেশে। আসুন দেখবেন।

আমাকে সে পুকুরের ওপারে বাগানের দক্ষিণ কোণে লইয়া গেল। বনের মধ্যে একটা ছোট বটগাছ, তাহার কচি পাতা পরস্পর জোড়া লাগিয়া ঠিক যেন ঠোঙার মত। মণিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখলেন ? কি তাজ্জব বাবুজী ? না ?

বিস্মিত হইবার মত মুখ করিয়া বলিলাম, তাজ্জবই বটে, সত্যি—

মণিয়া হাত নাড়িয়া উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল—দেখুন কতকাল আগে কৃষ্ণজী দুধ খেতেন বলে এখনও পাতাগুলো ওর জোড়া লেগে যায়। এতেও লোকের অবিশ্বাস ঘোচে না—বলুন বাবুজী !

বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম—ঠিক বলেছ মণিয়া—খুব ঠিক—

উহার সরল বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করিবার আমি কে ?

জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার বাবা কতদিন মারা গিয়েছেন ?

—ছ বছর বাবুজী।

—উনি মারা যাওয়ার পর কোথায় ছিলে ?

—কোথাও না বাবুজী, এখানেই। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই সঙ্গে থাকত।

—তা ওরা এখন কোথায় ?

—উনি আসাতে চলে গিয়েছে। কি করি বাবু, মুঙ্গেরে বড় কষ্ট পেতেন উনি, বাবা এমন কিছু রেখে যান নি যে সেখানকার সব খরচ দিই। তবে এখানে থাকলে চলে যায় এক রকমে। ওঁর কষ্ট চোখে দেখে থাকতে পারলাম না, তাই নিয়ে এলাম।

—তোমার ভাই তাতে চটল বুঝি ?

—উঃ, ভারি রাগ তাতে, বলে বাংগালি বাবুকে কেন নিয়ে এলি তুই ? আমিও বলেছি —ওর আসা পছন্দ না কর চলে যাও ; আমার বাড়ী, আমি যা ভাল বুঝব করব। তাই চলে গেল। এখন উনি ছাড়া আর আমার কে আছে বাবুজী !

মণিয়ার চোখ দুটি ছলছল্ করিয়া উঠিল। মেয়েটি সত্যবাদিনী, তাহার স্পষ্ট সত্য কথা বলিবার সাহস দেখিয়া প্রীত হইলাম। অন্য কথা পাড়িবার জন্য বলিলাম—গান গাইতে পার মণিয়া ?

মণিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিল—বেশী কিছু না বাবুজী, বহুৎ একটু—

—গাইবে। গাও না ?

মণিয়া কি বুঝিল জানি না, বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া প্রতিবাদের সুরে বলিল—বাবুজী—

আমি মণিয়ার সহিত প্রেম করিতে চাহি নাই। মণিয়া আমাকে ভুল বুঝিয়া বলিল। সেভাবে কথাটা বলি নাই আমি। বলিলাম—এখন না হয়, সন্ধ্যের সময় করো। ললিতবাবু যদি বলেন—তাহলে গাইবে ?

অতিথির প্রতি উহার কর্তব্যবোধ ও ভদ্রতা বড়ঘরের ঘরানার উপযুক্ত বটে। কি সুন্দরী দেখাইতেছে মণিয়াকে ! উহাকে দেখিলেই আমার মনে হয় ও সেকালের মেয়ে, সেকালের বেশভূষায়, প্রাচীন উদ্যানের বনস্পতিদের পটভূমিতেই ওকে মানায়, অন্যত্র ও নিতান্ত খাপছাড়া।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, প্রাচীন বটের ডালে ডাহুক ডাকিতেছে, ললিতবাবুর ঘুম ভাঙিবার সময় হইল। বলিলাম—চলো মণিয়া, চারটে বাজে—

সন্ধ্যার পর ললিতবাবুকে বলিয়া মণিয়াকে গান গাওয়াইলাম। ওর এমনি খুব সুরেলা গলা, তবে বিহারী দেশওয়ালী গ্রাম্যসুরের গানই বেশী জানে। বেণীগীর ফুলবাড়ীতে বড় বড় গাছপালা, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়া, চামেলির বন আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া গেল গান শুনিতে শুনিতে—আমি যেন অতীত যুগের ভারতে ফিরিয়া গিয়াছি। বাণভট্ট কি শূদ্রক বা ওই ধরনের কোন কবির নায়িকা জীবন্ত হইয়া যেন আমার সামনে বসিয়া সুন্দর হাতটি নাড়িয়া বীণা বাজাইয়া অর্দ্ধমাগধী ভাষায় সঙ্গীত গাহিতেছে…

সেদিন জ্যোৎস্নারাত্রের আলোছায়ার মধ্যে মণিয়াকে দেখিয়া আমার মনে হইল, কবি বাণভট্ট সে যুগের ঠিক এমনি একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখিয়া তাঁহার কাব্যের মহাশ্বেতার কল্পনা করিয়া থাকিবেন—সমগ্র বৃদ্ধ পৃথিবীকে নবযৌবনের সাজে সাজাইবার মায়ামন্ত্র যে ইহাদের সুন্দর মুখের স্মিতহাস্য, ইহাদেরই পদ্মপলাশলোচনের অশ্রুজল। হয়তো তখন আমার বয়স কম ছিল বলিয়াই মণিয়াকে আমার অত ভাল লাগিয়াছিল। এখনও বিহার বা পশ্চিমের কথা মনে হইলেই আমার মনের চোখে ভাসিয়া ওঠে বেণীগীর ফুলবাড়ী, তার প্রাচীন গাছপালা, চামেলি বন ও রূপসী মণিয়া।

মাস খানেক পরে।

একদিন ললিতবাবু মুঙ্গেরে আমার বাসায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলাম, আসুন, আসুন ললিতবাবু, কখন এলেন ?

ললিতবাবু কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন—এই এলাম মশাই। দেশে যাচ্ছি।

একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, দেশে ?

—হ্যাঁ দেশে। ওখান থেকে চলে এলাম—

—চলে এলেন ? তার মানে ? মণিয়া কেমন আছে ?

ললিতবাবু ঝাঁজের সহিত বলিলেন—ভালই আছে। আমার পোষালো না, চলে যাচ্ছি।

—ব্যাপার কি ? হলো কি ?

—হবে আর কি ? আমি কারো হাত-তোলা খেয়ে থাকতে পারব না। হয়েছে কি, আমার বাড়ীতে একটা সাড়ে এগারো টাকার রেভিনিউ মণিঅর্ডার পাঠাতে হবে, আজ কদিন ধরে চাচ্ছি টাকাটা। কবার চাইব ? আমার মান বলে একটা জিনিস আছে তো ? আজ দেব, কাল দেব, আজ ওবেলা নিয়ে এসেছে পাঁচটি টাকা। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আরে, আমার বইয়ের এককালে তিন-তিনটে এডিশন হয়েছে, আমায় টাকা চেনাতে হবে না। ওর মা মাগী ছিল ভ্রষ্টা, ওদের কি ভদ্রস্থতা আছে মশাই ? ভদ্রলোকের খাতির কি বোঝে ছাতুখোর মেড়ুয়াবাদীর দল ?

ললিতবাবুর মুখের এ কথার কিছুদূর পর্য্যন্ত আমি প্রণয়ীর অভিমান বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিতাম হয়তো, কিন্তু তাঁহার উক্তির সবটা এভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহার চরিত্র ও মেজাজের উপর আমার অশ্রদ্ধা হইয়া গেল। টাকার জন্ম আমাকে পূর্ব্বে তিনি কি রকম উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, (কারণ তাঁহার পুস্তক প্রকাশের আসল উদ্দেশ্য সাহিত্য-প্রীতি নয়—টাকা, তাহা অনেক দিন বুঝিয়াছি) সে কথা মনে পড়িল।

আমি বলিলাম—হয়তো মণিয়ার কাছে নেই, এ হতে পারে।

—নেই তো কি মশাই, সাতটা টাকা আর নেই ? এর আগেও বাড়ীতে টাকা পাঠাবার বেলা এমনি করেছে। তাছাড়া ঠিক সে কথাও নয়, আমার আর ভাল লাগছে না এ ছাতুখোরের দেশ। দেশে গিয়ে মানকচু আর নলেনগুড়ের পায়েস খেয়ে বাঁচি দিনকতক। রাঁধতে পারে কেউ এদেশে ? যা রাঁধবে এক তরকারী, বেগুন বেগুনই এক তরকারী, পটল পটলই এক তরকারী—এ দেশে মানুষ আছে ? রামোঃ—

বলিলাম—দেশে কে আছে আপনার ?

—ভাইপো আছে, ভাইপোর স্ত্রী আছে, তাদের ছেলে-মেয়েরা আছে, নেই কে ? তাদের ফেলে বিদেশে থাকা কি পোষায় এই বয়সে, বলুন তো ? দেশে থাকলে অভাব কি আমার ? এ ছাতুর দেশে আর না, ঢের হয়েছে, হাঁপিয়ে উঠেছে প্রাণ—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই।

মনে ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, দেশে থাকিলে যদি চলিবার ভাবনা নাই, তবে ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে

প্রতি মাসে টাকা পাঠানোর কি দরকার হইত ছাতুর দেশ হইতে? এবং তাও একটি ছাতুর দেশের সরলা মেয়ের নিকট হইতে ভুলাইয়া লওয়া টাকা?

নাঃ, লোকটা অকৃতজ্ঞের একশেষ। চলিয়া গেল তুপুরের ট্রেনে। আমি তুলিয়া দিতে পর্যান্ত গেলাম না। ঘৃণা হইল লোকটার প্রতি।

ললিতবাবু চলিয়া যাইবার তুদিন পরে আমার বাসায় জানলার কাছে বসিয়া আছি, এমন সময় দেখি মণিয়া বাসার সামনে টমটম হইতে নামিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইলাম। মণিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে বলিল—বাবুজী, উনি কোথায় জানেন? আপনার এখানে এসেছিলেন? ওখান থেকে বেরিয়েছেন আজ তুদিন হল, সঙ্গে টাকাকড়ি আছে, উনি তো আপন-ভোলা মানুষ—আমার বড্ড ভয় হয়েছে—মুঙ্গের বড় খারাপ জায়গা বাবুজী—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—টাকাকড়ি কিসের?

—আমার হার ছড়াটা ভেঙে গড়াতে দেবেন বলে সঙ্গে আনলেন আর পঞ্চাশটা টাকা—ওঁর নিজের কি দরকার আছে বল্লেন; আর বাগানের বড় চাতালটা—যেখানে বসে আপনারা চা খান, ওটা মেরামত করবার জন্যে চুণ আর সিমেণ্ট কেনবার দরকার—তাই। কালই ফিরবার কথা ছিল, কিন্তু আজ সকালেও যখন এলেন না তখন আর স্থির থাকতে পারলাম না—আপনার এখানে আসেন নি বাবুজী?

ব্যাপার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম।

কেন জানি না, মণিয়াকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে পারি নাই। অর্থনষ্টের দুঃখ হইতেও বড় দুঃখ আছে—এই সরলা দেহাতি তরুণীর মনে সে দুঃখ বড় বিষম বাজিত। হয়তো মণিয়ার প্রতি কোন ধরনের দুর্ব্বলতা ছিল আমার, তাই সে দুঃখের হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইলাম।

—বলিলাম, ললিতবাবু ভাইপোর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ দেশে চলে গিয়েছেন, আমার ঠিকানায় তার এসেছিল। টাকাটা সঙ্গে নিয়ে গেছেন, খরচপত্রের দরকার আছে বল্লেন। হারগাছটা তাড়াতাড়িতে দিতে পারেন নি, দেশের সেকরাকে দেবেন ভেঙে গড়াতে।

ইহার পর আমি বেশীদিন মুঙ্গেরে ছিলাম না; যে কদিন ছিলাম মণিয়া ছয় সাত দিন অন্তর আসিয়া ললিতবাবুর কোন চিঠি আসিল কি না খবর লইত। বলা বাহুল্য, ললিতবাবু কোন চিঠি দেন নাই।

সেই মাঘ মাসে আমি মুঙ্গের হইতে চলিয়া আসিলাম এবং তাহার পর প্রায় পাঁচ বছর ওদিকে যাই নাই। বিগত ১৯৩৪ সালের বিহার ভূমিকম্পের পর পিসিমাদের দেখিতে আমি আবার মুঙ্গেরে যাই।

মুঙ্গেরে পদার্পণ করিয়াই শহরের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে মুঙ্গের নাই—চারিদিকে ধ্বংসদেবের প্রলয় তাণ্ডবের পদচিহ্ন। অবশ্য ভূমিকম্পের পর তখন তিন চার মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন কি মনে করিয়া একখানি টমটম ভাড়া করিয়া বেণীগীর ফুলবাড়ীর দিকে রওনা হইলাম।

বেণীগীর ফুলবাড়ীতে মণিয়াদের সে জরাজীর্ণ বাড়ীটা ভূমিকম্পে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, মণিয়াও বাঁচিয়া নাই, বাড়ী চাপা পড়িয়া হতভাগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, বেণীগীর ফুলবাড়ীর প্রাচীন বট, মেহগ্নি, কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় মহাশ্বেতার বীণার ক্লান্ত স্বর কাঁদিয়া কাঁদিয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে—ইহাই সেখানে নিশ্চয় দেখিব ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছিলাম।

কিন্তু তাহার বদলে যাহা দেখিলাম তাহার জন্য সত্যই প্রস্তুত ছিলাম না।

ফুলবাড়ীর সামনে টমটম হইতে নামিলাম। ফটক দিয়া ঢুকিতেই গাছপালার ফাঁক দিয়া চোখে পড়িল, বাড়ীটা যেন মাটির উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। বাগানের ও বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া জনশূন্য বলিয়াও বোধ হইল না। আরও কিছু অগ্রসর হইয়া শুকনো ফোয়ারাটার ধারে চামেলি বনের কাছে যাইতেই কাছে একটি মেয়েকে গাছের ডালে বাঁধা তারের আলনায় কাপড় মেলিয়া দিতে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। সেই সময় পায়ের শব্দে মেয়েটিও চমকিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম সে মণিয়া।

মণিয়ার চেহারার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটু মোটা হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রী বদলাইয়াছে, তবুও সে এখনও সুন্দরী।

বলিলাম— চিনতে পারো মণিয়া ?

মণিয়ার ডাগর চোখ দুটিতে বিস্ময়ের দৃষ্টি তখনও কাটে নাই। আমার দিকে অল্পক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর উজ্জ্বল মুখে বলিল—বাবুজী ? আসুন, আসুন, এতদিন কোথায় ছিলেন ? সেই চলে গেলেন—আর খোঁজ নেই, খবর নেই, কত ভেবেছি আপনার জন্যে।

—এখানে ছিলামই না—দিন কয়েক হলো আবার এসেছি। যে কাণ্ড হয়েছে দেখলুম তোমাদের দেশে! তারপর তুমি ভাল আছ ?

মণিয়া সুন্দর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আপনার আশীর্ব্বাদে বাবুজী প্রাণে বেঁচে গিয়েচি সব! এ বাড়ীটার বিশেষ কিছু হয় নি—আসুন না, চলুন বাড়ীতে—

বলিলাম—বাড়ীতে তুমি, এখন—মানে আর কে আছে ?

মণিয়া বলিল—আমার দাই-মা, আর চাচেরা ভাই আছে—পরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—আর উনি আছেন।

পরম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম—কে ? ললিতবাবু ?

মণিয়া পুনরায় সলজ্জ হাসিয়া চোখ নীচু করিয়া বলিল—আবার কে বাবুজী ? সেই তো চলে গেলেন, দুবছর ছিলেন দেশে। আমার দাই-মা আর চাচেরা ভাই আবার এল। তিন বছরের মাথায় উনি ফিরলেন। মাগো, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছেন! বাঙ্গলা মুলুকের জল-হাওয়া একদম নরম, ওঁর এতকাল পশ্চিমে বাস, সহ্য হবে কেন ? হাতে পয়সা যা নিয়ে

গিয়েছিলেন, কবে উড়িয়ে বসে আসেন, আমার হার ছড়াটা পর্যন্ত—সে যাক্‌গে বাবুজী—ওর এই দাড়ি, চুল, ময়লা কাপড়, দশা দেখে তো কেঁদে বাঁচিনে। সেই থেকে আছেন। এখন বেশ শরীর সেরেছে। আর দেশে যাওয়ার নামটি মুখে আনতে দিইনে—

অবস্থা শুনিয়া মনে হইল, ললিতবাবুও বর্ত্তমানে সেকথা মুখে আনিবেন এমন কাঁচা লোক তিনি কখনই নহেন। বলিলাম—কোথায় উনি?

মনিয়া হাসিমুখে বলিল—চলুন, আসুন বাড়ীতে বাবুজী, ভারি ভাগ্যি আপনি এলেন! উনি খুব খুশী হবেন আপনাকে দেখে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি—চার বাজলেই উঠবেন—তারপর চা করব—আসুন।

প্রাচীন বটের ডালে পুরনো দিনের মত ডাহুক ডাকিতেছিল। বেণীগীর ফুলবাড়ী ঘুমন্ত স্বপ্নপুরী যেন, মণিয়া রাজকুমারী, ঘুম ভাঙ্গিয়া সদ্য উঠিয়াছে। সময় এখানে অচল।

ললিতবাবু লোকটার উপর পুনরায় ভয়ানক হিংসা হইল।